শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

আদি-লীলা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দুর্জ্ঞেয়, দুষ্প্রবেশ্য, গূঢ় চরিতের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে, তিনি যে সম্প্রদায়-বিশেষের আরাধ্য দেবতা, সেই সম্প্রদায়-বিশেষের বিষয় অগ্রেই কিছু জানা আবশ্যক। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তাঁহাতেই গতজীবন, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শরীর ও আত্মা। শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞান-বিহীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই আকাশ-কুসুম। বৈদিক-সম্প্রদায়-বিশেষের নামই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। ইদানীন্তন কোন কোন বিজ্ঞম্মন্য অজ্ঞ লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে যেরূপ বিবেচনা করেন, বস্তুতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সেরূপ একটি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তদীয় আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সম্প্রদায়ের প্রাণ, অনাদি বেদকল্পতরু হইতে যাঁহার আবির্ভাব, শুক-নারদ-সনক-সনাতনাদি পরমহংস সকল যে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, ব্রহ্ম-শিব-ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি যাঁহার পথপ্রদর্শক এবং জগৎপূজ্য শ্রীরূপাদি গোস্বামিপাদগণ যে সম্প্রদায়ের আচার্য্য, সে সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্টতা স্বতঃ-সিদ্ধা। ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের স্মরণীয়, ব্রজবধূবর্গকল্পিতা উপাসনাই এই সম্প্রদায়ের অনুসরণীয়া, অমল শ্রীভাগবতশাস্ত্রই এই সম্প্রদায়ের প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকাতে একবার বৈদিক সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকাতে বৈদিক সম্প্রদায়ের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

"পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর অপৌরুষেয় বেদার্থের সমালোচনা করিতেন। সাত্ত্বিকাদি-গুণ-গত অধিকারতারতম্য বশতঃ

তাঁহাদিগের ব্রত ও সমালোচনার তারতম্যানুসারে শ্রুতিসমূহের যে অর্থগত তারতম্য হয়, সেই তারতম্যই আর্য্যসমাজের সম্প্রদায়-ভেদের প্রধানতম কারণ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণ সকল বাহ্যজগতের ন্যায় আন্তরজগতেও নিজ নিজ সামর্থ্য অভিব্যক্তি করিতেছে। গুণ হইতে প্রবৃত্তির ভেদ এবং তাহা হইতে অধিকার-ভেদ সংঘটিত হয়। সত্ত্বগুণ হইতে অনুকূলা, রজোগুণ হইতে তটস্থা এবং তমোগুণ হইতে প্রতিকূলা ও উদাসীনা প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়। সাত্ত্বিক অনুরাগ হইতে প্রবৃত্তা, রোচনীয়া প্রবৃত্তির নাম অনুকূলা প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ে জীব দেবতুল্য ও প্রেমিক হয়েন এবং ভগবত্তত্ত্বে উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করেন। রাজস অনুরাগ হইতে প্রবৃত্তা স্বরূপানুসন্ধানায়িকা প্রবৃত্তির নাম তটস্থা প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ে জীব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করেন ও অনুসন্ধানপরায়ণ হয়েন এবং পরমেশ্বরতত্ত্বে মধ্যমাধিকার লাভ করেন। তামস অনুরাগ হইতে প্রবৃত্তা, দ্বেষময়ী প্রবৃত্তির নাম প্রতিকূলা প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ে জীব অহঙ্কৃত ও পশুতুল্য হয়েন এবং ঈশ্বরতত্ত্বে অধম অধিকার লাভ করেন। এই অবস্থায় ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস জন্মিবার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই তাদৃশ অধিকারীকে অধম অধিকারীর মধ্যেই নির্দ্দেশ করা হয়। ঐ তমোগুণ অপর একটি মহান্ অপকার সাধন করিয়া থাকে। উহা যে জীবে সমধিক প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়, তাঁহার নিকৃষ্টা প্রতিকূলা প্রবৃত্তিও দৃষ্ট হয় না। তিনি উপেক্ষাময়ী উদাসীনা প্রবৃত্তিতেই বিমূঢ় থাকেন। ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় না। তিনি সর্ব্বদাই তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া নাস্তিক আখ্যায় সমাখ্যাত হয়েন। যিনি অতি দুর্ভাগ্য, তাঁহারই এই শোচনীয়া দশার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

"প্রথমোক্ত ত্রিবিধ অধিকারীই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, অতএব বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য হয়েন। আর শেষোক্ত অধিকারী বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, সুতরাং বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও গণ্য হয়েন না। উক্ত সম্প্রদায় সকলের মধ্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, এই তিনটি অবান্তর ভেদও সুস্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে। বেদশব্দের অর্থভেদই উক্ত ভেদত্রয়ের একমাত্র কারণ। নানার্থসমুদ্গারিণী শ্রুতিকামধেনু স্বীয় সেবকবৃন্দের অভিলষিত অর্থ-নিচয় দোহন করিয়া থাকেন। ঋষিগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যিনি যে শ্রুতির যে অর্থ অবধারণ করিতেন, তাঁহার শিষ্যপরম্পরা সেই অর্থের গ্রাহক হইয়া সম্প্রদায়ভেদের প্রবর্ত্তক হইতেন। এইরূপেই বেদতরু বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। এই কারণেই স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রগত মতভেদ সংঘটিত হইয়াছে। এই

কারণেই বিভিন্নমতবোধক বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে বৈদিক শাস্ত্র-সমূহে আপাত-প্রতীয়মান সজাতীয় ও স্বগত মতভেদ উপস্থিত হইলেও, বিজাতীয় মতভেদের অভাব বশতঃ উহাদিগের একটি অপরটির অস্তিত্ব প্রতিকূল নহে। বৈদিকশাস্ত্র ও অবৈদিকশাস্ত্রের মধ্যে বিজাতীয় ভেদ থাকাতে উহারা যেরূপ একতর অন্যতরের উপমর্দ্দক হয়, বৈদিক-শাস্ত্র-সমূহের মধ্যে সেরূপ পরস্পরের উপমর্দ্দকতা নাই। তবে যে কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির উক্তিতে বা ব্যাখ্যানে ঐরূপ আন্দোলন শ্রুতিগোচর হয়, সে কেবল তাঁহাদিগের জিগীষা বা অজ্ঞতা প্রযুক্তই জানিতে হইবে। এক সম্প্রদায় জিগীষাপরবশ হইয়া অপর সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল বৃথা দোষারোপ করেন, তাহা কখনই বিজ্ঞজনের গ্রাহ্য হইতে পারে না। যখন একটি বৈদিক সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলিলে, চালনীয়-ন্যায়ে সকল বৈদিক সম্প্রদায়ই অবৈদিক হইয়া পড়িবেন, তখন ঐরূপ বলা কেবল নিজের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র।"

"বৈদিক সম্প্রদায় হইতে অবৈদিক সম্প্রদায়ের পার্থক্যাববোধার্থ উভয়ের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাঁহারা বেদ ও বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন ও তত্তৎ-শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের অচল বিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বের স্বরূপনির্ণয় ও উপাসনাদি বিষয়ে একমাত্র বেদই যাঁহাদের মুখ্য প্রমাণ, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-নিচয়ের অত্যন্ত অবিষয় পরমতত্ত্বই যাঁহাদের আরাধ্য, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই বৈদিক তত্ত্বত্রয়ে বা তাহাদের অন্যতমে যাঁহারা একান্ত পরিনিষ্ঠিত, বৈদিক আচার্য্যের চরণাশ্রয়ই যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রধান উপায় বলিয়া অবগত, বেদোক্ত আচারের অতিক্রমকে যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ বোধ করেন, তাঁহারাই বৈদিক সম্প্রদায় এবং তদ্বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত জড়বিজ্ঞানাশ্রিত নাস্তিক সম্প্রদায়ই অবৈদিক সম্প্রদায়। কর্ম্ম-মীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি, ন্যায়াচার্য্য ভগবান্ অক্ষপাদ, বৈশেষিকাচার্য্য ভগবান্ কণাদ, সাংখ্যাচার্য্য ভগবান্ কপিল, যোগাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি, নির্গুণ-ব্রহ্ম-মীমাংসক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সগুণ-ব্রহ্ম-মীমাংসক ভগবান্ শাণ্ডিল্য, জ্ঞানাচার্য্য ভগবান্ বশিষ্ঠ, পাশুপতাচার্য্য ভগবান্ উপমন্যু এবং সাত্বতাচার্য্য ভগবান্ নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ এই বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাঁদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-ক্রমেই বৈদিক সম্প্রদায় বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। চার্ব্বাক, লোকায়ত ও বৌদ্ধাদি মত সকলই অবৈদিক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্য ভগবান্ কপিল, স্বকল্পিত পুরুষতত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার না করিলেও,

নাস্তিকপদবাচ্য হয়েন নাই, এবং ভগবান্ জৈমিনি, কর্ম্মফলাত্মক স্বর্গসুখের অতিরিক্ত পারমেশ্বরসুখ স্বীকার না করিলেও, নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হয়েন নাই; কারণ, বেদে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন সম্প্রদায় সকল বৈদিক যে কোন তত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত থাকুন না কেন, সাধন-পরিপাক-কালে পরমকারুণিকী শ্রুতি প্রসন্ন হইয়া আপনার একদেশসেবী ব্যক্তিবৃন্দের চিত্তেও ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করাইয়া দেন। কিন্তু অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর ও তদুপাসনাদি কল্পনা করেন এবং নিজের কাল্পনিক ঈশ্বরের কাল্পনিক উপাসনাদিতে নিরতও থাকেন, তথাপি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়াই জানিতে হইবে; যেহেতু, বেদ ও বৈদিক গুরুর উপদেশ ব্যতীত প্রকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তির উপায়ান্তর দেখা যায় না।

"বহির্মুখ জনগণকে বৈদিকতত্ত্বে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত পরম কারুণিক ঋষিগণ যে বিজ্ঞানবাদ অঙ্কুরিত করেন, কলিযুগের দ্বিসহস্রাব্দ গত হইলে, বৌদ্ধদিগের ধারাবাহিক যুক্তিবারির সেচনে তাহাই বহুশাখাসমন্বিত, দিগন্তব্যাপী মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া যে ভীষণ বিষময় ফল উৎপাদন করে, যাহা আস্বাদন করিয়া ভূমণ্ডলবাসী অনেক মানবই অচৈতন্য অর্থাৎ বেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়েন, তাহারই সংস্কারার্থ, সেই ভয়ঙ্কর ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে, অখণ্ডিত-বেদব্রতপরায়ণ নির্জন-গিরিকন্দরবাসী সামগানতৎপর কতিপয় মহাত্মা ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত স্বীয়-স্বাজীব্য-রক্ষণ-সহকারে সমুদায় বেদই ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের নিত্য-আহবনীয় অগ্নি হইতেই নৃপলাঞ্ছনধারী ক্ষত্রিয়বীর সকল সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ব্রাহ্মণগণই উপযুক্তকালে বেদময় পরমপুরুষের প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অচৈতন্য আর্য্যসন্তানগণের চৈতন্যসম্পাদনার্থ শ্রীপুরুষসূক্ত, শ্রীরুদ্রসূক্ত, শ্রীদেবীসূক্ত, শ্রীবিনায়কসূক্ত ও শ্রীসূর্য্যসূক্ত প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের শান্তিবিধান করেন। তৎকালে যে সূক্ত দ্বারা যাঁহার শান্তি বিহিত হয়, তিনি সেই সূক্তের প্রতিপাদ্য পরদেবতার মূর্ত্তিবিশেষের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি পুরুষসূক্তে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি তৎপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশী ও অংশাদি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহাদি মূর্ত্তিবিশেষের যথাশাস্ত্র মন্ত্রময়ী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবনামে অভিহিত হইলেন। যিনি শ্রীরুদ্রসূক্তের অভিষেচনে প্রবুদ্ধ হইলেন, তিনি ভগবান্ শ্রীশিবের শ্রীমূর্ত্তিবিশেষের আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদুপাসনাতে প্রবৃত্ত ও শৈবাভিধান প্রাপ্ত হইলেন। যিনি শ্রীদেবীসূক্তানুসারে দুর্গা ও মহাবিদ্যা প্রভৃতি মূর্ত্তিবিশেষের তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদুপাসনায়

প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শাক্তসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেন। যিনি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্বকল্যাণগুণনিলয়, শ্রীগণপতির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদুপাসনায় নিযুক্ত হইলেন, তিনি গাণপত্য বলিয়া কথিত হইলেন। আর যিনি জগৎপ্রকাশক অংশুমালী শ্রীসূর্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদীয় উপাসনায় অনুরক্ত হইলেন, তিনি সৌরনামে অভিহিত হইলেন। অতএব বর্ত্তমান পঞ্চ উপাসকসম্প্রদায়ই বৈদিকসম্প্রদায়মধ্যে গণনীয় হইতেছেন।

পূর্ব্বভাষ।

অধুনা যে স্থান নবদ্বীপনগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপনগর তাহার প্রায় এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল, প্রাচীন নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর গর্ত্তগত হইলেও, তাহার কিয়দংশ অত্যুচ্চ ভূমিরূপে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তদীয় 'বল্লালদীঘি' নাম্নী দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে স্থানে তিনি কাজীর দর্প চূর্ণ করেন, সেই সকল স্থান এখনও পূর্ব্বাবস্থাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপের দক্ষিণে ও পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্ব্বদিকে খরবেগা খড়িয়া নদী প্রবাহিত হইত। ঐ দুই নদী নগরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে, গোগেছে বা গোয়ালপাড়া নামক গ্রামের নিম্নভাগে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নদীদ্বয়ের সঙ্গম এখনও সেই স্থানেই আছে, কিন্তু উহা বর্ত্তমান নবদ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে। গঙ্গা ও খড়িয়া উভয় নদীই বর্ত্তমান নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে। গঙ্গার প্রবল স্রোতে প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরদিক্ ভগ্ন হইলে, অধিবাসিগণ ক্রমে দক্ষিণদিকে আসিয়া বাস করাতেই এই নূতন নবদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি গঙ্গা আবার নূতন নবদ্বীপকে ভাঙ্গিয়া নিজ গর্ত্ত হইতে প্রাচীন নবদ্বীপকে উদ্গীরণ করিতেছেন।

আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, ঐ সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীনতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। যদিও সময়ে সময়ে হিন্দুরাজগণ তাৎকালিক গৌড়েশ্বরের অধীনে বাঙ্গালার প্রদেশবিশেষের সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা নামমাত্র রাজা থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গৌড়েশ্বরের ও দিল্লীশ্বরের অধীনেই থাকিতে হইত। আবার তাঁহারা সাক্ষিগোপালস্বরূপেও অধিককাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে অতিসত্বরই পদচ্যুত

হইতে হইত। আর যিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র পদভ্রষ্ট হইতেন না, তাঁহাকে কোন না কোন কারণে মুসলমান হইয়া যাইতে হইত। এমন কি, তৎকালে ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ হিন্দুরাজার অধিকার দৃষ্ট হইত না। আমাদিগের বর্ণনীয় সময়ের অত্যল্পকাল পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায় নামে একজন হিন্দু গৌড়েশ্বর আলা উদ্দীনের অধীনস্থ রাজা ছিলেন। হোসেন খাঁ নামে তাঁহার একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। সে রাজধন আত্মসাৎ করিয়া তদপরাধে সুবুদ্ধিরায় কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। পরে তাহারই ষড়যন্ত্রে গৌড়েশ্বর আলা উদ্দীনের পদচ্যুতি ঘটে। হোসেন খাঁ সুবুদ্ধিরায়ের সাহায্যে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া সাহ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজমহিষীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধিরায়কে মুসলমানের জলপান করাইয়া জাতিচ্যুত করিয়াছিল। সুবুদ্ধিরায় এইরূপে হোসেন সাহ কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়ীয় পণ্ডিতদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন সুবুদ্ধিরায় অনন্যগতি হইয়া অপেক্ষাকৃত লঘু প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থার আশায় বারাণসী ধামের পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হয়েন। সেখানেও তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলন হইলে, তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সুবুদ্ধিরায়কে 'প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত তমোধর্ম্ম' বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বপাপপ্রশমন শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং তদাশ্রয়েই সুবুদ্ধিরায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের পর হোসেন সাহ বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন নামমাত্র গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্য্যের কিছুই করিতেন না। তাঁহার অধীনস্থ কাজী ও মন্ত্রী নামক রাজপুরুষগণ দ্বারাই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। হোসেন সাহের অধীনে পানিহাটী গ্রামে রায়সাহেব, শ্রীনবদ্বীপে চাঁদ খাঁ ও শ্রীধাম শান্তিপুরে মুলুক নামক একজন কাজীর নামোল্লেখ দেখা যায়। কাজীরাও কার্য্য কিছুই করিতেন না। হিন্দু রাজা বা জমীদারেরাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কাজীরা প্রায় কেবল সৈন্যসামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং কর আদায় করিয়া কিছু গৌড়েশ্বরের নিকট পাঠাইতেন ও কিছু স্বয়ং রাখিতেন। তবে যদি কখন কোন বিশেষ বিবাদ বা অভিযোগ উপস্থিত হইত, হিন্দু জমিদারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। অতএব তৎকালে বাঙ্গালায় স্বাধীনতা লুপ্ত হইলেও, সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই বলিতে হইবে। ঐ সময়ে শ্রীনবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কালনার নিকট হরিপুর

গ্রামে গোবর্দ্ধন দাস, রাজসাহীতে খেতুর গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং বর্দ্ধমানের নিকট কুলীন গ্রামে মালাধর বসুর বংশীয় পরাক্রান্ত কায়স্থ জমীদারগণের নাম শ্রবণ করা যায়।

বঙ্গদেশ অতিপ্রাচীনকাল হইতেই চারিবর্ণের বাসস্থান ছিল। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মানুশীলন, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধকর্ম্ম, বৈশ্যদিগের কৃষি ও বাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের দ্বিজসেবাই বৃত্তি ছিল। বর্ণসঙ্কর সকল নিজ নিজ কুলক্রমাগত বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। বৈদ্যদিগের চিকিৎসাই বৃত্তি ছিল। দেশে শাস্ত্রের সম্মান থাকিলেও, ব্যভিচারস্রোত অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় ক্রমশঃ সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। কুতর্ক-কুশল পণ্ডিতগণ অন্তরে নাস্তিক ও বাহিরে আস্তিক হওয়াতে কেবল বাগ্‌-জালে লোক সকলকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাল-ধর্ম্মে পরস্পর-মত-সন্নিপাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ বৈদিক সম্প্রদায় পুনর্ব্বার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তার্কিকদিগের তর্কের আঘাতে বেদ ও বৈদিক ঈশ্বর পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মধ্বজিগণের অত্যাচারে বৈদিক সম্প্রদায় সম্যক্ কালুষ্য ধারণ করিয়াছিল। সন্ন্যাসিসকল জয়লাভার্থ তপোযুক্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ মায়ার জালে জড়ীভূত হইয়া বিতণ্ডাসাগরে পড়িয়া নিজের আসন্নবিনাশ দর্শন করিতেছিলেন। দুই এক জনমাত্র দেশের দুর্গতি ভাবিয়া সংগোপনে বিচরণ করিতেছিলেন। কাশী, কাঞ্চী, মথুরা ও অবন্তী প্রভৃতি পুরী সকল ও পুরী প্রভৃতি ধাম সকল ব্যাভিচারস্রোতে পড়িয়া নিজের তীর্থত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সকরুণহৃদয়ে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া গোপনে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ঐ বঙ্গদেশে এক একটি করিয়া মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবের প্রাক্কালে এইপ্রকার ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই তদীয় পার্ষদ সকল গোপনে জন্মগ্রহণ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পার্ষদবর্গের আবির্ভাবে বঙ্গ-দেশের অবস্থাপরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

অবতরণ।

একদা দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণ-গান-সহকারে ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগোলোকধামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গোপীমণ্ডলমণ্ডিত শ্রীভগবান্ অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীমন্নন্দনন্দন ও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী একীভূত হইয়াছেন। নবীন-নীরদ-শ্যাম-সুন্দর-রূপ বৃষভানুনন্দিনীর গৌরকান্তি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। গোপগোপীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীরাস-বিহারী হরি শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। তদ্দর্শনে সুবিস্মিত ও সমাকৃষ্ট দেবর্ষিও তাঁহাদিগের সহিত কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে যে কতকাল অতিক্রান্ত হইল, তাহা দেবর্ষি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। পরে যখন উক্ত সঙ্কীর্ত্তন নিবৃত্ত এবং দেবর্ষি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তিনি সম্মুখবর্ত্তী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আপনার লীলা স্বভাবতঃ দুরবগাহ হইলেও, এই লীলা আবার বিশেষতঃ দুরবগাহ বলিয়াই বোধ হইতেছে। হে লীলাময়, আপনি কখন কোন্ লীলা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করেন, তাহা আপনিই জানেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলরূপ আজ এই অপূর্ব্ব শ্রীগৌর-সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে। আজ শ্রীরাসমণ্ডল সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে পরিণত। এ অভূতপূর্ব্ব ভাব কেন ? আমি কি ভ্রান্ত হইয়াছি ? অথবা যাহা দর্শন করিতেছি, তাহা সত্য ?" দেবর্ষি নারদের এই বিস্ময়সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তিধারী শ্রীহরি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন, "দেবর্ষে, তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্যই। এই ভাববিপর্য্যয়ের কারণ আছে। আমি শ্রীরাধার ঋণপরিশোধের নিমিত্ত তদীয় ভাব ও কান্তি দ্বারা সমাচ্ছন্ন এই আবির্ভাববিশেষ অঙ্গীকার করিয়াছি। আমি এই আবির্ভাবে শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য অনুভব, মদীয় মধুরিমার আস্বাদন ও তদাস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহার অনুভব, এই তিনটি বাসনা পূরণ করিব। অধিকন্তু যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনেরও কাল নিকটবর্ত্তী। এই আবির্ভাব দ্বারাই যুগধর্ম্মও প্রবর্ত্তন করিব। একবার এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য কর, এই ভারতের গতি সন্দর্শন কর। কলির প্রারম্ভেই এই ভারতভূমিতে ধর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। এই দেখ, মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতরূপে ভারতে অবতরণ পূর্ব্বক আমার অবতারের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছেন। এই দেখ, স্বয়ং বলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতরণ করিয়া

আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন ; এই দেখ, শুক্লবর্ণাদি পরিকর সকল ক্রমে ক্রমে ভারতে অবতরণ করিয়াছেন। তুমিও ঐ স্থানে অবতরণ কর। আমিও সত্বর নদীয়া নগরে অবতরণ করিতেছি।" এই কথা শুনিতে শুনিতেই দেবর্ষি ভারতবর্ষে অবতরণ করিলেন।

শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। এই কলিযুগের প্রথম অবস্থাতেই শেষ কলির আচার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, করুণাময় শ্রীভগবান্ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মের প্রচারে মানস করিলেন। সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবানের সঙ্কল্পমাত্র তদীয় পরিকর সকল ক্রমে ক্রমে মনুষ্যলোকে মনুষ্যরূপে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ নবদ্বীপে, কেহ চট্টগ্রামে, কেহ উড়িষ্যায়, কেহ শ্রীহট্টে, কেহ রাঢ়ে, কেহ পশ্চিমে, এইরূপ নানাস্থানে প্রভুর ভক্তগণ অবতরণ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং বলরাম শ্রীনিত্যানন্দরূপে, মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতরূপে, শ্রীব্রহ্মা হরিদাসরূপে, সনাতন শ্রীসনাতনরূপে ও দেবর্ষি নারদ শ্রীবাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহাঁদিগের অবতরণকালে শ্রীনবদ্বীপই ভারতের প্রধান স্থান ছিল। ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে ঐ শ্রীনবদ্বীপেই আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যাগৌরবে অদ্বিতীয়। নব্য ন্যায় মিথিলা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপকেই আশ্রয় করিয়াছিল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থী সকল আসিয়া শ্রীনবদ্বীপেই অবস্থান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ নবদ্বীপ বাঙ্গালার একটি প্রধান নগর বলিয়াও নানাশ্রেণীর লোকে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। এক এক ঘাটে শত শত লোক স্নান করিতেন। অধ্যাপক, অধ্যাপনার স্থান ও অধ্যয়নার্থীর সংখ্যা হইত না। প্রত্যেক অধ্যাপকই ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন ; প্রত্যেক বর্ণী ও আশ্রমী ধর্ম্মানুশীলন করিতেন ; কিন্তু অনেকেই শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতেন না। সাধারণ লোক বাহ্যিক পূজাকেই ধর্ম্ম জানিতেন। অধ্যাপক সকল নামে শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্ম্মিক, কার্য্যতঃ অজ্ঞ ও নাস্তিক হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ মূর্ত্তিধর দম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের আদর ছিল না, বরং তাঁহারা জনসমাজে ঘৃণিত হইতেন। দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ বিষাদে বিবিক্তসেবী হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে দুই চারি জন অন্তরঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া গোপনে জগতের দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিতেন। শ্রীহট্টপ্রদেশের অন্তর্গত নবগ্রাম নামক স্থানের অধিপতি রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রিতনয় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাদিগের নেতা ছিলেন। তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও তাপস ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য আপনাদিগের পূর্ব্ববাস শ্রীহট্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী শান্তি-

পুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাসস্থান শান্তিপুর হইলেও, তাঁহার শ্রীনবদ্বীপেও একটি সামান্য আবাস ছিল। নবদ্বীপস্থ ভক্তবৃন্দ ঐ স্থানেই সময়ে সময়ে সমবেত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রাদির আলোচনা ও লোকের দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিতেন। আমাদিগের বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপও অনেক সময় ঐ স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। তৎকালে তান্ত্রিক বীরাচারের প্রভাব জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উহা ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবাসীকেই আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছিল। উহা পঞ্চ উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই উক্ত তান্ত্রিক বীরাচারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুই একজন বিশুদ্ধ অকিঞ্চন ভগবদ্‌ভক্তমাত্র উক্ত ব্যভিচারস্রোত লক্ষ্য করিয়া বিষাদিত হইতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে বীরাচারী পাষণ্ডিদিগের অত্যাচারে শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীনবদ্বীপে বাস করা নিতান্ত ভার হইয়া উঠে। এই কথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রবণগোচর হয়। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় উচ্চহৃদয় ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ সাধারণ লোকের ন্যায় ছিল না। তিনি তাৎকালিক জীবের দুর্গতি, পণ্ডিতকুলের নাস্তিকতা ও জনসাধারণের আচারব্যবহার দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। পরম সাধু শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রতি অসাধু পাষণ্ড সকলের অত্যাচার তাঁহার সহ্য হইল না। অদ্বৈতাচার্য্য লোকপরম্পরায় ঐ কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনই শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি নদীয়া ত্যাগ করিও না; পাষণ্ডগণ হইতে আর ভয় নাই; অচিরেই ভগবান্ অবতরণ করিয়া পাষণ্ডকুলের দলন পূর্ব্বক লোক সকলের উদ্ধারসাধন করিবেন; তাঁহার অবতারের আর অধিক বিলম্ব নাই।" অদ্বৈতাচার্য্য যে কেবল মুখেই শ্রীবাস পণ্ডিতকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি মনুষ্যশক্তিতে উপস্থিত দুর্গতি নিবারিত হইতে পারে না জানিয়া শ্রীভগবানের অবতারের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়া ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি পরমকারুণিক পরমেশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া অবতরণকামনায় শ্রীভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতরণ পূর্ব্বক দুর্গতিপ্রাপ্ত জীবগণের নিস্তারকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

আবির্ভাব। ৩

প্রদ্যুম্নমিশ্ররচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক গ্রন্থে, এবং জগজ্জীবনমিশ্র-রচিত তদনুবাদে লিখিত আছে যে, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয় মধুকরমিশ্র নামক একজন পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করেন। তিনি কিছু ভূমিসম্পত্তি বরস্বরূপে লাভ করেন। ঐ ভূমি শেষে বরগঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী চারিটি পুত্র ও একটি সর্প প্রসব করেন। ইহাঁদিগের অন্যতম মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র সস্ত্রীক কৈলাস পর্ব্বতের সন্নিকটে গুপ্তবৃন্দাবন নামক স্থানে গিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। তাঁহার তপোবনের পূর্ব্বভাগে কালিন্দীসদৃশী ইক্ষুনদী প্রবাহিতা। দক্ষিণদিকে বৃদ্ধ-গোপেশ্বর মহাদেব। উত্তর-দিকে একটি সুগুপ্ত পবিত্র অমৃতময় কুণ্ড। ঐ স্থান সাধারণের অগম্য। উপেন্দ্র মিশ্র স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ স্থানে যাইয়া তপোনিরত হয়েন। তদবস্থাতেই তাঁহার সাতটি পুত্র জন্মে। উক্ত সপ্ত পুত্রের নাম যথা,—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোক। উপেন্দ্র মিশ্র জগন্নাথ নামক নিজ পুত্রকে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করাইয়া নিজ পত্নীর সহিত স্বদেশ শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্বয়ংও অপরাপর পুত্রগণের সহিত কিছুদিনের জন্য শ্রীহট্টে আগমন করেন। জগন্নাথ মিশ্র পরে অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। তিনি ন্যায়াদি বিবিধ শাস্ত্রের পারদর্শী এবং সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমসাময়িক অধ্যাপক হয়েন। তাঁহার শাস্ত্রীয় উপাধি পুরন্দর। তিনি নবদ্বীপেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ মিশ্রের বিদ্যাদি-বিবিধ-গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। জগন্নাথ মিশ্র বিবাহের পর একবারের অধিক স্বদেশে গমন করেন নাই, তীর্থ-বাসোদ্দেশে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী উভয়েই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা পরমেশ্বরচিন্তাতেই রত থাকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচী দেবীর দশম গর্ভের সন্তান। শচী দেবী উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা প্রসব করেন, উহাঁরা সকলেই অকালে কালকবলিত হয়েন। উহাঁদিগের মৃত্যুতে অনপত্যতানিবন্ধন মিশ্রপুরন্দর অতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্রলাভার্থ শ্রীমন্নারায়ণের আরাধনা করেন। তাঁহার প্রসাদে জগন্নাথ মিশ্রের একটি পুত্র জন্মে। ঐ পুত্রের নাম 'বিশ্বরূপ'। বিশ্বরূপ

শ্রীবলদেবেরই প্রকাশ। এই বিশ্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর পরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়। জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপকে লইয়াই একবার শ্রীহট্টে গমন করেন। শচী দেবীও সঙ্গেই ছিলেন। স্বীয় জননীকে পুত্র দর্শন করানই মিশ্রের এই স্বদেশযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। শচীদেবী যখন শ্রীহট্টে, সেই সময়েই মিশ্র-জননী একটি স্বপ্ন দর্শন করেন। শচীদেবীর গর্ভে শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করি-বেন, ইহাই ঐ স্বপ্ন। ঐ স্বপ্ন দর্শন করিয়া মিশ্রজননী শচীদেবীকে বলেন, "তুমি এইবার যে পুত্র প্রসব করিবে, তাঁহাকে আমায় দেখাইও।" তিনি নবদ্বীপ প্রত্যা-গমনসময়ে নিজ পুত্রবধূকে এই কথা আবার বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরসুন্দর যে একবার শ্রীহট্টে গমন করেন, এই ঘটনাটি তাহার একটি প্রধান কারণ।

সঙ্কীর্ত্তন।

উদয় বৃন্দাবনচন্দ্র কি আনন্দ নদেপুরে,
পুরবাসী যত, প্রেমে পুলকিত, হরিধ্বনি করে,
দেবগণ নৃত্য করে গৌররূপ হেরে।
(ও সেই) পতিতপাবন, হরি ব্রহ্ম সনাতন,
এবে ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে শচীর নন্দন।
প্রেমানন্দে অদ্বৈত নাচে বাহু তুলে,
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন অবনীমণ্ডলে।
আজ কি আনন্দ নদেপুরে।
যতেক দেবতাগণ, করিবারে দরশন,
ও সেই গৌরচাঁদে দেখিবারে ধাইল রে।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয় উচ্চস্বরে ॥

চৌদ্দশত সাত শকের বিশে ফাল্গুন শুক্রবার সায়ংকালে সিংহলগ্নে রবির ক্ষেত্রে চন্দ্রের হোরায় বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে রবির নবাংশে বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে ও ত্রিংশাংশে গৌড়ের একটি প্রধান নগর নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসময়ে কেতু ও চন্দ্র সিংহরাশিতে শনি বৃশ্চিকরাশিতে বৃহস্পতি ও মঙ্গল ধনুরাশিতে এবং রবি, শুক্র, রাহু ও বুধ কুম্ভরাশিতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঐ দিবস একে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, তাহাতে আবার চন্দ্রগ্রহণ হয়; সুতরাং

তদুপলক্ষে গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গের ও রাঢ় অঞ্চলের বহুসংখ্যক নরনারীর সমাগমে নবদ্বীপ নগর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্নানযাত্রিগণের মুহুর্মুহু হরিনামধ্বনিতে এবং নবদ্বীপবাসিগণের গ্রহণোচিত মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মদিবস বিশেষ একটি পর্ব্বদিবসের তুল্য অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঐ দিনটি সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসবদিবসস্বরূপে পূজিত হইবেন বলিয়া, পূর্ব্ব হইতেই যেন তাহার সূচনা হইয়া রহিল। মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জগতের সমক্ষে যে চিত্র প্রসারিত করিবেন, তদাজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রকৃতি অগ্র হইতেই তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। ভবিষ্যতে যে মধুর শ্রীহরিনামে জগৎ মাতিয়া উঠিবে, তাঁহার আবির্ভাবের প্রাক্‌কালেই তাহা আবির্ভূত হইয়া রহিল। যে বৃক্ষ পল্লবিত হইয়া পরে সমগ্র ভূমণ্ডলের তাপিত জীবকে ছায়াদানে সুশীতল করিবে, তাঁহার আবির্ভাবের সময়েই তাহা অঙ্কুরিত হইল। যে রিপুর আক্রমণকে জগতের জীবমাত্রই ভয় করিয়া থাকেন, আজ সেই শত্রুর উৎপীড়ন হইতে রক্ষার আশ্রয়ভূত সুদৃঢ় দুর্গের সূত্রপাত হইয়া রহিল। বস্তুতঃ এইসকল জানিতে পারিয়াই যেন লোক সকল ভবিষ্যতের জয়াশায় সমুৎসাহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া ত্রিলোক বিকম্পিত করিতে লাগিল। চিদানন্দমূর্ত্তি অকলঙ্ক শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকল অন্ধকার দূরীকৃত হইবে, অতএব, এই সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কি প্রয়োজন, এই ভাবিয়াই যেন মায়াময় ছায়াসুত রাহু প্রকৃত চন্দ্রকে গ্রাস করিতে লাগিল। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া দেবতা সকল আকাশ হইতে ঘোরকলিজীবের নিস্তারের আশাপ্রদ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিনামের ও শ্রীহরিনামময় কলির জয়সূচক দেবদুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ ও কিন্নরগণের নর্ত্তনকীর্ত্তনে ত্রিদিবপুর উৎসবময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মভবাদি দেবগণ এবং ব্রহ্মাণী ও ভবানী প্রভৃতি দেবীগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকে অভিনন্দন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত গুপ্তবেশে মিশ্রভবনে সমাগমন করিলেন।

নদীয়ারূপ উদয়াচলে শ্রীগৌরাঙ্গরূপ পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলেন। তাঁহার উদয়ে পাপতাপরূপ তিমির বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ত্রিজগৎ উল্লাসিত হইল। ত্রিজগৎ ভরিয়া জয়ধ্বনির সহিত হরিধ্বনি হইতে লাগিল। অদ্বৈতাচার্য্য নিজভবনে অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া সানন্দান্তরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীহরিদাসও বিস্মিত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের এই দশা ঘটিতে লাগিল। পরে তাঁহারা গ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া স্নানদানে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাবর্ণের নর-

নারী সকল বিবিধ উপহার লইয়া মিশ্রসদনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী ও শচী প্রভৃতি দেবী সকল নারীবেশে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও নরবেশে প্রচ্ছন্নভাবে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরকে নয়নগোচর করিয়া সফলমনোরথ হইলেন। কতশত লোক গমনাগমন করিলেন, গ্রহণান্ধকারে কেহই কাহারও লক্ষ্যমধ্যে পতিত হইলেন না। নর্ত্তক, গায়ক, বাদক ও ভাট সকল মিশ্রভবনে সমুপস্থিত হইয়া মিশ্রতনয়ের জন্মকালীন মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া মিশ্রনন্দনের জাতকর্ম্ম-সংস্কার করাইলেন। পরে সমাগত নর্ত্তক প্রভৃতি বিদ্যোপজীবিগণকে যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান পুরঃসর বিদায় করা হইল। অদ্বৈতাচার্য্য নিজপত্নী সীতাদেবীর সহিত মিশ্রের আলয়ে আগমনপূর্ব্বক জাত বালককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী প্রভৃতিও বিবিধ উপহার লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপরূপ রূপলাবণ্য সন্দর্শনে সমাগত সকল নরনারীরই নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল। শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী দৌহিত্রের জন্মলগ্নাদি গণনা করিয়া অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। পরে তিনি গোপনে জামাতাকেও নিজের অনুমান বিদিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "গণনা দ্বারা যতদূর অনুমান করা যায়, কোন মহাপুরুষ আসিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।" অনন্তর জাত বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া উক্ত অনুমানকে আরও দৃঢ়ীভূত করা হইল।

বাল্যলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ মিশ্রগৃহে আবির্ভূত হইয়া সমুদিত শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে জনকজননীর আনন্দের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র উভয়েই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনুক্ষণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দেখিলেই হাসিতে হাসিতে ক্রোড়ে লইয়া থাকেন। আত্মীয়বর্গ সময় পাইলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে আইসেন। প্রতিবেশিগণ দিবানিশি বালক শ্রীগৌরাঙ্গকে আবরণ করিয়া থাকেন। কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহ কেহ দেবীরক্ষা পাঠ করেন। কেহ কেহ মন্ত্রপাঠ করিয়া বালকের গৃহরক্ষা করেন। উপস্থিত নরনারীগণ হরিধ্বনি না করিলে, বালকের স্বভাবসুলভ রোদনের নিবৃত্তি

হয় না। ক্রমে সকলেই এই পরম সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন। তদবধি বালক রোদনপরায়ণ হইলেই তাঁহারা হরিধ্বনি করিতে থাকেন। হরিধ্বনি শ্রবণ করিলেই বালকের রোদন নিবৃত্ত হয়। রহস্যপ্রিয় দেবতাসকল কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত ছায়ার ন্যায় অলক্ষিতভাবে বালকের বাসগৃহে প্রবেশ করেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত নরনারী সকল চোর বলিয়া অনুমান করিতে থাকেন। কিন্তু শেষে কাহাকেও না দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। কেহ সভয়ে 'নরসিংহ' 'নৃসিংহ' ধ্বনি করিতে থাকেন। কেহ অপরাজিতার স্তোত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেহ বা বিবিধ মন্ত্রপাঠ সহকারে দশদিক্ বন্ধন করেন। জনকজননী গ্রহাশঙ্কায় মন্ত্রবিদ্‌গণ দ্বারা বালকের রক্ষাবিধান করেন। আর দর্শনার্থ সমাগত দেবতারা অলক্ষ্যে আসিয়া হাস্য করিতে থাকেন। এইরূপে একমাস অতিক্রান্ত হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গপরিবর্তন উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিতা নারী সকল শচীদেবীর সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। বাদ্যগীতাদি সহকারে ভাগীরথীর অর্চ্চনার পর তাঁহারা ষষ্ঠিদেবীর স্থানে গমনপূর্ব্বক বিবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিলেন। তদনন্তর শচীদেবী খৈ, কলা, তৈল, সিন্দুর, সুপারি ও পান প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা সমাগত নারীবৃন্দের সম্মাননা করিলেন। তাঁহারাও বালককে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিজ নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, বালগোপালের ন্যায় গুপ্তভাবে, পিতৃগৃহে থাকিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি একদা শয্যা হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক গৃহসামগ্রী সকল ফেলিয়া ছড়াইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জননীর আগমন বুঝিতে পারিয়া নিঃশব্দে ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। পরে জননী গৃহমধ্যে পদার্পণ করিলেই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শচীদেবী রোদনপরায়ণ পুত্রের সান্ত্বনার নিমিত্ত 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিধ্বনি শ্রবণে বালকের রোদন নিবৃত্ত হইল। তখন শচীদেবী দেখিলেন, গৃহসামগ্রী সকল গৃহের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ও পতিত রহিয়াছে। গৃহমধ্যে চারিমাসের শিশু। শিশু আবার শয্যাতলে শয়ন করিয়া আছেন। গৃহসামগ্রী সকল কে ছড়াইল, বুঝিতে পারিলেন না, দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জগন্নাথ মিশ্রও গৃহের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। কেবল পুত্রের চরণচিহ্নের ন্যায় দুই একটি চরণচিহ্ন দৃষ্ট হইল। ক্রমে প্রতিবেশী দুই এক জনও ঐ স্থানে আসিয়া মিলিলেন। সকলে

মিলিয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর শিশুর লক্ষনার্থ কোন দানব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই স্থির করিলেন। সকলেই ভাবিলেন, দানব আসিয়াছিল, কিন্তু রক্ষাবিধান হেতু বালকের অনিষ্টসাধন করিতে পারে নাই; শেষে সেই রাগে গৃহসামগ্রী সকল অপচয় করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর পদচিহ্নগুলি শাল-গ্রাম শিলাতে অধিষ্ঠিত বালগোপালেরই পদচিহ্ন বলিয়া অবধারিত হইল। এই প্রকারে পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স যখন ছয় মাস, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও অপরাপর আত্মীয়বর্গ আসিয়া তাঁহার নামকরণের দিনস্থির করিলেন। বালকের জন্ম হইতেই মিশ্র-সংসারের অবস্থার দিন দিনই উন্নতি হইতেছিল। মিশ্রবর বিশেষ সমারোহের সহিত পুত্রের অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিলেন। ১৪০৮ শকের শ্রাবণ মাসে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে উক্ত কার্য্যের দিন ধার্য্য হইল। ঐ দিন পিতৃদেবা-দির অর্চ্চনান্তে, চলিত প্রথা অনুসারে, বালক কোন্ বস্তুটি ধারণ করে দেখিবার নিমিত্ত, বালকের সম্মুখে ধান্য, রজত ও পুস্তক প্রভৃতি কয়েকটি মাঙ্গলিক বস্তু স্থাপন করা হইল। বালক অন্য সকল বস্তু ছাড়িয়া শ্রীভাগবত পুস্তক আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত নরনারী সকল 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বালক শ্রীগৌরাঙ্গ সময়ে পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত হইবেন স্থির হইল। অনন্তর বিশেষ সমারোহের সহিত নামকরণোৎসব সমাহিত হইল। জন্মপত্রিকার গণনানুসারে বালকের নাম রাখা হইল, 'বিশ্বম্ভর'। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "ইহাঁর জন্মাবধি বিশ্ব সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলময় হইয়াছে, অতএব বিশ্ব-ম্ভরই ইহাঁর যোগ্য নাম হইয়াছে।" বর্ণ গৌর বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই বালককে 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরসুন্দর' ও 'গৌরহরি' বলিয়া ডাকা হইত। বিশ্বরূপের পর শচী-দেবীর অনেকগুলি সন্তান বিনষ্ট হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, প্রতি-বেশিগণের অনেকে তাঁহাকে 'নিমাই' বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নিম্ববৃক্ষের তলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'নিমাই' নাম হইয়াছিল। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' তাঁহার সন্ন্যাসকালের নাম। নামকরণোৎসব সমাধা হইলে, তদুপলক্ষে সমাগত আত্মীয় কুটুম্ব সকল স্বস্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে রিঙ্গণকাল প্রাপ্ত হইলেন। প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের রিঙ্গণলীলা এইপ্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন;—

"এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানারঙ্গে শচীবালা॥

লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহুযুগলে।
চরণে নূপুর বাজে বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি শিরে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনি আপনা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ জানুর উপর ভর দিয়া পরমসুন্দর হামাগুড়ি দেন। গমনকালে কটিদেশে কিঙ্কিণীর ও চরণযুগলে নূপুরের ধ্বনি হইতে থাকে। তিনি নির্ভয়ে অঙ্গনে বিহার করেন। অগ্নি ও সর্পাদি যাহা দেখেন, তাহাই ধরিতে থাকেন। একদিন হামাগুড়ি দিয়া যাইতে যাইতে একটি সর্পের উপর শয়ন করিলেন। আত্মীয় স্বজন সকল কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে গরুড়াদি সর্পভয়নিবারক দেবতাদিগকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সর্প ভয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে রাখিয়া পলায়ন করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনর্ব্বার ঐ সর্পকে ধরিবার জন্য গমন করিলেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত নরনারীগণ দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। জনকজননী মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ পদচারণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্য কোটি কন্দর্পকেও পরাজয় করিল। সুধাকরসদৃশ বদন, সুবলিত মস্তকে চাঁচর কেশদাম, সুদীর্ঘ কমলনয়ন, অরুণবর্ণ অধর, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত ভুজযুগল ও সুকোমল চরণকমল প্রভৃতি দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। পিতামাতার বিস্ময়ের সীমা নাই। তাঁহারা বালকের রূপ, গুণ ও লীলা সকল দর্শন করিয়া মহাপুরুষজ্ঞানে সদাই মোহিত থাকেন। বালক লোক সকলের হস্তধারণ করিয়া চলিয়া বেড়ান। কখন ভ্রূভঙ্গি, কখন দন্তপ্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ কৌতুকের সহিত সমবেত নরনারী সকলের আনন্দবৰ্দ্ধন করেন। কখন হাসেন। কখন আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য কাঁদিতে থাকেন। কখন মুকুরাদিতে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া রোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রোদনকালে হরিধ্বনি ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই প্রবোধ মানেন না। প্রাতঃকাল অবধি সকল সময়েই প্রতিবাসিগণ আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া হরিধ্বনি করেন। তিনি কখন বা তাঁহাদিগের সহিত করতালি দিয়া মনোহর নৃত্য করিতে থাকেন, কখন বা ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ হয়েন। সময়ে সময়ে বাটীর বাহিরে যাইয়া খৈ কলা ও সন্দেশ প্রভৃতি

আনিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারী নরনারীদিগকে প্রদান করেন। কখন বা অতিশয় চাপল্য প্রকাশ করিতে থাকেন। নিকটস্থ প্রতিবাসীদিগের গৃহে যাইয়া খাদ্যসামগ্রী চুরি করিয়া ভোজন করেন। কখন বা তাঁহাদিগের দ্রব্য সকল অপচয় করেন। এই প্রকার বালচাপল্যের মধ্যে মধ্যে আবার গাম্ভীর্য্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন। একদিন শচীদেবী তাঁহাকে খৈ ও সন্দেশ খাইতে দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে, তিনি ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শচীদেবী আসিয়া দেখিলেন, পুত্র খৈ ও সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি পুত্রের হস্ত হইতে মৃত্তিকা কাড়িয়া লইলেন এবং খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখাদ্য মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র বলিলেন, "মৃত্তিকা ভক্ষণে কি দোষ? খৈ এবং সন্দেশও যাহা, মৃত্তিকাও তাহাই; সকল দ্রব্যই মৃত্তিকার বিকার।" শচী দেবী পুত্রের মুখে দর্শন বিজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইয়াই অলঙ্কারলুব্ধ দুইটি চোরের নয়নপথে পতিত হইলেন। চোরদ্বয় অলঙ্কারলোভে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাদিগের অভিলষিত গন্তব্য স্থানের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু দেবমায়ায় বিমোহিত ও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া অভিপ্রেত স্থান না পাইয়া বহুক্ষণ ভ্রমণের পর পুনর্ব্বার মিশ্রভবনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বালকের নিজভবনেই ফিরিয়া আসিয়াছি বুঝিতে পারিয়া আপনাদের দুরভিসন্ধির স্মরণে লোকভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিতে বালককে নামাইয়া দিয়া পলায়ন করিল। জনকজননী বহুক্ষণের পর অদৃশ্য পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অদর্শনজনিত সমস্ত ক্লেশই বিস্মৃত ও পরমানন্দে ভাসমান হইলেন। এদিকে চোরদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীগৌরাঙ্গস্পর্শে দিব্যজ্ঞানের উদয় হওয়ায় সেই দিন হইতেই চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধুমার্গ অবলম্বন করিল।

অতঃপর শচী দেবী পুত্রকে আর বাটী হইতে বাহির হইতে দেন না, ঘরে থাকিয়াই খেলা করিতে বলেন,—

"আরে মোর সোণার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি, না যাবে পরের বাড়ী,
বসিয়া খেলাবে এক ঠাঁই॥
শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাতে,

এথাই রাখিবে তা সবারে।
যখন যা চাও তুমি, তাহা আনি দিব আমি,
কিসের অভাব মোর ঘরে ॥
যদি কেহ কিছু কয়, তারে দেখাইও ভয়,
বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালক মিলে বাড়ীর বাহিরে গেলে,
মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া।
তিলেক আঁখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে,
নরহরি জানে মোর দুঃখ।
মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি খেলা কর,
সদা যেন হেরি চাঁদমুখ ॥"

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিবস মিশ্রমহাভাগ শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর? আমার পুথিখানি দাও তো"। শ্রীগৌরাঙ্গ পিতার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পুস্তক আনয়নের উদ্দেশ্যে গৃহমধ্যে গমন করিলেন। গমনকালে গৃহমধ্যে নূপুরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। শচীদেবীও ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুথি লইয়া বাহিরে আসিলে দেখা গেল, পুত্রের চরণ শূন্যই রহিয়াছে, অথচ নূপুরের শব্দ হইতেছে। তখন তাঁহারা কি হইল, কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, তাহার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু জনকজননীর সেই ভাব স্থায়ী হইল না। তাঁহারা পরক্ষণেই উহা ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, উহা তাঁহাদিগের গৃহদেবতা দামোদরশিলারই লীলা। সেই দিনেই তদুদ্দেশে সঘৃত পরমান্নাদি ভোগ দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ জনকজননীর ভাব বুঝিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ ঐশ্বর্য্য প্রচার করিবার ইচ্ছা হইল, উক্ত ঘটনাটি অপ্রকাশিত থাকিল না, ক্রমে প্রতিবাসিগণ শুনিলেন, মিশ্রের ভবনে সদাই নূপুরের ধ্বনি হইতেছে। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেকেই মিশ্রসদনে আগমন করিলেন। কেহ কেহ নূপুরধ্বনিও শ্রবণগোচর করিলেন। ভূতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি পদচিহ্ন সকলও দৃষ্টিগোচর হইল।

"সব গৃহে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥"

দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে শচীদেবীকে বলিলেন,—

"শচী মা, তোর গোপালভাবেতে,
উদয় বৃন্দাবনচন্দ্র গৌররূপেতে,
ঐ চেয়ে দেখ গো, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন আছে শ্রীচরণেতে ॥
জান না গো শচীরাণী, (ওগো তোমার) ঘরে নন্দের নীলমণি,
(ওগো) চেয়ে দেখ গো, (ওগো) ঐ দেখা যায়,
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাঙ্গা চরণে ঐ দেখা যায় ॥
কিবা শোভা আরও অপরূপ গৌরচাঁদের নখরেতে চাঁদের উদয়,
শীতল কিরণ একি হেরিয়ে গো পরাণ জুড়ায়, (চাঁদের উদয়),
ঐ চেয়ে দেখ গো, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন আছে শ্রীচরণেতে ॥"

একদা শ্রীগৌরাঙ্গ কোন মতে নিদ্রা যাইতেছেন না। শচী দেবী স্ত্রীস্বভাবোচিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে নানাবিধ উপকথা ও পৌরাণিক ইতিহাস সকল শুনাইতেছেন। এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে কংসবধবৃত্তান্ত উত্থাপন করিয়া কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভীষণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইতেছেন। ইচ্ছা—যদি শ্রীগৌরাঙ্গ এই সমস্ত লোমহর্ষণ যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে ভীত হইয়া নিদ্রা যান। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল, শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন,—

"আর যে আছয়ে তারে করিমু সংহার।"

শচী দেবী শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আবার এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন,—

"ওহে শিব ব্রহ্মা চিন্তা না করিহ মনে।
জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সঙ্কীর্ত্তনে।"

শচী দেবী পুত্রের পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এইপ্রকার প্রলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইলেন এবং পাছে বালকের কোন অমঙ্গল হয় ভাবিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্র পড়িয়া রক্ষা বন্ধন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দেখা গেল, কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বালককে বেষ্টন করিয়া কি যেন কহিতেছেন। এবার শচী দেবীর বস্তুতঃ ভয় হইল। তিনি আর পুত্রকে আপনার নিকট রাখিতে সাহস করিলেন না। পিতার নিকট থাকিলে পুত্রের কোনরূপ বিপদ ঘটে না ভাবিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রকে পাঠাইয়াও নিজে স্থির থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। পরে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিমাইকে আপনার নিকট পাঠাইয়েছি, অগ্রসর হইয়া লইয়া যান।" শ্রীগৌরাঙ্গ গমন

করিতে লাগিলেন। গমনকালে চরণে নূপুরধ্বনি হইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে লইয়া শয়ন করাইলেন। পুত্র নিদ্রা যাইলে, জনকজননী পুত্রের অলৌকিক কার্য্য সকল উল্লেখ সহকারে তাঁহার শরীরে গোপাল আছেন, ইহাই স্থির করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, তাঁহারা বিধিবিধানে পুত্রের নিমিত্ত মাঙ্গলিক কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস দামোদরের পূজার বিশেষ আয়োজন করা হইল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ অপরাপর দিনের ন্যায় শিশুগণপরিবেষ্টিত হইয়া অঙ্গনে নৃত্যারম্ভ করিলেন। তাৎকালিক পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বর্ণনা করিতেছেন,—

"নাচে গোরা শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, দেয় তারা করতালি,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥
মাথে শোভে দিব্য চূড়া গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করে পরায়েছে মায় ধড়া গাছি আঁটি।
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবন মোহন বেশ ভুরু কামধনু।
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাঙ্গা উৎপল, চরণযুগল, তুলিতে নূপুর বাজে।
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা যেন পরাণের পরাণী॥"

যে মায়ায় বিশ্বসংসার বিমোহিত, সেই মায়ায় যে শচী দেবী মুগ্ধ হইবেন, ইহা অসম্ভব নয়। শচী দেবী দামোদরের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আকর্ষণে স্থির থাকিতে পারিলেন না, নৃত্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও জননীকে সমাগত দেখিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার অঞ্চলে বদন আবৃত করিলেন।

"শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে।
বাসুদেব ঘোষে কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন-লোভা॥"

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট হইলেন। তদবস্থায় তিনি শচীমাতাকে "মা ননী দাও, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে বারংবার উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। শচীদেবী পুত্রের অকস্মাৎ এই প্রকার ভাবান্তর দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইলেন। প্রাচীন সঙ্কীর্ত্তন যথা—

"বলে ননী দে মা যশোদে গৌর আমার কি ভাবে কাঁদে,
প্রবোধিতে নারি আমি শিশু অবোধে।
তোরা দেখে যা গো নগরবাসী আমার গৌরাঙ্গচাঁদে॥
ধরে আমার অঞ্চলে ননী দে মা দে মা বলে গো।
যশোদা জননী তোর কি দয়া নাই মা কোলে নে গো॥
(আমি) নহি আহীরিণী, কোথা পাব ননী, এ বড় বিষম মোরে।
(আমি) যা শুনি পুরাণে, নন্দের ভবনে, সেই কি আমার ঘরে॥
ও গো গৌর কি সেই নন্দের কানু।
ও চাঁদবদন মলিন হেরে বুক বিদরে খেদে॥"

শচীদেবীর কথা শুনিয়া উপস্থিত নারী সকল বলিতেছেন ;—
নন্দকিশোর নীলমণি পেয়েছ গো শচীরাণী।
একি বাৎসল্যে ব্রহ্ম গোপালে পেয়েছ কোলে,
ব্রজের—গোকুলের চাঁদ তোমায় মা বলে ও গো গৌরাঙ্গজননী,
কত পুণ্যেতে মদনগোপালে, নাচাও যারে—
হরি বোল হরি বোল বলিয়ে।
ব্রজের মাখনচোরা, তোমার হলেন গোরা, এ নদীয়া নগরে।
(বলে) হে দে গো জননী, দে মা নবনী, বলে বারে বারে।
কত রূপ ধরে, কে চিনিতে পারে, তোমার গৌরাঙ্গসুন্দরে।
ও যার দরশনে, জিহ্বায় কৃষ্ণ বলে, হেরে গৌর গুণমণি॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের চাপল্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত প্রতিবেশিগণের গৃহে যাইয়া খাবার চুরি করেন, তাঁহাদিগের শিশু

সন্তানদিগকে মারেন ও নানাবিধ উপদ্রব করেন। এই ঘটনা ক্রমে শচীদেবীর কর্ণগোচর হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "নিমাই, তুমি কেন পরের ঘরে গিয়া উপদ্রব কর, তোমার নিজের ঘরে কিসের অভাব আছে?, অপরের শিশুসন্তান-দিগকে প্রহারই বা কেন কর? তুমি এত দুষ্ট হইতেছে কৈন?" মাতার কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "মা, ঐ সকল মিথ্যা কথা, আমি কিছুই করি নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মৃদুহস্তে জননীকে তাড়না করিলেন। সেই তাড়-নাতেই শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জায় ও ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। উপস্থিত নারীসকল বলিলেন, "নিমাই, নারিকেল আনিয়া দাও, তাহা হইলেই তোমার জননী সুস্থ হইবেন।" শ্রীগৌ-রাঙ্গ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দুইটি নারিকেল ফল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শচীদেবী উত্থিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

একদিন শচীদেবী পুত্রকে অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। আসিবার সময় কোন প্রতিবাসীর ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া বিরক্তি সহকারে সত্বর গৃহে আগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন, পুত্রকে যে অবস্থায় গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তদবস্থাতেই রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে মনে হইল, তাঁহার দেখিবার ভ্রম হইয়াছে, প্রতিবাসীর ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখেন নাই, তাঁহার মত অন্য কোন বালককে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সংশ-য়ের নিবৃত্তি হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্রোড়ে লইয়া সেই প্রতিবাসীর ভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই স্থলে অবিকল আর একটি শ্রীগৌরাঙ্গ অব-স্থিত। শচীদেবী গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা. এ বালকটি কে?" প্রতি-বেশিনী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তাইত মা, এ বালকটি কে?" শচীদেবী সেই গৌরাঙ্গকেও ক্রোড়ে লইলেন। দুইটি গৌরাঙ্গ একটি হইয়া গেল। শচীদেবী ও প্রতিবেশিনী দৃষ্টিভ্রম বিবেচনা করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

দৈবযোগে এক তীর্থভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ আসিয়া মিশ্রভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা সহকারে আসন প্রদান করিলেন। পরে তিনি আসন গ্রহণ করিলে, পাদপ্রক্ষালনানন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বালগোপালের উপাসক ছিলেন। পাক সমাধা হইলে, তিনি ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অন্নাদি নিজ ইষ্টদেবকে নিবেদন করিলেন। বালক শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলাখেলা করিতে করিতে

ঐস্থানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বিপ্র কর্ত্তৃক নিবেদিত অন্ন হইতে এক গ্রাস তুলিয়া লইয়া ভোজন করিলেন। তদ্দর্শনে বিপ্র "হায় হায়" করিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আহ্বান করিয়া তদীয় বালকের চাঞ্চল্য দেখাইলেন। জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধে বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, অজ্ঞান বালক সর্ব্বথা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া, তাঁহাকে পুত্রের তাড়নোদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র বালকের আচরণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। তখন ঐ বিপ্র বলিলেন, "মিশ্রবর, দুঃখিত হইবেন না, গৃহে ফলমূলাদি যাহা থাকে, তাহাই দেন, আমি ভোজন করিতেছি। বিধাতা যে দিন যাহা লিখেন, সে দিন তাহাই ঘটে, অন্যথা হয় না।" তখন জগন্নাথ মিশ্র অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাক করাইলেন। শচীদেবী বালককে ক্রোড়ে লইয়া অন্য বাড়ীতে গমন করিলেন। প্রতিবেশিনী সকল বালকের ব্যবহার শুনিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি এমন দুষ্ট বালক, যে অতিথি ব্রাহ্মণের ভোজন নষ্ট করিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমার কি দোষ, ব্রাহ্মণ আমাকে ডাকিল কেন?" তখন প্রতিবেশিনীরা বলিলেন, "যে ডাকিবে, তুমি কি তাহারই অন্ন খাইবে? যাহার তাহার অন্ন খাইলে, জাতি থাকে কি? তোমার জাতি গিয়াছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি সর্ব্বকালেই ব্রাহ্মণের অন্ন খাইয়া থাকি। ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোয়ালার জাতি যায়?" এইরূপ হাস্যপরিহাস হইতেছে, এমন সময়ে অতিথি ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ অন্নাদি নিবেদন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সকলকে মোহিত করিয়া অলক্ষিতভাবে আগমনপূর্ব্বক ধ্যাননিমীলিত-নয়ন ব্রাহ্মণের অন্ন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ নয়ন উন্মীলন করিয়াই উহা দেখিতে পাইলেন। ক্রমে উক্ত ঘটনা জগন্নাথ মিশ্রেরও প্রত্যক্ষ হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রকে তাড়না করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। মিশ্র ব্রাহ্মণের অনুরোধে পুত্রের তাড়না হইতে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ বিশ্বরূপ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত বৃত্তান্ত বিদিত হইবার পর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার পাকের আয়োজন করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপের মুখ দেখিয়া সকল ভুলিয়া গেলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, অগত্যা পাক করিতে বাধ্য হইলেন। এইবার দুষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া নারীগণ গৃহমধ্যে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। গৃহের দ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ করিয়া, জগন্নাথ মিশ্র স্বয়ং ঐ দ্বার আগুলিয়া বসিয়া

থাকিলেন। পাক সমাধা হইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ অন্নাদি নিবেদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোথা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখা দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ও গৃহস্থিত নারীগণ নিদ্রায় অচেতন, কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সমস্ত সতর্কতাই ব্যর্থ হইয়াছে। বালক আসিয়া পূর্ব্ববৎ অন্নগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াই 'হায়' 'হায়' করিয়া উঠিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, তুমি বিষাদিত হইতেছ কেন? আমি তোমার আহ্বানেই নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছি। তুমি দ্বাপরযুগের ন্যায় এবারও ভ্রান্ত হইতেছ কেন?" এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি ব্রাহ্মণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৃত্তান্তের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব বিদিত ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। তখন করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহস্তস্পর্শে ব্রাহ্মণকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে সম্মুখস্থ বালগোপালের প্রসাদান্ন ভক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। এতাবৎকাল মিশ্রভবনের সকলেই নিদ্রায় অচেতন ছিলেন। ব্রাহ্মণের নৃত্য গীত ও হুঙ্কারে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ আত্মভাব সংগোপনপূর্ব্বক আচমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও ব্রাহ্মণকে ইঙ্গিত করিয়া ইতিমধ্যে পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্টভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণের নির্ব্বিঘ্নে ভোজন সমাধা হইয়াছে বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণও কৃতার্থ হইয়া তীর্থভ্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীয়া নগরেই বাস করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন নিজ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিত বুঝিয়া এই বৃত্তান্ত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন চঞ্চল তেমনই অতিশয় দুরাগ্রহ হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন যাহা দেখেন, তাহাই চান। যাহা চান, তাহা না পাইলে, কাঁদিয়া আকুল হয়েন। একদিন অকারণে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। জনকজননীর ও প্রতিবেশিগণের অনেক সান্ত্বনাবাক্যেও তাঁহার রোদনের অবসান হইল না। সকলে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে বিবিধ উপহার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গৃহ হইতে ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া দাও, তবে আমার শান্তি

হইবে।" জনকজননী পুত্রের এইপ্রকার অসম্ভব কথা শুনিয়া যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। উক্ত পরম বৈষ্ণব বিপ্রদ্বয় লোকপরম্পরায় শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া, উহা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা মনে করিয়া, ভগবন্নিবেদিত যথাবস্থিত উপহার সকল মিশ্রবালকের নিমিত্ত লইয়া গেলেন এবং উহার কিয়দংশ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া শ্রীভগবানের তৃপ্তি হইল ভাবিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ঘটনা-স্থলে সমুপস্থিত নরনারীবৃন্দ এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর অচিন্ত্যনীয় অলৌকিক ব্যাপার অবলোকনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। এইরূপে মায়া-মনুজ-বালক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নদীয়ার ও তন্নিকট-বর্ত্তী স্থানের লোক সকল আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

পৌগণ্ডলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলেন। জগন্নাথমিশ্র পুত্রের বিদ্যা-রম্ভের কাল উপস্থিত বুঝিয়া, শুভদিনে যথাবিধি তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত পাঠশালায় যাইয়া লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণমালাদি প্রথম পাঠ সকল শিক্ষা হইল। এই সময়েও কিন্তু তাঁহার স্বভাবের চাঞ্চল্য দূর হইল না। তিনি পাঠান্তে বালক-দিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইয়া বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লিখিত আছে,—তিনি স্নানের সময় অতিশয় চাপল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কখন স্নানকারী লোকদিগের গাত্রে জল নিক্ষেপ করেন; কখন তাঁহাদিগের বস্ত্র সকল পরিবর্ত্তন করেন; কখন কাহার দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক হরণ করেন; কখন কোন বালককে কটুবাক্য বলেন; কখন কাহাকে প্রহার করেন; কখন কাহার সহিত অনর্থক বিবাদ করেন; কখন কাহাকে জলে ডুবাইয়া দেন; কখন স্বয়ং জলে মগ্ন হইয়া কাহার পা ধরিয়া টানেন; কখন কাহার স্কন্ধে আরোহণ করেন; কখন কাহার গাত্রে ধূলিকর্দ্দমাদি প্রক্ষেপ করেন; কখন কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চান; কখন কাহার বস্ত্রহরণ করেন; এই সকল অত্যাচারে প্রতিবাসিগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করেন ও নানা প্রকার ভয় দেখান। কিন্তু তাহাতেও যখন তাঁহার দৌরাত্ম্যের নিবৃত্তি হইল না, তখন অগত্যা তাঁহারা ঐ সকল বৃত্তান্ত তাঁহার পিতামাতার

কর্ণগোচর করিতে বাধ্য হইলেন। শুনিয়া শচীদেবী অভিযোগকারীদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া ও পুত্রের শাসন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় করিলেন। মিশ্রপুরন্দর কিন্তু ঐরূপ অভিযোগ সকল শুনিতে শুনিতে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে একদিন বালকের শাসনার্থ স্বয়ং দণ্ডহস্তে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে অভিযোগকারিগণই আবার, 'অবোধ বালকের কার্য্যে ক্রোধ করিতে নাই' এইপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কারণ, তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত বাহে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেও, অন্তরে বালক শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হন নাই, বরং অনুরক্তই ছিলেন, অতএব তাঁহাকে কোনরূপ পীড়ন করা হয়, এরূপ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ছিল না। যাহা হউক, জগন্নাথমিশ্র যখন নিতান্তই রোষভরে পুত্রের শাসনার্থ চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহারা অন্য পথ দিয়া সত্বর গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে সতর্ক করিয়া দিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ নিকটবর্ত্তী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া পূর্ব্ববৎ পুস্তকাদি লইয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অন্য পথ অবলম্বনে গৃহে উপনীত হইলেন। এদিকে জগন্নাথমিশ্র পুত্রের শাসনার্থ গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জলে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া উহাদিগকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা শিক্ষিত ছিল, জিজ্ঞাসামাত্রই বলিল, "নিমাই আজ এখনও স্নান করিতে আইসে নাই, পাঠশালা হইতে গৃহে গিয়াছে, আমরা তাহার অপেক্ষা করিতেছি।" বালকদিগের কথা শ্রবণ করিয়া জগন্নাথ মিশ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ মলিন কলেবরে শুষ্ক বসনে তৈলপ্রার্থনায় জননীর নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, যাঁহারা পুত্রের দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেন নাই, ইহা স্থির, অথচ পুত্রের অঙ্গে কিছুমাত্র স্নানচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। মিশ্রবর ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইলেন। তিনি মনে মনে পুত্রকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ভাবও স্থায়ী হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ক্রোড়ে উঠিলেই তিনি বাৎসল্যরসের উদ্রেকে সকল ভুলিয়া গেলেন। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর, তোমার এরূপ কুবুদ্ধি হইতেছে কেন? তুমি কি নিমিত্ত গঙ্গাতীরে যাইয়া লোকের প্রতি অত্যাচার কর? তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণ মান না, সকলের

প্রতি অত্যাচার করিয়া থাক।” এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—“আজ আমি স্নান করিতেই যাই নাই। আপনি আমাকে বিনা অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিতেছেন। আজ যদি কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, সে অন্য বালকের কৃত, আমার কৃত নহে। আমি না থাকিলেও যদি আমার নামে দোষারোপ হয়, তবে সত্য সত্যই যথেষ্ট অত্যাচার করিব।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া জননীর নিকট হইতে তৈল গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। জনক ও জননী উভয়েই অবাক্ হইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাতীরে আসিয়া পুনর্ব্বার বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইলেন এবং চাতুরীর কথা আলোচনা করিতে করিতে সকলে মিলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র কোন কোন দিন তাঁহাকে কিছু কিছু তাড়ন-ভর্ৎসনও করিয়া থাকেন। একদিন স্বপ্নযোগে এক অতিতেজস্বী ব্রাহ্মণ কিছু ক্রোধের সহিত বলিলেন,—“মিশ্র, তুমি কি তোমার পুত্রের তত্ত্ব জান না? তুমি উঁহাকে তাড়ন-ভর্ৎসন কর কেন?” মিশ্র বলিলেন,—“পুত্রের তত্ত্ব আবার জানিব কি? সে দেব সিদ্ধ বা মুনি যেই হউক, সে আমার পুত্র। পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া বা লালনপালন করা পিতার স্বধর্ম্ম। আমি শিক্ষা না দিলে, সে শিখিবে কিরূপে?” মিশ্রের শুদ্ধ বাৎসল্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। মিশ্র জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যতই কেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করুন না, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপকে দেখিলেই তাঁহার চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইত। বিশ্বরূপের প্রকৃতি অতি ধীর ছিল। তিনি আজন্ম বিরক্ত ও সর্ব্বগুণের আকর ছিলেন। তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। বিশ্বরূপ অধিকাংশ সময়ই অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় শাস্ত্রালাপে অতিবাহিত করিতেন। একদিন ভোজনের সময় হইলেও বিশ্বরূপ বাটী না আসায়, শচীদেবী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতসভায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতসভাস্থ ভক্তবর্গের সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, সকলেই একদৃষ্টিতে মিশ্রতনয়ের সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন দেখেন বটে, কিন্তু সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ শোভা বিশ্বরূপেরও নয়নমন হরণ করিল। ক্ষণ-

কাল পরে অদ্বৈতাচার্য্য সভার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই বালক কথনই প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না; নিশ্চয়ই কোনি মহাপুরুষ মিশ্রের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" অপর সকলেও তাঁহার বাক্যের অনুমোদনপূর্ব্বক বালক শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দিগম্বর শ্রীগৌরাঙ্গ জ্যেষ্ঠের হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন।

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বরূপের সংসারত্যাগের বাসনা ছিল। তৎকালে জনকজননী তাঁহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি সত্বর গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। শুনা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ পরিভ্রমণকালে শ্রীনিত্যানন্দের কলেবরেই মিলিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া পিতামাতার নয়নের অন্তরালে গমন করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসসংবাদ জনকজননীর শ্রবণগোচর হইলে, তাঁহারা শোকে অতিশয় বিহ্বল হইলেন। আত্মীয়স্বজনগণ নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকাবেগ নিবারিত হইবার নহে, বাহিরে অপ্রকাশ হইলেও, তুষানলের ন্যায় অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বরূপের শোকপ্রবাহ অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় জনকজননীর অন্তরে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে নদীয়ানগরের অনেকেই দুঃখিত হইলেন। ভক্তসম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতিবোধ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ বিশ্বরূপের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া প্রচুর বিলাপ করিলেন। জনকজননীর ত কথাই নাই। তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নহে, ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গই জনকজননীর ও আত্মীয়স্বজনের বিশ্বরূপবিরহাক্রান্ত শোকাকুল হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স তখন ছয় বৎসর। তদীয় মাধুর্য্যরশ্মি প্রকাশিত হইয়া লোক সকলের হৃদয়গুহানিহিত বিষাদতিমির বিদূরিত করিতে লাগিল। মিশ্রবর বাৎসল্যমোহে আচ্ছন্ন হইয়া, জ্ঞানই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কারণ ভাবিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাছে জ্ঞানলাভের পর শ্রীগৌরাঙ্গও জ্যেষ্ঠের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদিগকে অপার বিষাদসাগরে নিমজ্জিত করেন, এই ভাবিয়া, তিনি সহধর্ম্মিণী শচীদেবীর নিকট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"পুত্রের

মূর্খতাজনিত দুঃখ তদ্বিরহজনিত শোকাপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল। এক পুত্রের বিরহব্যথাই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, আবার এই পুত্রটিও যদি সন্ন্যাসী হয়, তাহা আমরা কিপ্রকারে সহ্য করিব? অতএব বিশ্বম্ভরের বিদ্যাভ্যাস স্থগিত হউক।” এই কথা বলিয়া জগন্নাথ মিশ্র নিজের সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চা রহিত করিয়া দেওয়া হইল।

এই সময়ে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নৈবেদ্যের তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। জনকজননী পুত্রের এইপ্রকার মূর্চ্ছাবস্থা আরও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ ভীত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষার পর শ্রীগৌরাঙ্গ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন,—“মাতঃ, একটি কথা শুনুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমিও আমার মত সন্ন্যাসী হও। আমি বলিলাম, আমি বালক, এখন সন্ন্যাস করিলে কি হইবে? আমি গৃহে থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিব, তাহা হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন,—তবে তুমি গৃহে যাও, গৃহে যাইয়া পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইও।” পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকজননী জ্যেষ্ঠপুত্রের সংবাদপ্রাপ্তিতে এবং পুত্র এখনও তাঁহাদিগকে ভুলেন নাই এই জ্ঞানে হর্ষান্বিত হইলেন। কিন্তু কালে শ্রীগৌরাঙ্গও পাছে সন্ন্যাসী হন ভাবিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হইল। শচীদেবী এই বিষয়টি শীঘ্রই ভুলিয়া গেলেন; মিশ্র কিন্তু উহা ভুলিলেন না। পুত্রের বিদ্যাভ্যাস স্থগিত করার সম্বন্ধে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার মত এইরূপে দৃঢ়তর হইয়াও স্থায়ী হইতে পারিল না। তিনি অধিক দিন ঐ মত পোষণ করিতে পারিলেন না। বালকরূপী শ্রীহরি পিতার মত পরিবর্ত্তনের অভিলাষে ছল করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন গরু সাজিয়া গৃহস্থের গাছ-পালা নষ্ট করিয়া দিয়া, কখন কাহারও গৃহদ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ বালস্বভাবসুলভ; লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন তিনি উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ত্যক্ত হাঁড়ির উপর আসন করিয়া বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বাঙ্গে হাঁড়ির কালি লাগিয়া গেল। শচীদেবী দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং অস্পৃশ্য হাঁড়ি স্পর্শ করার নিমিত্ত অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“আমি কি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি? এজগতে উচ্ছিষ্ট বা অনুচ্ছিষ্ট

কিছুই নাই। ইহা পবিত্র, ইহা অপবিত্র, কেবল মনে। বস্তুতঃ পবিত্র বা অপবিত্র বলিয়া কোন সামগ্রী নাই। সকলই মায়াময়, সকলই একই প্রকৃতির বিকার। বিশেষতঃ এসংসারে এমন বস্তুই থাকিতে পারে না, যাহাতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভগবান সর্ব্বতীর্থময়; অতএব তদধিষ্ঠিত বস্তুমাত্রই পবিত্র, কিছুই অপবিত্র নহে।" শচীদেবী বালকের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ছাড়িবার নহে। এক এক দিন এক একটি নূতন নূতন অনাচার ও অত্যাচার করেন। পিতামাতা তাঁহার ঐ সকল অনাচার ও অত্যাচারে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত হন, আবার সময়ে সময়ে ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সকলই ভুলিয়া যান। ফলে তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল না, শ্রীগৌরাঙ্গকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত কোন চেষ্টাই হইল না। ভাবগতি বুঝিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তনের জন্য অপর এক অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, শাস্ত্রমতে গঙ্গায় যাহার অস্থি পড়ে, সেই মুক্ত হয়, অতএব আমি সাধ্যমত মৃত প্রাণীর অস্থি সঞ্চয় করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব, এইরূপ করিলে, অনেক প্রাণীর উপকার করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা শ্রীভগবানেরও সেবা হইবে। এইটি নিশ্চয় হইলে, তিনি কর্ত্তব্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সঙ্গী বালকদিগকে লইয়া নানাস্থান হইতে মৃত প্রাণী সকলের অস্থি সংগ্রহ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই গঙ্গার জল অস্থিময় হইয়া উঠিল। অনেকেরই ঘাটে স্নান ও পূজাহ্নিকের বাধা জন্মিল। সকলেই তাঁহাকে ঐ প্রকার আচরণ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু অচলপ্রতিজ্ঞ শ্রীগৌরাঙ্গ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তখন তাঁহার উক্ত ব্যবহার মিশ্রের কর্ণগোচর করা হইল। জগন্নাথ মিশ্র মহাক্রোধভরে গঙ্গাতীরে আসিয়া স্বচক্ষে পুত্রের ব্যবহার দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রোদন করিতে করিতে সকলের সমক্ষে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বালকের এই গুরুতর উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া সকলেই সুখী হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রকে পুনর্ব্বার বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স নয় বৎসর হইল। উপনয়নের কাল

উপস্থিত। বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনয়নের দিনস্থির হইল। জগন্নাথ মিশ্র আত্মীয়স্বজনের সহিত বিহিতবিধানে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিলেন। যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া স্বভাবসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইলেন। তাঁহার অদ্ভুত ব্রহ্মণ্যতেজ সন্দর্শনে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের মনের ভাব পূর্ব্বেই কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শচীদেবীর অনুনয়ে পুনর্ব্বার পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে নদীয়ায় গঙ্গাদাস নামে একজন ব্যাকরণশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকটেই শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যাকরণ অধ্যয়ন অবধারিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র অল্পদিবসের মধ্যেই পুত্রকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অনতি-দীর্ঘকালমধ্যেই ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিলেন। সহাধ্যায়িগণ ও অপরাপর বৈয়াকরণ সকল তাঁহার সেই অভাবনীয় ব্যাকরণপাণ্ডিত্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এমন কি, অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতও নবীন শিষ্যের সেই অত্যল্পকালের মধ্যে তাদৃশ অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে একদিন জগন্নাথ মিশ্র একটি অতি ভীষণ হৃদয়বিদারক স্বপ্ন দর্শনে ব্যথিত হইয়া পরমেশ্বরের নিকট পুত্রের গৃহবাস ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শচীদেবী অকস্মাৎ পতির সেই অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিয়া বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি হঠাৎ এরূপ বর প্রার্থনা করিতেছেন কেন? তখন জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গত নিশাতে দেখিলাম, আমার বিশ্বম্ভরও বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসী ও সর্ব্বলোকের নমস্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই এই প্রকার বর প্রার্থনা করিতেছি।" শচীদেবী বলিলেন,—"আপনি নিরন্তর বিশ্বরূপের বিষয় চিন্তা করিয়াই এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। নিমাই আমার নিতান্ত শান্তস্বভাব। বিশেষতঃ সে বিদ্যাভ্যাসে যেরূপ নিবিষ্টচিত্ত, তাহাতে সে যে গৃহবাসী হইবে, ইহাই বুঝা যায়।"

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে বলিলেন, "মাতঃ, তুমি শ্রীহরিবাসরে অন্ন ভোজন করিও না।" শচীদেবী বলিলেন,— "তাহাই হইবে।" ইহার পর হইতেই মিশ্রভবনে শ্রীহরিবাসরে অন্নভোজন রহিত হইল। এদিকে মহাপুরুষের ভাবী কার্য্য সম্পাদনের সময়ও ক্রমে

নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। জগন্নাথ মিশ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার লোকান্তরগমনে মিশ্রগৃহ যে কীদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। শচীদেবী বালক পুত্রের সহিত সুগভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভবতারণের আশ্রয়ে থাকিয়াও শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলেন। মিশ্রের অভাবে কে সংসার প্রতিপালন করিবে, এই চিন্তাই তখন তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। নিজের ভারভূত জীবন চিন্তার বিষয় না হইলেও, তিনি পুত্রের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। জীবনের অভিলাষ না থাকিলেও, তিনি কেবল পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই তাঁহার সেই শোকসন্তপ্ত শূন্য জীবন ও পতিবিরহানলে দগ্ধপ্রায় অন্তঃসারবিরহিত দেহযষ্টি ধারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন সময় বুঝিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার সেই বালচাপল্য অদৃশ্যপ্রায় হইল। তিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া শোক-চিন্তাতুরা জননীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

কৈশোরলীলা।

জগন্নাথ মিশ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাভ্যাস বন্ধ-প্রায় হইল। কিন্তু বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর মাত্র। তিনি পুনর্ব্বার বিদ্যার্জ্জন-লীলা প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। জননী শচীদেবী সংসার-ভার-বহনের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক পুত্রের উক্ত অভিলাষ নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হইল না। একদা শ্রীগৌরাঙ্গ স্নানার্থী হইয়া জননীকে গঙ্গাপূজার উপহার সকল প্রস্তুত করিতে বলিলেন। গৃহে দ্রব্যাভাববশতঃ উপহার প্রস্তুতকরণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। তিনি বিলম্বের কারণ বুঝিয়াও অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া গৃহসামগ্রী সকল ভাঙ্গিয়া অপচয় করিতে লাগিলেন। জননী কর্ত্তৃক তাঁহার বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে বাধা প্রদানই উক্ত উপদ্রবের মূল কারণ। পুত্রের ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তায় শচীদেবীও উহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আবার বিদ্যার্জ্জন করিতে অনু-মতি দিলেন। তদবধি পুনর্ব্বার বিদ্যার্জ্জন আরম্ভ হইল। গৃহে কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থাভাব। শচীদেবী ভয়প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি জননীর মন বুঝিয়া ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মধ্যে মধ্যে

স্বর্ণমুদ্রাদি আনিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ অর্থ কোথা হইতে আসিতেছে, শচীদেবী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সময়ে সময়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর দেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর দেন, এই পর্য্যন্ত। শচীদেবী শুনিয়াও পুত্রবাৎসল্যে মোহিত হইয়া অবাক্ হইয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যুগধর্ম্মপ্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় বিদ্যারসে বিনোদলীলা করিতে লাগিলেন। রাত্রিদিন অবসর নাই, বিদ্যালোচনাতেই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আবার যথাকালে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাস্ত্রচিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকিতে লাগিলেন। কি অধ্যাপক, কি সহাধ্যায়িগণ, কি নবদ্বীপবাসী অপরাপর পণ্ডিত ও ছাত্র, সকলেই তাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও অসামান্য সূক্ষ্মবুদ্ধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এমন কি, ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্তও পরাভবভয়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে মূকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণসমাপ্তির পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু উহার কোন লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের মত এই যে, তিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেই, মুকুন্দসঞ্জয় নামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বাটীতে স্বয়ং টোল করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যদিও ব্যাকরণমাত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা সকল শাস্ত্রেরই চলিত। বহুশাস্ত্রের আলোচনা, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা, যদিও তিনি, অফল বলিয়াই, অনুচিত বোধ করিতেন, তথাপি, যে বিদ্যাগৌরবের কালে তাঁহার আবির্ভাব, সেই কালের উপযোগী বোধ করিয়া, সাধারণের বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ সকল শাস্ত্রেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার একটি বিশেষ ফলও ফলিয়াছিল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জ্ঞানে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কেহ কোনরূপ বিদ্যাগর্ব্ব প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না; অধিকন্তু সকলেই আপনাকে তাঁহার নিকট বিদ্যাবলে হীন বলিয়াই বোধ করিতেন।

এই সময়ে পতিবিয়োগবিধুরা শচীদেবী সংসারসাগরের একমাত্র অনুজ্জ্বল আশাদীপতুল্য পুত্রকে বয়স্থ দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগি-

লেন। অচিরেই নবদ্বীপনিবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুমারী অনিমেষনয়নে তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী পান করিতেছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, উভয়েই নীরব, নিস্পন্দ; যেন দুইটি কনকপ্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে। অকস্মাৎ লক্ষ্মীদেবীর বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। তাঁহার নয়নযুগল বাষ্পপরিপ্লুত হইয়া উঠিল। বায়ুভরে ঈষৎ প্রফুল্ল শতদলে রজনীসঞ্চিত নীহারবিন্দুর পতনে যাদৃশী অবস্থা হয়, লক্ষ্মীদেবীর নয়নকমল তাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তিনি সহসা সেই ভাব গোপন পূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনে দ্রুতপদসঞ্চারে অন্তর্হিত হইলেন। তীরস্থ পুষ্পবাটিকার মধ্য দিয়া প্রয়াণকালে বোধ হইল যেন জলদপটল ভেদ করিয়া সৌদামিনী ছুটিয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদ্দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই শচীদেবী বনমালী ঘটকের সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। দিনস্থির হইল। শুভদিনে শুভলগ্নে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনে মিশ্রগৃহ অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। নদীয়াবাসীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। সকলে মিলিয়া মহানন্দে লক্ষ্মীনারায়ণের বৈবাহিক উৎসবব্যাপার সমাধা করিলেন। শচীদেবী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া মিশ্রের বিরহসন্তাপ কিয়ৎপরিমাণে ভুলিলেন।

যৌবন-লীলা।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত করিয়া খণ্ড খণ্ড কাল সকল অখণ্ডকালের অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐ কালগতিতে জীবেরও বাল্যের পর যৌবন ও যৌবনের পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। আমাদিগের বর্ণনীয় মহাপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর কালের অতীত হইয়াও প্রাকৃতিক লীলারঙ্গে নরভাবে ক্রমে ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়া নিজ ঐশ্বর্য সংগোপনপূর্ব্বক নদীয়ানগরে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া দর্শকমাত্রই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বৃহস্পতির সমান এবং সাধারণ নরনারী

কন্দর্পের সমান দেখিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া শচী দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা সহকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বাভাবিক চঞ্চলতার কিন্তু এই সময়েও নিবৃত্তি হইল না। তিনি যখন যাঁহাকে সম্মুখে পান, তখনই তাহাকে একটি না একটি প্রশ্ন করিয়া পরাজয়ের চেষ্টা করেন। কাহারও পরিহারের সামর্থ্য হয় না, পলায়নের চেষ্টা করিলেও ছাড়েন না, ডাকিয়া আনিয়া পরাজয় করিয়া থাকেন। অগত্যা মুকুন্দ ও গঙ্গাধর প্রভৃতি বৈষ্ণব সকল বৃথা তর্কের ভয়ে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রকৃত ভক্ত দেখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এমন কি, ভক্তের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দেখিলে, তিনি তাঁহাকে আদর সহকারে নিজের গৃহে লইয়া ভিক্ষা করাইতেন।

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরী নামক একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নদীয়ায় আগমন করিলেন। ঈশ্বরপুরীর পূর্ব্বাবাস কুমারহট্ট, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরপুরী নদীয়ায় আগমন করিলে, অদ্বৈতাচার্য্যাদি বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ এক দিবস তাঁহাকে লইয়া সমাদর সহকারে নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ঈশ্বরপুরী "শ্রীকৃষ্ণলীলা" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নদীয়ায় গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থানকালে একদিন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে উক্ত গ্রন্থখানির দোষগুণ সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু ভক্তের দোষানুসন্ধান বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আপনি পরমভক্ত, আপনার কবিত্ব যেমনই হউক, উহা শ্রীভগবানের প্রীতিকর জানিবেন। শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী, পাণ্ডিত্যের অনুসন্ধান করেন না।" যাহা হউক, একদিন নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া উক্ত গ্রন্থের কোন একটি কবিতায় একটি ধাতুতে দোষারোপ করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুরীগোসাঁই স্বপক্ষসংস্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তিনি আর কোনরূপ তর্ক উত্থাপন না করিয়া ভক্তগৌরব রক্ষা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক চাপল্যের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, যে শ্রীগৌরাঙ্গ বাজার করিতে গিয়া কখন তন্তুবায়ের সঙ্গে কখন তাম্বূলীর সঙ্গে কখন খোলাবিক্রেতা শ্রীধরের সঙ্গে বিবিধ আমোদজনক রহস্য করিতেন। ঐগুলি সর্ব্বথা নির্দ্দোষ ও মধুর।

সাধারণের চক্ষুতে উহার কোনটি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাদের সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের কেহ কখন কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষই প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা যখন অসন্তুষ্ট হইতেন না, তখন তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার নাই।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ বায়ুচ্ছলে কয়েকটি সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করাইলেন। মুহুর্মুহু অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ভ ও মূর্চ্ছাদি হইতে লাগিল। মুকুন্দসঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর নিজ জন সকল প্রভুর ঐ সকল বিকার দর্শন করিয়া বায়ুর কার্য্য বলিয়াই স্থির করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তৈলাদি মর্দ্দন করিবারও ব্যবস্থা হইল। ফলতঃ কয়েকদিবস এই ভাবে কাটাইয়া প্রভু নিজের ভাব নিজেই সম্বরণ করিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনাকার্য্য চলিতে লাগিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একজন গণকের সাক্ষাৎ হইল। ঐ গণক সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত গণনা করিতে বলিলেন। গণক গণনা দ্বারা তদীয় ঐশ্বর্য্য বিদিত হইলেন। তিনি প্রভুকে কখন মৎস্য, কখন কূর্ম্ম, কখন বরাহ, কখন বামন, প্রভৃতি বিবিধ অবতাররূপে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ইনি হয় কোন এক জন মহামন্ত্রবিৎ, না হয় কোন দেবতা। গণক অবাক হইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "কি ভাবিতেছ? গণনা করিয়া আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি বিদিত হইলে বল।" গণক বলিলেন, "আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না, অন্য এক সময় বলিব।" এই বলিয়া গণক বিদায় হইলেন, প্রভুও কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ কয়েকটি ছাত্রের সহিত নগরভ্রমণ করিতেছিলেন। পথিমধ্যে পরমবৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার পিতৃবন্ধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বাৎসল্যভাবেই দেখিতেন এবং সময়ে সময়ে উপদেশাদিও প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আশীর্ব্বাদ পুরঃসর বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর, তুমিত যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জনই করিয়াছ; জ্ঞানের ফল তোমাতে না ফলিয়াছে, এরূপও নয়; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, ঐ ফল অকিঞ্চিৎকর কি না? উহা যদি অকিঞ্চিৎকরই হয়, তবে আর অধিক কাল উহাতে মগ্ন থাকায় ফল কি? এখন ঐ জ্ঞানগর্ভ হইতে উত্থিত হও। যাহা প্রকৃত জ্ঞান, যাহা জ্ঞানের সার, তাহাতেই নিবিষ্ট হও। তুমি ভক্তিরসে রসিক হও। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজন করিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।" পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলি-

লেন, "পণ্ডিত, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এখন আমাকে বালক ভাবিয়া কেহই গ্রাহ্য করিবেন না। আরও কিছুদিন পরে একজন উত্তম বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া আমি এমনই বৈষ্ণব হইব যে, তখন অজ, ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" এই কথা বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ চাপল্য সহকারে হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীবাস পণ্ডিতও হাসিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, আমি ভাল চপলকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি কি দেবতাকেও মান না?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি স্বয়ং ভগবান্, আমি আবার কোন্ দেবতাকে মানিব?" তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও বিষণ্নমনে ভগ্নসঙ্কল্পে যথাভিলষিত পথে চলিয়া গেলেন।

দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়।

পশ্চিম প্রদেশ হইতে কেশব কাশ্মীর নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাদিগ্‌দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিদ্যাবলে পরাস্ত করিয়া দিগ্‌বিজয়ী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়া এখনকার ন্যায় তখনও শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য সুবিখ্যাত ছিল। তখনকার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সকল নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। অতএব নদীয়ার পণ্ডিতসমাজকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্যে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতও নবদ্বীপে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন একপ্রকার সার্থকও হইল। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া দুই এক জন বিখ্যাত পণ্ডিতকে বিচারে পরাজয় করিলে, অপর পণ্ডিত সকল ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। পরে সকলে মিলিয়া গোপনে পরামর্শ করিলেন, দিগ্‌বিজয়ী যেরূপ গর্ব্বিত, তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের নিকট পাঠাইলেই যথেষ্ট শাসন হইবে। বিশেষতঃ তাঁহাকে এইরূপে পরাজয় করিতে পারিলে নদীয়ার গৌরবও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হইলে, দিগ্বিজয়ীকে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করা হইল। দিগ্বিজয়ী তদনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গমন করিলেন। কিন্তু সে দিন তাঁহার

শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দিগ্‌বিজয়ী লোকপরম্পরায় শুনিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপকমাত্র। শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ীর মনে নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভাব হইল, কিন্তু নদীয়ার সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে পরাজয় না করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগের অভিলাষ যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গও লোকমুখে দিগ্‌বিজয়ীর আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার পরাজয় দ্বারা গর্ব্ব চূর্ণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াও, পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহাকে অসম্মানিত করা সঙ্গত বোধ করিলেন না; পরন্তু দিগ্‌বিজয়ীকে গোপনে পরাজয় করাই সুস্থির করিলেন। যিনি ব্রহ্মভবাদি দেবগণকে মোহিত করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে দিগ্‌বিজয়ীকে পরাজয় করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তিনি মানবলীলা স্বীকার করিয়াছেন। তদবস্থায় দিগ্‌বিজয়ীকে সাধারণের সমক্ষে পরাস্ত করিলে তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইবেন এই ভাবিয়া মহাপুরুষোচিত ছল অবলম্বন করিলেন। দিগ্বিজয়ীর সহিত দেখা করিলেন না।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া সন্ধ্যার পর বিমল শশধরের কিরণে সমালোকিত গঙ্গাতটে বিদ্যাপ্রসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দিগ্‌-বিজয়ী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বরচিত গঙ্গাবন্দনার আবৃত্তি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। প্রথম মিলনেই দিগ্‌বিজয়ী শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত, আমি এই নবদ্বীপে আসিয়া তোমার প্রচুর প্রশংসাবাদ শুনিতেছি। যদিও তুমি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের ব্যবসা করিয়া থাক, তথাপি তোমার যাদৃশী প্রশংসা,তাহাতে আমি তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তন্নিমিত্ত কয়েকদিবস অনুসন্ধানও করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার দেখা পাই নাই, আজ ভাগ্যক্রমে গঙ্গাতীরে তোমার সহিত সাক্ষাৎকার হইল।" তখন তাঁহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দিগ্‌-বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াও অযাচিতভাবে আমার ন্যায় একজন নবীন ব্যাকরণ ব্যবসায়ীকে দর্শন দিলেন, এ অতি ভাগ্যের কথা। যদি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিলেন, তবে ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্লোক দ্বারা গঙ্গার স্তব করিলেন, উহারই একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করুন।"

দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন, "কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিলাষ করিয়াছ, বিদিত হইলেই, তোমার অভিলাষ পূরণ করিতে পারি।" শ্রীগৌরাঙ্গ তন্মুহূর্ত্তেই,—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥"

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী ও স্বয়ং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের এই অদ্ভুত শ্রুতিধরসদৃশ আচরণ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দিগ্‌বিজয়ীর রচিত অজ্ঞাত শ্লোক আবৃত্তিমাত্র কিরূপে তাঁহার অভ্যস্ত হইল ভাবিয়া সকলেই আকুল হইলেন। দিগ্বিজয়ী সবিস্ময়ে বক্ষ্যমাণপ্রকারে উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"গঙ্গার ইহাই মহিমা সতত দেদীপ্যমান্ হইতেছে যে, ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় সুরগণ ও নরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতচরণা। ইনি ভবানীভর্ত্তা শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজ করেন, অতএব ইহাঁর গুণও অতি অদ্ভুত।"

এই প্রকারে শ্লোকটি ব্যাখাত হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"আপনি মহাকবি, এই কবিতা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে কবিতাটির দোষগুণের বিষয় কিছু ব্যাখ্যা করুন, আমরা শুনিয়া চরিতার্থ হইব।" দিগ্‌বিজয়ী শুনিয়া সগর্ব্বে বলিলেন,—"তুমি অলঙ্কারশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, বলিয়াই কবিতার দোষের কথা বলিতেছ; কবিতাটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"আমি ব্যাকরণ ভিন্ন শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করি নাই সত্য, কিন্তু যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এই কবিতাটিতে পাঁচটি দোষ ও পাঁচটি গুণ দেখিতে পাইতেছি। আপনি যদি ক্ষুব্ধ না হন, তবে তাহা দেখাইতেও পারি।" দিগ্বিজয়ী সবিস্ময়ে বলিলেন, "ক্ষতি কি, তোমার যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পার।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"এই কবিতাটিতে 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' নামক দোষ দুইটি, 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নামক দোষ একটি, 'ভগ্নক্রম' নামক দোষ একটি, এবং 'সমাপ্তপুনরাত্ত' নামক দোষ একটি, এইরূপে সর্ব্বসমেত পাঁচটি দোষ আছে। আর 'অনুপ্রাস' 'পুনরুক্তবদাভাস', 'উপমা', 'বিরোধাভাস' ও 'অনুমান' এই পাঁচটি অলঙ্কাররূপ পাঁচটি গুণ আছে। 'ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া', এই উদ্দেশ্য অংশটি 'গঙ্গার ইহাই মহিমা' এই বিধেয় অংশের পূর্ব্বে উক্ত না হইয়া পরে উক্ত হওয়াতে, 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' নামক দোষ হইয়াছে। আবার

শ্রীলক্ষ্মীর দ্বিতীয়ের ন্যায় না বলিয়া দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় বলাতে, উক্ত দ্বিতীয় শব্দ সমাসে লক্ষ্মীর বিশেষণ হইল, সুতরাং গঙ্গা যে দ্বিতীয় লক্ষ্মী, ইহা না বুঝাইয়া, তিনি অপর কোন দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্য, ইহাই বুঝাইল, অতএব এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই ঘটিল। ভবানীভর্ত্তা শব্দের প্রয়োগে, ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং বিরুদ্ধ বুদ্ধির উৎপাদন করিয়া 'বিরুদ্ধ-মতিকৃৎ' নামক দোষ হইল। বিভবতি ক্রিয়া দ্বারা বাক্য শেষ হইলেও, পুনশ্চ অদ্ভুতগুণা এই বিশেষণটির প্রয়োগে 'সমাপ্তপুনরাত্ত' নামক দোষ হইল। শ্লোকটির তিন চরণে অনুপ্রাস অলঙ্কার আছে। শ্রীলক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্ত-বদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় এই স্থলে উপমা অলঙ্কার হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে গঙ্গার উৎপত্তিকথন দ্বারা বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। বিষ্ণুপাদোৎপত্তিরূপ সাধন দ্বারা গঙ্গার মহত্বরূপ সাধ্যবস্তুর সাধনে অনুমান অলঙ্কার হইয়াছে। এইরূপে যদিও শ্লোকটিতে পাঁচটি অলঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি দোষেই শ্লোকটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ভরতমুনি বলিয়াছেন,—

"রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্‌বিভূষিতম্।
স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥"

কাব্য যদি নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়াও একটি দোষে দুষ্ট হয়, তবে সেই কাব্য নানাভূষণভূষিত সুন্দর শরীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে যেরূপ ঘৃণার্হ হয় তদ্রূপ ঘৃণার্হ হইয়া থাকে।

দিগ্‌বিজয়ী শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রকার বিচারনৈপুণ্য দর্শনে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নিজ গৌরব রক্ষার জন্য বিচারের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে আর কোনরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি ভাবিলেন, আজ সরস্বতী বালক-মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন। অন্যথা সমগ্র ভারতের পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট জয়লাভের পর একজন ব্যাকরণ-মাত্র-ব্যবসায়ীর নিকট এইরূপ পরাজয় স্বীকার করিতে হইল কেন? তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সবিনয় সাদরসম্ভাষণ সহকারে বিবিধ প্রশংসাবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সে দিবস বিদায় করিলেন। পরে স্বয়ংও শিষ্য-বর্গের সহিত গৃহে গমন করিলেন। ঐ রাত্রিতেই দিগ্বিজয়ী স্বপ্নাবেশে শ্রীগৌরা-ঙ্গের তত্ত্ব অবগত হইয়া পরদিন প্রত্যূষে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথম দর্শনেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

প্রভুও তাঁহাকে সংগোপনে কৃপা করিয়া বিদায় করিলেন। তিনি গোপনে কার্য্য সমাধা করিলেও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যাদিক্রমে লোকপরম্পরায় দিগ্বিজয়ীর পরাজয়সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীগৌরাঙ্গ তদবধি শ্রীনবদ্বীপে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইরূপে জনসমাজে তাঁহার বিদ্যা-গৌরব বিঘোষিত হইলেও, তিনি স্বয়ং নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনীতভাব পরিত্যাগ করিলেন না। ফলতঃ এই অসাধারণ বিনয়ই আবার তাঁহার সমধিক যশোবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববঙ্গযাত্রা।

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের পর শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের উদ্ধারবাসনায় পিতার জন্মভূমি সন্দর্শনচ্ছলে পদ্মাপারে শ্রীহট্টপ্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে তৎপ্রদেশবাসী লোক সকল তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মুখে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইলেন। লিখিত আছে,—তপন মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের অনিরূপণে অশান্তচিত্তে বিষাদের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গই তাঁহার মনের সকল অন্ধকার দূর করিবেন। ঐ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ প্রদেশেই উপস্থিত ছিলেন। তপন মিশ্র লোকপরম্পরায় ঐ কথা শুনিয়া নিজের বিদ্যাগর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা করিয়া তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারাণসীধামে যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তপন মিশ্র তদনুসারে বারাণসীতেই গমন করিলেন এবং ঐ স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পুনর্ব্বার দেখা হইবে এই আশায় উৎসাহিত হইয়া তদ্দত্ত উপদেশ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গপ্রদেশ কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবী নবদ্বীপে লোকলীলা সম্বরণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গে থাকিয়াই এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। লক্ষ্মীদেবীর বিরহজন্য সন্তাপ শচীদেবীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইল। বর্ষাকালের বারিদবিমুক্ত জলকণার আশায় বৃক্ষ সকল যেরূপ প্রখর রবিকর সহ্য করে, শচীদেবীও তদ্রূপ পুত্রের ভাবি সুখের আশায় অসহ্য পতিবিয়োগতাপ সহ্য করিতেছিলেন। এই আকস্মিক পুত্রবধূবিরহ

নবজলদনিক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় পতিত হইয়া তাঁহার অন্তরকে এককালে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর এই শোক-সন্তাপ নিবারণার্থ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রচুর ধন-রত্ন লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। গৌরচন্দ্রের উদয়ে জননীর হৃদয় আবার শীতল হইল। শোকের পর শোক বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়াকাশকে সময়ে সময়ে আবরণ করিলেও তনয়ের অকলঙ্ক বদন-সুধাকর সন্দর্শনে আবার সকলই বিস্মৃত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা জননীর শোকসন্তাপ নিবারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেও তাঁহার চাপল্যের নিবারণ হইল না। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতেই শ্রীহট্টনিবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্রূপ প্রভৃতি পুত্রের বিবিধ চাপল্য দর্শন করিয়া শচীদেবী পুনর্ব্বার তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রের বিবাহ দিলে, নববধূর মুখদর্শনে তিনি চাপল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করিবেন। স্ত্রীজাতি শ্রীভগবানের লীলারহস্য কি বুঝিবেন, কি জন্য যে নিমাই চঞ্চল কেমন করিয়াই বা জানিতে পারিবেন, সাধারণজ্ঞানে পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত সমুৎসুক হইলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিণয়।

শচীদেবী প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইয়া দেখেন, একটি সর্ব্বসুলক্ষণা পরমাসুন্দরী কন্যা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে এবং দেখা হইলেই বিনীতভাবে নমস্কার করে। কন্যাটি কেবল বাহিক সৌন্দর্য্যেই বিভূষিত নহে, অতিশয় বিনয়শালিনী ও ভক্তিমতী; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে এবং স্নানান্তে তীরে বসিয়া পূজাহ্নিক করে। কন্যাটি যখন প্রণাম করে, শচীদেবীও প্রীতিসহকারে "কৃষ্ণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যোগ্য পতি সংঘটন করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কখন বা মনে মনে ইচ্ছা করেন, এইটি বা এইরূপ একটি কন্যা পাইলে পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। কন্যাটির পরিচয় কিছুই জানেন না, একদিন আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার নাম কি? কুমারী উত্তর করিল, "আমার পিতার নাম সনাতন মিশ্র।" শচীদেবী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নিজের নামটি কি?" উত্তর—"বিষ্ণুপ্রিয়া।"

সনাতন মিশ্র বৈদিক-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ এবং শচীদেবীর আদান প্রদানের ঘর। তাঁহার বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে;—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
অকৈতব, পরম-উদার, বিষ্ণুভক্ত।
অতিথিসেবন-পর-উপকারে রত॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় মহাবংশজাত।
পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ॥
তাঁর কন্যা আছেন পরমসুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী-লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা॥"

শচীদেবী সনাতন মিশ্রের সম্বন্ধে জানিবার কিছুই অপেক্ষা রাখিলেন না; কারণ, তিনি রাজপণ্ডিত ও একজন সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; অতএব অচিরেই কাশীমিশ্র নামক ঘটককে ডাকাইলেন এবং সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতে বলিলেন।

সনাতন মিশ্র পূর্ব্ব হইতেই এই সম্বন্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে কাশীমিশ্রের মুখে প্রস্তাবটি অবগত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকেও শুনাইলেন। লোকপরম্পরায় বিষ্ণুপ্রিয়া এই বিবাহপ্রস্তাব শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পতি; তিনি স্বয়ং মহালক্ষ্মীর সখী ভূশক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি সাধারণ বালিকার ন্যায় নহে, উহা তাঁহার ব্যবহার হইতেই জানা যায়। গঙ্গাস্নানে লক্ষ লক্ষ লোক গমন করিত, তিনি কেনই বা প্রত্যহ কেবল শচীদেবীকেই নমস্কার করিতেন! বিষ্ণুপ্রিয়া এই বিবাহপ্রস্তাবে তাঁহার প্রাক্তন-পতি-লাভের উপযুক্ত কাল সমুপস্থিত ভাবিয়া নীরবে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এদিকে সনাতন মিশ্র শুভকার্য্যে কালবিলম্ব অনুচিত ভাবিয়া সত্বর বিবাহের দিন স্থির করিবার নিমিত্ত গণককে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। গণক সংবাদ পাইয়া মিশ্রের ভবনে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে নিমাই পণ্ডিতের সহিত দেখা হইল। গণক নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়াই বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এরূপ চঞ্চলভাবে বেড়াইতেছ, আমি যে তোমার বিবাহের দিনস্থির করিতে যাইতেছি।" নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "কৈ আমিত বিবাহের কিছুই জানি না!"

গণক শুনিয়া ভগ্নমনে মিশ্রসদনে সমুপস্থিত হইলে, মিশ্র তাঁহাকে কন্যার বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে বলিলেন। গণক বলিলেন,—"আসিবার সময় আমার নিমাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, তিনি এই বিবাহের কিছুই সমাচার রাখেন না। তাঁহার কথার ভাবে আমার বোধ হইল, তিনি বিবাহে অনিচ্ছুক।" এই কথা শুনিয়া মিশ্রসংসারে ঘোরতর হাহাকার পড়িয়া গেল। সনাতন মিশ্র ভাবিলেন, নিমাই পণ্ডিত আজকাল নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, অতএব তিনি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন না। বিশেষতঃ এই বিবাহের কথাবার্ত্তা শচীদেবীর সহিত হইতেছে। শচীদেবী স্ত্রীলোক, নিমাই পণ্ডিতও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি নিজের মতেই কার্য্য করিবেন, জননীর মতে চলিবেন না। তাঁহারা এইপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাল অতিকষ্টেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে এই কথা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং নিজের একজন সুহৃদ্‌কে ডাকাইয়া মিশ্রভবনে বিবাহের উদ্‌যোগ করিবার আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। দুই বৎসর পরেই যাঁহাকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে হইবে, তিনি জানিয়া শুনিয়াও এরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন কেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরহানলে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই কি এই বিবাহ?—না, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত নহে, পরন্তু বিরহস্ফূর্ত্তি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকে পরমদশান্ত প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত। বিরহস্ফূর্ত্তি ভিন্ন প্রেম যে পরমদশান্ত প্রাপ্ত হয় না, তাহা সাধারণের বুদ্ধিবেদ্য না হইলেও, ধ্রুব সত্য। সংসারী হইয়া সংসারত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, লোকসাধারণকে এই পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ এই বিবাহের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমতি পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটীর সকলেই মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন। বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্যগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কায়স্থ জমীদার বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দসঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা একজন সুসম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিবাহের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন।

লিখিত আছে;—

"বুদ্ধিমন্ত খান বোলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা মত এ বিবাহে কিছু নাই॥

এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥"

অনন্তর সকলে মিলিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে অধিবাসের লগ্ন করিলেন। স্থান পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদন করা হইল। চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, ফলপল্লবাদির সহিত পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সম্পাদন করা হইল। নদীয়ার ব্রাহ্মণবৈষ্ণব সকল নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাহ্ণে প্রভুর ভবনে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। ভাটগণ রায়বার পাঠ করিতে লাগিল। পতিব্রতাগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সভার মধ্যস্থলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তদনন্তর সমাগত ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলকেই মালাচন্দনাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করা হইল। এক এক জন শঠতা করিয়া দুই তিন বার পর্য্যন্ত মাল্যতাম্বূলাদি উপহার সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধিবাস কার্য্য সমাপন হইল। সনাতন মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের অধিবাসের পর গৃহে যাইয়া শচীদেবীর অধিবাস করাইলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে যথাবিধি নান্দীমুখ কার্য্য করা হইল। পতিব্রতাগণ লোকাচারের অনুরূপ ষষ্ঠীপূজাদি সমাধা করিলেন। ভোজনাদির পর অপরাহ্ণে বরযাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। কেহ শ্রীগৌরাঙ্গকে বিচিত্র বসনভূষণাদি দ্বারা সাজাইতে লাগিলেন। কেহ বা বাদ্য, দীপ, পতাকা প্রভৃতি গমনোপযোগী সজ্জা সকল সাজাইতে লাগিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সুসজ্জিত হইলে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করাইয়া মিশ্রভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়ৎকাল নদীয়ার পথে পথে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে সনাতন মিশ্রের ভবনে সমাগত হইলেন। বরের আগমনে মিশ্রভবনে বিবিধ বাদ্যের ধ্বনির সহিত 'জয় জয়' ধ্বনি হইতে লাগিল। সনাতন মিশ্র জামাতাকে লইয়া সভামধ্যে উপবেশন করাইলেন। পরে শুভক্ষণে কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিলেন। যথাবিধি সবস্ত্রা সালঙ্কৃতা কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গের করে সমর্পণ করা হইল। সনাতন মিশ্র নিজের বিভবানুরূপ বিবিধ-যৌতুক-সামগ্রীও প্রদান করিলেন। পরে আচারানুরূপ সমস্ত কার্য্যই সম্পাদিত হইল। এইরূপে বিবাহ সমাধা হইল।

পরদিন অপরাহ্ণে প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে লইয়া দোলারোহণে পূর্ব্ববৎ সমারোহের সহিত নিজভবনে আগমন করিলেন। শচীদেবী পতিব্রতাগণকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে আনয়ন করিলেন। পরবর্ত্তী ব্যাপার

সকলও যথাবিধি আচারানুরূপই সম্পাদিত হইল। এইরূপে বিবাহোৎসব সমাহিত হইলে, প্রভু বুদ্ধিমন্ত খানকে সানন্দে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। শচীদেবী নববধূর মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর শোক বিস্মৃত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইরূপে গৃহস্থ হইয়া অধ্যাপকরূপে মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে টোল করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। তিনি যে প্রেমভক্তি প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই করা হয় নাই। সমস্ত সংসার দিন দিন পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তুচ্ছ বিষয়েই সকলের সমাদর, পরমার্থ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র আদর বা অপেক্ষা লক্ষিত হয় না। কাহারও কোন সাধন ভজন নাই, কিন্তু সকলেই প্রচার করেন, 'আমি বেদান্তী', 'আমি ব্রহ্ম'। এমন কি, যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করেন, তাঁহারাও ভক্তিরসে বঞ্চিত, শুষ্কজ্ঞানী; তাঁহারা শ্রীভগবানের নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেহই সঙ্কীর্ত্তনে রত নহেন। কাহারও নামসঙ্কীর্ত্তনে কিছুমাত্র আস্থা দেখা যায় না। অধিকন্তু, যদি কখন কাহারও তদ্বিষয়ে অল্পমাত্রও চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তখনই পাষণ্ড সকল তাঁহাকে উপহাস করিতে থাকেন। উপহাসে তাঁহার ঐ চেষ্টার ত্যাগ না হইলে, তাঁহার উপর উৎপীড়নও হইয়া থাকে। উৎপীড়নেও উদ্যমের নিবৃত্তি না হইলে, তাঁহার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বিবিধ উপায় সকল অবলম্বিত হইতে থাকে। আমরা হরিদাস ঠাকুরের জীবনে এইরূপ দুর্ঘটনা সকলের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে সংসারের যে দুরবস্থার কথা লেখা হইয়াছে, সংসার যখন তাদৃশ-দুরবস্থা-গ্রস্ত, ঠিক সেই সময়েই শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগ্রামের নিকটে বুড়ন নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে ঐ গ্রামে এক পবিত্র সচ্চরিত্র দ্বিজদম্পতি বাস করিতেন। শিবগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাস ঠাকুর ঐ দ্বিজদম্পতি হইতেই জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুমতি ঠাকুর এবং মাতার নাম গৌরী দেবী। ১৩৭১ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। হরিদাস ঠাকুরের বয়স যখন ছয়মাসমাত্র, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। জননীও পিতার অনুমৃতা হয়েন।

শিশু হরিদাস অসহায় অবস্থায় গৃহে পতিত থাকেন। একটি প্রতিবাসী দয়ার্দ্র-চিত্ত মুসলমান জনকজননীহীন রোদনপরায়ণ শিশু হরিদাসকে লইয়া প্রতিপালন করেন। সুতরাং হরিদাস ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও যবনত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হরিদাস এইরূপে যবনগৃহে প্রতিপালিত এবং যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও জাতিস্মরতা বশতঃ বাল্যেই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়েন। তদ্দর্শনে তাঁহার প্রতিপালক মুসলমান, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। হরিদাস প্রতি-পালক কর্তৃক তাড়িত হইয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, পরন্তু স্বাধীনভাবে ভজন করিতে পারিবেন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া সানন্দ অন্তরে বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বেনাপোলের জঙ্গলে যাইয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভজন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের জঙ্গলে নিজ নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম করেন, সদাই নামজপে বিভোর থাকেন, দিনান্তে একবারমাত্র গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যদি কেহ কখন তাঁহার নিকট আইসেন তাঁহাকে হরিনাম গ্রহণেই উপদেশ ও অনুরোধ করেন। কাহারও সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। বনগ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খান লোকপরম্পরায় হরিদাস ঠাকুরের তপ-স্যার কথা শুনিয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। পরের মন্দ চেষ্টা করাই দুষ্টলোকের স্বভাব। রামচন্দ্র খান কয়েকটি সুন্দরী বার-বনিতাকে ডাকিয়া হরিদাস ঠাকুরের তপস্যার বিঘ্নাচরণার্থ অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে একটি বারবনিতা একদিন রাত্রিযোগে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে গমন করিল। সে যাইয়া তুলসীকে প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। পরে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরের দ্বারে বসিয়া নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিতে আরম্ভ করিল। হরিদাস ঠাকুর নাম করিতে করিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং তাহার ভাবগতি বুঝিয়া অনন্যমনে শ্রীহরিনাম জপ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। বারবনিতা হরিদাস ঠাকুরের যৌবনসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও তাঁহার প্রভাবে অভিভূত এবং বিফলমনোরথ হইয়া প্রভাতে রামচন্দ্র খানের নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রিঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। দুষ্ট রামচন্দ্র খান ঐ বারবনিতাকে পুনর্ব্বার হরিদাস ঠাকুরকে প্রলো-ভিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। বারবনিতা সেই রাত্রিতেও হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্ববৎ রাত্রি অতিবাহিত

করিল। আবার তৃতীয় রাত্রিতেও পূর্ব্ববৎ গমন করিল। কিন্তু এই তৃতীয় রজনীতে তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। হরিদাস ঠাকুরের আকৃতি প্রকৃতি ও আচরণ দর্শনে তাহার মন ফিরিয়া গেল। হরিদাস ঠাকুরের মুখোচ্চারিত মধুর হরিনাম শ্রবণে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন সে আত্মাপরাধ স্বীকার করিয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—

"বেশ্যা কহে,—কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় সর্ব্ব ক্লেশ॥
ঠাকুর কহে, পরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

হরিদাসঠাকুর বলিলেন, "বৎসে, আমি তোমার আগমনমাত্র সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াও কেবল তোমার নিমিত্তই তিনদিন অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, নতুবা তৎক্ষণাৎ এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতাম।" অনন্তর তিনি ঐ বারবনিতাকে হরিনামমহামন্ত্র উপদেশ করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বারবনিতাও হরিদাসঠাকুরের উপদেশ অনুসারে নিজের যাহা কিছু বিত্তসম্পত্তি ছিল, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া গুরুদত্ত আশ্রমে থাকিয়া তপস্যায় নিরত হইল। বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া তত্রত্য লোক সকল চমৎকৃত হইলেন এবং হরিদাসঠাকুরের মহিমা বুঝিয়া তদুদ্দেশে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বারবনিতাকে কৃতার্থ করিয়া হরিদাসঠাকুর শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া নামক গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ফুলিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রসিদ্ধ বাসস্থান। ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ হরিদাসঠাকুরের প্রভাব বিদিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু হরিদাসের এই ধর্ম্মানুরাগ যবনকুলের চক্ষুঃশূল হইল। হরিদাস যবন হইয়াও হিন্দুর ধর্ম্মে অনুরাগী, ইহা তাহাদিগের সহ্য হইল না। ক্রমে এই বৃত্তান্ত মুলুকপতি কাজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি হরিদাসঠাকুরকে ধরিয়া বন্দী করিলেন। হরিদাসঠাকুরকে দর্শন করিয়া তত্রত্য অপরাপর বন্দীদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইল। তাহারাও হরিদাসঠাকুরের সহিত উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন হরিদাসঠাকুরের বিচার আরম্ভ হইল। মুলুকপতি হরিদাসঠাকুরকে বলিলেন,—"দেখ, লোকে বহুভাগ্যে মুসলমান হয়; তুমি সেই মুসলমান হইয়াও হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ কেন?"

হরিদাসঠাকুর নিজ স্বভাবসিদ্ধ বিনয় সহকারে উত্তর করিলেন,—

"শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর।
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়।
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন।
সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজশাস্ত্রমতে॥"

হরিদাসঠাকুরের মধুর সত্যবাক্যে বিচারকর্ত্তা মুলুকপতি ও সভাস্থ অপর সকল মুসলমানই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন, কেবল গোরাই নামক এক দুষ্ট কাজী অসন্তুষ্ট হইল। সেই নীচাশয় কাজী বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তি যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, তদুপযুক্ত দণ্ডবিধানই কর্ত্তব্য, নতুবা ইহার দৃষ্টান্ত অনুসারে অপরাপর মুসলমানও হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানধর্ম্মের ক্ষতি করিবে।" এই কথা শুনিয়া বিচারপতির ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তখন তিনি বলিলেন,—"আরে ভাই, তুমি হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিয়া মুসলমান-শাস্ত্র পাঠ কর ও মুসলমানধর্ম্ম আচরণ কর। অন্যথা তোমাকে যথেষ্ট শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।" হরিদাসঠাকুর শ্রীহরিনামের প্রভাব বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

হরিদাসের কথা শ্রবণ করিয়া মুলুকপতি সভাসদ্‌বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"এবে কি করিবা ইহা প্রতি?"

পূর্ব্বোক্ত দুষ্টাশয় কাজী অবসর বুঝিয়া বলিল,—"ইহাকে লইয়া বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা হউক। বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতেও যদি ইহার জীবন

থাকে, তাহাতেও যদি ইহার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে, হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বুঝা যাইবে।”

হরিদাসঠাকুরের প্রতি উক্ত ভীষণ দণ্ডেরই আদেশ হইল। আদেশমাত্র পাইক সকল হরিদাসঠাকুরকে লইয়া বাজারে বাজারে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। হরিদাসঠাকুর মনে মনে সুমধুর হরিনাম স্মরণ করিতেছেন। আঘাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। সকরুণহৃদয় দর্শকবৃন্দের কেহ বা প্রহারকারীদিগকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন, কেহ বা সবিনয়ে হরিদাসঠাকুরকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হরিদাসঠাকুর, সংসারের জন্য নয়, প্রাণপ্রেষ্ঠ মধুর হরিনামের জন্য বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন, এই ভাবিতে ভাবিতে নামানন্দে বিভোর হইলেন, জগৎসংসার ভুলিয়া গেলেন, দেহদৈহিক সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, তুরীয়স্থ হইয়া আনন্দচিন্ময় নামের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। প্রহারকারিগণ হরিদাসঠাকুরকে প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—

"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে।
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে।
মরেও না আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা সভেই ভাবে মনে॥"

পরে যখন তাহারা বলিতে লাগিল,—

—"অয়ে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ।
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা-সভাকার।"

তখন হরিদাসঠাকুর স্থূলে আগমন করিলেন, প্রহারকারী পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি, তাঁহাকে প্রহার করিয়া, পাপিষ্ঠগণের যে ক্লেশ ভয় ও অপরাধ হইয়াছে তাহার প্রশমনার্থ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ভাই সকল, আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদিগের মন্দ হয়, তবে এই আমি মরিলাম।" তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। প্রহারকারীরা তিনি মরিয়াছেন ইহাই স্থির করিল। অনন্তর তাহারা সানন্দে মৃতবৎ হরিদাসঠাকুরকে লইয়া মুলুকপতির

সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মুলুকপতিও হরিদাসঠাকুরকে মৃত ভাবিয়া প্রথমতঃ ভূগর্ভে নিহিত করিতে আদেশ করিলেন। পরে গোরাই কাজীর পরামর্শে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই স্থির হইল।

"মাটি দেহ নিঞা বোলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে তবে ত পাইব ভাল গতি।
বড় হই যেন করিলেক নীচকর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় এই ধর্ম্ম।
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল॥"

তদনুসারে হরিদাসঠাকুরকে ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করা হইল। হরিদাসঠাকুর কৃষ্ণানন্দ-সিন্ধু-মধ্যে নিমগ্ন, পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে বা গঙ্গায়—কোথায় আছেন, জানেন না। ভাসিতে ভাসিতে অনেকদূর চলিয়া গেলেন। অনেকদূর যাইয়া তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি পরমানন্দে তীরে উঠিলেন। তীরে উঠিয়া উচ্চস্বরে নাম করিতে করিতে পুনর্ব্বার ফুলিয়ায় আগমন করিলেন। হরিদাসঠাকুরের তাদৃশ অদ্ভুত প্রভাব সন্দর্শন করিয়া, হিন্দুদিগের কথা দূরে থাকুক, মুসলমানেরাও বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি হিংসাদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মুলুকপতি ও গোরাই কাজী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও যুক্তকরে প্রণতিপুরঃসর তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা 'হরিদাসঠাকুর যথেচ্ছ বাস ও বিচরণ করিবেন' এইপ্রকার একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি হরিদাসঠাকুর গঙ্গাতীরে এক নির্জ্জন গহ্বরে বাস করিতে লাগিলেন।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণসজ্জন সকল প্রায়ই হরিদাসঠাকুরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আসিয়া ঐ স্থানে অতিশয় সর্পের উপদ্রব অনুভব করিতে লাগিলেন। শেষে জানা গেল, হরিদাসঠাকুর যে গহ্বরে বাস করেন, উহার মধ্যে একটি ভীষণ বিষধর সর্প আছে। তদনুসারে হরিদাসঠাকুরকে ঐ গহ্বর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হইল। হরিদাসঠাকুর তাঁহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "ঐ সর্প যদি এই স্থান ত্যাগ না করেন, তবে আমিই এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিব।" বলিতে বলিতেই একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

একদিন কোন গৃহস্থের ভবনে ডঙ্ক নামক ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিল। সে ক্রীড়া করিতে করিতে কালিয়দমন বিষয়ক গীত গাইতে লাগিল। ঐ সময় হরিদাসঠাকুর যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ডঙ্কের সেই লীলাগীত শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। দর্শকবৃন্দ তাঁহার চরণের ধূলি-কণা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে এক ভণ্ড ব্রাহ্মণ হরিদাসঠাকুরের অনুকরণ পূর্ব্বক নাচিতে নাচিতে ভূতলে পতিত হইল। হৃদয়ের সাক্ষী মুখ। ডঙ্ক মুখ দেখিয়াই ব্রাহ্মণের ভণ্ডতা বুঝিতে পারিল। সে বুঝিয়া উক্ত ভণ্ড ব্রাহ্মণকে সবলে বেত্রাঘাত করিল। ব্রাহ্মণ প্রহারে কাতর হইয়া ঐ স্থান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিল।

তখন উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ঐ ডঙ্ককে ব্রাহ্মণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ডঙ্ক বলিতে লাগিল,—

"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তভো কহিব অবশ্য।
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ।
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ আহার্য্য করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্যবুদ্ধে আছাড় খাইয়া।
আমারো কি নৃত্যসুখ ভঙ্গ করিবারে।
আহার্য্যে মাৎসর্য্যে কোনো জন শক্তি ধরে।
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি করে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে।
বড় লোক করি লোকে জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণপ্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥"

আর একদিন এক ব্রাহ্মণ হরিদাসঠাকুরকে উচ্চস্বরে হরিনাম করিতে শুনিয়া বলিলেন,—

"অয়ে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার।

মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥"

হরিদাসঠাকুর বলিলেন,—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া হরিদাসঠাকুরকে নানা দুর্ব্বাক্য বলিতে বলিতে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। তদনন্তর হরিদাসঠাকুর রামদাস নামক ব্রাহ্মণকে হরিনাম দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রতিষ্ঠার ভয়ে ফুলিয়া ত্যাগ করিয়া কিছুদিন কুলীন গ্রামে যাইয়া বাস করেন। পরে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ লয়েন। অদ্বৈতপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হরিদাসঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষিতও হয়েন। দীক্ষার পর হরিদাসঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন এবং তাঁহারই বাটীতে প্রসাদ পাইতেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরের বাটীতে গমন করিলে হরিদাসঠাকুরও তাঁহার সহিত শান্তিপুরেই গমন করিতেন। আবার তিনি যখন নদীয়ায় আসিতেন, হরিদাসঠাকুরও তাঁহার সহিত নদীয়াতেই আগমন করিতেন।

একদিন সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধনদাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য অনেক অনুরোধ করিয়া হরিদাসঠাকুরকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে বলরাম আচার্য্য হরিদাসঠাকুরকে একদিন গোবর্দ্ধনদাসের বাটীতেও লইয়া যান। হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়া গোবর্দ্ধনদাসের সভাসদ্‌গণ হরিদাসঠাকুরের প্রশংসার সহিত শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়েন। নামমাহাত্ম্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া হরিদাসঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥"

নামের উদয়মাত্র সকল পাপের ক্ষয় হয়, এই কথা, সভাস্থ গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক ব্যক্তিবিশেষের অসহ্য হইল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার নাক কাটা যাইবে।" হরিদাসঠাকুর সকল

সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নামের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং তিনিও বলিলেন, "এই কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার নাক নষ্ট হইবে।" এই কথা বলিয়াই হরিদাসঠাকুর সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিলেন। লিখিত আছে, অল্পদিনের মধ্যেই কুষ্ঠরোগে ঐ ব্রাহ্মণের নাসিকা নষ্ট হইয়া যায়।

গয়াধাম যাত্রা।

হরিদাসঠাকুর যখন আপনমনে কখন নদীয়ায় কখন শান্তিপুরে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন, সেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের পূর্ব্বে, একবার গয়াধামগমনের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলেন। পরে তিনি তীর্থযাত্রার উপযোগী নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল সমাধান পূর্ব্বক জননীর অনুমতি লইয়া মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও কতিপয় শিষ্যের সমভিব্যাহারে গয়াধামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান ও শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে পরমসুখে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। লিখিত আছে, একদিন একস্থানে মৃগমিথুনের বিহারদর্শনে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্ব্বজন ॥"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক ভাগলপুর অঞ্চলের অন্তর্গত মন্দারপর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে শ্রীমধুসূদনবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিলেন। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার বঙ্গদেশের ন্যায় নহে। বাঙ্গালীরা এইরূপ আচার ব্যবহারকে অনাচার মনে করেন। সুতরাং অনাচারীর গৃহে বাস করায় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ তাঁহাকেও অনাচারী বিবেচনা করিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের সেই অন্তরের ভাব বিদিত হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে, আর কাহারও তাঁহাকে অনাচারী মনে করিবার সামর্থ্য হইল না। তিনি অকস্মাৎ নিজদেহে জ্বর প্রকাশ করিলেন। পথের মধ্যে জ্বর প্রকাশ হওয়ায়, তাঁহার সঙ্গিগণ বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহারা একস্থানে থাকিয়া তাঁহার সেই জ্বরের প্রতীকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই জ্বরের বিরাম হইল না।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই এক অদ্ভুত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ আর কিছুই নয়, কেবল বিপ্রপাদোদক। বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করাতেই তাঁহার জ্বরের বিরাম হইল। তাঁহাকে কেবল বিপ্রপাদোদক গ্রহণ দ্বারা জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের বাহ্যিক আচার যত কেন দূষিত হউক না, তিনি কখনই অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারেন না, বাহ্যিক অনাচার দ্বারা স্থূলশরীরের দোষ ঘটিলেও তদন্তর্ব্বর্ত্তী সূক্ষ্মশরীরের দোষ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শিষ্যদিগকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতার বিষয় শিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। কয়েকদিবসের মধ্যেই গয়াধামে পৌঁছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ শ্রীধামকে প্রণাম করিলেন। পরে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া স্নান করিলেন। তদনন্তর বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, নানাদেশীয় বিপ্রগণ বিষ্ণু-পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। কেহ বা পিণ্ডদান করিতেছেন। কেহ কেহ বা পাদপদ্মের মাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন। শ্রীপাদপদ্মের সেই পঠিত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। দুনয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে কম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলও প্রকটিত হইল। দর্শকবৃন্দ তাঁহার ভাব দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। শেষে তিনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া অনিমিষনয়নে শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ পান করিতে করিতে বিবশ-ভাবে পতিতপ্রায় হইলেন। তখন উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ভিন্ন অপর কেহই তাঁহাকে ধারণ করিতে সাহস করিলেন না। ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিতে গেলেন। পুরীগোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। উভয়েই উভয়ের কলেবরস্পর্শে শিথিলাঙ্গ হইলেন। অনন্তর শ্রীগৌর-চন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুরীগোসাঁইকে বলিলেন, "আজ আমার গয়াযাত্রা সফল হইল; শ্রীপাদের চরণদর্শনে কৃতার্থ হইলাম; এই দেহ ঐ চরণেই সমর্পিত হইল; শ্রীপাদ আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করাইবেন।" পুরীগোসাঁই বলিলেন,—"পণ্ডিত, আমি সত্য বলিতেছি, তোমাকে দেখিলে বিশেষ সুখ পাইয়া থাকি। নদীয়ায় দর্শনাবধি তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ। তোমার দর্শনে আমার কৃষ্ণদর্শনের আনন্দ লাভ হইয়াছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমার ভাগ্য মনে করি।"

এই প্রকার কথোপকথনের পর, শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীগোসাঁইর অনুমতি লইয়া তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে গমন করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ফল্গুতীর্থে, পরে ক্রমান্বয়ে প্রেতগয়ায়, দক্ষিণমানসে, রামগয়ায়, যুধিষ্ঠিরগয়ায়, উত্তরমানসে, ভীমগয়ায়, শিবগয়ায়, ব্রহ্মগয়ায় ও ষোড়শগয়ায় শ্রাদ্ধ করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন করিলেন। পিণ্ডদানের পর, পুষ্প চন্দন ও মাল্যাদি উপহার দ্বারা বিষ্ণুপদের পূজা এবং দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বাসায় গমন করিলেন। বাসায় আসিয়া হবিষ্যান্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হয়, এমন সময়ে হরিনাম গান করিতে করিতে হঠাৎ ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীগোসাঁইকে দেখিয়া যথোচিত সাদর-সম্ভাষণ-সহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পুরীগোসাঁই আসন গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ঠিক সময়েই উপস্থিত হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত্ত, তোমারও পাক প্রস্তুতপ্রায়।" শ্রীগৌরাঙ্গ শুনিয়া বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি এইস্থানে অন্ন ভিক্ষা করিবেন।" তখন পুরীগোসাঁই বলিলেন, "তুমি কি খাইবে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি পুনর্ব্বার পাক করিব।" পুরীগোসাঁই বলিলেন, "আর রন্ধনের কি কাজ, যাহা রন্ধন করিয়াছ তাহাই দুই জনে খাইব।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তাহা হইতে পারে না, যাহা রন্ধন হইল, তাহা আপনি ভোজন করুন, আমি সত্বর আমার মত পাক করিয়া লইতেছি।" এই কথা বলিয়া, তিনি যাহা পাক করিয়াছিলেন, তাহা পুরী-গোসাঁইকে দিয়া পুনশ্চ নিজের মত পাক করিয়া লইলেন। সেদিন এইরূপেই কাটিয়া গেল। অপর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীকে নিভৃতে পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। যদিও তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান, যদিও তিনি স্বয়ংই উপদেশামৃত বিতরণ দ্বারা জীবনিস্তারের নিমিত্ত আচার্য্যরূপে ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি আজ লোকশিক্ষার্থ ও শাস্ত্রমর্য্যাদাসংরক্ষ-ণার্থ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পণ্ডিত, মন্ত্র কোন্ কথা, আমি তোমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি।" এই কথা বলিয়া, তিনি যন্ত্রিতের ন্যায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গকে দশাক্ষর মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দীক্ষালাভের পর পুরীগোসাঁইর চরণ ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পুরীগোসাঁই তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রুধারা দ্বারা উভয়েই উভয়কে অভিষিক্ত করিয়া পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন

করিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের এই শেষ দেখা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীগোসাঁইর নিকট বিদায় লইয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অল্পদিবসের মধ্যেই নির্বিঘ্নে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অদর্শনে নদীয়ায় ভক্তগণ নির্জীবের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে পাইয়া মেঘাগমে চাতকের ন্যায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

ভাবান্তর।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলেন। নদীয়া নগরে মহান্ আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। তাঁহার আত্মীয়গণ আগমনসংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আসিতে লাগিলেন। যাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ, তিনি আসিয়া, তদনুরূপ আশীর্ব্বাদ বা অভিবাদনাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতৃকুল পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুত্রের শুভাগমনে শচীদেবী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন। পতিমুখদর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। শ্রীবৈষ্ণবকুল শ্রীগৌরাঙ্গকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, শ্রীগৌরাঙ্গের তাহাই ঘটিল। তিনি বন্ধুবর্গের নিকট নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ গয়াক্ষেত্রের বৃত্তান্ত, বলিতে লাগিলেন। বৃত্তান্ত বলিবেন কি, তাঁহার আর পূর্ব্বভাব নাই, তাঁহার সম্প্রতি ভাবান্তর ঘটিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের কথা বলিতে বলিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথা বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি যাঁহারা কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের উক্ত অভিনব ভাব অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। শেষে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যদৃষ্টি হইল, তখন তিনি শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতিকে বলিলেন, "আজ তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর, কল্য প্রাতঃকালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আগমন করিও, সেই স্থানেই গয়াধামের বৃত্তান্ত বলিব।" তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সেই দিবস গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ জননী ও পত্নীর সহিত কৃষ্ণকথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীবাসপণ্ডিতের বহির্বাটীতে গদাধর, গোপীনাথ, রামাই ও শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীমান পণ্ডিতও

পুষ্পচয়নার্থ ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তিনি পুষ্পচয়ন করিতে করিতে পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত শ্রীবাসাদির নিকট বর্ণনা করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমান্ পণ্ডিতের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের আকস্মিক ভাবান্তর শ্রবণে 'আমাদিগের গোত্র-বৃদ্ধি হইল' এই কথা বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কথিত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আবাসে উপস্থিত হইলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব। ইনি নানা-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আবাসে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বদিবসীয় ভাবান্তরের সমালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলেই পরম-সমাদর-সহকারে তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি নাই। তিনি সম্মুখে ভক্তগণকে দেখিয়া "হা কৃষ্ণঃ! কোথায় গেলে!" বলিয়া ভাবাবেশে ঘরের খুঁটি ধরিয়া ঐ খুঁটির সহিতই পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের যত্নে ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করিলেন। কিন্তু ঐ সংজ্ঞা আবার লুপ্ত হইল। এইরূপ ক্ষণে সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে আবার নিঃসংজ্ঞ হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা বলিয়া রোদনও করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। তখন তিনি কোনরূপে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শনে অতীব বিস্মিত হইলেন। সেদিন এই ভাবেই চলিয়া গেল।

পরদিন শ্রীগৌরাঙ্গ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। গুরুও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দন করিয়া পুনর্ব্বার টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে পড়াইবার কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গুরুর নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাটীতে যাইয়া টোল খুলিলেন। শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। ঐ দিবস আর পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ 'কল্য হইতে পাঠারম্ভ হইবে' বলিয়া শিষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববৎ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সকল সমাধানা-নন্তর মুকুন্দসঞ্জয়ের বাটীতে যাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিলেন। শিষ্যগণও যথাসময়ে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গুরু গঙ্গাদাসপণ্ডিতের অনু-

রোধে পাঠ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পড়ান হইল না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অপর কোন বিষয়ই স্ফুরিত হইল না, তদ্বিষয়িণী কথা ভিন্ন অপর কোন কথাই মুখে আসিল না, সুতরাং অধ্যাপনার ব্যাঘাত হইল। সূত্র বৃত্তি ও টীকার প্রত্যেক অক্ষরেই শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই বলিলেন, "ভাই সকল, আজ পুঁথি বন্ধ কর, কাল পাঠ পড়াইব।" শিষ্যগণ গুরুর আদেশমত পুস্তক বাঁধিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া গৃহে গমন করিলেন। গৃহে যাইয়া পত্নী ও জননীকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া সেদিনও অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন আবার যথাসময়ে টোল খোলা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ আবার শিষ্যগণকে পড়াইতে বসিলেন। কিন্তু পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও পড়ান হইল না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যানেই সময় কাটিয়া গেল। শিষ্যগণ গুরুর বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া বিষণ্ণমনে পুস্তক বাঁধিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ টোল ত্যাগ করিয়া এক নগরবাসীর দ্বারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানে রত্নগর্ভ আচার্য্য নামক এক অতি ভাগ্যবান্ বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীভাগবতপুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ উপবিষ্ট হইয়া আচার্য্যকে দশমস্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে শুনিলেন।

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥"

শ্লোকটি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত ও ভূমিতলে পতিত হইলেন। সঙ্গের শিষ্যগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণপরে চৈতন্যোদ্রেক হইলে, তিনি আচার্য্যকে পুনশ্চ শ্লোকটি পাঠ করিতে বলিলেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার শ্লোকটি পাঠ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্লোক শুনিয়া পুনশ্চ সংজ্ঞাহীন হইলেন। তদ্দর্শনে রত্নগর্ভ আচার্য্য আসন ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পুনঃ সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার আলিঙ্গনে আচার্য্য প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লোকসমাগম আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মসংবরণ পূর্ব্বক সঙ্গী শিষ্যদিগের সহিত গঙ্গাতীরে গমন

করিলেন। পরে গঙ্গার পবিত্রসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। শিষ্যগণও স্নানাদি সমাপনানন্তর নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন আবার নিয়মিত টোল খোলা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববৎ শিষ্যগণকে পড়াইতে যাইয়া পাঠ দিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকথাতেই সময় কাটিয়া গেল। ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ পাঠ ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত হইলেন। গুরুশিষ্য মিলিয়া "শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" বলিয়া করতালি সহকারে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপে টোল উঠিয়া গেল।

আত্মপ্রকাশ।

১৪৩০ শকের মাঘমাসে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপনার পরিবর্ত্তে প্রতিদিন শিষ্যগণকে লইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এখন আর মুকুন্দসঞ্জয়ের বাটীতে গমন করেন না। নিজের বাটীতেই শিষ্যগণকে লইয়া কীর্ত্তন করেন। নদীয়ায় ভক্তগণ লোকপরম্পরায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনারম্ভ শুনিয়া তাঁহার বাটীতে আগমন এবং অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও ভাবাবেশ দর্শন করিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে এই বৃত্তান্ত অদ্বৈতাচার্য্যের শ্রবণগোচর হইল। তিনি শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে তিনি অতিশয় আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"মোর আজুকার কথা শুন ভাই সব।
নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাও দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কথো রাত্রে আমারে বোলয়ে একজন।
উঠহ আচর্য্য ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইলে সকল।
যে লাগি সঙ্কল্প কৈলে সে হৈল সফল॥

যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলে কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন॥
যা আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিব অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়।
আর বার আসিবাঙ ভোজন বেলায়॥
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্ব বিশ্বরূপ নাম।
আমা সঙ্গে আসি গীতা করিতা ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম মধুর—রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥
চিত্তবৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করেঁা ভক্তি হউক বলিয়া॥
আভিজাত্যে আছে বড়মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্বগুণে উত্তম পণ্ডিত।
তাঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ করে সভে তথাস্তু বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে॥

যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বাসনার স্থানে॥"

এই কথা বলিতে বলিতে অদ্বৈতাচার্য্য হুঙ্কার দিলেন। বৈষ্ণব সকল 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়াই নমস্কার করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতও তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের আর সেই উদ্ধত ভাব নাই, সে বিদ্যামদ সে জিগীষা নাই, এখন ফলবান্ তরুর ন্যায় বিনয়াবনত। দেখিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন। অজ্ঞলোক সকল কিন্তু তাঁহার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া বায়ুরোগ মনে করিতে লাগিলেন। সরলমতি শচীদেবী পুত্রের সেই ভাবগতি বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও পতির ঈদৃশ ভাবান্তর অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন। নানালোকে নানাকথা বলিতে আরম্ভ করিল। শচীদেবী কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত আসিয়া শচীদেবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের বায়ুরোগ হয় নাই, ইহা কৃষ্ণপ্রেমের বিকার। তুমি পুত্রের রোগাশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইও না। কৃষ্ণ আমাদিগের দুঃখের অবসান করিবেন। তুমি কিন্তু এই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। অচিরেই কৃষ্ণের রহস্য বুঝিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত চলিয়া গেলেন। শচীদেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের কথায় আপাততঃ কিছু আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু পাছে এই পুত্রও সন্ন্যাসী হয় এই ভাবিয়া ভীত হইলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনরসে উন্মত্ত হইয়া একদিন গদাধরের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্য্যকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মূর্চ্ছাপগমে গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়া তদীয় চরণতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে গদাধর প্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গের অকল্যাণ ভাবিয়া ক্ষুব্ধ ও আচার্য্যের তাদৃশ অযোগ্য আচরণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আচার্য্য তাহা বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে শ্রীগৌরাঙ্গের মহত্ত্ব খ্যাপন পূর্ব্বক গদাধরের বিস্ময় অপনোদন করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আত্মগোপনের নিমিত্ত ছল প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে আচার্য্যের চরণবন্দনা করিলেন। তাহাতে আচার্য্যের তদীয়

ভগবত্তার সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয় জন্মিল। তিনি ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার ভগবত্তার সম্বন্ধে মনে মনে অনেক বিতর্ক উঠাইলেন। পরিশেষে ইহাই অবধারণ করিলেন যে, ইনি যদি সত্য সত্যই শ্রীভগবান্ হয়েন, তবে আমাকে খুঁজিয়া লইবেন। অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন। আচার্য্যও শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য নদীয়া ছাড়িয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরের ভবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্ববৎ নিজভবনে ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। পাষণ্ড সকল এই কীর্ত্তনের কথা লইয়া নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে শ্রীবাসপণ্ডিতের উপরই সকল দোষ আরোপিত হইতে লাগিল। পাষণ্ডেরা শেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগকে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহাদিগের এই চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইল না। রাজদণ্ডের ভয় অনেক ভক্তের এবং শ্রীবাসপণ্ডিতেরও হৃদয়কে আক্রমণ করিল। অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ সকলই বিদিত হইলেন। বিদিত হইয়া তিনি একদিন হঠাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজেষ্ট নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যাইয়া গৃহের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত বিরক্তিসহকারে উঠিয়া রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিলেন। দ্বার মোচন করিয়াই দেখিলেন, বিশ্বম্ভর শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ ধারণ পূর্ব্বক বীরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখিয়াই স্তব্ধ হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কোনরূপ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,—"অরে শ্রীবাস, তুই এতদিন আমার প্রকাশ জানিতে পারিস্ নাই। তোর উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে ও নাড়ার হুঙ্কারেই আমি গোলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুই আমাকে আনিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছিস্। নাড়াও আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল। যাহা হউক, এখন তুই সকল দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর। আমি দুষ্টগণের দমন পূর্ব্বক শিষ্টগণের উদ্ধার সাধন করিব।" প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন সদয় হইয়া বলিলেন, "তোর স্ত্রীপুত্রাদি সকলকে আনিয়া আমাকে দর্শন করা এবং সস্ত্রীক হইয়া আমার পূজা কর।" শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞানুসারে বাটীর সকলকে ডাকিয়া প্রভুকে দর্শন করাইলেন। পরক্ষণেই সস্ত্রীক ভক্তিভরে প্রভুর

পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা সমাধা হইলে, সপরিবারে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভুও সকলকেই "আমাতে চিত্ত হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর প্রভু সম্মুখে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীকে দেখিয়া বলিলেন, "নারায়ণি, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ।" বালিকা নারায়ণী প্রভুর আদেশমাত্র "হা কৃষ্ণ" বলিয়া অচেতন অবস্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন। নারায়ণীর নেত্রনীরে পৃথিবী পঙ্কিলা হইতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন; "দেখ শ্রীবাস, এই সকল বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই কথা বলিয়াই প্রভু গৃহে গমন করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত সপরিবারে প্রভুর অলৌকিক প্রকাশ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজদণ্ডের ভয়ও কিয়ৎপরিমাণে অপগত হইল।

অনন্তর একদা শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিগুপ্তের ভবনে যাইয়া 'বরাহ বরাহ' বলিতে বলিতে অকস্মাৎ নিজের বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিলেন। সেই অপূর্ব্ব বরাহমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মুরারিগুপ্ত ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। পরে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই অদ্ভুত যজ্ঞবরাহের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মুরারির স্তব শেষ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকেও শ্রীবাসপণ্ডিতের ন্যায় আশ্বাসপ্রদানসহকারে তাঁহার সেই অদ্ভুত প্রকাশবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নিজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ আরও কোন কোন ভক্তের গৃহে যাইয়া আরও কোন কোন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই সকল আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দর্শনে সমাশ্বস্ত হইয়া ভক্তগণ পুনর্ব্বার নির্ভয়ে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন। আর কেহই পাষণ্ডীর বা রাজশাসনের ভয়কে অন্তরেও স্থান দিলেন না। ক্রমে পথে ঘাটে সকল স্থানেই উচ্চসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নদীয়ায় যখন এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন শ্রীনিত্যানন্দ নিজ প্রভুর প্রকাশপ্রতীক্ষায় শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়াই প্রভুর প্রকাশ বিদিত হইলেন। বিদিত হইয়াই শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন। পথে কোন স্থানেই বিলম্ব করিলেন না। অবিশ্রান্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি নদীয়ায় উপস্থিত হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গের চরণদর্শন করিলেন না, গোপনে নন্দন আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ।

রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বীরভূম জেলায় মল্লারপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) প্রাচীন একচক্রা গ্রাম। মহাভারতে ঐ একচক্রার উল্লেখ দেখা যায়। পাণ্ডবগণ বনবাসকালে উক্ত একচক্রা গ্রামে কিছুদিন বাস ও দুষ্ট রাক্ষসগণের সংহার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ঐ একচক্রা গ্রামে চক্রেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও অপরাপর দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একচক্রার পাদপ্রবাহিতা মৌড়েশ্বরী নদীর প্রবাহে কালে ঐ সকল দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীনতম সময়ের কথার প্রয়োজন নাই। পঞ্চশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বেও ঐ একচক্রা একটি সমৃদ্ধিশালিনী পুরী ছিল। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে জানা যায়, তৎকালে ঐ পুরী উদ্যানোপবনে সুসজ্জিত বিভিন্নবর্ণের বহুলোকের বাসস্থান ছিল। ঐ পুরীতে অনেক ধনী, মানী ও জ্ঞানী লোক বাস করিতেন। পুরবাসী সকল ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ছিলেন। পুণ্যকর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ ছিল। পুরমধ্যে অনেক স্থানেই দিবানিশি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন হইত।

ঐ সমৃদ্ধিশালী একচক্রাগ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত বটব্যালগ্রামীয় ওঝা-উপাধিধারী এক অতি ধর্ম্মশীল বিপ্র বাস করিতেন। উক্ত ওঝার পত্নীও তাঁহার অনুরূপা ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মের সংসার সর্ব্বপ্রকারে সুখময় ছিল। দুঃখের মধ্যে সন্তানগণ অল্পবয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শেষে হরপার্ব্বতীর প্রসাদে একটি পুত্র রক্ষা পান। মহাত্মা ওঝা ঐ মৃতাবশিষ্ট পুত্রের 'হাড়ো' নাম রাখেন। হাড়োর রাশিগত নাম মুকুন্দ।

মুকুন্দ জনকজননীর স্নেহে বয়োবৃদ্ধির সহিত বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিতপদবাচ্য হয়েন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে পদ্মাবতী নাম্নী সর্ব্বসুলক্ষণা সাক্ষাৎ বাৎসল্যলক্ষ্মীর সদৃশী সৎকুলজাতা কোন এক কন্যার সহিত মুকুন্দপণ্ডিতের পরিণয়কার্য্য সমাহিত হয়। মুকুন্দপণ্ডিত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতী শুদ্ধভক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের আচারব্যবহারও পরমপবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের চরিত্র গ্রামের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহারা স্বাভাবিক ঔদার্য্য বিনয় ও লজ্জাদি সদ্‌গুণে প্রতিবাসিগণের পরম প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কয়েকটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে বয়সে ও গুণে জ্যেষ্ঠ তনয়ের নামই শ্রীনিত্যানন্দ। অপরাপর পুত্রদিগের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

এইমাত্র জানা যায় যে, তাঁহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরুদ্দেশ ও জনকজননীর লোকান্তরগমনের পর একচক্রার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁড়র নামক গ্রামে যাইয়া বাস করেন ও তদনুসারে বাঁড়ুরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।

১৩৯৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাবসময়ে দিক্ সকল প্রসন্ন, বায়ু সুখকর, জলাশয় সকল নির্ম্মল, ভক্তগণের মন উল্লাসিত, স্বর্গে দুন্দুভি প্রভৃতির ধ্বনি হইয়াছিল; অন্তরীক্ষ হইতে 'জয় জয়' ধ্বনির সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও মনে ঐ ভবিষ্যদ্‌ঘটনার আভাস দেখা দেয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব না হইতেই বৈষ্ণবগণের মন অকস্মাৎ প্রসন্ন হইল। মনুষ্যলীলাকারী মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের চিত্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দের জন্মের প্রাক্‌কালেই তদ্বিষয় অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তর হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার অমল অন্তঃকরণে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব স্ফুরিত হইতে লাগিল।

"রাঢ়দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুরনাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দসাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥"

পুত্রের উৎপত্তিতে আনন্দিত হইয়া মুকুন্দপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ

দান করিলেন। পরে যথাবিধি বালকের জাতকর্ম্মাদি করাইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। পুত্রের রূপ দেখিয়া জনকজননী আনন্দে বিহ্বল হইলেন। মুকুন্দ পণ্ডিতের একটি পরমসুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে এই সংবাদ ক্রমে গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচার হইল। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই আসিয়া পণ্ডিতের পুত্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যিনি দেখেন, তিনি আর ফিরিয়া যাইতে চান না, সদাই দেখিতে ইচ্ছা করেন। নিত্যানন্দের রূপলাবণ্য দেখিয়া, তিনি যে সামান্য বালক নহেন, কোন মহাপুরুষ আসিয়া পণ্ডিতের গৃহে জন্ম লইয়াছেন, সকলেরই মনে এইরূপ একটি ধারণা হইল। সকলেই জনকজননীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসী লইয়া মহাসমারোহে শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন করা হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ জনকজননীর বাৎসল্যের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অঙ্গলাবণ্যও বাড়িতে লাগিল। বর্ণ কনক-চম্পকের সদৃশ; মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল হইতেও সুন্দর; হস্তপদের নখ সকল চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী; ভুজযুগল আজানুলম্বিত; কটিদেশ ক্ষীণ; পদতলের নিকট রক্তোৎপলও পরাজিত হয়; শরীর স্থলকমলের ন্যায় কোমল।

"ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হইলা কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম॥
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ন ভাঙুধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ, তনু থলপঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু॥
চরণ কমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে,
আধবাণী অমিয়া প্রকাশ।
দুহু কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইল সবে,
কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস॥"

বালকের অঙ্গপরিবর্ত্তন উপলক্ষে একটি উৎসব হইল। ষষ্ঠমাসে নাম-করণ করা হইল। নাম হইল নিত্যানন্দ। বালক নিত্যানন্দ ক্রমে জানুর উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিলেন। চাঞ্চল্যমাত্র নাই। যে কোলে করিতে চায়, বালক তাহারই কোলে যান। রোদন কাহাকে বলে, জানেন না। সদাই হাস্যমুখ। যে একবার তাঁহার সেই সহাস্য বদন দেখে, সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারে না। দাঁত দেখিতে ইচ্ছা করিলে, দাঁত দেখান। কে তোমার পিতা, কে তোমার মাতা, জিজ্ঞাসা করিলে, পিতাকে ও মাতাকে দেখাইয়া দেন। ক্রমে পাদচারণ করিতে শিখিলেন। পিতামাতার ও প্রতি-বেশী নরনারীর অঙ্গুলি ধরিয়া চলিয়া বেড়ান। নিজের ছায়া দেখিলে ধরিতে যান, নিজের প্রতিবিম্ব দেখিলে আলিঙ্গন করিতে চান। বালক নিত্যানন্দের সকলই অদ্ভুত। কথা কন, তাহাও অদ্ভুত। খেলা করেন, তাহাও অদ্ভুত। তাঁহার কোন কার্য্যই সাধারণ বালকের ন্যায় নহে। সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত যে কিছু ক্রীড়া করেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সকল খেলাই অপরাপর যুগের লীলার অনুকরণ। তিনি কখন ভূভারহরণ, কখন দৈত্যদমন, কখন রাক্ষসসংহার প্রভৃতি বিবিধ লীলারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। যে দেখে, সেই অদ্ভুত মানিয়া থাকে।

এইরূপে নিত্যানন্দের বাল্যের পর পৌগণ্ড উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। এই সময়ে মুকুন্দপণ্ডিত আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের উপনয়নসংস্কার সমাধা করিলেন। উপ-নয়নের পর শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কালে ঐ শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ বিদ্যারস আস্বাদন করিতে করিতে একাদশ বৎসর অতিবাহন করিলেন। এই সময়ে মুকুন্দপণ্ডিত পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ সুসিদ্ধ হইল না। একদিন এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া মুকুন্দপণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। পণ্ডিত বিশেষ ভক্তি সহকারে তাঁহার সৎকার করিলেন। অতিথি সে রাত্রি সেই স্থানেই রহিলেন। উভয়ের কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে গমনোদ্যত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" পণ্ডিত বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা, অস-

ক্ষোচে বলিতে পারেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিতেছি, একটি ব্রাহ্মণবালকের প্রয়োজন, তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কিছুদিনের মত আমাকে দাও, আমি উহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিব এবং নানাতীর্থ দর্শন করাইব।" সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মুকুন্দপণ্ডিতের মস্তকে বজ্রাঘাত বোধ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী আমার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। আমি প্রাণকে বিদায় দিয়া কিরূপে দেহধারণ করিব? সন্ন্যাসীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। বিষম ধর্ম্মসঙ্কটে পতন হইল। ভাবিতে ভাবিতে পুত্রকে প্রদান করাই স্থির করিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে পত্নীর কি মত, জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়া পত্নীর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহাকে সকল কথাই বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া বলিলেন, "আপনার মতেই আমার মত। আপনি যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, আমার তাহাতে বাধা দিবার অধিকার নাই।" তখন মুকুন্দপণ্ডিত সন্ন্যাসীর সমীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্র নিত্যানন্দকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসীও পণ্ডিতের তাদৃশ আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী গমন করিলে, মুকুন্দপণ্ডিত পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী নানাপ্রকারে পতিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের শোক আচ্ছাদন করিয়া পতিকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। পণ্ডিত পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিলেন। পদ্মাবতীরও সেই দশাই হইল। অত্যল্পকালের মধ্যে উভয়েই লোকান্তরে গমন করিলেন। পিতামাতার লোকান্তর গমনের পর অবশিষ্ট পুত্রগুলি একচক্রার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঁড়র গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসীর সহিত প্রথমেই বক্রেশ্বর তীর্থে গমন করিলেন। বক্রেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। তিনি ঐ স্থানে বক্রেশ্বরভৈরব ও মহিষমর্দ্দিনী দেবীকে দর্শন করিয়া গয়াধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তিনি গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপাদ ও অপরাপর দর্শনীয় ক্ষেত্র সকল দর্শন করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শনাদি করিয়া প্রয়াগে যাইয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান ও বেণীমাধব দর্শন করিলেন। পরে মথুরামণ্ডলে যাইয়া শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি বন সকল দর্শন

করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্র হইয়া হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। তিনি হরিদ্বারে যাইয়া মায়াপুরী ও কনখল তীর্থাদি দর্শন পূর্ব্বক হিমাচলে আরোহণ করিলেন। তিনি হিমাচলে আরোহণ পূর্ব্বক দেরাদূন ও মুসৌরি হইয়া সুমেরু-শিখরে গমন করিলেন। সুমেরু-শিখর গড়োয়াল প্রদেশে অবস্থিত ও হিমালয়ের অংশবিশেষ। হিমালয়ের ঐ অংশে পাঁচটি শৃঙ্গ আছে। উক্ত শৃঙ্গ পাঁচটির নাম ব্রহ্মপুরী, বিষ্ণুপুরী, রুদ্রহিমালয়, উদ্‌গারিকণ্ঠ ও স্বর্গরোহিণী। তন্মধ্যে রুদ্রহিমালয়ই গঙ্গার উৎপত্তিস্থান। ঐ স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী। শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গোত্তরীতে যাইয়া স্নান করিলেন। পরে ঐ স্থান হইতে যমুনোত্তরীতে গমন করিলেন। কলিন্দদেশে বানরপুচ্ছ নামে হিমালয়ের একটি স্থান আছে। ঐ স্থান হইতে যমুনার উৎপত্তি হওয়ায় উহার যমুনোত্তরী নাম হইয়াছে। তিনি যমুনোত্তরীতে কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিয়া পঞ্চকেদারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে পঞ্চকেদারে কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেশ্বর দর্শন করিয়া মন্দাকিনীর ধার দিয়া পশ্চিমাভিমুখে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি বদরিকাশ্রম ও বদরীনারায়ণ দর্শন পূর্ব্বক অলকনন্দার ধার দিয়া উত্তরকাশী বা গুপ্তকাশীতে আগমন করিলেন। পরে তিনি গুপ্তকাশী হইতে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম রুদ্রপ্রয়াগে আগমন করিলেন। পরে অলকনন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম দেবপ্রয়াগে আগমন করিলেন। দেবপ্রয়াগ হইতে সপ্তস্রোতা হইয়া পুনর্ব্বার হরিদ্বারে আগমন করিলেন। হরিদ্বার হইতে নৈমিষারণ্য ও অযোধ্যাপুরী হইয়া গণ্ডকীতীরে গমন করিলেন। গণ্ডকীতীরে সিদ্ধাশ্রম দর্শন করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নানের পর পূর্ব্বদক্ষিণে যাত্রা করিয়া চন্দ্রনাথশিখরে গমন করিলেন। চন্দ্রনাথ হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণদেশে গমন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণে হরক্ষেত্র হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমন্‌মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সাক্ষাৎ ও কিছুদিন একত্র অবস্থান হয়। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া দক্ষিণে সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ হইতে হরিহরতীর্থ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে উত্তরমুখে সোলাপুর প্রদেশের অন্তর্গত পাণ্ডুপুরে গমন করিলেন। এই পাণ্ডুপুরেই তাঁহার পথদর্শক সন্ন্যাসী সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির পর প্রভু নিত্যানন্দ একাকী পুনর্ব্বার উত্তরমুখে যাত্রা করিয়া পঞ্চবটীতে গমন করিলেন।

পঞ্চবটী হইতে অবন্তী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিলেন। দ্বারাবতী হইয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। পরে পুষ্কর হইতে মৎস্যদেশের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণাবেশে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে যখন বিদিত হইলেন, নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র প্রকট হইয়াছেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দসম্মিলন।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিতেছেন জানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন নিজ ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই সকল, দুই এক দিনের মধ্যে কোন এক মহা-পুরুষ নদীয়ায় আগমন করিবেন।" পরদিন তিনি ভক্তগণের সহিত মিলনের পর অকস্মাৎ হলধরভাবে আবিষ্ট হইয়া 'মদ আন মদ আন' বলিতে লাগি-লেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রভুর তাদৃশ ভাবাবেশ দর্শন করিয়া, ইহার অবশ্য কোন গূঢ় কারণ থাকিবে, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বলিলেন, "অহে হরিদাস, অহে শ্রীবাস পণ্ডিত, যাও, কে কোথায় আসিয়াছে, দেখ।" প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া হরিদাস-ঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত সমস্ত নদীয়ায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন কাহাকেও পাইলেন না, তখন প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা সমস্ত নদীয়ায় অনুসন্ধান করিয়াও কোন লোকই পাইলাম না।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "চল, আমিও তোমাদিগের সহিত তাঁহার অন্বেষণে যাইব।" তিনি এই কথা বলিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে 'জয় কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব পুরুষরত্ন উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যসদৃশ; তিনি সদাই ধ্যানসুখে মগ্ন; সদাই হাস্য করিতেছেন।

নিত্যানন্দকে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মদনমনোহরমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। নিত্যানন্দও শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই আপনার ঈশ্বর বলিয়া চিনিলেন। চিনিয়াও কোন কথাই বলিলেন না, স্তিমিত নয়নে প্রাণসখাকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ উভয়ের ভাবগতি

প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার সঙ্গিগণকে নিত্যানন্দের পরিচয় প্রদান করিবেন মনে করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিতকে একটি শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত নিম্নলিখিত দশমস্কন্ধের শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥"

শ্লোক শ্রবণমাত্র নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসপণ্ডিতকে পুনর্ব্বার শ্লোকটি পাঠ করিতে বলিলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে নিত্যানন্দের চৈতন্য হইল; তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া আনন্দে হুঙ্কার করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন নাচেন, কখন কাঁদেন, কখন হাঁসেন, কখন লাফান, কখন ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যান। তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব উন্মাদভাব অবলোকন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাকে ধরিয়া স্থির করিতে কাহারও সাহস হইল না। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিলেন। তিনি যাইয়া ধরিবামাত্র শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মস্তক রাখিয়া নিস্পন্দ হইলেন। উভয়ের নয়নের ধারায় উভয়ের অঙ্গ প্লাবিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ যখন নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আজ আমার শুভদিন, আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনার অদ্ভুত ভক্তিযোগ দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। আপনার কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন হইল, আমরা শুনিতে পারি কি?" নিত্যানন্দ বলিলেন,—"আমি তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলাম। কৃষ্ণের অনেক স্থানই দর্শন করিলাম, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণকে দেখিলাম না। যেখানে যাই, দেখি, কৃষ্ণের সিংহাসন শূন্য, কৃষ্ণ নাই। শেষে বিজ্ঞলোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কৃষ্ণ গৌড়-দেশে, অল্পদিন হইল, তিনি গয়া করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আরও শুনিলাম, নদীয়ায় বড় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও পতিতের পরিত্রাণ হইতেছে। আমি অতিশয় পাতকী, নদীয়ায় পতিতের ত্রাণ শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ নীরব হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আপনার ন্যায় ভক্ত-জনের সমাগমে আজ আমরা কৃতকৃত্য হইলাম। আপনার অদ্ভুত ভাববিকার

সকল সন্দর্শন করিয়া আজ আমরা আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিলাম।" উভয়ের এইপ্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ ভাবিলেন, ইহাঁরা কি কৃষ্ণবলরাম না শ্রীরামলক্ষ্মণ? তাঁহারা মনে মনে বিবিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, কল্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আপনার ব্যাস-পূজা কোন্ স্থানে হইবে?" নিত্যানন্দ শ্রীবাসপণ্ডিতের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহাঁর আলয়ে।" শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসপণ্ডিতের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতের উপর ভার পড়িল।" শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো, এ বড় বিশেষ ভার নয়। আমার গৃহে সকলই আছে, কেবল ব্যাসপূজার পদ্ধতি নাই, তাহাও কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া আনিব। আমার মহা-ভাগ্য, কাল শ্রীপাদের ব্যাসপূজা দর্শন করিব।" শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শেষ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আসুন, তবে পণ্ডিতের ভবনেই গমন করা যাউক।" শ্রীনিত্যানন্দ তখনই আনন্দসহকারে নন্দন আচার্য্যের অনুমতি লইয়া গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন।

ব্যাসপূজার অধিবাস।

শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে যাইয়াই ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ করা হইল। ব্যাসপূজার অধিবাস-ব্যাজে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হুঙ্কার, গর্জ্জন, লম্ফ, কম্প, স্বেদ, অশ্রু ও পুলক প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভক্তগণ অদ্ভুত মানিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভরের পদভরে ধরণী টলমল করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ নৃত্যগীতাদির পর শ্রীগৌরাঙ্গ বলরামভাবে আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের নিকট হল ও মুষল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে হল ও মুষল দিলেন এবং প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন। প্রভু হল ও মুষল লইয়া 'মদ আন মদ আন' বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পরস্পর যুক্তি করিয়া এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন। প্রভু তাহা লইয়া পান করিলেন। তখন ভক্তগণ

দেখিলেন, প্রভু হল-মুষল-ধর-বলরাম-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। নিত্যানন্দ স্তুতিপাঠ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহ যার।
সেই নাঢ়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহরে আনিলা নাঢ়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাসে লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সভারে দিমু প্রেমযোগ।
নাগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভু সুস্থির হইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "আমি, বোধ হয়, অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম; তোমরা কিন্তু আমার অপরাধ লইবে না।" পরে দেখিলেন, নিত্যানন্দ তখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। কোথায় দণ্ড, কোথায় কমণ্ডলু, কোথায় বসন, কিছুরই ঠিক নাই। তিনি বালভাবে দিগম্বর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া স্থির করিয়া বসন পরিধান করাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ স্থির হইলে, প্রভু গৃহে গমন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণও নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবনেই থাকিলেন। কিছুরাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া হুঙ্কার দিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ব্যাসপূজা।

প্রভাতে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিত দেখিলেন, দণ্ড ও কমণ্ডলু ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। নিত্যানন্দের বাহ্য নাই, আপনার মনে হাসিতেছেন। রামাই পণ্ডিত এই বৃত্তান্ত শ্রীবাসপণ্ডিতকে বিদিত করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে এই সংবাদ জানাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া ঐ ভাঙ্গা দণ্ড ও কমণ্ডলু স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে

গেলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণও তাঁহাদের সহিত স্নান করিতে গেলেন। প্রভু যাইয়া গঙ্গাজলে ঐ ভাঙ্গা দণ্ড ও কমণ্ডলু ভাসাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে নামিয়া অতিশয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কখন সাঁতার দেন, কখন কুম্ভীরাদি জলজন্তু দেখিলে ধরিতে যান, কখন হুঙ্কার করেন, কেহ নিবারণ করিলে শুনেন না, কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় কিছু স্থির হন। নিত্যানন্দের চাঞ্চল্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ, উঠ, ব্যাসপূজা করিতে হইবে, সত্বর আইস।" প্রভুর কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ জল হইতে উঠিলেন। সকলে মিলিয়া গৃহে আগমন করিলেন।

এই সময়ে অপরাপর ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইলেন। ভক্তগণ মধুর মধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ নিজের ভাবেই বিভোর। শ্রীবাসপণ্ডিত মন্ত্র বলিতে বলেন, কে শুনে, কে বা মন্ত্র পাঠ করে! নিত্যানন্দ অনন্যমনে হাসিতেছেন, ধীরে ধীরে কি বলিতেছেন, শুনাও যায় না। শ্রীবাসপণ্ডিত নিজেই কোন মতে প্রারব্ধ ব্যাসপূজন সমাধা করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে মালা লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, মন্ত্র পাঠ করিয়া এই মালা ব্যাসদেবকে অর্পণ করুন।" কে কাহার কথা শুনে, নিত্যানন্দ মালা হাতে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। উদারমতি শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন, "তোমার শ্রীপাদ ত কোন কথাই শুনেন না।" শ্রীবাসপণ্ডিতের কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, "নিত্যানন্দ, কথা শুন, সত্বর মালা দিয়া ব্যাসপূজা সমাপন কর।" নিত্যানন্দ করস্থিত মাল্য সম্মুখস্থ শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা অর্পণ করিয়াই দেখিলেন, বিশ্বম্ভর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মুষল ধারণ পূর্ব্বক ষড়্‌ভুজমূর্ত্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। পতিত নিত্যানন্দকে নিস্পন্দ ও ধাতুরহিত দেখিয়া ভক্তগণ ভীত হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গ হুঙ্কার দিয়া নিত্যানন্দকে উঠাইলেন। পরে বলিলেন, "নিত্যানন্দ, স্থির হও, অভিলষিত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর।" তিনি এই কথা বলিয়া ভক্তগণকে কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে বেড়িয়া পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্যগীতের পর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসপণ্ডিতকে ব্যাসপূজার নৈবেদ্য সকল আনয়ন করিতে বলিলেন। নৈবেদ্য আনীত হইলে, প্রভু উহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং

লইয়া অবশিষ্ট ভক্তগণকে ভাগ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাস-পূজামহোৎসব সম্পন্ন হইল।

অদ্বৈতমিলন।

একদা ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি সত্বর অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আমার প্রকাশবৃত্তান্ত জানাও।" প্রভুর আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রামাই পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আচার্য্যের আবাসে উপনীত হইয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য ভক্তিযোগপ্রভাবে সমস্তই বিদিত হইয়াছিলেন। তথাপি রামাইপণ্ডিতকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পণ্ডিত, হঠাৎ শান্তিপুরে আসিবার কারণ কি বল।" রামাইপণ্ডিত বলিলেন, "প্রভুর আদেশ লইয়া আসিয়াছি, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।" পরে তিনি বলিলেন,—

"যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিতে বিবর্ত্তন॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লৈয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈলা আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন॥
তুমি সে জানহ তাঁরে মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু॥"

রামাই পণ্ডিতের মুখে প্রভুর আদেশ শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সীতাদেবীকে প্রভুর আদেশ শুনাইয়া সত্বর গমনের আয়োজন করিতে বলিলেন। সীতাদেবী প্রভুর প্রকাশ শ্রবণ করিয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র, ক্ষীর, দধি, নবনীত, কর্পূর

ও তাম্বূল প্রভৃতি পূজোপহার সকল সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যকে উহা নিবেদন করিলেন। আচার্য্য সস্ত্রীক রামাইপণ্ডিতের সহিত নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি নবদ্বীপে উপনীত হইয়া রামাইপণ্ডিতকে বলিলেন,—"পণ্ডিত, আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে থাকিব। তুমি আমার আগমনের কথা কাহাকেও বলিবে না। পরন্তু বলিবে, আচার্য্য এখানে আসিলেন না।" এই কথা বলিয়া আচার্য্য রামাইপণ্ডিতকে বিদায় দিয়া সস্ত্রীক নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামাইপণ্ডিত না আসিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার সহকারে ভক্তগণকে বলিলেন, "আচার্য্য আমার ঐশ্বর্য্য দেখিতে চান।" এমন সময়ে রামাইপণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু রামাইপণ্ডিতকে দেখিয়া বলিলেন, "আচার্য্য আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নদীয়ায় আসিয়াও এখানে আগমন করিলেন না, তোমাকে পাঠাইয়া দিলেন; যাও, আচার্য্যকে লইয়া আইস।" রামাইপণ্ডিত প্রভুর আদেশ পাইয়া পুনশ্চ আচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রভুর শেষ আদেশ শুনাইলেন। আচার্য্য শুনিয়া তখনই সস্ত্রীক শ্রীবাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতেই প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরে উত্থিত হইয়া প্রভুকে কোটিকন্দর্পসুন্দর দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সকল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদ যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা॥"

বলিতে বলিতে আচার্য্য প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে পূজা করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া আচার্য্য পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনপদ্ধতি অনুসারে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়

গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" এই শ্লোক পাঠ সহকারে প্রণাম করিলেন। পরে স্তবপাঠানন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতলে পতিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যের মস্তকে চরণ প্রদান করিলেন। আচার্য্য তাঁহার চরণরেণু পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ 'জয় জয়' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার গলদেশ হইতে মালা লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং কোন বর প্রার্থনা না করিয়া তাঁহার উপরই বরদানের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥
ব্রহ্ম-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে ॥"

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

একদা শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ 'পুণ্ডরীক' নাম করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে পুণ্ডরীকের নাম করিয়া রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, পুণ্ডরীক কে?" প্রভু বলিলেন,—"তোমরা ভাগ্যবন্ত, যেহেতু তোমাদিগের পুণ্ডরীককে জানিবার অভিলাষ হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র অতীব অদ্ভুত। উহা শ্রবণ করিলেও লোক পবিত্র হয়। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। এখানেও তাঁহার বাড়ী আছে, এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়াও থাকেন। তাঁহার আচারব্যবহার বিষয়ীর মত, কিন্তু তিনি পরম ভক্ত ও বিরক্ত বৈষ্ণব। ধনশালী বিপ্রের কুলে তাঁহার জন্ম, উপাধি বিদ্যানিধি। গঙ্গার প্রতি তাঁহার ঈদৃশী ভক্তি, যে, তিনি পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গায় স্নান করেন না। তিনি সত্বর এই স্থানে আগমন করিবেন। তোমরা অচিরেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সুখী হইবে।" ভক্তগণ সকলেই এই কথা শুনিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল মুকুন্দ ও বাসুদেবদত্ত তাঁহাকে জানিতেন, অপর কেহই জানিতেন না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিলেন। মুকুন্দ তাহা জানিতে পারিয়া গদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন, "পণ্ডিত,

তোমার বৈষ্ণব দর্শনের বিশেষ অভিলাষ, আজ এখানে একজন পরম বৈষ্ণব আসিয়াছেন, ইচ্ছা হইলে, আমার সহিত আগমন কর।" মুকুন্দের কথা শুনিয়া গদাধর তখনই তাঁহার সহিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখিতে গেলেন। তাঁহারা যাইয়াই সম্মুখে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখিলেন। গদাধর মুকুন্দের মুখে পরিচয় পাইয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে নমস্কার করিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহাদিগকে সাদরসম্ভাষণসহকারে আসন প্রদান করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের সহিত আসন গ্রহণ করিলে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মুকুন্দকে তৎসমভিব্যাহারী গদাধর পণ্ডিতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, "ইহাঁর নাম গদাধর, ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, বাল্যাবধি বিরক্ত ও ভক্ত, আমার মুখে আপনার নাম শুনিয়া আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" মুকুন্দের কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গদাধর দেখিলেন, বিদ্যানিধি পরমসুন্দর পুরুষ, বেশভূষা রাজপুত্রের ন্যায়, সুসজ্জিত গৃহে সুসজ্জিত শয্যায় উপবিষ্ট, ওষ্ঠাধর তাম্বূলরাগে সুরঞ্জিত, দুইজন ভৃত্য দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছে। গদাধর আজন্ম সংসারবিরক্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বেশভূষা দেখিয়া তাঁহার মনে কিছু সংশয় জন্মিল। তিনি তাঁহার দিব্য ভোগ, দিব্য বেশ, দিব্য কেশ ও দিব্য গৃহোপকরণ সকল দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। দর্শনের পূর্ব্বে শুনিয়া যে ভক্তিলেশ জন্মিয়াছিল, দেখিয়া তাহা দূরে গেল। মুকুন্দ গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতীব সুস্বরসম্পন্ন গায়ক ছিলেন, গদাধরকে বিদ্যানিধির পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বাভাবিক সুস্বরে ভক্তিযোগের মহিমাসূচক একটি গান করিলেন। গান শুনিয়াই বিদ্যানিধি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কম্প, পুলক, স্বেদ ও মূর্চ্ছাদি সাত্ত্বিক বিকার সকলের যুগপৎ উদয় হইল। তাঁহার হস্তপদাদির আঘাতে শয্যা ও গৃহোপকরণ সকল লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বেশভূষা সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। শেষে তিনি নিশ্চলভাবে সংজ্ঞাহীন ও ধাতুহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া গদাধর অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে অবজ্ঞাকরণ নিমিত্ত আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া উক্ত অপরাধের ক্ষমাপণার্থ তাঁহাকেই দীক্ষাগুরু করিবার মনস্থ করিলেন এবং মুকুন্দের নিকট নিজের

মনের কথা জানাইলেন। মুকুন্দ শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং বিদ্যানিধির চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহাকে গদাধরের অভিপ্রায় জানাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মুকুন্দের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বিধাতা আমাকে মহা-রত্ন মিলাইয়া দিলেন, বহুভাগ্যে গদাধরের তুল্য শিষ্য পাওয়া যায়, আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে মন্ত্রদান করিব।" গদাধর বিদ্যানিধির কথা শুনিয়া আনন্দে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মুকুন্দের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর একদিন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গোপনে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শন করিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়াই আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যানিধিকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ আগন্তক বিদ্যানিধিকে প্রভুর কোন প্রিয়তম ভক্ত বুঝিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগকে বিদ্যানিধির পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনা-নন্দের পর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্বৈতাচার্য্যাদি প্রভুর ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। গদাধর প্রভুকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত দিবসে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হইলেন।

শচীদেবীর গৃহে নিত্যানন্দের ভিক্ষা।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিতে হাসিতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি নিত্যানন্দ অবধূতকে গৃহে রাখিয়া ভাল কর নাই; ইহাঁর জাতি বা কুল জানা নাই; বিশেষতঃ ইহাঁর আচার ব্যবহারও ভাল দেখা যায় না।" প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো, আমার এরূপ পরীক্ষা উচিত হয় না। যে তোমাকে একদিনও ভজে, সেই আমার প্রাণ। নিত্যা-নন্দ ত তোমার দেহ, তাঁহার কথাই নাই। নিত্যানন্দ যদি মদ্যপান বা যবনীগমনও করেন, তিনি যদি আমার জাতি ধন বা প্রাণও নষ্ট করেন; তথাপি তাঁহার প্রতি আমার চিত্তের ভাবান্তর হইবে না, এই সত্য কথা বলিলাম।" শ্রীবাসের কথা শুনিয়া প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি নিত্যানন্দের প্রতি তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমার গৃহে কখনই দারিদ্র্য প্রবেশ করিবে না।

তোমার বাড়ীর বিড়ালকুকুরও আমাতে ভক্তিলাভ করিবে। আমি নিত্যানন্দকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাঁকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।” এই কথা বলিয়া প্রভু নিজগৃহে গমন করিলেন।

এইরূপে নিত্যানন্দ পরমানন্দে শ্রীবাসভবনে বাস করেন। তাঁহার প্রকৃতি বালকের ন্যায় সদাই চঞ্চল। তিনি কখন নদীয়ার পথে পথে ভ্রমণ করেন, কখন গঙ্গাদাসের বা মুরারির ভবনে গমন করেন, কখন গঙ্গাপ্রবাহে পতিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিয়া যান। শচীদেবী তাঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসীবোধে নিজচরণ স্পর্শ করিতে দেন না, পলাইয়া যান। একদিন শচীদেবী রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, কৃষ্ণ ও বলরাম শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এবং ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় তাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। শচীদেবী নিদ্রাভঙ্গের পর উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শুনিয়া বলিলেন,—“মাতঃ, তুমি অতি সুস্বপ্ন দর্শন করিয়াছ। তোমার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না। তোমার গৃহে যে শালগ্রামশিলা আছেন, তিনি অতীব জাগ্রত, এসকল তাঁহারই খেলা। তুমি প্রতিদিন শালগ্রামের পূজার নিমিত্ত যে নৈবেদ্য দাও, প্রায়ই দেখি, তাহার অর্দ্ধেক থাকে না। দেখিয়া আমার মনে তোমার বধূকেই সন্দেহ হইত, আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়া ঐ সন্দেহ দূর হইল। যাহা হউক, আজ শ্রীনিত্যানন্দকে ভোজন করাও।” পশ্চাদ্‌ভাগে হইতে পতির কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হাসিতে লাগিলেন। শচীদেবী কোন কথাই বলিলেন না। প্রভু জননীকে পাকের আয়োজন করিতে বলিয়া স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে যাইয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, “গোসাঁই, আজ আমার বাড়ীতে তোমার ভিক্ষা, কিন্তু দেখিও, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না।” নিত্যানন্দ হাসিয়া বলিলেন, “বিষ্ণু বিষ্ণু, চঞ্চলতা পাগলেই প্রকাশ করে, তুমি সকলকেই নিজের মত চঞ্চল মনে কর।” অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে লইয়া নিজ ভবনে আগমন করিলেন। গদাধর প্রভৃতি পরম আপ্তগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্য ঈশান সকলকে চরণ ধৌত করিবার নিমিত্ত জল দিলেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে পাদপ্রক্ষালনের পর ভোজন করিতে বসিলেন। শচীদেবী অন্নাদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাধা হয় হয় এমন সময়ে শচীদেবী দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণ ও বলরামের ন্যায় একত্র

বসিয়া ভোজন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি মুর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। প্রভু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আচমন পূর্ব্বক জননীকে তুলিলেন। শচীদেবী সংজ্ঞালাভ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। ঈশান গৃহাদি পরিষ্কার করিলেন।

ভক্তসম্মিলন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে নিজানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। রাত্রি-দিন জ্ঞান নাই, সদাই আবিষ্ট, আনন্দে বিভোর থাকেন। ভক্তগণের ভাগ্যের সীমা নাই. কেহ প্রভুকে মৎস্য দেখেন. কেহ কূর্ম্ম দেখেন, কেহ বরাহ দেখেন, কেহ বামন দেখেন, কেহ নৃসিংহ দেখেন. কেহ পরশুরাম দেখেন, যাঁহার যেমন মনের গতি তিনি তেমনি দর্শন করিয়া থাকেন। দৈবাৎ একদিন প্রভুর বাড়ীতে এক শিবের গায়ক আসিয়া ডমরু বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। প্রভু গান শুনিতে শুনিতে শিবভাবে আবিষ্ট হইয়া ঐ গায়কের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন এবং হুঙ্কার দিয়া 'আমি শিব' এই কথা বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্য হইল। তখন তিনি স্কন্ধ হইতে নামিয়া গায়ককে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেন। গায়ক কৃতার্থ হইয়া নিজগৃহে গমন করিল। ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গায়ক চলিয়া গেলে, প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, আমাদের দিবাভাগ একপ্রকার আনন্দেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু রাত্রিকাল বৃথা যায়, অত-এব আজ হইতে আমরা প্রতিরাত্রিতেই সঙ্কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ভক্তগণ শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। রাত্রিকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। প্রতিরাত্রিতেই নিয়মিত সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ নিয়মিতভাবে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ক্রমে নানা স্থান হইতে নানা ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কখন আপনাকে ভক্তভাবে কখন বা ঈশ্বরভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীহরিবাসরকীর্ত্তন।

"করুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চাঁদে, ছটায় পরাণ কাঁদে,
তাহে নব প্রেমের আরম্ভ॥
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজলি ঝলমল করে,
চমকিত অমর-সমাজে॥
কি দিব উপমা তার, করুণা-বিগ্রহ-সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচনদাস গায়॥"

একদা শ্রীহরিবাসরে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের বিধান হইল। একে একে ভক্তগণ সমবেত হইলে, রবির উদয় হইতেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পুণ্যবান্ শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে 'গোপাল গোবিন্দ' ধ্বনি উত্থিত হইল। জগতের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নদীয়াপুরী প্রেমভরে টলমল করিতে লাগিল। গায়ক সকল দলে দলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এক সম্প্রদায় লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ অপর সম্প্রদায় লইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দঘোষ অন্য এক সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্ভুত প্রকাশ ধারণ পূর্ব্বক যুগপৎ সকল সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নকমল করুণা-মকরন্দে ডুবু ডুবু হইল। ভক্তগণের নেত্রভ্রমর সকল ঐ মকরন্দ পান করিতে লাগিল। অদ্বৈতাচার্য্য নাচিতে নাচিতে অলক্ষিতভাবে প্রভুর পাদরজ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবেশ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অদ্ভুত ভাবাবেশে ভক্তবর্গের মধ্যে কাহাকে হলধর, কাহাকে শিব, কাহাকে শুক, কাহাকে নারদ, কাহাকে প্রহ্লাদ, কাহাকে ব্রহ্মা, কাহাকে উদ্ধব প্রভৃতি সম্বোধন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের ঘোররোলে সমস্ত নদীয়াপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারে আঘাত করিতে

লাগিলেন। দ্বার রুদ্ধ বলিয়া কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বাহিরে থাকিয়াই বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ বা অদ্বৈতাচার্য্যকে, কেহ বা নিত্যানন্দকে, কেহ বা শ্রীবাস পণ্ডিতকে, কেহ বা শ্রীগৌরসুন্দরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "নিমাই পণ্ডিত ছিল ভাল, সঙ্গদোষে নষ্ট হইয়া গেল।" কেহ বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিতের আর কি পদার্থ আছে, বায়ুরোগে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।" ইহাদের কীর্ত্তনের উপদ্রবে দেবতারা পর্য্যন্ত বিরক্ত হইবেন, দেশে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হইবে, অতএব ইহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত কর্ম্ম হইতেছে।" কেহ বলিলেন, "দেবতাকে চীৎকার করিয়া ডাকা এই নূতন দেখিতেছি, নির্জ্জনে নীরবে বসিয়াইত দেবতাকে ডাকিতে হয় জানিতাম; এ আবার নূতন সৃষ্টি হইল; শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ভাত নাই, এই এক অদ্ভুত সর্ব্বনাশকর কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে।" কেহ বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইলে, দেওয়ানে যাইয়া ইহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কেহ বলিলেন, "ইহারা যখন দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর বিশেষ কোন অশ্লীল গোপনীয় কুৎসিত ব্যাপার আছে।" কেহ কেহ বলিলেন, "দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেল।" শেষে স্থির হইল, শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক, নতুবা ইহারা দেশটাকে একবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার কিছুক্ষণ বাক্যব্যয়ের পর যে যার গৃহে চলিয়া গেল। ভক্তগণ আপনার মনে প্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অবশেষ আছে এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কলিযুগে আমার প্রকাশ্য অবতার নাই, আমি এই যুগে এইরূপই প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ করিয়া জীবগণের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকি এবং তোমরাও এইরূপই প্রচ্ছন্নভাবে আমার সহিত লীলাবিহার করিয়া থাক।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। দেহ নিশ্চল হইয়া গেল। ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু স্বয়ংই বাহ্য পাইলেন। রাত্রি অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। স্নান সমাধা হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

মহাপ্রকাশ।

একদিন শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গনে পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তন হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় যাইয়া উপবেশন করিলেন। আরও অনেকবার ঐরূপ করিয়াছেন। এবার কিছু বিশেষ হইল। অন্য অন্য বার কিছুক্ষণ পরেই বিষ্ণুখট্টা হইতে অবতরণ করিয়া দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবার কিন্তু তাহা করিলেন না, সাতপ্রহরকাল পর্য্যন্ত ঐরূপেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া রহিলেন। প্রথমতঃ ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার অভিষেকের আয়োজন কর।" বলিবামাত্র নূতন কলস ভরিয়া গঙ্গা হইতে জল আনয়ন করা হইল। সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে জল ঢালিলেন। পরে অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ পুরুষসূক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রভুর অভিষেক করিতে লাগিলেন। মুকুন্দাদি গায়কগণ অভিষেক গীত গান করিতে লাগিলেন। কুলবতী রমণীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত শত কলস জল দ্বারা অভিষেক কার্য্য সমাধা হইল। প্রভুকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করান হইল। তদনন্তর ভক্তগণ বিবিধ উপহারের আয়োজন করিয়া প্রভুর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে ছত্রধারণ করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের বিধানে ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা করিয়া স্তব প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। একে একে সকল ভক্তই প্রভুর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। নানাবিধ ভক্ষ্যোপহার প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে, প্রভু তাহা স্বয়ং হস্তদ্বারা তুলিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজনের পর আচমন করিয়া তাম্বূল সেবন করিলেন। তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি যে দিন শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, অবোধ পড়ুয়া সকল তোমার অনেক লাঞ্ছনা করিয়াছিল, দেবানন্দ অভিমানে পড়ুয়াদিগকে নিবারণ করে নাই, তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে আগমন করিলে, আমি তোমার হৃদয়ে বসিয়া তোমায় সান্ত্বনা করিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে পড়ে?" শ্রীবাসপণ্ডিত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রভু শ্রীবাসের ন্যায় অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতিকে ঐ প্রকার এক একটি অন্যের অগোচর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের মনে নিজচরণে সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধরকে আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া কয়েকজন ভক্ত যাইয়া শ্রীধরকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইলেন। শ্রীধর শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। শ্রীধর উপস্থিত হইয়া সম্মুখে স্বীয় ইষ্ট-দেবের সন্দর্শনে আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষণপরে শ্রীধর চৈতন্য লাভ করিলে, প্রভু বাজারে যাইয়া যেরূপে তাঁহার সহিত আনন্দকলহ করিতেন সেই সকল কথা উত্থাপন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে শ্রীধরের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের কণ্ঠে অকস্মাৎ সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। শ্রীধর মহাজ্ঞানীর ন্যায় প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীধরের স্তবে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদানের সঙ্কল্প বিদিত করিলেন। শ্রীধর প্রভুর সঙ্কল্প শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "প্রভো, এখনও আমাকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আর বঞ্চিত হইব না।" প্রভু বলিলেন, "শ্রীধর, আমি তোমাকে বঞ্চনা করিবার অভিলাষ করিতেছি না, তুমি যথেচ্ছ বর গ্রহণ কর, আমার দর্শন কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না।" তখন শ্রীধর বলিলেন, প্রভো, নিতান্তই যদি বর লইতে হয়, তবে আমার বর এই—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণযুগল॥"

প্রভু শ্রীধরের ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিলেন। ভক্তগণ শুনিয়া 'জয় জয়' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু আচার্য্যকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। আচার্য্য বলিলেন, "আমি যাহা চাই, তাহা পাইয়াছি।" তখন প্রভু মুরারিকে তাঁহার অভীষ্ট শ্রীরামরূপ দর্শন করাইয়া বর গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। মুরারি দাস্যমাত্র বর প্রার্থনা করিলেন। প্রভু মুরারির সেই অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস, তোমাকে যবনেরা যখন বেত্রাঘাত করে, তখন আমি উহা নিজপৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এই দেখ" বলিয়া নিজ অঙ্গ দর্শন করাইলেন। প্রভুর করুণা দেখিয়া হরিদাস ঠাকুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভু হরিদাসকে ডাকিয়া সচেতন করিয়া বর লইতে বলিলেন। হরি-দাস ঠাকুর প্রভৃতি স্তবস্তুতির পর বলিলেন,—

"মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করো বড় আশ।
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তাঁর অবশেষ যেন মোর হয় গ্রাস।
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম।
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।
... ...
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর।
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥"

প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাসকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ভক্তগণ আনন্দে 'জয় জয়' ধ্বনি করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল ভক্তকেই ডাকিয়া প্রভু বরদান করিলেন, কেবল মুকুন্দকে ডাকিলেন না। শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভুর নিকট মুকুন্দের কথা বলিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "মুকুন্দের জন্য কেহ আমাকে অনুরোধ করিও না। ও বেটা বহুরূপী, যখন যেমন তখন তেমন হয়। ও যখন ভক্তের নিকট যায়, তখন ভক্ত হয়; আবার যখন অন্য সম্প্রদায়ের নিকট যায়, তখন ভক্তির নিন্দা করিয়া আমাকে কষ্ট দেয়। অতএব ও বেটা আরও কোটিজন্মের পর আমার দর্শন পাইবে, এখন আমার দর্শন পাইবে না।" কোটিজন্মের পর প্রভুর দর্শন পাইব শুনিয়াই মুকুন্দ মহানন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুকুন্দের নৃত্য দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, মুকুন্দকে আমার নিকট লইয়া আইস।" মুকুন্দ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আমি অপরাধী, যাইলেও দর্শন পাইব না, অতএব যাইব না।" তখন প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তোমার অপরাধ নাই, অপরাধ ছিলও না, আমি তোমাকে পরিহাস করিতেছিলাম, আইস, আসিয়া আমাকে ইচ্ছানুরূপ দর্শন কর।" মুকুন্দ যাইয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু মুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, মুকুন্দ অদ্যাবধি যেখানে আমার অবতার হইবে, সেইখানেই তুমি আমার গায়ক হইবে, ইহাই তোমার বর রহিল।" এইরূপে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু আত্মসংবরণ করিলেন।

নিত্যানন্দের চরিত্র।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা করিতেছেন। নিত্যানন্দও শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহেই বাস করিতেছেন। তিনি বালভাবে শ্রীবাসপণ্ডিতকে পিতা এবং তৎপত্নী মালিনীকে মাতা বলেন। ভাবাবেশে সময়ে সময়ে মালিনীর স্তনপানও করিয়া থাকেন। মালিনী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায়ই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার স্তনে দুগ্ধ না থাকিলেও নিত্যানন্দের স্পর্শেই দুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে।

একদা মালিনীর অসাবধানতায় এক কাক আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতের পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল। শ্রীবাসপণ্ডিত রাগ করিবেন বলিয়া মালিনী কাঁদিতে লাগিলেন। কাক আবার আসিল, কিন্তু শূন্যমুখ, মুখে বাটী নাই। মালিনী দেখিয়া একেবারেই হতাশ হইলেন। তাঁহার সেই কাতরতা দেখিয়া নিত্যানন্দ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মালিনী কাক কর্তৃক ঘৃতপাত্রের অপহরণ বৃত্তান্ত জানাইলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "মা, আপনি কাঁদিবেন না। আমি আপনার ঘৃতপাত্র আনাইয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কাককে বলিলেন, "কাক, সত্বর মাতার ঘৃতপাত্র আনিয়া দাও।" তখন কাক উড়িয়া গিয়া বাটীটি আনিয়া দিল। মালিনী দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন।

পরে একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ীতে যাইয়া হঠাৎ সকলের সম্মুখে দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন, নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট, সংজ্ঞা নাই, শুনিলেন না। তখন প্রভু স্বয়ং উঠিয়া তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, "শ্রীপাদ, এরূপ চাঞ্চল্য করা কি ভাল?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "চাঞ্চল্য পাগলেই করে।" প্রভু শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে দেখিয়া ভোজন করিতে চাহিলেন। শচী মাতা গৃহ হইতে পাঁচটি সন্দেশ আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ একটি খাইয়া অবশিষ্ট চারিটি ফেলিয়া দিলেন। ফেলিয়া দিয়াই শচীমাতাকে বলিলেন, "মাতঃ, সন্দেশ দাও।" শচীমাতা বলিলেন, "দিলাম, ফেলিয়া দিলে, আর ত ঘরে নাই।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "যাও মাতঃ, ঘরে গিয়া দেখ।" শচীমাতা ঘরে গিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ যে চারিটি সন্দেশ ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই চারিটি সন্দেশই ঘরে রহিয়াছে। তিনি তখন ঐ সন্দেশ চারিটির ধূলা ঝাড়িয়া আবার নিত্যানন্দের হাতে দিলেন এবং তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র ভাবিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন।

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের একখানি পুরাতন কৌপীন চিরিয়া উহার এক এক খণ্ড এক এক ভক্তের মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। ভক্তগণ অকস্মাৎ আনন্দে উন্মত্তপ্রায় ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপ অপর একদিন প্রভু ভক্তগণকে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করাইলেন। তাঁহারা প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া গেলেন। নিত্যানন্দের এই সকল অদ্ভুত মহিমা দর্শন করিয়া সকলেই অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

এতদিন গৃহমধ্যেই নামের প্রচার হইতেছিল। অতঃপর প্রভু গৃহের বাহিরেও নাম প্রচার করিবার মানস করিলেন। নিত্যানন্দ অবধূত এবং হরিদাস ঠাকুর এই দুইজনের উপর নাম প্রচারের ভার অর্পিত হইল। প্রভু নিত্যানন্দকে ও হরিদাসকে বলিলেন, "তোমরা নদীয়ার গৃহে গৃহে যাইয়া 'ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণ নাম রে' এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার কর।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরিয়া গৃহে গৃহে যাইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বা তাঁহাদিগের শ্রীমুখনির্গত কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়েন, কেহ বা তাঁহাদিগকে পাগল বলিয়া উপহাসও করেন। কেহ কেহ অলক্ষিতে তাঁহাদিগের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গকেও উপহাস করিয়া থাকেন।

এইপ্রকারে যখন নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রতিদিন নদীয়ার গৃহে গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে নদীয়ার কোতোয়াল জগাই ও মাধাই নামক দুইটি ব্রাহ্মণতনয় নদীয়ানগরের একপ্রকার কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা অর্থ দ্বারা তখনকার বাঙ্গালার রাজা হোসেন সাহের দৌহিত্র চাঁদ কাজীকে বশীভূত করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। উহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না; সদাই সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া থাকিত এবং কথায় কথায় লোকের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিত। ঐ দুই ভ্রাতার অধীনে অনেক অস্ত্রধারী প্রহরী থাকায় কেহই উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে সাহস করিত না।

একদিন নিত্যানন্দ হরিদাসের সহিত প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে কিছুদূরে দস্যুপ্রায় ঐ দুই দুর্দ্দান্ত পুরুষকে সন্দর্শন করিলেন। নিকটবর্ত্তী পথিক

সকল নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে, সম্মুখবর্ত্তী দস্যুদ্বয়কে দেখাইয়া, উহাদিগের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "সম্মুখে ঐ যে দুইটি প্রকাণ্ড-কায় দস্যুপ্রায় ব্যক্তি দেখিতেছ, উহারা অতীব দুর্দ্দান্ত! উহাদিগের নিকট কাহারও পরিত্রাণ নাই। তোমরা সন্ন্যাসী হইলেও উহাদিগের নিকট সদ্ব্যবহারের আশা করিতে পার না। ঐ জগাই মাধাইয়ের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। উহারা ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও মদ্যমাংসাদি সকল অখাদ্য ভোজন করিয়া থাকে। সংসারে যত কিছু পাপকর্ম্ম আছে, উহারা সকলই করিয়াছে। অতএব ঐ দুর্বৃত্ত দুরাচার জগাই ও মাধাইয়ের নিকট গমন করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। উহারা পথের পথিককে ধরিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার অসদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। উহাদিগের দুরাচারে আত্মীয়বর্গও উত্যক্ত হইয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের কৃষ্ণনাম কোন কার্য্যকারক হইবে না; সুতরাং ঐ দুরাচারদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র গমন কর।" লোকমুখে এইরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, দয়ালু নিত্যানন্দের পাপিদ্বয়কে উদ্ধার করিবার বাসনাই অধিক হইল। না হইবে কেন, পাপীর উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার। পাপীর উদ্ধারার্থই নিত্যানন্দের নামপ্রচার। পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্তই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে নামপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি পাপীর উদ্ধার-সাধনই না হইল, তবে আর এই অবতারের বা নামপ্রচারের সার্থকতা কোথায় রহিল? ফলতঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলিলেন, "হরিদাস, এই দুই পতিত ব্রাহ্মণকে উদ্ধার কর। এই অজ্ঞ মায়ামোহিত সংসার শ্রীগৌরাঙ্গের নামের প্রভাব দর্শন করুক। অজামিলাদির উদ্ধারবৃত্তান্ত পুরাণসঙ্কিত। আজ তোমার কৃপায় নিখিল সংসার সাক্ষাতে পাপীর পরিত্রাণ সন্দর্শন করুক।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো, আপনার অসাধ্য কি আছে, আপনার অভিপ্রায় ও শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায়ে কিছুমাত্র ভেদভাব নাই। আপনার কৃপায় গৌরকৃপাও সুলভ, সুতরাং আপনি যখন ইহাদিগের প্রতি সকরুণ হইয়াছেন, তখন ইহারা যে উদ্ধার পাইয়াছে, ইহাই স্থির।"

হরিদাসের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরম কৌতূহলে জগাই মাধাইয়ের নিকট গমন করিলেন। তিনি উভয়কে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। আহ্বান শুনিয়া দুর্বৃত্তদ্বয় অধিকতর উন্মত্তভাবে রোষকষায়িত অরুণ নয়নে 'ধর ধর' বলিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাসের অভিমুখীন হইল। তখন

নিত্যানন্দ প্রভু লৌকিকভাবে হরিদাসের সহিত পলায়নপরায়ণ হইলেন। সন্ন্যাসিদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেখিয়া জগাই মাধাইও বিকট শব্দ করিতে করিতে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নিকটবর্ত্তী লোক সকল ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দূরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং সন্ন্যাসিদ্বয়কে, নিষেধ না শুনিয়া, এই উপস্থিত বিপদ ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করার নিমিত্ত, প্রভূত তিরস্কার করিতে লাগিল।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়া প্রভুর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হরিদাস বলিলেন, "শ্রীপাদ, আজ তুমি কি চাঞ্চল্যই দেখাইলে!" নিতাই বলিলেন, "কেন, আমার কি অপরাধ?" হরিদাস বলিলেন, "ওরূপ মদ্যপায়ীর নিকট গমন করা কি উচিত হইয়াছিল?" নিতাই বলিলেন, "যত দোষ আমারই, তুমি ত কোন দোষ কর নাই?" হরিদাস বলিলেন, "আমার দোষ কি? তুমি উহাদিগকে উদ্ধার করিতে গেলে কেন?" নিতাই বলিলেন, "প্রভুর আদেশ মত গিয়াছিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমাকে এই ডাকাইতের হাতে ফেলিয়া না পালাইলে আর আমি পালাইতাম না। সে যাহা হউক, এখন প্রভুর চরণে পতিত হইয়া ঐ দুই পাপীর উদ্ধার প্রার্থনা কর, তিনি কখনই তোমার কথায় অবহেলা করিবেন না।"

এইপ্রকার কথা কহিতে কহিতে দুইজনে প্রভুর নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা কীর্ত্তন করিলেন। বিশেষতঃ নিতাই বলিলেন, "তুমি আমাদিগকে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলে, আর আমরা দুর্বৃত্তের তাড়নায় অস্থির হইতে লাগিলাম। দুরাত্মাকেই যদি উদ্ধার না করিবে, তবে আর নামপ্রচারের আদেশ কেন?" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্যই দুর্বৃত্তের উদ্ধার হইবে।" ভক্তগণ তখন, জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল ভাবিয়া, আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন এইভাবেই অতিবাহিত হইল। পরে একদিন সন্ধ্যাকালে জগাই ও মাধাই আসিয়া শ্রীবাসের বাটীর নিকট থানা করিল। লোকে উহাদের ভয়ে ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীবাসের বাটীতে যথাকালে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জগাই ও মাধাই কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত, শ্রীবাসের গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না; বাহিরে থাকিয়াই কীর্ত্তনের তালে নৃত্য আরম্ভ করিল। উহারা এইভাবেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে, যখন

ভক্তগণ বহির্গমনার্থ দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তখন দেখিলেন, সম্মুখে জগাই ও মাধাই। দুরাত্মদ্বয়কে দর্শন করিয়াই তাঁহারা ভয়ে তটস্থ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, জগাই ও মাধাই তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিল, "নিমাই পণ্ডিত, এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? তোমাদের গান শুনিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি একদিন আমাদিগকে তোমাদের গান শুনাও।" শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তগণ দস্যুদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাশ কাটাইয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। অপরাহ্নে সুযোগ বুঝিয়া ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন, "প্রভো, সাধুলোককে উদ্ধার করিতে সকলেই পারে; কিন্তু এই জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার না করিলে তোমার পতিতপাবন নামের সার্থকতা থাকে না। এই দুরাত্মদ্বয়কে উদ্ধার করিয়া নিজের ও নামের গৌরব প্রচার কর।" প্রভু কথাবার্ত্তায় ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝিলেন ও বলিলেন, "আচ্ছা, আজ সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া জগাই ও মাধাইকে হরিনাম দিব। উহাদিগকে হরিনাম দিয়া জগতে নামের শক্তি দেখাইব।" প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ক্রমে ক্রমে সকল ভক্ত আসিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তনে প্রস্তুত হইলেন। খোল, করতাল, শঙ্খ ও ভেরী বাজিতে লাগিল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ও নরহরি প্রভৃতি সকলেই নগরসঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। একাল পর্য্যন্ত বাহিরের লোকে কেহ কখন প্রভুর কীর্ত্তন দেখেন নাই, আজ তাহা সম্পন্ন হইল; দেখিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইলেন।

সকলের অগ্রভাগে শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি জগাই মাধাইয়ের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। জগাই মাধাইয়ের দুঃখ দেখিয়া কৃপার অবতার নিত্যানন্দপ্রভু সকলের অগ্রসর হইয়াছেন। জগাই ও মাধাই মদিরাপানে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। বেলা অবসান হইল, তখনও তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। কীর্ত্তনের শব্দে তাহাদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। শয়নাবস্থাতেই প্রহরীকে অনুমতি করিল, "কে গোলমাল করিতেছে, নিষেধ কর।" প্রহরী যাইয়া সঙ্কীর্ত্তনমত্ত ভক্তগণকে নিজ প্রভুর আদেশ জানাইল। কিন্তু তাহাতে সঙ্কীর্ত্তন নিবৃত্ত হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল। সে কীর্ত্তন থামাইতে অশক্ত হইয়া অগত্যা নিজ প্রভুর নিকট যাইয়া সকল কথা নিবেদন করিল। তখন সেই উন্মত্ত জগাই ও মাধাই ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের

দিকে আসিতে লাগিল। ভক্তগণ আজ আর জগাই মাধাইকে দেখিয়া ভীত হইলেন না; কীর্ত্তনও নিরস্ত হইল না। তাঁহারা অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের রোলে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সকলের অগ্রে। তিনি সম্মুখে ক্রোধান্ধ অসুরদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন। মাধাই অবধূতের কথা শ্রবণমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, পতিত ভগ্ন খোলা দ্বারা নিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করিল। খোলাখানি মস্তকে বিদ্ধ হওয়াতে ক্ষতস্থান দিয়া শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুর্বৃত্ত মাধাই তাহাতেও নিবৃত্ত নহে, পুনর্ব্বার আঘাত করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেই অবস্থাতেও জগাইকে বলিলেন, "জগাই, হরি বল।"

"আয় রে জগাই মাধাই আয়।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়॥
মাধাই মেরেছ কলসীর কানা।
তা বলে কি নাম (প্রেম) দিব না॥
মাধাই মেরেছ তায় ভয় কি।
আয় হরিনাম তোরে দি॥
আমি এই হরিনাম তোরে দিব।
দিয়ে সঙ্কীর্ত্তনে নাচাইব॥
তোরা দু ভাই জগাই মাধাই।
আমরা দু ভাই গৌর নিতাই॥"

তখন জগাই প্রকৃতিস্থ হইয়া মাধাইয়ের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিষেধ করিল, এবং 'তুমি অতি নির্দ্দয়' প্রভৃতি বলিয়া মাধাইকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চাতে ছিলেন। লোকমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি তখনই সগণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্যানন্দের কলেবর রক্তাক্ত দর্শন করিয়া যার-পর-নাই ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুর ক্রোধ শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শ্রীভগবান্

নিজের প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নিজ ভক্তের প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না, এবং সেই অত্যাচারকারীর প্রতি তাঁহার কৃপাও সহজে হয় না। তখন করুণাময় নিতাইচাঁদ নিরুপায় ভাবিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। জগাইয়ের সদ্ব্যবহার নিবেদন করিলেন। জগাইয়ের সদ্ব্যবহারের সহিত মাধাইয়ের অসদ্ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে উভয়কেই ক্ষমা করিতে বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সময় বুঝিয়া নিরপরাধী বলিয়া জগাইকে ক্ষমা ও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। মাধাইকে ক্ষমা করা না করার ভার শ্রীমন্নিত্যানন্দের উপর নিহিত হইল। তখন দয়াল নিতাই মাধাইয়ের সকল অপরাধ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের তৎপ্রতি প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া—দয়াল নিতাইয়ের ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তি সকল বিস্মিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই ও মাধাইকে পুনর্ব্বার পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "জগাই মাধাই; তোমাদিগের যত কিছু পাপ আছে, আমাকে সমর্পণ কর, আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিব।" পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই আপনাদিগের অসৎস্বভাব স্মরণ করিয়া এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গের করুণস্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া গভীর বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। জগাই ও মাধাই আপনাদিগের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহারা, যাহা কখন আশা করে নাই, এবং অন্যে যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, আজ তাহাদিগের সেই অবস্থার উন্নতি লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইল। উভয়ের শরীর রোমাঞ্চ হইল। নয়নদ্বয় হইতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা যে, প্রভুর নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, কিন্তু আনন্দে ও বিস্ময়ে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, তখন কিছুই বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জগাই ও মাধাই সর্ব্বজনসমক্ষে বলিতে লাগিল, "প্রভো, আপনি আজ যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৌরব অল্পত্ব প্রাপ্ত হইল। যদিও আপনি অজামিলাদি অনেকানেক পাপীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের উদ্ধারের নিকট সে অতি তুচ্ছ। অজামিল পাপী হইলেও মুক্তির অধিকারী। কারণ, সে মৃত্যুকালে সর্ব্বপাপ-প্রণাশন তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। আমরা নাম উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, তোমার নাম উচ্চারণকারীর প্রতি অত্যাচার পর্য্যন্ত করিয়াছি। অত্যাচারও

আবার যথা তথা অত্যাচার নহে। অবধুত প্রভুর শ্রীঅঙ্গ হইতে রক্তপাতন পর্য্যন্তও করিয়াছি। প্রভো, তথাপি তুমি আমাদিগের উভয়কে উদ্ধার করিলে—অতি দুর্লভ তোমার দাসত্ব প্রদান করিলে। ভগবন্, এতদিন তুমি তোমার মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে, আজ কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তোমার এই অপার করুণা কি বর্ণনীয় হইতে পারে? তোমার এই মহিমা লোকবেদের অগোচর, তাই তোমার এই মহিমা শাস্ত্রে সুব্যক্ত হয় নাই। তোমার এই সুকরুণ অবতারও সচরাচর ঘটে না। যাঁহাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি সুদৃঢ় ভবিষ্যতে কল্পের পর কল্প ভেদ করিয়া কল্পান্তরে গূঢ়ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই অতি সাবধানে তোমার এই অবতারের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। এ দৃষ্টি কিছু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু প্রভো, আমরা অতি পাপিষ্ঠ দুরাচার হইয়াও তোমার করুণার সেই রহস্য ভেদ করিয়াছি। আজ তোমার করুণা আমাদিগের হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে স্তরে স্তরে গ্রথিত ও অঙ্কিত হইয়াছে। কংসাদি অসুরগণ বিদ্রোহ আচরণেও মুক্ত হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু তাহারা কি জীবনসত্ত্বে পবিত্র হইতে পারিয়াছিল, বা তোমার করুণার পাত্র হইয়াছিল? তাহারা নিরন্তর শত্রুভাবে তোমার প্রতি দ্রোহ আচরণ করিয়া শয়নে স্বপনে তোমার অনুধ্যান করিয়া ক্ষত্রিয়-ভাবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা সে সকল কিছু না করিয়া, ভ্রমেও তোমার নাম না ভাবিয়া, যে, তোমার দর্শনে ও স্পর্শনে মুক্ত ও চরিতার্থ হইলাম, সে কি কেবল তোমার অলোকসামান্য কৃপারই গুণে নহে? প্রভো, তোমার তুল্য এমন করুণ অবতার আর কে আছে? যোগী ঋষির অপ্রাপ্য দেবের দুর্লভ অতুল প্রেম বিতরণ করিতে আর কে আছে? আর কে তোমার ন্যায় কৃপা করিয়া আমাদিগের ন্যায় দুরাত্মার উদ্ধারসাধন করিয়াছে বা করিবে? মার খেয়ে প্রেম দিতে আর কে আছে প্রভো!!"

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উঁহাদের পাপ-স্বভাব দূর হইল। ভ্রাতৃদ্বয় অতীত বৈষ্ণবাপরাধ স্মরণ করিয়া উহা হইতে মুক্তিকামনায় গঙ্গাতীরে আশ্রয় লইলেন। যিনি স্নান করিতে আইসেন, তাঁহারা বিনীতভাবে তাঁহারই শরণাগত হয়েন। জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অপরাধের নিমিত্ত সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আহারাদির চেষ্টা নাই, কার্য্যের মধ্যে প্রতিদিন দুইলক্ষ হরিনাম। যাঁহারা এককালে নদীয়ার রাজা ছিলেন,

তাঁহাদিগের এইরূপ দীনতা দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝিলেন। জগাই ও মাধাইয়ের উদ্ধারে নগরে শ্রীহরি-নাম প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। জগাই নগরে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন, মাধাই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গঙ্গাতে স্বহস্তে এক ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়েই বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

"অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত॥"

সঙ্কীর্ত্তনে অনুল্লাস।

শ্রীবাসের ভবনে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়াই কীর্ত্তন হইয়া থাকে। কীর্ত্তনদ্বেষী লোকদিগকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। পাছে রসভঙ্গ হয় বলিয়া বহিরঙ্গ লোক সকলকেও সঙ্কীর্ত্তনস্থানে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয় না। একদিন এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুমতি পাইয়া সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দিবস সঙ্কীর্ত্তনে উল্লাস হইতেছে না এইরূপ ছল করিয়া, তাঁহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আবার পরক্ষণেই, সেই ব্রাহ্মণের, তাদৃশ অপমানেও আপনাকে অপমানিত বোধ করার পরিবর্ত্তে, অন্তরে রুচি উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানে কৃতার্থ করিলেন। এই প্রকারে জগতে এই শিক্ষা প্রচার করিলেন যে, অপরাধের নিবৃত্তি না হইলে, কেবল বাহ্য নিষ্ঠায় কৃতার্থ হওয়া যায় না।

এই ঘটনার পর হইতে আর কেহ কাহাকেও হঠাৎ সঙ্কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইতে সাহস করিতেন না। যদি কেহ কোন দিন কোনরূপে প্রবেশ করিয়া

গোপনেও সঙ্কীর্ত্তন দর্শন করিতেন, প্রভু তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িতেন না। শ্রীবাসপণ্ডিতের শাশুড়ীর ভাগ্যেও একদিন তাহাই ঘটিয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের শাশুড়ী সংকীর্ত্তন দেখিবেন বলিয়া গোপনে গৃহমধ্যে লুকাইয়া আছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তান্ত অবগত নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অপরাপর দিনের ন্যায় সে দিনও নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। অন্তর্যামী প্রভু সকলই জানেন, কিন্তু কৌতুক করিবেন বলিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্কীর্ত্তনে উল্লাস হইতেছে না কেন? বোধ হয়, কেহ কোথাও লুকাইয়া আছে।" প্রভুর কথা শুনিয়া এবং প্রকৃতই সে দিন কাহারও সঙ্কীর্ত্তনে উল্লাস হইতেছে না বুঝিয়া বাড়ীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করা হইল; কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখা গেল না। দ্বিতীয়বার অন্বেষণ করা হইল। এবার শ্রীবাসপণ্ডিত নিজের শাশুড়ীকে ঘরের এক কোণে ডোল চাপা দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। পরে সকলেই যথারীতি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন এবং পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অপর একদিন সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। প্রভু উল্লাস পাইতেছেন না। একে সেদিন উল্লাস হইতেছে না, তাহার উপর আবার অদ্বৈতাচার্য্য মধ্যে মধ্যে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন আর বলিতেছেন,—

"কেমতে হইব প্রেম নাঢ়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম না পায় শ্রীবাস।
তেলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইলা ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেহ গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাঞি॥

ঈশ্বরের চরিত্র অতীব দুর্ব্বোধ। অদ্বৈতাচার্য্যের কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, তিনি যেন নিত্যানন্দের প্রতি ঈর্ষা করেন। উল্লিখিত পয়ার কয়টি হইতে তাহাই প্রকাশও পায়। বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সখ্যভাব

প্রকাশ করিতেন এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরুজনের ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাহাতে আচার্য্যপ্রভু বিশেষ দুঃখিত হইতেন। তিনি যদি কোন দিন অবসর-সুযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ স্পর্শ করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তৎপরক্ষণেই তাঁহার চরণধূলি লইয়া তাহার পরিশোধ দিতেন; কিন্তু এই প্রকার আচরণ সকল কখনই উপদেশবিহীন হইত না; প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের মহিমাপ্রচারই তাদৃশ আচরণ সকলের উদ্দেশ্য ছিল।

যাহা হউক, অদ্বৈতাচার্য্যের উক্তি সকল শ্রবণ করিয়া, প্রভু কোন উত্তর না দিয়াই বহির্দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক গঙ্গাতীরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভক্ত-গণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব, তোমরা কাহাকেও কিছু বলিবে না।" এই বলিয়াই তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইলেন। ঐ রাত্রি ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিলে, প্রভু তাঁহাকে আচার্য্যের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "অদ্বৈতাচার্য্যের কাল উপবাসেই গিয়াছে। তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ দণ্ড হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কাল আপনাকে না পাইয়া আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি। অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যবহার সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজেও তাহার পরিণাম ভোগ করিতেছেন।" শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়া প্রভু তখনই তাঁহাকে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। আচার্য্য তখন শয়ন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। আচার্য্য উঠিয়া বলিলেন,—"প্রভো, আপনি অপরকে দাস্যভাব দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন, আর আমাকে কেবল অহঙ্কার দিয়া দূরে পরিহার করিতেছেন। আপনি আমার ধন প্রাণ দেহ ও মান সমস্তই, আমাকে আপনার দাস করিয়া চরণে স্থান দিন।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর, শিবব্রহ্মাদি দেবগণ তদ্দত্ত অধিকারে অধিকারী। নিজ নিজ অধিকার পালনে যদি কখনও কাহারও কোন অপরাধ হয়, কৃষ্ণ তাঁহাকে দণ্ডও দেন, ক্ষমাও করেন, ইহাই নিয়ম।" এই কথা বলিয়া প্রভু আচার্য্যকে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। অপরাপর ভক্তবৃন্দও সমাচার পাইয়া তাঁহা-

দিগের সঙ্গী হইলেন। সকলে মিলিয়া স্নান ও জলবিহার আরম্ভ হইল। কি প্রভু, কি প্রভুর ভক্তবৃন্দ, সকলেই বালকের ন্যায় চঞ্চল, সকলেই প্রেমানন্দে উন্মত্ত। তাঁহারা যখন যাহা করেন, তখন তাহাই অতিরিক্ত বোধ হইয়া থাকে। জলে নামিয়া প্রবীণ সুধীর ভক্তবৃন্দও মাতিয়া উঠিলেন। বালক-দিগের ন্যায় পরস্পর জলক্ষেপণ আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের ভাবে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ এইরূপ ক্রীড়া করিয়া জল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন।

চাপালগোপাল।

শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রায় প্রতি রাত্রিতেই সঙ্কীর্ত্তনানন্দ হয়। পাষণ্ড সকল ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় না, বাহিরে থাকিয়াই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যুক্তিও করে। এক দিন চাপালগোপাল নামক এক পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ভবানীপূজার সামগ্রী সকল লইয়া শ্রীবাসের দ্বারে উপস্থিত হইল। সে দ্বারের কতকটা স্থান লেপিয়া কলাপাতের উপর হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল, জবাফুল ও সুরাভাণ্ড রাখিয়া গৃহে চলিয়া গেল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত বাটীর বাহিরে যাইয়া উহা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তিনি প্রতিবেশী ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন। তাঁহারা দেখিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যাচারীকে মন্দ বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত ঐ সকল দ্রব্য ফেলাইয়া গোময়াদি দ্বারা স্থান সংস্কার করিয়া স্নান করিলেন।

এদিকে উক্ত অপরাধে চাপালগোপালের অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি উৎপন্ন হইল। দুরাত্মা, উক্ত বৈষ্ণবাপরাধই তাহার ব্যাধির কারণ বুঝিয়া, একদিন গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া পড়িল। সে ব্যাধিতে কাতর হইয়া রোগমুক্তির জন্য অনেক অনুনয় করিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কিন্তু তখনও তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় নাই জানিয়া উপেক্ষা করিলেন। চাপালগোপালের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা পরে প্রকাশ পাইবে।

বিবিধ অদ্ভুত ঘটনা।

একদিন সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রভু হঠাৎ নিজ অঙ্গনে একটি আম্রবীজ রোপণ করিলেন। দেখিতে দেখিতেই উহা অঙ্কুরিত, বৃক্ষাকারে পরিণত, বর্দ্ধিত ও শাখাপল্লবাদিসমন্বিত হইল। ক্ষণকালপরেই মুকুল ও ফল দেখা গেল। পরে যখন অনেক ফল পাকিয়া উঠিল, তখন প্রভু দুইশত আম্র পাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইলেন। ভোগের পর ভক্তগণকে ঐ সকল প্রসাদী ফল ভোজন করাইলেন। তদবধি ঐ আম্রবৃক্ষ বার মাসই ফলিতে লাগিল। ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের পর মধ্যে মধ্যে উক্ত আম্র প্রসাদ পাইতে লাগিলেন।

অপর একদিন কীর্ত্তনের কালে আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইল। বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনস্থানে বিন্দুমাত্র জল পড়িল না।

অপর একদিন প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃসিংহভাবে আবিষ্ট ও উন্মত্ত হইয়া পাষণ্ডদলনোদ্দেশে দৌড়িতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে সত্য সত্যই নৃসিংহরূপী দর্শন করিতে লাগিলেন।

অপর একদিন এক সর্ব্বজ্ঞ গণক আসিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আপনার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গণনা করিয়া বুঝিলেন, ইনি শ্রীভগবান্। তিনি যখন প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বুঝিলেন, তখনই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ রূপও সন্দর্শন করিলেন। রূপ দেখিয়াই তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া গেল। প্রভু পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ ও অবাক্ হইয়া চলিয়া গেলেন।

অপর একদিন প্রভু নিজ ভক্তগণের নিকট শ্রীহরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে এক পাষণ্ড পড়ুয়া বলিল, নামের মহিমাসূচক বাক্য সকল প্রশংসাবাদমাত্র। প্রভু শুনিয়াই ভক্তগণের সহিত সবস্ত্র স্নান করিলেন, এবং বলিলেন, "ঐ প্রকার লোকের মুখদর্শনও অকর্ত্তব্য।"

অপর একদিন প্রভু গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজের উপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চরণতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলে, আমাকে প্রবেশ করিতে দিলে না, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, এবং কিছুমাত্র তপস্যা করিয়া

থাকি, তবে তুমি নিশ্চয় সংসারসুখে বঞ্চিত হইবে।" প্রভু সেই ক্রোধান্বিত ব্রাহ্মণের উপবীতখণ্ড শিরে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনার শাপ আমার শিরোধার্য্য জানিবেন।" ভক্তবৃন্দ শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

অপর একদিন সঙ্কীর্ত্তনের পর এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আসিয়া হঠাৎ প্রভুর চরণ-তলে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কিছু না বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া তীরে উঠাইলেন।

আর একদিন যশোহরের অন্তর্গত তালপেড়া নামক গ্রামের পদ্মনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র লোকনাথ চক্রবর্ত্তী আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। লোকনাথ চক্রবর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্যের বিশেষ অনুগত ও প্রভুর প্রিয়পাত্র হইলেন। সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বেই হঠাৎ একদিন প্রভু লোকনাথ চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন, "তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর, আমিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সত্বর শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি।" লোকনাথ প্রভুর আজ্ঞা শিরে ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবনেই গমন করিলেন। ঠাকুর নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ইঁহারই নিকট দীক্ষিত হয়েন।

আর একদিন প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন, "পণ্ডিত, পূর্ব্বে তোমার জীবনান্ত সময় উপস্থিত হইলে, আমি তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, স্মরণ হয় কি?" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, "প্রভো, কালকবলে পতিত হইতেছিলাম, কোনরূপে হঠাৎ রক্ষা পাইয়াছি, ইহা আমার স্মরণ আছে। আপনার অবতারের পূর্ব্বে আমি অতিশয় দুর্দ্দান্তস্বভাব ছিলাম, স্বপ্নেও কখন ভগবদ্‌গুণ-নামাদি শ্রবণকীর্ত্তন করিতাম না। দৈবাৎ কোন মহাত্মা আমাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দান করিয়া বলিলেন, "অরে ব্রাহ্মণাধম, তুই যেরূপ দুর্দ্দান্ত, তোকে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়, তথাপি বলিতেছি, তোর এক বৎসর মাত্র পরমায়ু আছে, এখনও সাবধান হইয়া কার্য্য কর।" রজনী প্রভাত হইলে, ঐ স্বপ্নোপ-দেশ আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। আমি মরণভয়ে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া নারদীয়পুরাণ পাঠ করিতে করিতে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এই শ্লোকটি প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর এই শ্লোকটিকেই শ্রীহরির উপদেশ বিবেচনা করিয়া হরিনামের শরণ গ্রহণ করিলাম। এইভাবে কথিত মরণদিন নিকটবর্ত্তী হইলে, দেবানন্দ পণ্ডিতের বাটীতে শ্রীভাগবতশ্রবণার্থ গমন করিলাম। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আপনিই বিদিত আছেন।"

আর একদিন প্রভু শ্রীবাসের আবাসে ভগবন্মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই মন্দিরের দক্ষিণভাগে সূচিকর্ম্মজীবী এক যবন তাহার নিজ সৌচিক কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার নিরুপম মাধুরী অবলোকন করিয়া মহানন্দে নিমগ্ন হইল। পরে প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে হাস্য করিতে করিতে "কি আশ্চর্য্য দেখিলাম, কি আশ্চর্য্য দেখিলাম" বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতেই আনন্দাশ্রুপরিব্যাপ্ত হইয়া সৌচিক কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তদবধি সে সংসার ত্যাগ করিয়া অবধূতের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমানন্দে বিবশ হইয়া আচার্য্যরত্নের ভবন হইতে নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক কুষ্ঠী বিপ্র তাঁহার চরণে শরণ লইলেন। তিনি করুণার্দ্র হইয়া ঐ বিপ্রকে অদ্বৈতাচার্য্যের পাদোদক গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাতেই তাঁহার রোগের শান্তির সহিত ভবরোগেরও শান্তি হইল।

শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভোজন।

একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে করিতে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন কৃষ্ণভক্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তবর্গের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া সন্তোষের সহিত বলিলেন, "ব্রহ্মচারিন্, তুমি আজ আমাকে তোমার ভিক্ষালব্ধ বস্তু অর্পণ কর।" ব্রহ্মচারী শুনিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং তাঁহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর কারুণ্য দেখিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর বলিলেন, "প্রভো, এই নিকৃষ্ট তণ্ডুলকণা কি আপনার ভোজনযোগ্য! লোকে কত কত সুমধুর দ্রব্য আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকে।" প্রভু বলিলেন, "ভক্তের তণ্ডুলকণাও অভক্তের অমৃত অপেক্ষা স্বাদু।" শুনিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আনন্দে বিহ্বল হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক প্রভুকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে প্রেমভক্তি প্রদান

করিয়া কৃতার্থ করিলেন। তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিক হইতে 'হরি হরি' ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

নাটকাভিনয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ গূঢ়ভাবে নদীয়ানগরে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত। কখন বা গৃহ হইতে বাহির হইয়া নগরে নগরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মোহিত হয়েন। পাষণ্ড সকল তাঁহার রূপাদির মাধুর্য্যে সমাকৃষ্ট হয়েন না বটে, কিন্তু বিদ্যার প্রভাবে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করেন। অধ্যয়ন কেবল ব্যাকরণমাত্র, কিন্তু তাঁহার বিদ্যার তুলনায় অপরের বিদ্যা তৃণ হইতেও লঘু হইয়া যায়। ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে সকল মাধুর্য্যের নিকেতনস্বরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। অভক্তগণ দেখেন, যেন মূর্ত্তিমান্ দম্ভ। সুতরাং পাষণ্ড সকল ঈর্ষান্বিত হইয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত রাত্রিকালে সঙ্কীর্ত্তনস্থলে গোপনে লোকসমাজের অহিতকর কুৎসিত কার্য্য সকল করিয়া থাকেন। এই বৃত্তান্ত ক্রমে কাজীরও কর্ণগোচর হইল। অনেকেই অনেকপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তিনি নির্ভয়ে ভক্তগণের সহিত পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই সময়েই একদিন ভক্তগণের নিকট নাটকাভিনয়ের প্রস্তাব করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খানের উপর সাজসজ্জার আয়োজনের ভার অর্পিত হইল। গদাধরকে গোপী ব্রহ্মানন্দকে সখী নিত্যানন্দকে যোগমায়া হরিদাসকে কোতোয়াল শ্রীবাসকে নারদ এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিবার ও শ্রীরামাদিকে গান করিবার ভার দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং লক্ষ্মী সাজিবার ভার লইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "প্রভো, আমি অজিতেন্দ্রিয়, অতএব অভিনয় দেখিতে যাইব না।" শ্রীবাস পণ্ডিতও আচার্য্যের সহিত একমত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তোমরাই যদি অভিনয়কার্য্যে যোগদান না কর, তবে আমি কাহাকে লইয়া নাটকাভিনয় করিব? তোমরা যে কারণে চিন্তিত হইতেছ, সে ভার আমার। আজ সকলেই মহাযোগেশ্বর হইবেন, কাহারও কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই, কেহই আমাকে দেখিয়া মোহিত হইবেন না।" প্রভু যখন শ্রীমুখে এইপ্রকার সাহস প্রদান করিলেন, তখন

সকলেই অভিনয়ে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনেই অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। শচীদেবী নিজবধূর সহিত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। অপরাপর আপ্ত ভক্তগণের পরিবার সকলও ঐ স্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ যথাসময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই হরিদাস কোতোয়াল-বেশে দণ্ডহস্তে সভাস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥"

সভ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হরিদাস বলিলেন, "আমি বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল, প্রভু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন, আজ তিনি লক্ষ্মী সাজিয়া প্রেমভক্তি লুটাইবেন, আপনারা সাবধান হউন।"

তদনন্তর শ্রীবাসপণ্ডিত নারদবেশে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "তুমি আবার কে?"

শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন, "আমি দেবর্ষি নারদ, শ্রীকৃষ্ণের গায়ক, অনন্তব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে গোলোকে যাইয়া ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া এই স্থানে আসিয়াছি, শুনিয়াছি, আজি প্রভু এই স্থানেই লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন।"

শ্রীবাসপণ্ডিত নারদভাবে এমনই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শ্রীবাস বলিয়া চেনা যায় না। তাঁহার রূপ, বাক্য ও চরিত্র ঠিক নারদের মত হইয়া গিয়াছিল। শচীদেবী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, শ্রীবাসপণ্ডিত নারদ সাজিবেন। ঐ কথা স্মরণ করিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনি, এই না পণ্ডিত?" মালিনী বলিলেন, "হাঁ, ইনিই বটেন।" শচীদেবী অতীব বিস্ময়ের সহিত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মালিনী অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। শচীদেবী সংজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রুক্মিণীবেশে আসিয়া সভামধ্যে দর্শন দিলেন। তিনি আসিয়া কিয়ৎকাল ব্যাপিয়া রুক্মিণীর বিবাহের অভিনয় করিলেন। এইরূপে প্রথম প্রহর অতীত হইল। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর গোপীবেশে সুপ্রভাত নাম্নী নিজসখীর সহিত সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ী সাজে সাজিয়া দর্শন দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের হস্তধারণ

পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের বেশে আগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার ভাবে তাঁহার সহিত দানলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দানলীলার অভিনয় দর্শন করিয়া ভক্তগণ এমনই আবিষ্ট হইয়া গেলেন যে, কাহারও আত্মজ্ঞান রহিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে শ্রীভগবানের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিজগৎ মোহিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারই শ্রীরাধিকামূর্ত্তি দেখিয়াও ভক্তগণের মধ্যে কেহই মোহিত ও বিচলিত হইলেন না। সকলই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে অংশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে ঠিক তদ্রূপেই অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উক্ত ভাবাবেশ শীঘ্র অপগতও হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবান্তর স্বীকার না করা পর্য্যন্ত কাহারও ঐ ভাবের অপগম হইতে দেখা যায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবান্তর গ্রহণ করিলেই, ভক্তগণও নিজ নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। বিশেষতঃ এই দানলীলার অভিনয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ যে একটি অপূর্ব্ব তেজ আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমান্বয়ে সাত দিন পর্য্যন্ত আচার্য্যরত্নের ভবন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সাতদিনের পর তবে ঐ তেজ অল্পে অল্পে অপসৃত হইয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের সময়ও ঐপ্রকার একটি অদ্ভুত তেজ ভক্তবৃন্দের নেত্রগোচর হইয়াছিল, কিন্তু উহা একদিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

অদ্বৈতাচার্য্যের অভিমান।

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে নদীয়ানগরের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐ কার্য্যে সকলেই সুখী, সকলেই সন্তুষ্ট, কেবল অদ্বৈতাচার্য্যই সুখ পান না। যতদূর ব্যক্ত আছে, তদ্দ্বারা, শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহার প্রতি গৌরব দেখাইতেন, তাহাই তাঁহার তাদৃশ ক্ষোভের কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়। যাহা হউক, উক্ত ক্ষোভ অপনয়নের নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্য্য মনে মনে স্থির করিলেন যে, এবার হইতে ভক্তিবিরোধীর ভান করিবেন, ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকিবেন। তিনি ভাবিলেন, এইরূপ আচরণে প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন,এবং ঐ দণ্ডই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির উপায় হইবে, অর্থাৎ প্রভু তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করিলেই তিনি নিজের অপরাধ ক্ষমাপণব্যাজে প্রভুর চরণে ধরিয়া নিজের লঘুতাসম্পাদনের সুযোগ পাইবেন।

অদ্বৈতাচার্য্য এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক হরিদাস ঠাকুরের সহিত শান্তিপুরে নিজভবনে গমন করিলেন। তিনি শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট থাকিয়াই যোগবাশিষ্ঠোক্ত জ্ঞান-মার্গের প্রচারে ব্রতী হইলেন। আচার্য্যপ্রভুর ঈদৃশ ছলব্যাখ্যান শ্রবণগোচর করিয়া হরিদাস ঠাকুর মনে-মনে হাসিতে লাগিলেন। আচার্য্যপ্রভুর এই জ্ঞানমার্গের প্রচারে হরিদাস ঠাকুরের যদিও কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্যের অনেক হতভাগ্য শিষ্য তাঁহার এই ব্যাখ্যানকেই প্রকৃত সাধু ব্যাখ্যান বিবেচনা করিয়া স্থানে স্থানে ইহাই প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ প্রচারের বিষময় ফল অদ্যাপি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচুর পরিমাণেই দৃষ্ট হইতেছে।

অদ্বৈতাচার্য্য জ্ঞানমার্গ প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী প্রভুর উহা অবিদিত রহিল না। লোকহিতাবতার শ্রীগৌরসুন্দর একদিন নগরভ্রমণ করিতে করিতে সমভিব্যাহারী শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, চল, আমরা দুইজনে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে গমন করি।" এই কথা বলিতে বলিতেই উভয়ে অবিলম্বে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহাঁরা পথিমধ্যে গঙ্গাতীর-বর্ত্তী ললিতপুরগ্রামে এক সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী প্রভুর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সন্তোষের সহিত যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রভুকে বলিলেন, "তোমার ধন, বংশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি হউক।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমার এইরূপ আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক, ইহাই বলুন।" সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি দুগ্ধপোষ্য বালক, তোমার এখনও জ্ঞান হয় নাই, তাই এইরূপ বলিতেছ, কি খাইয়া ভক্তি করিবে বল দেখি?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "গোসাঞি, বালকের সহিত আপনার বিচার শোভা পায় না, এই বালক আপনার মহিমা কি বুঝিবে, ক্ষমা করুন।" নিত্যানন্দের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, তোমরা আজ আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর।" পতিতপাবনাবতার প্রভুদ্বয় তাহাই স্বীকার করিলেন। ঐ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী নহে, বামাচারী তান্ত্রিক গৃহস্থ, বেশতঃ ও নামতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত। প্রভু তাহা বিদিত থাকিয়াও, কেবল কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, ঐ মদ্যপায়ী তান্ত্রিকের গৃহে আতিথ্য অঙ্গীকার করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত দুগ্ধ ও ফলাদি ভোজন করিতে দিলেন। ভোজন প্রায়

শেষ হয়, এমন সময় সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব?" সন্ন্যাসীর পত্নী অতীব ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বামীর কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং পাছে অতিথির ভোজনের বিঘ্ন হয় ভাবিয়া তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ভাবগতি দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অনুচ্চস্বরে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসী কি বলিতেছে, ব্যাপার কি, আনন্দ কি?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "বোধ হয় মদিরা।" শুনিবামাত্র প্রভু "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া আচমন করিলেন। আচমনের পর দুই প্রভু দ্রুতবেগে গঙ্গায় পড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে যাইয়া শান্তিপুরে উপনীত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুর পাইয়া নিত্যানন্দের সহিত তীরে উঠিলেন এবং আর্দ্র-বসনেই অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্য্যের ভবনে উপনীত হইবামাত্র আচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ ও হরিদাস ঠাকুর প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। আচার্য্য মনে মনে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগকে আর্দ্রবসন ত্যাগ করাইয়া আসন প্রদান করিলেন। পরে তিনি প্রভুর নিকট দণ্ডিত হইবার অভিলাষে ছলক্রমে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, জ্ঞানের প্রাধান্য প্রচারের নিমিত্ত তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া, তন্নিমিত্ত রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক, তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্যপত্নী সীতাদেবী প্রভৃত অনুনয় সহকারে প্রভুর সান্ত্বনা করিলেন। আচার্য্য, 'দণ্ডলাভে কৃতার্থ হইলাম' বলিতে বলিতে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস আচার্য্যের অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ সন্দর্শনে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যতনয় অচ্যুতানন্দ ও আচার্য্যপত্নী সীতাদেবীও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতভবন অকস্মাৎ কৃষ্ণপ্রেমময় হইয়া উঠিল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ লজ্জিতের ন্যায় ভাব ধারণ পূর্ব্বক আচার্য্যকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ভৃত্য শত অপরাধে অপরাধী এবং অতি নিকৃষ্ট হইলেও, প্রভু তাহার প্রতি প্রসাদ বিতরণে বিমুখ হয়েন না, আচার্য্য, আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" প্রভুর কথা শ্রবণে আচার্য্য নিজাভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া সানন্দে প্রভুর চরণযুগল ধারণ করিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত স্নানাহার সমাপন করিলেন। ভোজনানন্তর নিত্যানন্দ

আচার্য্যকে রাগাইবার নিমিত্ত সমস্ত গৃহে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। আচার্য্য কল্পিতরোষ ভরে বক্ষ্যমাণপ্রকারে নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মন্থপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥
কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥"

চারিদিক হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রভুর দর্শনাভিলাষে অদ্বৈতভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যভবন আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে কয়েক দিবস আচার্য্যগৃহে অবস্থিতির পর প্রভু পুনর্ব্বার নদীয়ায় শুভাগমন করিলেন।

এই যাত্রাতেই একদিন প্রভু নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া হঠাৎ কাল্নায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটী যাইয়া উপস্থিত হয়েন। গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করেন নাই। প্রভু তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ দ্বারা তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া পুনশ্চ শান্তিপুরে আগমন করিলেন। আগমনকালে গৌরীদাস পণ্ডিতও প্রভুর সহিত শান্তিপুরে আগমন করিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, প্রভু ইহাঁকে নদীয়ায় লইয়া গিয়া একখানি হস্তলিখিত গীতা প্রদান পূর্ব্বক নিজের দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

মুরারিগুপ্ত।

মুরারিগুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের একজন সহাধ্যায়ী। অধ্যয়নকালে প্রভু মুরারির সহিত অনেক বাদবিতণ্ডা করিতেন। মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গেও তাঁহার অনন্যমমতা ছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলা স্বচক্ষে

দেখিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়া প্রভু তাঁহাকে রামদাস বলিয়া ডাকিতেন। মুরারি একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়া অগ্রে প্রভুকে পরে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মুরারি, তুমি অগ্রে শ্রীপাদকে প্রণাম না করিয়া আমাকে প্রণাম করিলে কেন?" মুরারি বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমার হৃদয়ে বসিয়া যেমন করাইলেন, আমি তেমনি করিলাম।" প্রভু বলিলেন, "ভাল, আজ তুমি গৃহে যাও, কল্য দেখা যাইবে।" মুরারি গৃহে গেলেন। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, "স্বয়ং বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন এবং প্রভু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। তদবস্থাতেই প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মুরারি, নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ, আমি উহাঁর কনিষ্ঠ।" এই কথার পর মুরারির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে যাইয়া অগ্রে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিয়া পরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু দেখিয়া বলিলেন, "মুরারি, আজ কেন অগ্রে আমাকে প্রণাম না করিয়া শ্রীপাদকে প্রণাম করিলে?" মুরারি বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে আজ যেরূপ বুদ্ধি দিলেন, আমি সেইরূপই করিলাম।" প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মুরারিকে চর্চ্চিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। ঐ তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া মুরারি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মুরারি আগমন করিলে, তাঁহার পত্নী অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি "খাও খাও খাও কৃষ্ণ" বলিয়া ঘৃতযুক্ত অন্ন মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুরারির পত্নী স্বামীর তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত হইয়া পুনঃ পুনঃ অন্ন আনিয়া দিতে লাগিলেন, মুরারিও ঐ অন্ন পূর্ব্ববৎ ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে মুরারি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছেন। অকস্মাৎ প্রভু আসিয়া সম্মুখে দর্শন দিলেন। মুরারি প্রভুকে দেখিয়াই উঠিয়া বন্দনা করিলেন। পরে আসন প্রদান করিয়া প্রভুকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "অজীর্ণের চিকিৎসার নিমিত্ত তোমার নিকটে আসিলাম।" মুরারি শুনিয়া বলিলেন, "কাল প্রভুর কি ভোজন হইয়াছিল?" প্রভু বলিলেন, "তুমি যে ঘৃতমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিয়াছিলে, তাহাই ভোজন করিয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়াই প্রভু

মুরারির জলপাত্র লইয়া জলপান করিতে লাগিলেন। পান শেষ হইলে, বলিলেন, "তোমার অন্ন ভোজনে উৎপন্ন অজীর্ণ তোমার জল পান ব্যতিরেকে আরোগ্য হইবে না বলিয়াই তোমার জল পান করিলাম।" মুরারি প্রভুর অসাধারণ করুণা অবলোকন করিয়া প্রেমভরে রোদন করিতে লাগিলেন।

আর একদিন প্রভু শ্রীবাসভবনে মুরারিকে পাইয়া হুঙ্কারধ্বনি সহকারে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক 'গরুড় গরুড়' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি বলিলেন, "প্রভো, তুমি আমার স্কন্ধে এই প্রথম আরোহণ কর নাই। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন করিয়াছিলে, বাণরাজার সহিত ও রাবণরাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে।" এই কথা বলিয়া মুরারি প্রভুকে স্কন্ধে লইয়াই ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ দেখিলেন, প্রভু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে মুরারির স্কন্ধে বিরাজ করিতেছেন।

মুরারির হঠাৎ একদিন একটি কুমতির উদয় হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজলীলা সমাপন করিলে, তিনি কিরূপে একাকী এই সংসারে থাকিয়া প্রভুর বিরহ সহ্য করিবেন এই ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবশেষে আত্মহত্যা করাই তাঁহার সুস্থির হইল। তন্নিমিত্ত একখানি ছুরিকাও প্রস্তুত করাইলেন। এদিকে অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া অতর্কিতভাবে মুরারির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু ইঙ্গিতে অল্পকথায় তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুসঙ্কল্প জানাইলেন। মুরারি কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেন না। তখন প্রভু তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ ছুরিকাখানি বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। মুরারি যখন বুঝিলেন, অন্তর্যামী প্রভু সমস্তই বিদিত হইয়াছেন, তখন আর কিছু না বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মুরারির পত্নী অন্তরালে থাকিয়া এই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে প্রভুকে অসংখ্য প্রণাম ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে, অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিকে উক্ত অসৎসঙ্কল্প পরিত্যাগের শপথ করাইয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবানন্দের দণ্ড।

একদা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত নগরভ্রমণ করিতে করিতে নগরের প্রান্তভাগে এক শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হলধরভাবে আবিষ্ট হইলেন। প্রভু আবেশে মুহুর্মুহু 'মদ আন মদ আন' বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অপকলঙ্কের আশঙ্কায় অনেক অনুনয় বিনয় সহকারে প্রভুকে উক্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইতেছে, প্রভু কোনরূপেই নিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন বলিলেন, "প্রভো, তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" শ্রীবাস পণ্ডিতের ব্যাকুলতায় প্রভুর আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি, পণ্ডিত মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া, নিজভাব সংবরণ করিলেন। এদিকে মদ্যপায়িগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখিলেন, বিষম বিপদ। প্রভু তখন মদ্যপায়িগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহারা প্রেমে মত্ত হইল এবং 'হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

"হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥"

মদ্যপায়িগণের এই বিসদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত আনন্দে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু পণ্ডিতকে লইয়া আপনমনে নগরভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকদূর যাইয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর মনে ক্রোধের উদয় হইল। দেবানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের অবমাননা করিয়াছে, অতএব সে বৈষ্ণবাপরাধী, এই ভাবিয়াই প্রভু রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"অয়ে অয়ে দেবানন্দ বলিয়ে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সভারে॥
যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন গেল শুনিবারে ভাগবত॥
কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য হাতাইয়া।
বাড়ীর বাহির করি এড়িলে টানিয়া॥

ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিয়া ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে॥
বুঝিলাঙ তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমরস ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাঙ আমি॥"

দেবানন্দ কোন উত্তর করিলেন না, লজ্জায় অধোবদন হইয়া চলিয়া গেলেন। প্রভুও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সারঙ্গদেব নামক জনৈক বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভু বলিলেন, "সারঙ্গদেব, তুমি শিষ্য কর না কেন?" সারঙ্গদেব বলিলেন, "উপযুক্ত শিষ্য পাই না বলিয়াই শিষ্য করা হয় না।" পুনশ্চ প্রভু বলিলেন, "যে উপযুক্ত না হইবে, সে তোমার শিষ্য হইবে কেন? তুমি যাহাকে শিষ্য করিবে, সে তোমার শিষ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়াই জানিবে।" সারঙ্গদেব হাসিয়া বলিলেন, "প্রভো, কল্য প্রত্যূষে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিব।" এই কথা বলিয়া সারঙ্গদেব প্রভুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভুও শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন।

লিখিত আছে, সারঙ্গদেব প্রভুর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন অতিপ্রত্যূষে গঙ্গাতীরে যাইয়া এক মৃত বালককে দেখিয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক ঐ মৃত বালকেরই কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্রের সহিত বালক জীবন পাইল। অবশেষে জানা গেল, ঐ বালকটি যজ্ঞোপবীতের দিবস সর্পদংশনে মরিয়া যাওয়ায়, তৎকালের রীতি অনুসারে, তাহার আত্মীয়দিগের কর্ত্তৃক গঙ্গাজলে ত্যক্ত হয়। বালক জীবন লাভ করিলে, তাহার পিতামাতা আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, বালক কিন্তু তাহাতে সম্মত হয় না। বালকের নাম মুরারি। মুরারি গুরুসেবায় নিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যেই পরবর্ত্তী জীবন অতিবাহিত করে।

শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ।

একদা শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশকালে কথাপ্রসঙ্গে শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধের কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "যিনি আপনাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারও বৈষ্ণবাপরাধ! আমরা একথা মুখেই আনিতে পারি না। যদিও তাঁহার কোন অপরাধ থাকে, তাহা আপনিই খণ্ডন করিবেন।" প্রভু বলিলেন, "আমি কাহারও বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডাইতে পারি না, কিন্তু যেরূপে উক্ত অপরাধের খণ্ডন হয়, তাহা উপদেশ করিতে পারি। অদ্বৈতাচার্য্যের শিক্ষায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন,-এই ধারণায় তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। তিনি যদি অদ্বৈতাচার্য্যের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উক্ত অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে।" এই কথা শচীদেবীর শ্রবণগোচর হইল। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের চরণধূলি লইতে ইচ্ছা করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন, যাঁহার গর্ব্ভে আমার প্রভুর অবতার, তিনি আমার জননী, আমি তাঁহার সন্তান। আমি শচীমাতার চরণধূলির পাত্র, তিনি আমার চরণধূলির পাত্র হইতে পারেন না।" এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলেন। এই সুযোগে শচীদেবী যাইয়া তাঁহার চরণধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। ধারণমাত্র তিনিও অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ 'জয় জয়' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—

"এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥"

এই ঘটনায় প্রভু বিশেষ একটি লোকশিক্ষা প্রচার করিলেন, জননীকে লক্ষ্য করিয়া সকলকেই কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন।

চাঁদকাজীর দমন।

এই সময়ে পাষণ্ডকুলের প্ররোচনায় নদীয়ার শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী কর্ত্তৃক দুই এক স্থানে মৃদঙ্গাদি ভঙ্গের সহিত সঙ্কীর্ত্তন নিবারণের আদেশ প্রচারিত

হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ আদেশ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজ রাত্রিকালে নদীয়ার পথে পথে নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। তদনুসারে নদীয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে বৈষ্ণবগণ আসিয়া একত্র সমবেত হইলেন। ঘরে ঘরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। চারি-দিকে মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনির সহিত "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" ইত্যাদি কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের ঘোর রোল উত্থিত হইলে, যবন সকল কুপিত হইয়া কাজীকে তৎসংবাদ প্রদান করিল। কাজী কিন্তু বারংবার শুনিয়াও কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং অভিযোগকারী যবন সকল বাধ্য হইয়া মনের ক্ষোভ মনেই রাখিয়া অন্যত্র গমন করিল, সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের প্রতি অত্যাচারের অভিলাষ সফল করিতে পারিল না। এদিকে অন্ধকার হইতে না হইতেই মশাল জ্বালিয়া সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণ দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতাচার্য্য তৎপশ্চাৎ হরিদাস, তৎপশ্চাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতাদি প্রভুর ভক্তগণ এবং তৎপশ্চাৎ নিত্যানন্দের সহিত স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গও বাহির হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রতাপে ত্রিলোক বিকম্পিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা নাই, সকলেই সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইলেন। প্রতি গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষ সকল স্থাপিত হইল। নদীয়া নগর আলোকময় হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব সকল উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিলেন। পাষণ্ড সকল, আজ কাজীর নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের গর্ব্ব খর্ব্ব ও সঙ্কীর্ত্তনব্যাপার একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে ভাবিয়া, মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রতিমুহূর্ত্তেই সসৈন্যে কাজীর আগমন চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ মনেই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না। কাজীর বা তাঁহার অনুচরবর্গের কেশাগ্রও দৃষ্ট হইল না। সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্বিঘ্নে কাজীর ভবনের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কাজী ইতিপূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের ও তদীয় সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বিশেষরূপেই বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই সঙ্কীর্ত্তন রোধ করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। জানিয়া শুনিয়া কে জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয়? কাজী যবন হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গকে হিন্দুর দেবতা বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। অতএব সঙ্কীর্ত্তন নিবারণের চেষ্টা দূরে থাকুক,

তিনি ইতিপূর্ব্বে যে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তন নিবারণের আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্মরণ করিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতেছিলেন। তিনি, এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পাছে তাঁহার কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া যান, এই ভয়ে বাটী হইতে বাহির না হইয়া গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনুচরবর্গ সঙ্কীর্ত্তনের সংবাদ প্রদান করিলেও, তিনি উহাতে বাধা দিবার আদেশ না করিয়া, সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের প্রতি কোনরূপ অনাচার অত্যাচার না হয় এইরূপই আদেশ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিরাট সঙ্কীর্ত্তনব্যাপার শ্রবণ করিতেছিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া কাজীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধত লোক সকল নিষেধ না মানিয়াই কাজীর উদ্যানের বৃক্ষলতাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শিষ্ট লোক সকল বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উক্ত গর্হিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ লোক দ্বারা সমাচার প্রদান করিয়া কাজীকে আনাইলেন। কাজী বাহিরে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিলেন। অনন্তর মনে মনে নিজকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিকূলতাচরণের পরিবর্ত্তে সুপ্রচারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর তাদৃশ সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম, তুমি আমাকে অভ্যর্থনা না করিয়া লুকাইলে কেন?" কাজী বলিলেন, "তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ জানিয়া তোমাকে শান্ত করিবার জন্যই দেখা করি নাই।" তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা গোদুগ্ধ খাইয়া থাক। যাহার দুগ্ধ পান করা হয়, সে জননী। বৃষ ক্ষেত্রকর্ষণাদি দ্বারা অন্ন উৎপাদন করে। অন্নদাতা পিতার তুল্য। পিতা ও মাতাকে তোমরা মারিয়া ভক্ষণ করিয়া থাক। ইহাতে কি তোমাদের অধর্ম্ম হয় না?" কাজী বলিলেন, "তোমরা যেমন বেদশাস্ত্রের আজ্ঞায় গোবধ কর, আমরাও তদ্রূপ কোরাণশাস্ত্রের আজ্ঞায় গোবধ করিয়া থাকি। শাস্ত্রাজ্ঞায় কার্য্য করিলে কি পাপ হয়? প্রভু বলিলেন, "হিন্দুরা যে শাস্ত্রের আজ্ঞায় গোবধ করে, তাহাতে গরুর অপকার না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। মুনিগণ বৃদ্ধ গরুকে বধ করিয়া পুনশ্চ যখন তাহার জীবন দান করেন, তখন ঐ গরু জীর্ণ শরীরের পরিবর্ত্তে নবীন শরীর লাভ করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ গোবধ গোবধ নহে, পরন্তু গরুর উপকার

হয়। কলিকালের ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ গোমেধ যজ্ঞের সামর্থ্য না থাকায়, কলিতে গোমেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে।" কাজী শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন। বিচারের চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। তিনি নিজের পরাভব স্বীকারপূর্ব্বক বলিলেন,—

"তুমি কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥"

প্রভু হাসিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্য গীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি॥"

কাজী বলিলেন,—"তোমাকে সকলে গৌরহরি বলিয়া থাকে, আমিও তাহাই বলিব। দেখ গৌরহরি, আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে, তুমি একটু নির্জ্জনে আসিলে, আমি তোমাকে সকল কথাই বলিতে পারি।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমার সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন, সকলেই আমার অন্তরঙ্গ লোক, অতএব তুমি অসঙ্কোচে সকল কথাই বলিতে পার।" তখন কাজী বলিতে লাগিলেন,—"আমি যেদিন হিন্দুর ঘরে গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিবারণ করিলাম, ঐ রাত্রিতেই নিদ্রাবস্থায় দেখিলাম, এক ভয়ঙ্কর সিংহ আমার বুকের উপর চড়িয়া বলিল, তুই যেমন মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া আমার কীর্ত্তন নিষেধ করিয়াছিস্, আমি তেমনি এই নখ দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তোর জীবন সংহার করিব। দেখিয়া শুনিয়া আমি ভয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলাম। আমাকে ভীত জানিয়া ঐ সিংহ বলিল, আমি তোকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আসিয়াছি, তুই সেদিন অধিক উৎপাত না করাতেই আজ তোর জীবন লইলাম না। এরূপ কর্ম্ম আর কখন করিলে, আমি তোকে সবংশে সংহার করিব। এই কথা বলিয়া সিংহ চলিয়া গেল। সিংহ চলিয়া গেলেও আমার ভয় গেল না, বুক্ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবেই গেল। শেষে আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখন এরূপ কর্ম্ম করিব না। আমি একথা এপর্য্যন্ত আর কাহাকেও বলি নাই, এই প্রথম তোমাকে বলিলাম। আর একদিন আমার এক অনুচর কীর্ত্তন মানা করিতে

গিয়া মুখ পোড়াইয়া আসিয়াছে। সে একস্থানে কীর্ত্তন মানা করিতে গিয়াছিল, অকস্মাৎ কোথা হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা আসিয়া তাহার দাড়ি পোড়াইয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে বলিলাম, আর কখন কীর্ত্তন মানা করিতে যাইও না। এইরূপ অপরাপর লোক সকলকেও কীর্ত্তন মানা করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। আরও অদ্ভুত, যে যবন তোমার কীর্ত্তন লইয়া হিন্দুকে পরিহাস করে, তাহারই মুখে নিরন্তর 'হরি কৃষ্ণ রাম' নাম হইতে থাকে। সে শত চেষ্টা করিয়াও ঐ নামকে তাড়াইতে পারে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এই অলৌকিক কীর্ত্তন নিবারণ করা আমার সাধ্যাতীত। তথাপি সময়ে সময়ে হিন্দুরা আসিয়া আমার নিকট তোমার ও তোমার কীর্ত্তনের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ উপস্থিত করে, আমি কোনমতে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বিদায় করি, কীর্ত্তন নিবারণের কথা মনেও স্থান দান করি না। আমার মনে হয়, হিন্দুর ঈশ্বর যিনি নারায়ণ, তিনিই তুমি।"

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার মুখে নারায়ণাদি নাম শুনিয়া আমি অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি ঐ সকল নামের প্রভাবে পাপক্ষয়ে পবিত্র হইলে।" প্রভুর কথা শুনিয়া কাজীর চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কাজী কৃতার্থ হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমার প্রসাদে আমার কুমতি দূর হইল, এক্ষণে কৃপা কর, তোমাতে দৃঢ় ভক্তি প্রদান কর।" প্রভু কাজীকে প্রার্থিত ভক্তি প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা এই, নদীয়ায় কীর্ত্তনের বাধা না হয় এইরূপ আদেশ প্রদান কর।"

"কাজী কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

কাজীর কথা শুনিয়া প্রভু 'হরি হরি' বলিয়া উঠিলেন। প্রভুকে উঠিতে দেখিয়া ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুনর্ব্বার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখ হইলেন। কাজী প্রভুর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া শ্রীধরের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীধরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তাহার ভগ্ন জলপাত্র লইয়া জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দেখিয়া 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। প্রভু ভক্তগণকে প্রেমমহিমা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীধরের ভগ্নপাত্রে জলপান করিয়া নিজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীবাসপুত্রের মরণ।

কাজীর দমনের কয়েকদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন সগণে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তনরসে নিমগ্ন আছেন। ভক্তগণ সকলেই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। দৈবযোগে ঐ দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের একটি পুত্রের মরণ হইল। নারীগণ পুত্রের শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত অলক্ষিতভাবে অন্তঃপুরে যাইয়া বিবিধ প্রবোধ বাক্য দ্বারা নারীগণের সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু উহা বিদিত থাকিয়াও একজন ভক্তকে শ্রীবাসের বাটীতে অকস্মাৎ রোদনধ্বনির কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিয়া প্রভুকে নিবেদন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই উক্ত দুর্ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের শোকসহিষ্ণুতার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া সেই রাত্রির জন্য কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"মৃত শিশু প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে॥
শিশু বোলে প্রভু যেন নির্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
মৃত পুত্র উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
শিশু বোলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস॥
নির্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্বন্ধিত পুরী॥
কে বা কার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন'॥
যত দিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে।
আছিলাঙ এবে চলিলাঙ অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥"

মৃত শিশুর কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। শ্রীবাসপরিবারের পুত্রশোক দূরীভূত হইল। অনন্তর প্রভু সগণে শ্রীবাসের মৃত বালককে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীরে যাইয়া মৃত বালকের যথোচিত সৎকার করিয়া স্নানানন্তর 'কৃষ্ণ' বলিয়া আপনাপন গৃহে গমন করিলেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অন্নভোজন।

অতঃপর প্রভু প্রেমরসে বিভোর হইয়া পড়িলেন। সংসারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রহিল না। স্নান করিয়া নারায়ণের পূজা পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, কাঁদিয়া আকুল হয়েন। সদাই নেত্রনীরে বসন আর্দ্র হইয়া যায়। পূজা করিতে বসিয়া দুই তিন বার বসন ত্যাগ করিতে হয়। এই অবস্থায় প্রভু একদিন স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "ব্রহ্মচারিন্, অদ্য আমি তোমার গৃহে ভোজন করিব, তুমি অন্ন পাক কর, আমি নারায়ণের পূজা করিয়া সত্বর আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া প্রভু গৃহে গমন করিলেন। গৃহে আসিয়া পূজায় বসিলেন। পূজা করিতে পারিলেন না, নয়নের জলে কাপড় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শেষে গদাধর দ্বারা নারায়ণের পূজা সমাধা করিয়া শুক্লাম্বরের গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভুর অন্নপ্রার্থনায় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি প্রভুর সেবায় নিজের অযোগ্যতা বোধে কর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া শুক্লাম্বরেকে প্রভুর নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জন পাক করিতে বলিলেন। শুক্লাম্বর ভক্তিভাবে পাকার্থ অন্ন উঠাইয়া দিলেন। প্রভু আসিয়া দেখিলেন অন্ন প্রস্তুত। শুক্লাম্বর উহা নামাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া, প্রভু স্বয়ং নামাইয়া লইলেন এবং অতীব আগ্রহ প্রকাশ সহকারে নিত্যানন্দাদি কতিপয় আপ্ত ভক্তের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, প্রভু আচমন করিয়া শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ স্থানে বিজয় নামক প্রভুর এক ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে ভক্তগণের একটু নিদ্রার আবেশ হইল। এই সময়ে ভাগ্যবান্ বিজয় অকস্মাৎ প্রভুর প্রকাশ

দর্শন করিয়া বিস্ময়ে নিদ্রাবিষ্ট ভক্তগণকে জানাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া বিজয়ের মুখে হস্তাবরণ দিলেন। বিজয় হুঙ্কার সহকারে উঠিয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন। বিজয়ের হুঙ্কারে ভক্তগণ জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা জাগিয়া বিজয়ের নৃত্য দেখিয়া প্রভুর কৃপা বোধে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের সূচনা।

এই ঘটনার পর হইতেই প্রভুর বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার তিরোহিত হইয়া গেল। প্রভুর যখন ঈদৃশী অবস্থা, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, প্রভু ভক্তমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, বাহ্যদৃষ্টি মাত্র নাই, মুখে কেবল 'গোপী গোপী' শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। আগমবাগীশ কিয়ৎকাল অবাক্ হইয়া প্রভুর ভাবগতি দেখিতে লাগিলেন। পরে নানাবিধ শাস্ত্রযুক্তি সহকারে প্রভুকে গোপীনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনাম জপ করিবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু হঠাৎ কৃষ্ণনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তখন গোপীভাবে ভাবিতান্তর। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কৃষ্ণনাম শুনিয়া ভাবিলেন, কৃষ্ণের দূত কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আগমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি আগমবাগীশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর কৃষ্ণনাম লইব না; তিনি অতিশয় নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন।" অভিমানী আগমবাগীশ বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "এমন কথা মুখে আনিতে নাই; ওরূপ কথা যে বলে ও যে শুনে তদুভয়েরই অধঃপতন হইয়া থাকে।" প্রভু বলিলেন, "আমি আর তোমার কথায় ভুলিব না, তুমি যাও।" আগমবাগীশ প্রভুর ভাবগতি কিছুই বুঝিলেন না, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, "তুমি এখনও গেলে না, এখনই আমার কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাও।" এই কথা বলিয়া প্রভু একগাছি যষ্টি লইয়া আগমবাগীশকে তাড়া করিলেন। আগমবাগীশ প্রভুকে যষ্টি লইয়া তাড়া করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেক দূর যাইয়া আপনার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া কিছু স্থির হইলেন। এতক্ষণ, পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে পারেন নাই, এখন চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে কেহই নাই। পশ্চাতে কেহই নাই

দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে ভীত ও ক্লান্ত দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিলেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্বেষী ছিলেন। এক্ষণে আগমবাগীশের অপমানরূপ ছিদ্র পাইয়া তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন।

'এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাভাবে বিভোর হইয়া কিছুক্ষণ আগমবাগীশের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক বাহ্যদৃষ্টির উদয়ে হস্তের যষ্টি ফেলিয়া দিয়া ভক্তগণের সহিত বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "আমি কি চাঞ্চল্যই প্রকাশ করিলাম।" ভক্তগণ তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ আর কিছু না বলিয়াই নীরবে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। প্রভু একস্থানে উপবেশন করিলেন, ভক্তগণ একটু দূরে যাইয়া বসিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলিখণ্ড করিলাম, কিন্তু কফের নিবৃত্তি না হইয়া আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।" ভক্তগণ প্রভুর প্রহেলিকাবাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তাতুর হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি উহা বুঝিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন।

ক্ষণকাল পরেই প্রভু নিত্যানন্দের হস্তধারণ পূর্ব্বক একটি নিভৃতপ্রদেশে গমন করিলেন। অনন্তর বলিলেন,—

"ভাল সে আইলাঙ আমি জগৎ তারিতে।
তারণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটিপাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥
ভাল লোক রাখিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সর্ব্বজীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥

তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ। দেখোঁ কে মোহরে মারে॥
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাসকরণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমিত জানহ অবতারের কারণ॥”

নিত্যানন্দ প্রভু প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া যার-পর-নাই বিষণ্ণ হইলেন। কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে প্রভু নিশ্চয়ই সন্ন্যাস করিবেন বুঝিয়া বলিলেন,—“প্রভো, আপনি ইচ্ছাময়, আপনাকে কে নিষেধ করিতে বা বিধি দিতে পারে? যেরূপ করিলে জগতের উদ্ধার হয়, তাহা তুমিই জান। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে। তবে এই কথা তোমার ভক্তগণকে একবার বিদিত করাই উচিত বলিয়া মনে করি।” নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল ভক্তকেই নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। যিনি শুনিলেন, তিনিই কাতর হইলেন, কেহই কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তবে প্রায় সকলেই শচীদেবীর দুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া প্রভুকে অন্ততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিষেধ কিন্তু ফলবান্ হইল না। প্রভুর মতের পরিবর্ত্তন হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণই সুস্থির হইল।

শচীমাতার প্রবোধ।

শচীদেবী লোকমুখে পুত্রের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া অধীর হইলেন। পরে পুত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, শুনিতেছি, তুমি না কি সন্ন্যাসী হইবে? তুমি আমার একমাত্র পুত্র, অন্ধের চক্ষু। তোমাকে না দেখিলে, আমি ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখি। তুমি আমার নয়নের তারা, কুলের প্রদীপ। তুমি আমাকে অনাথিনী করিয়া ছাড়িয়া যাইও না। তোমাকে না দেখিলে, আমি সংসার অরণ্যময় দেখিয়া থাকি। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিপ্রকারে জীবন ধারণ করিব? তোমার অদর্শনে এই বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ও তোমার নিজজন সকলের দশা কি হইবে ভাবিয়া দেখ। তোমার এই তরুণবয়স কি সন্ন্যাসের উপযুক্ত? তুমি সন্ন্যাস করিও না, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম কর।" এই কথা বলিতে বলিতে শচীদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "মাতঃ, আমার কথা শুন, মনকে প্রবোধ দাও, কাতর হইও না। অভিমান ত্যাগ কর। এ সংসারে কে কার পুত্র, কে কার পিতা বা মাতা? শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ব্যতিরেকে কাহারও গতি নাই জানিবে। শ্রীকৃষ্ণই জীবের মাতা পিতা ও পুত্র। তিনিই জীবের ভাই বন্ধু ও প্রিয়জন। তিনি ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা, সকলই অসার; তিনিই একমাত্র সার বস্তু। লোক সকল বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া ইহকাল পরকাল দুইকালই নষ্ট করিতেছে। জননি, পুত্রজ্ঞান ত্যাগ কর, শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন কর। এই দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, তার জন্মই বিফল হয়।" পুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে শচীদেবীর দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি পুত্রের মুখপানে চাহিয়া সংসার ভুলিলেন। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনে নবীনশ্যামসুন্দর গোপগোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সর্ব্বশরীর পুলকিত হইল। প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর পুত্রকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "বাপ, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এই কথা বলিয়া শচীদেবী পুনশ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ, রোদন সংবরণ কর। আমি তোমারই। আমি যেখানেই থাকি, তোমারই থাকিব। তুমি যখনই আমাকে দেখিতে অভিলাষ করিবে, তখনই আমার দেখা পাইবে।"

"যে দিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে।
সেই ক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে ॥"

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রবোধ।

ক্রমে ক্রমে প্রভুর সন্ন্যাসের সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরও কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া দেবীর মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। প্রভু ভোজন পান করিয়া গৃহে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীকে শয়ন করাইয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। আসিয়া পতির চরণতলে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নের নীর প্রভুর চরণ বহিয়া শয্যায় পতিত হইতে লাগিল। অন্তর্যামী প্রভু প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিয়া উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া দেবীর চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" দেবী কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবী কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রাণনাথ, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া বল, কোথায় যাইবে? শুনিলাম, তুমি সংসার ত্যাগ করিবে। বৃদ্ধা জননীকে অনাথিনী করিয়া যাইবে, ইহা কি তোমার উচিত কর্ম্ম হইতেছে? আমাকে লইয়াই ত তোমার সংসার, আমাকে ছাড়িয়া গৃহে থাকিয়াই জননীর সেবা কর। জননীর সেবা করিলেই ত তোমার ধর্ম্ম হইতে পারে। আমি না হয় পিতার গৃহেই থাকিব। আমার জন্য তুমি মাতাকে ত্যাগ করিবে কেন? আমি তোমাকে পাইয়া মনে করিয়াছিলাম, আমার সদৃশী ভাগ্যবতী আর নাই। কিন্তু তুমি আমার কর্ম্মদোষে সংসার ত্যাগ করিতেছ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে, তা কর, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, কিন্তু তোমার জননীকে ত্যাগ করিও না। গৃহে থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না? আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণভজন কর। আমি তোমাকে দেখিতে না পাইলেও, শুনিয়াই জীবন ধারণ করিতে পারিব। অন্যথা এই জীবন ধারণ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসনাঞ্চল দ্বারা বদনকমল মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব, একথা তোমাকে কে বলিল? এখনও

আমি সন্ন্যাস করি নাই, গৃহেই আছি. তবে তুমি কেন বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ?" দেবী বলিলেন, "তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, সংসার ত্যাগ করিবে কি না?" তখন প্রভু কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"এ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সকলই মিথ্যা, সত্য এক শ্রীভগবান্। এ জগতের যে কিছু সম্বন্ধ, সে সকলই মিথ্যা, সত্য কেবল সেই শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ। শ্রীভগবান্ সকলের পতি, জীব সকল তাঁহার পত্নী।" বলিতে বলিতে প্রভু কিছু নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিবে। তোমার কর্ম্মে বাধা দিবে, এ জগতে এমন কে আছে?" তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুনশ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইলেন।

গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিন।

সংযোগের পর বিয়োগ এবং বিয়োগের পর সংযোগই নৈসর্গিক নিয়ম। সংযোগসুখ প্রতিনিয়ত ভোগ করিতে করিতে উহার তৃপ্তিদায়িনী শক্তির হ্রাস হইলেই বিয়োগ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিয়োগের পর সংযোগসুখ আবার পরিবর্দ্ধিতভাবেই আস্বাদিত হইতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে নিজ সংযোগসুখ পরিবর্দ্ধিতভাবে আস্বাদন করাইতে অভিলাষ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আগামিনী উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে আমি কাটোয়ায় যাইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিব, তুমি এই বৃত্তান্ত আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দকে জানাইবে।" নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশমত তাঁহাদিগকে ঐ বৃত্তান্ত জানাইলেন। শুনিয়া তাঁহাদিগের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রপতন বোধ হইল। অপরাপর ভক্তগণও, প্রভু কোন্ দিন কোথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন সবিশেষ না জানিলেও, সন্ন্যাস গ্রহণের সমাচার পরম্পরায় বিদিত হইলেন। তাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাসের সমাচার জানিয়া শুনিয়াও আনন্দে ভুলিয়া গেলেন, ঐ কথা কাহারও মনে রহিল না। তাঁহারা ভুলিলেও কাল ত তাহা ভুলিল না। সে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তগণ যে বিষম মুহূর্ত্তে প্রভুর বিরহে ত্রিজগৎ শূন্যময় দেখিবেন, সেই মুহূর্ত্ত ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। উত্তরায়ণসংক্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগামি কল্য উত্তরায়ণসংক্রান্তি, প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন। গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিনও প্রভু অপরাপর দিনের ন্যায় দৈনন্দিন সকল কার্য্যই সমাধা করিলেন। পূর্ব্বপূর্ব্বদিনের ন্যায় সমস্তদিন ভক্তগণের সহিত মহাসুখে অতিবাহিত করিলেন। অপরাহ্ণে কতিপয় ভক্তের সহিত নগরভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। ভক্তগণ না জানিলেও, প্রভু জানেন, আর সেই নগরে ভ্রমণ করিবেন না। মনে মনে সমস্ত পরিচিত তরু, লতা, গৃহ ও পথ প্রভৃতি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে সুরধুনীর তীরে যাইয়া তাঁহারও নিকট বিদায় লইলেন।

এইরূপে নগরভ্রমণ সমাপ্ত হইলে, সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের সকলকেই আকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, অকস্মাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া তদ্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠান্বিত হইলেন। সকলেই মাল্যচন্দনাদি উপহার সকল হস্তে লইয়া প্রভুর আলয়ে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রভু মণ্ডপগৃহে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে প্রভুর সম্মুখবর্ত্তী অঙ্গনে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 'হরি হরি' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই শত শত লোক যাইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই অনিমিষ-নয়নে প্রভুর বদনকমলের মকরন্দ পান করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার গলা হইতে মালা লইয়া একে একে সকল ভক্তকেই পরাইয়া দিলেন। পরে প্রত্যেক ভক্তকেই যথোচিত অভ্যর্থনা সহকারে নিজসমীপে উপবেশন করাইলেন। ভক্তগণ উপবেশন করিলে, প্রভু তাঁহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে সকলকেই বলিলেন, "তোমাদিগের যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে, তবে সকলেই আমার অভিপ্রায়মত কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর।" ইহাই প্রভুর ভক্তগণের নিকট বিদায়গ্রহণ হইল। এইপ্রকার বিদায়গ্রহণের পর সকলকেই নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর ভাবগতি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রভুর আদেশে আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে শ্রীধর একটি লাউ লইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু শ্রীধরকেও বিদায় দিয়া শচীমাতাকে শ্রীধরের লাউটি রন্ধন করিতে বলিলেন। রন্ধন শেষ হইলে, প্রভু ভোজন করিলেন। ভোজনের পর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে মণ্ডপগৃহে যাইয়াই শয়ন করিলেন। হরিদাস ও গদাধর সেদিন প্রভুর নিকটেই শয়ন করিয়া রহিলেন। শচীদেবী জানিতেন,

রাত্রি শেষ হইলেই প্রভু উঠিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি নিজ গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন না, বাহির বাটীতেই প্রভুর পথ অবরোধ করিয়া জাগরণে রাত্রি অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি অবসান হইলে, প্রভু উঠিলেন। হরিদাস ও গদাধর প্রভুর অনুগমনের অভিলাষ জানাইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, শচীদেবী পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি, শচীদেবীকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বিদায় দিলেন। প্রভু জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকার বলেন,—প্রভু রাত্রিতে ভোজনের পর নিজ গৃহে যাইয়াই শয়ন করিলেন। শচীদেবীও বধূকে শয়ন করিতে বলিয়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহমধ্যে আগমন করিলে, প্রভু তাঁহাকে সম্ভোগসুখের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সম্ভোগসুখ সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াই সমুজ্জ্বল বিরহের ভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার পূর্ব্বরাগের চিত্র ইতিপূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার বিপ্রলম্ভের চিত্র প্রদর্শিত হইবে। মধ্যে সম্ভোগের চিত্র প্রয়োজন। অতএব ঠাকুর লোচনদাস সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে সেই চিত্রই অঙ্কিত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃদয়ে স্বীয় বিরহের চিত্র সমুজ্জ্বলভাবে লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবেন বলিয়াই তাহার পূর্ব্ববৃত্ত অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয়া গৃহমধ্যে আগত হইলে, প্রভু তাঁহার সহিত বিবিধ রসালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রিয়তমাকে সাদরসম্ভাষণ সহকারে ক্রোড়ে লইলেন, ইচ্ছানুরূপ মাল্য-চন্দন-বসন-ভূষণাদি দ্বারা সাজাইলেন। পরে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পুরঃসর নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতির ক্রোড়ে থাকিয়াই প্রেমবৈচিত্ত্যের উদয়ে পতিবিরহে কাতর হইয়া বিরহমূর্চ্ছারূপ নিদ্রাবেশে সংজ্ঞাহীনা হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞার আবির্ভাব না হইতে হইতেই রাত্রি অবসানপ্রায় হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। তদনন্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া দ্রুতগতি গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। প্রণামের

পর ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার পরপারে উঠিয়া সেই আর্দ্র বসনেই দ্রুতপদে কাটোয়ার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু যে ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন, নদীয়াবাসিগণ মনোদুঃখে ঐ ঘাটের নাম রাখিলেন, "নিরদয়ের ঘাট"। চব্বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল, প্রভু গৃহত্যাগ করিলেন। এই পর্য্যন্ত প্রভুর আদি লীলা। ইহার পরবর্ত্তী লীলাই শেষলীলা। এই শেষ লীলা আবার মধ্য ও অন্ত্য নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। সন্ন্যাস হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল লীলা করেন, তাহার নাম মধ্যলীলা। আর অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা।

মধ্যলীলা।

বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীদেবী ও ভক্তগণ।

"অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সবে বিরহসমুদ্রে ফেলাইয়া॥
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া সে অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর এ জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥
শিরোপরে দিয়ে হাত, বুকে মারে নিরঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবা না বলিলা,
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দনরব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধায়া।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায়া মহাশোক,
কাঁদে সব মাথে হাত দিয়া॥
নাগরিয়া ভক্ত যত, তারা কাঁদে অবিরত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে, পাষণ্ডীর গণ হাসে,
নিমাইরে না দেখিমু আর॥"

রজনী প্রভাত হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুকে না দেখিয়া বুঝিলেন, তিনি সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শচীদেবীর

তাৎকালিক অবস্থা তাঁহার ঐ বুদ্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া দিল। শচীদেবী বধূর দিকে দৃষ্টি করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শাশুড়ীকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতঃস্নান করিয়া প্রভুকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, শচীদেবী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাদিগকে দেখিয়া শচীদেবীকে রাখিয়া একটু অন্তরালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ঈশানকে ডাকিলেন। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ঈশানের মুখে প্রভুর গৃহ-ত্যাগের কথা শুনিলেন। শুনিয়া ভক্তগণের সহিত অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শেষে নিত্যানন্দ প্রভু বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর এই চারিজনকে লইয়া প্রভুকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত, কাটোয়ায় যাইবেন, ইহাই স্থির হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণার্থ নবদ্বীপেই থাকিলেন।

সন্ন্যাস।

"হেদে হে শচীর প্রাণ নিমাই সন্ন্যাসী হবে,
গৃহ ত্যেজে গৌরহরি কার ভাবে বিভোর হয়ে তুমি দণ্ডগ্রহণ করিবে।
কেঁদে কেশব ভারতী বলে নিমাই রে,
একে নব অনুরাগী এ নবীন বয়স,
নিমাই কেমনে মুড়াব কেশ,
তোমার গৌর, কাঁচা সোণার বরণ।
কেমনে পরিবে তুমি অরুণ বসন,
সন্ন্যাসী না হয়ে, গৃহে করহ গমন,
এখন সময় নয় রে।
সোণার অঙ্গে কৌপীন পরে কেবল শচী মায়ে কাঁদাবে।"

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণসংক্রান্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শীতে আর্দ্র বস্ত্রে কাটোয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রদোষ সময়ে প্রভু আসিয়া সুরধুনীর তীরে বটবৃক্ষতলে কেশব-ভারতীর কুটীরদ্বারে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার ক্ষীণালোকে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতী গোসাঁইকে দেখিয়া প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

ভারতী গোসাঁই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "নারায়ণ নারায়ণ" বলিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একটি তেজোময়ী কাঞ্চনমূর্ত্তি তাঁহার চরণতলে পতিত। দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রণাম করিতেছ, কে তুমি ?" প্রভু বলিলেন, "আমি আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী। ইতিপূর্ব্বে আর একবার আপনার চরণ দর্শন পাই, তখন আপনি আমাকে সন্ন্যাসমন্ত্রদানে কৃপা করিবেন বলিয়াছিলেন, তাই আজ আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাগত, কৃতার্থ করিতে অনুমতি হয়।" ভারতীর তখন সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎস, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, তাহার পর সে কথা হইবে।"

ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়াই স্তম্ভিত হইলেন, এবং এরূপ নবীন পুরুষকে কিরূপে সন্ন্যাস করাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে বিবিধ ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতেই প্রভুকে দেখিয়া "হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।" প্রভুও মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাঁচ জন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইলেই প্রভু বলিলেন, "তোমরা আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইব।" এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, নেত্রযুগল হইতে অবিরল বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তখন ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাব ও সেই মধুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতেছেন,—আহা! বিধাতার কি সুন্দর সৃষ্টি! এরূপ সুন্দর পুরুষ ত আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই! আবার ইহার প্রেমই বা কি অদ্ভুত! আমি ইহাকে সন্ন্যাস দিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিব কি করিয়া? নবনীত অপেক্ষা কোমল এই শরীর সন্ন্যাসের কঠোর তাপ সহ্য করিবে কি প্রকারে? ইহাকে দর্শন করিয়া অবধি আমার বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক হইতেছে। আমি কি করিয়া কঠিন হইয়া ইহার জননী ও রমণীকে সঙ্গসুখে বঞ্চিত করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না। বৃদ্ধা জননী ও বালিকা পত্নীর কথা তুলিয়াই ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিব, কখনই সন্ন্যাসমন্ত্র দিব না।

সেই অপরূপ দৃশ্যে সমাকৃষ্ট হইয়া পথের লোক দাঁড়াইতে আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন এবং তাঁহার সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার

করিতে লাগিলেন। কেহই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই সময়ে ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান বিষয়ে নিজের অনভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি বলিলেন,—"সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল আছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হইলে, কাহাকেও সন্ন্যাস দেওয়া উচিত নয়। অল্প বয়সে রাগাদির প্রাবল্য থাকে বলিয়া সন্ন্যাসের ধর্ম্ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়। নিমাই পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি, তোমার নবীন বয়স, স্ত্রী বালিকা, এখনও সন্তান-সন্ততি হয় নাই, বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তোমাকে সন্ন্যাসী করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঁই, আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু গুরো, আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে এই জনম সফল করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিন। আমি আমার জননী প্রভৃতির অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপার অপেক্ষা।"

উপস্থিত লোক সকল প্রভুর এই সকল কথা শুনিতেছেন। সকলেরই মনের ভাব, নবীন যুবকের সন্ন্যাসে বাধা পড়ুক। বৃদ্ধা জননী এবং বালিকা পত্নীকে অনাথ করিয়া এই নবীন যুবক সন্ন্যাসী না হয়, ইহা ভারতীরও অভিপ্রায় বুঝিয়া, সকলেই মনে মনে ভারতী গোসাঁইকে ধন্যবাদ দিতেছেন। ইতিমধ্যে ভারতী গোসাঁই বলিলেন,—"তোমার জননী ও পত্নী তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন? সম্ভবতঃ সন্ন্যাস কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। আমি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াও যখন তোমাকে সন্ন্যাস দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি, তখন তাঁহারা যে সহজে তোমাকে সন্ন্যাসী হইতে বলিলেন, ইহা আমার মনেই স্থান পায় না। ঐ দেখ, উপস্থিত লোক সকল, যাঁহারা হয়ত তোমাকে কখনই দেখেন নাই, যাঁহারা তোমার নিতান্ত অপরিচিত, তাঁহারাও তোমার সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তবে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার ধারণা হইয়াছে যে, তুমি স্বয়ং ভগবান্, তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। তোমার মায়ায় যখন বিশ্বসংসারই মোহিত, সংসারই যখন তোমার ভ্রূভঙ্গীর অধীন, তখন তোমার জননী প্রভৃতিও তোমার আজ্ঞাধীন বা ভাবাধীন না হইবেন কেন? তুমি তাঁহাদিগকেও

ভুলাইয়াছ। যাহাই হউক, আমার ত তোমাকে সন্ন্যাস দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী করিতে পারিব না।" ভারতী গোসাঁইর এই প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সাশ্রুনয়নে ভারতী গোসাঁইর প্রতি এবং উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "আপনারা আমার পিতা ও মাতা; কারণ, আপনাদিগের আমার প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্য—তদ্রূপ স্নেহই দেখিতেছি। আপনারা এক্ষণে আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আমাকে আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের সাহায্য করুন। আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণেশ্বরের সেবায় এই জীবন অতিবাহিত করি।" এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন,

"আমার হেন দিন হবে কবে।
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে অতি হরষিতে পুলকাঙ্গ অশ্রু হবে।
কবে ব্রজের রজে হয়ে বিভূষিত, ডাকিব প্রেমে হয়ে পুলকিত,
হরিভক্তসঙ্গে হরিগুণপ্রসঙ্গে, মন মত্ত সদা রবে।
কবে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশিয়ে, মাধুকরি করি উদর পুষিয়ে,
ডাকিব হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়ে, হেন ভাগ্য কবে হবে।
স্কন্ধে নিব প্রেমানন্দে ভিক্ষার ঝুলি, বেড়াইব ব্রজবাসীর কুলি কুলি,
হয়ে কুতুহলী রাধাকৃষ্ণ বলি, ডেকে জীবন শীতল হবে॥
কতদিনে যাবে বিষয়বাসনা, কবে হবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা,
ললিতা বিশাখা সুবলাদি সখা কবে দয়া প্রকাশিবে।
কবে প্রিয়সখীর অনুগত হয়ে, রাধাকৃষ্ণ যুগলসেবা নিব চেয়ে,
আমাকে দেখিয়ে যুগলে হাসিয়ে, সেবার কার্য্যে নিয়োজিবে॥
কবে আমি যাব রাধাকুণ্ডতীরে, উদর পূরিব তার শীতল নীরে,
শ্যামকুণ্ডবারি পানে তৃষ্ণা বারি, তাপিতাঙ্গ শীতল হবে।
কবে মম মন্দভাগ্য দূরে রবে, সাধুর কৃপা হৈলে সখীর কৃপা হবে,
এ দাসের তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, সখীভাবে রাস পাবে॥"

এই পদটি গাহিতে গাহিতে আনন্দে বিভোর হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সকল ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিতাই, পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ কঠিন মাটিতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পান, এই আশঙ্কায়

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতে লাগিলেন। কাটোয়াতে নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল। চন্দ্রশেখর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ভাল বাপ, খুব নৃত্য কর! এখানে আর কে তোমার নৃত্যে বাধা দিবে? তোমার জননী আর তোমার নৃত্যে বাধা দিবেন না।"

ওদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোরতর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দুনয়নে অবিরল-ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু কম্প ও পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদয় হইতে লাগিল। উপস্থিত লোকদিগের ত কথাই নাই, সঙ্কীর্ত্তনের রোল শ্রবণ করিয়া যিনি আসিলেন, তিনিই প্রেমে মাতিয়া গেলেন, সহস্র সহস্র লোক উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মূর্চ্ছিতও হইলেন। এই ভাব দর্শন করিয়া ভারতী ভাবিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কখনই মনুষ্য নহেন। মনুষ্যে এরূপ প্রেম ও এরূপ আকর্ষণ দেখা যায় না। ইনি স্বয়ং ভগবান্, আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন। যাহাই হউক, আমি ইহাঁকে মন্ত্র দিব কি প্রকারে? যিনি ত্রিলোকের গুরু, তিনি যে শিষ্য হইয়া আমাকে প্রণাম করিবেন, এ অপরাধ রাখিবার স্থান হইবে না। ক্রমে ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে ভারতী গোসাঁই শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। শেষে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই, নৃত্য সম্বরণ কর, তুমি কে, তাহা আমি বুঝিয়াছি, এবং সেই জন্যই তুমি জননী ও স্ত্রীর নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি লইতে পারিয়াছ, তাহাও বুঝিয়াছি। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব, তোমার গতিরোধ করিব, এরূপ সামর্থ্য আমার নাই। তুমি যাহাকে যাহা করাইবে, তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু দেখ, এ অধমকে অপরাধী করিও না। আমি তোমার গুরু হইয়া অপরাধী হইতে পারিব না। তবে যদি তুমি আমার উদ্ধারের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে, তোমার অভিলষিত সন্ন্যাস দিতে পারি, অন্যথা আমাকে ক্ষমা কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীর মনের ভাব বুঝিয়া স্থির হইলেন। কিন্তু উপস্থিত লোক সকল ভারতীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পূর্ব্বে ভারতীর সন্ন্যাস দানে অনিচ্ছা জানিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্তেরা তজ্জন্য ভারতীকে শিক্ষা দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীগৌরাঙ্গ সময় বুঝিয়া মুকুন্দকে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে বলিলেন। পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভ

হইল। দর্শকগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্রমে বহুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল সকল আসিতে লাগিল। সকলেই মাতিয়া গেল। প্রেমের তরঙ্গে লোক পাগল হইয়া উঠিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে নরহরি ও গদাধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতীর কুটীরের চারিদিক লোকে লোকারণ্য। সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের বিষয় মনে করিয়া হাহাকার করিতেছেন। কেহ কেহ যে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণে নিষেধ না করিতেছেন, তাহাও নহে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের বিনয়বচনে সকলেই আপনার হার মানিতেছেন। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ গম্ভীর ভাবে মেসো চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাপ্! সন্ন্যাসের যে কিছু নিয়ম, তাহা আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তুমিই সম্পাদন কর।" চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, "আমি কেন, তোমার জননী উপস্থিত থাকিলে, তুমি তাহাকে দিয়াই এই কার্য্য করাইতে পারিতে। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ তাঁহাকে কিছুই করিতে হইল না। উপস্থিত গ্রামবাসীদিগের দ্বারাই সকল সমাহিত হইল। কাটোয়াবাসীরা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল আয়োজন করিয়া দিলেন। ক্ষৌরকার আসিয়া উপস্থিত হইল। নাপিত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতে বসিল। প্রভুর সুন্দর কেশরাজি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইবে ভাবিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কাঁদিয়া উঠিলেন। দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ও গলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোলে নাপিতের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ক্ষুর তুলিবে কি, শরীর অবশ হইয়া গেল, নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। চাকন্দগ্রামবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক দর্শক কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া নাপিতকে ক্ষৌরকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলেন। নাপিত প্রবৃত্ত হইলে কি হইবে, তাহার হাত স্থির হইল না, ক্ষুর পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। নাপিত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখন নৃত্য করে, কখন বা প্রভুর পদতলে পতিত হয়। প্রভুও যে নৃত্য না করেন, এমন নহে। ক্ষৌর হইবে, সন্ন্যাস করিবেন, ভাবিয়া নৃত্য থামে না। এই ভাবে বেলা অতিরিক্ত হইয়া পড়িল। পরিশেষে তিনি স্বয়ং শান্ত হইয়া নাপিতকেও শান্ত করিলেন। অপরাহ্নে ক্ষৌর সমাধা হইল। প্রভু স্নান করিতে গেলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর কেশগুলি লইয়া

গঙ্গাতীরে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। পরে ঐ স্থানে একটি কেশসমাধি নামে মন্দির উঠান হয়। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নাপিত অস্ত্রগুলি মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় যাইয়া অস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার অভিপ্রায়, যে হস্তে প্রভুর কেশ মুণ্ডন করিয়াছে, সে হস্তে আর কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। বস্তুতঃ সে জন্মের মত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান সমাধা করিয়া আর্দ্রবসনে ভারতীর সম্মুখে আগমন করিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী গোসাঁই তিন খণ্ড গৈরিকবসন হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। উহার একখানি কৌপীন, আর দুইখানি বহির্বাস। প্রভু অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ভারতী সেই তিনখানি বস্ত্র তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন কৃতার্থ হইয়া অরুণবসন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক উপস্থিত লোক সকলকে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, বন্ধু, বাবা, মা, তোমরা আমাকে অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হই। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন ব্রজে গিয়া কৃষ্ণ পাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলীর চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রভু শান্ত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক ঘোর নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে একটি কথা নাই। এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীকে বলিলেন, "গোসাঁই, আমাকে স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন, আপনি শুনিয়া দেখুন, আমাকে সেই মন্ত্রই দিবেন, কি পৃথক্ মন্ত্র দিবেন।" এই বলিয়া প্রভু ভারতীর কাণে কাণে সন্ন্যাসের মন্ত্রটি বলিলেন। ভারতী বুঝিলেন, প্রভু তাঁহাকে গুরু করিবেন বলিয়া অগ্রেই শক্তিসঞ্চার করিয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। যাহাই হউক, ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। অধীর অবস্থাতেই কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে ঐ সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার কি নাম দিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরক্ষণেই বলিলেন, "বাপ নিমাই, তুমি অবতীর্ণ হইয়া জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম রহিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এই প্রকারে প্রভুর নামকরণ হইলে, সেই নামটি মুখে মুখে সকলেই শুনিতে পাইলেন এবং কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা চৈতন্য বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এই নাম শুনিয়া চৈতন্য চৈতন্য বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায়

নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে ইনি খেপা চৈতন্যদাস বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

রাঢ়দেশ ভ্রমণ।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সেই জনরব থামিয়া গেল। সকলেই একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নির্ম্মল মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। লোকমাত্রই স্থির—অচঞ্চল, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কেহ তৎকালের সেই ভাব দর্শন করিয়া আর গৃহে গমন করিলেন না, সন্ন্যাসী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু সে রাত্রি সেই স্থানে বাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত জনগণকে করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথের সেবা করিব।" এই কথা বলিতে বলিতেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। ভারতী গোসাঁই তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। অপূর্ব্ব বেশ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, অরুণনয়নে অবিরলধারে প্রেমবারি বিগলিত হইতেছে। লোক সকল দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতে লাগিলেন। প্রভু আবার বিদায় লইয়া দৌড়িলেন, ইচ্ছা, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। উপস্থিত দর্শকগণও দৌড়িতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে লক্ষ্য করেন নাই, কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন, যাইবার পথ নাই, লোক সকল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা ও মা সকল, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আমার প্রাণনাথের উদ্দেশে যাইতেছি, আমাকে বাধা দিও না।" এমন সময়ে ভারতী ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিলেন। গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। ভারতীও সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন, প্রভুর তাহাতে সম্মতি হইল। এতাবৎকাল চন্দ্রশেখর প্রভুর নয়নগোচর হয়েন নাই। বাহ্যজ্ঞান ছিল না, ভাবে বিভোর ছিলেন। সম্প্রতি বাহ্যাবেশ হইলে, চন্দ্রশেখরকে দেখিলেন। অমনি নদীয়ার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। জন্মস্থান, ঘর, বাড়ী, বৃদ্ধা জননী এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তগণ প্রভৃতি সকলই ধীরে ধীরে তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার নয়ন হইতে

অনর্গল বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তদবস্থায় উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রশেখরের গলা ধরিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! তুমি বাড়ী যাও। গৃহে বসিয়া তুমি আমার জননীর সান্ত্বনা করিও। দেখিও, যেন তিনি আমার বিরহে প্রাণত্যাগ না করেন। আর যাঁহারা আমার বিচ্ছেদে দুঃখ পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিবে যে, তাঁহাদের নিমাই জন্মের মত বিদায় লইয়াছে। নিমাই তাঁহাদিগকে কেবল দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল, দুঃখ দিয়াই গেল। তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আরও বলিবে যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়াছে, সেই দিন অবধি তাহার প্রাণ তাহাতেই মিশিয়া গিয়াছে"। বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আবার প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় স্বজন সকলকেই ভুলিয়া গেলেন, আপনাকেও ভুলিলেন। "প্রাণবল্লভ' এই আমি আসিলাম" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত লোক সকল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। কাটোয়ার পশ্চিমভাগে তখন বন ছিল, দেখিতে দেখিতে প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন। লোক সকল তাঁহার অনুসরণে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোক সকল তাঁহার সঙ্গে দৌড়িতে পারিতেছে না। ক্ষণকালের মধ্যেই প্রভু নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক সকল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল কয়েকজন ভক্ত তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ প্রাণপণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভু কমণ্ডলুটি কটিবন্ধন-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া দণ্ডহস্তে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিতেছেন, ভক্তগণ ক্রমে তাঁহার অনুগমনে অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন। নিত্যানন্দ অবসন্নপ্রায় হইয়া পশ্চাৎ হইতে "প্রভো, একটু আস্তে চলুন, আমি আর পারি না, আমাদের ফেলিয়া যাইও না" বলিয়া বারংবার প্রভুকে ডাকিতেছেন। প্রভু কিন্তু কোন উত্তর না দিয়াই একমনে চলিতেছেন।

"কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিক্‌পগে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হয়ে আমা উদ্ধারিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিতপাবন নাম তোমার সে সাজে॥"

পশ্চাতে ভক্তগণ ক্রমে দূরে পড়িলেন। কেবল নিতাই এখনও সঙ্গ ছাড়েন নাই, প্রভুর অল্প দূরেই আছেন। প্রভুর এখন দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই। প্রভু যে সকল ভক্তকে ছাড়িয়া গেলেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রভুর সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী হইলেন। কেহ কেহ পাগলের ন্যায় হইয়া গেলেন। পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর পরমভক্ত। প্রভুর উপেক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত দৈন্য উপস্থিত হইল। তিনি ক্রোধ করিয়া শ্রীমতীর ন্যায় প্রভুর ভজনা ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি যে দেশে প্রভুর নাম নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তিকে ঘৃণা করেন, সেই বারাণসীধামে যাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এইখানে ইহাঁর নাম হইল, স্বরূপদামোদর।

প্রভু দৌড়িতে দৌড়িতে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেছেন। ইত্যবসরে নিতাই তাঁহার সঙ্গ লইতেছেন। অন্য অন্য ভক্তগণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু একবার এমনই দৌড় মারিলেন যে, নিতাই পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। পশ্চাতের ভক্তগণ আসিয়া নিতাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন। সকলে মিলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রভুর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সকলে সেই গ্রামের প্রান্তভাগে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। অনতিবিলম্বেই একটি সকরুণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ভক্তগণ সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া দেখেন, প্রভু একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে অধোমুখে বসিয়া আছেন, এবং বামহস্তে গণ্ড রাখিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ! কৃষ্ণ হে! আমি কি তোমার দর্শন পাইব না, আর যে সহ্য হয় না, আমাকে দেখা দাও।" প্রভু এইপ্রকার বিলাপ সহকারে মধ্যে মধ্যে রোদনও করিতেছেন। ভক্তগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রভু তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষও করিলেন না। আবার উঠিয়া পশ্চিমমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। পথ বিপথ জ্ঞান নাই, আশে পাশে দৃষ্টি নাই, পশ্চাতে সম্মুখেও লক্ষ্য নাই, কেবল অনন্যমনে চলিতেছেন।

"অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার ॥
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিহীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর ॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক গেয়ান।
পথ পানে নাহি চায় ঘূর্ণিত নয়ন ॥

কথন উন্মত্তপ্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে।
কথন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কথন পড়েন যাই জলে।
কথন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মেলে॥"

নবদ্বীপে প্রভুর আত্মীয় ভক্তগণ প্রভুর বিরহে অবিরত কাঁদিতেছেন, প্রভু কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। ইচ্ছা, তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবেন, যাইতেও পারিতেছেন না। তিন দিবস ক্রমাগত রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কে যেন টানিয়া টানিয়া পূর্ব্বস্থানেই লইয়া আসিতেছে। প্রভু প্রথম দিবস যেখানে ছিলেন, তিন দিন ভ্রমণের পরও প্রায় সেইখানেই আছেন, অথচ তিন দিন অবিশ্রান্ত হাঁটিতেছেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি চলিয়া গেল, প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই। পরে প্রভু যখন সংজ্ঞাবিহীন হইলেন, তখন ভক্তগণ মনে করিলেন যে, তাঁহাকে কোন গতিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। প্রভু কাটোয়া হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, এখন কিন্তু শান্তিপুরের অপর পারে অত্যল্প দূরেই অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভু যেখানে ঘুরিতেছেন, গঙ্গা সেখান হইতে দুই চারি ক্রোশের মধ্যেই। ভক্তগণ নানা কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। প্রভু অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, দিক্ বিদিক্ লক্ষ্য নাই। ভাবগতি দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন বলিয়া মনোমধ্যে আশা করিতেছেন। পথের ধারে ক্ষেত্রমধ্যে রাখাল বালক সকল গোরু চরাইতেছিল। প্রভুকে দেখিবামাত্র তাহারা আনন্দে হরিবোল দিয়া উঠিল এবং নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন, হরিনাম শুনিয়াই দাঁড়াইলেন। ভাবের ঘোর ভাঙ্গিল, চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "বাপ্ সকল, আমাকে হরিনাম শুনাও। বহুদিন হরিনাম শুনি নাই, তাহাতে মৃতপ্রায়ই হইয়াছিলাম, তোমরা হরিনাম শুনাইয়া আমাকে প্রাণদান কর।" রাখালেরা আবার হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু ক্ষণকাল পরে তাহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্কেত অনুসারে তাহারা প্রভুকে শান্তি-পুরের পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু সেই পথেই চলিলেন।

এই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "আপনি শান্তিপুরে যাইয়া, আচার্য্যকে সত্বর নৌকা লইয়া ঘাটে পাঠাইয়া দিন, এবং তদনন্তর নদীয়ায় গিয়া

প্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রকাশ করুন।" নদীয়াবাসীরা এপর্য্যন্ত প্রভুর সন্ন্যাসের সংবাদ জানিতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর নিত্যানন্দের কথামত শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন।

প্রভু এখন শান্তিপুর যাইবার প্রশস্ত পথ ধরিয়াছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাঁহার পশ্চাতে একটু দূরে গোবিন্দ এবং মুকুন্দ। প্রভুর ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেছেন, এবং সাধু ব্রাহ্মণ, সাধু! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রেরই অনুকরণীয়," এইরূপ বলিতে বলিতে অনন্যমনে চলিতেছেন। হঠাৎ বোধ হইল, পশ্চাতে কেহ আসিতেছেন, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন কত দূর ?" বৃন্দাবন কত দূর, এই কথা শুনিয়াই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিলেন, এবং উত্তর করিলেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূর নাই।" প্রভু শুনিলেন এবং কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নিত্যানন্দ অবসর বুঝিয়া দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক প্রভুর সম্মুখীন হইলেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চেন চেন মনে হইল, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। ভাব বুঝিয়া নিতাই বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? আমি আপনার নিত্যানন্দ।" তখন প্রভু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে ? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমিও আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, দুইজনে মিলিয়া রাধাগোবিন্দের সেবায় দিনযাপন করিব।" নিত্যানন্দ তখন, প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইলে, আর কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, এই আশঙ্কায়, অধিক কথা না কহিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার ভান করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই প্রভু আবার বলিয়া উঠিলেন, শ্রীপাদ, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দ আমায় দর্শন দিবেন ত ?" নিতাই মনে করিলেন, আবার বুঝি কপাল ভাঙ্গিল ? যাহাই হউক, সঙ্ক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিয়া এবারও প্রভুকে অল্পে অল্পেই নিরস্ত করিলেন। কিছুদূর গিয়া প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন আর কতদূর আছে ?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।" অবশেষে প্রভুর প্রবোধের জন্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষকে শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট এবং গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। প্রভু তাহাই

বিশ্বাস করিলেন, এবং দ্রুতপদে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যমুনা বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। পতনের সময় বলিলেন,

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ অনুসারে অদ্বৈতাচার্য্যও তৎকালে নৌকা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দের সাহস হইল। এবার প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন, বিশ্বাস হইল। প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। অদ্বৈতও সেই সময়ে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অকস্মাৎ অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া তিনিও নিতাইয়ের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন নাই, শান্তিপুরের অপরপারে আসিয়াছেন, নিতাই তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছেন এবং যমুনাভ্রমে গঙ্গাতেই স্নান করিয়াছেন, এই সকল বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া নিত্যানন্দের আচরণে কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন। যাহাই হউক, অদ্বৈতাচার্য্য তখন তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, এবং নিত্যানন্দের সহিত নৌকার উপর উঠাইয়া নিজভবনে লইয়া গেলেন।

শান্তিপুরাগমন।

অদ্বৈতাচার্য্য বাড়ী গিয়া তিনদিন তিনরাত্রি উপবাসের পর শ্রীগৌরাঙ্গকে ভোজন করাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া আচার্য্যের ভবনে প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। সায়ংকালে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অনুমতি লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতের গণ বিদ্যাপতির এই পদ গাইতে লাগিলেন ;—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
আর প্রাণপ্রিয়া দূরদেশে না পাঠাব।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাইব॥"

আচার্য্যের গুণ এই গীত গাইতেছেন, আর আচার্য্য স্বয়ং আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি প্রভুকে প্রণামও করিতেছেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী, পূর্ব্বের ন্যায় আচার্য্যের প্রণামে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, প্রণামের পরিবর্ত্তে আচার্য্যকে কেবল আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত; প্রভুর কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছে না; প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহানল জ্বলিতেছে। প্রভুর প্রিয়গায়ক মুকুন্দ ভাব-গতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, গীতটি ভাবোপযোগী না হওয়ায় প্রভুর সন্তোষজনক হইতেছে না। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন;—

"আহা প্রাণপ্রিয়া সখি কি না হইল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনুমন জ্বরে॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ি যাই॥"

এই গীত শ্রবণমাত্র প্রভু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। নয়নযুগল দিয়া শতধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। ক্রমে ভাবতরঙ্গে আকুল হইয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়া প্রভুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপ নৃত্যাদির পর প্রভুর বাহ্য হইল। ভক্তগণ কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুর শনের আয়োজন করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দও প্রভুর নিকট শয়ন করিলেন।

শয্যায় শয়ন করিয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপবাসীদিগকে সন্ন্যাসের সমাচার দিয়া শান্তিপুরে আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পূর্ব্বে একবার জননীকে দর্শন দিয়া যাওয়া উচিত এই বিবেচনায় তাহাতে সম্মত হইলেন। তবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শান্তিপুরে আগমনও প্রকারান্তরে নিষেধ করিলেন।

যাহাই হউক, নিত্যানন্দ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ হইবে। বেলা এক প্রহর না হইতে হইতেই নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌছিলেন। নবদ্বীপ দেখিয়া নিত্যানন্দের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার বোধ হইল, নবদ্বীপও কাঁদিতেছে। নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে প্রভুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নিতাই আগমন করিয়াছেন শুনিয়া প্রভুর বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল। নিত্যানন্দ শচীদেবীকে

নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনাইলেন। শুনিয়াই শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মালিনী প্রভৃতি বয়স্থা রমণীগণ অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "মা, আপনার নিমাই আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, শান্তিপুরে যাইতে হইবে, আমরাও আপনার সহিত যাইব, সকলে মিলিয়া নিমাইকে ধরিয়া আনিব।"

নদীয়ায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রভুর ভক্তমাত্রই শান্তিপুরে যাইবার জন্য আসিয়া মিলিত হইলেন। প্রভুর অভক্ত এবং বিদ্বেষিগণও প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে নিজ নিজ পূর্ব্ব আন্তরিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে অপরাধনির্ম্মুক্ত ও কৃতার্থ করিবেন ভাবিয়া প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। চতুর্দ্দিকেই হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও পতিসন্দর্শনে গমন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু যখন নিত্যানন্দের মুখে তাঁহার গমনের নিষেধের কথা শুনিলেন, তখন বজ্রাহতের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিষেধের কথা শুনিয়া শচীদেবী এবং আর সকলেই প্রভুর দর্শনে যাইবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই বৃত্তান্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রুতি-গোচর হইল। তখন তিনি হৃদয় বাঁধিলেন। লজ্জা ও গৌরব যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়েকে আবরণ করিল। জননীকে ও ভক্তগণকে দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত দেবী লজ্জিত হইলেন। ত্রিজগতের জন তাঁহার হৃদয়ের রতনকে দেখিতে যাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? এই মহান্ লাভ পাইয়া সামান্য চক্ষুর তৃপ্তির লোভ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া দেবী নিজের আকুল হৃদয়কে শান্ত করিলেন। পরে স্বয়ং শচীদেবীকে বুঝাইয়া শান্তিপুরে যাইতে সম্মত করিলেন। দোলা সজ্জিত হইল। শচীদেবী তাহাতে আরোহণ করিলেন। বাহকগণ শান্তিপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। নদীয়ার লোক নদীয়া শূন্য করিয়া প্রভুর দর্শনে শচীদেবীর অনুবর্ত্তী হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতিবিরহে কাতর হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন ;—

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥

এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিল বনবাস ॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবায় প্রাণে ॥
চাঁদ মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাই আশ ॥

এদিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ীতে সহস্র সহস্র লোক আগমন করিতে লাগিলেন। লোকের সঙ্ঘট্ট অধিকতর হইলে, আচার্য্য দ্বাররক্ষার্থ কয়েকজন বলবান পুরুষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে দ্বার অবরুদ্ধ হইলে, আচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী স্থান সকল লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বাহির হইতে লোক সকল আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু আচার্য্যের অভিপ্রায়মত জনকয়েক ভক্তের সহিত ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উপস্থিত ভক্তগণ প্রভুর দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ নবদ্বীপবাসিগণকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। যাইবার পথ ঘাট বন্ধ, অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। কিন্তু নদীয়াবাসীরা আসিতেছেন শুনিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলী তাঁহাদের যাইবার পথ করিয়া দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দও নদীয়াবাসিগণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের বাটীর সম্মুখে পৌছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, শচীমাতা দোলায় চড়িয়া আসিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জননীর চরণতলে নিপতিত হইলেন। শচীদেবী নিজের প্রাণধন নিমাইচাঁদকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন, এবং বলিলেন, "বাপ্ নিমাই! বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া আর আমাকে দেখা দেয় নাই। বাপ্ রে! তুমিও যদি নিষ্ঠুর হও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।" প্রভু জননীর চরণে বারংবার নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মা, এ শরীর তোমার, আমি চিরজীবনেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে

পারিব না; তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। যদিও না জানিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তোমাকে কখনই ভুলিতে পারিব না।" তখন আচার্য্যরত্ন শচী ও নিমাইকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবাসী সকলকেই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া শান্ত করিলেন।

এই দিবস শচীদেবী স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের রন্ধনকার্য্যের ভার লইলেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের সহিত ভোজনে বসিলেন। আচার্য্য নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রভুর ইচ্ছা, অল্প কিছু ভোজন করিয়াই উঠেন। কিন্তু আচার্য্যের নিতান্ত অনুরোধে তাহা করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর অধিক ভোজন অকর্ত্তব্য বলিয়া বারবার আচার্য্যকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলে আচার্য্যের ইচ্ছানুরূপ ভোজন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভোজনকালে আচার্য্যে ও নিত্যানন্দে অনেক হাস্য পরিহাস হইল। প্রভুর ভোজন দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। প্রভু, ভোজন সমাপ্ত হইলে, আচমন করিলেন। তদনন্তর আচার্য্য ভক্তগণকেও পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। প্রতিদিন এইপ্রকার মহামহোৎসব হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ সামগ্রী আসিয়া আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্নানভোজনাদিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হয়। অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন। ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই। সকলেরই ইচ্ছা, এইরূপেই দিন যায়। কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না। কয়েকদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্যকে বলিলেন, "সন্ন্যাসীর একস্থানে অধিকদিন বাস করা উচিত নহে, আমি স্থানান্তরে যাইব।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। শচীমাতাও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষে সর্ব্বসম্মতিতে প্রভুর নীলাচলে গমন ও সেই স্থানেই বাস স্থির হইল। কারণ, নীলাচলে বঙ্গদেশীয় লোক প্রায়ই যাইয়া থাকেন, তথায় থাকিলে শচীমাতা সচরাচর প্রভুর সংবাদ পাইতে পারিবেন। ভক্তগণও তাহাতেই সম্মত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ জননীর ও ভক্তগণের অভিপ্রায়মত নীলাচলেই বাস করিতে সম্মত হইয়া, ভক্তগণকে বলিলেন, "বাপ্ সকল, তোমরা আমার প্রাণতুল্য। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমরা সকলেই, নিজ নিজ গৃহে যাইয়া কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণারাধনায় কালাতিপাত কর।

আমি এক্ষণে নীলাচলে চলিলাম, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাদিগের সহিত দেখা করিব, এবং তোমরাও সময়ে সময়ে তথায় যাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।" প্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা আকুল হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উপর কথা কহিতে পারিলেন না। কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের আকার প্রকারই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। প্রভুও ভাবগতি দেখিয়া অনেক প্রকার বুঝাইয়া তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করিলেন। ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে বিদায় লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে কয়েকজন অতীব অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত প্রভু আরও কয়েকদিন শান্তিপুরেই থাকিলেন। পরিশেষে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও মুকুন্দ এই পাঁচজনকে সঙ্গে লইয়া প্রভু শান্তিপুর আঁধার করিয়া গঙ্গাতীর দিয়া ছত্রভোগপথে নীলাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাঁরা পাঁচজনেই সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রভু যাইবার সময় স্বীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আচার্য্যকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

নীলাচল যাত্রা।

প্রভু যে ছত্রভোগের পথে চলিয়াছেন, ঐ ছত্রভোগ গঙ্গার দক্ষিণসীমা। গঙ্গাদেবী এই পর্য্যন্ত আসিয়া শতমুখী হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছত্রভোগ এখন ডায়মণ্ড হারবার সবডিভিসনের মথুরাপুর থানার অন্তর্গত খাড়ি নামক গ্রামে অবস্থিত। এই স্থান জয়নগর মজিলপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তখন গঙ্গা এই স্থান দিয়াই সাগরে মিলিত হইয়াছিলেন।

প্রভু যখন ছত্রভোগে আগমন করেন, তখন ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল। ঐ নগরটি তাৎকালিক গৌড়রাজ্যের দক্ষিণসীমান্ত ছিল। তথায় গৌড়াধিপতির অধীনস্থ রামচন্দ্র খান নামে একজন রাজা ছিলেন। ছত্রভোগ তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থল বলিয়া সাধারণ লোকের এবং পীঠস্থান বলিয়া শাক্তদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ তীর্থে আসিয়াই অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। ভক্তগণও তাঁহার সহিত অবগাহন করিলেন। স্নানাদি সমাপনের পর প্রভু তীরে উঠিলেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসীর আগমনের জনরব শুনিয়া রামচন্দ্র খান সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র খান রাজকীয় অভিমানে দোলায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর চরণ দর্শনমাত্র তাঁহার সে অভিমান দূরীভূত হইল। নবীন সন্ন্যাসীর তেজে মুগ্ধ ও ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দোলা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভুর কিন্তু দৃক্‌পাতও নাই।

"প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দজলে।
হা হা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন॥"

নিত্যানন্দ অকস্মাৎ সেই স্থানে রামচন্দ্র খানের আগমন প্রভুরই লীলা খেলা বুঝিয়া বলিলেন, "প্রভো, আপনার পদতলে শরণাগত ভক্তটির প্রতি একটু কৃপা-দৃষ্টি করুন।" প্রভু নিত্যানন্দের এই কথায় কিঞ্চিৎ বাহ্য পাইলেন, এবং রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপ্, তুমি কে?" রামচন্দ্র খান বলিলেন, "আমি অতি ছার, আপনার দাসের দাস হইতে বাসনা করি।" রামচন্দ্রের অনুযায়িবর্গ বলিলেন, "প্রভু, ইনি রামচন্দ্র খান, এই প্রদেশের রাজা।" প্রভু বলিলেন, "ভাল, তুমি এই দেশের অধিকারী, আমি কল্য প্রাতে নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইব, তুমি কি আমাদিগের কিছু সাহায্য করিতে পারিবে?" এই বলিয়াই প্রভু প্রেম-ভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভুর চৈতন্য হইলে, রামচন্দ্র খান বলিলেন, "প্রভুর আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়। কিন্তু সময়টি বড়ই বিষম। গৌড়াধিপের সহিত উৎকলাধিপের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে। উভয়ের অধীনস্থ রাজারা স্থানে স্থানে পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমিও রাজভৃত্য। কোনরূপ দোষ পাইলে, আর আমার রক্ষা নাই। যাহাই হউক, আমার জাতি ও প্রাণ যায় যাইবে, আপনি দিবাভাগ এইস্থানেই অতিবাহিত করুন, আমি রাত্রিতে আপনাকে যে কোন সুযোগে পাঠাইয়া দিব, ভৃত্য বলিয়া যেন মনে থাকে।" প্রভু রামচন্দ্র খানের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। হাসিয়া তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র খান প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সানুচর প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করিয়া দিলেন। পাকাদি প্রস্তুত হইলে, প্রভু সহচরগণের সহিত ভোজন করিতে গেলেন। প্রভু সদাই আবেশে আছেন, ভোজনের প্রতি লক্ষ্য নাই, নামমাত্র ভোজন করিয়া উঠিলেন। ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, "জগন্নাথ কতদূর?" ভোজনের পর মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। ছত্রভোগবাসী লোক সকল প্রভুর মুহুর্মুহুঃ অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক,

স্তম্ভ ও স্বেদ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাপার হইতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন প্রভু কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র খান আসিয়া বলিলেন, "নৌকা ঘাটে উপস্থিত, প্রভুর শুভাগমন হউক।" শুনিবামাত্র প্রভু "হরি হরি" বলিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র খান সপরিবার প্রভুকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করাইলেন। পরে তিনি প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। নাবিকগণ নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা তীর ত্যাগ করিলে, প্রভু মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভু নৃত্যারম্ভ করিয়া দিলেন। নাবিকগণ প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া বলিল, "গোসাঁই, স্থির হউন; পথ অতীব দুর্গম, সদাই ডাকাইত ফিরিতেছে, জলে কুম্ভীর, কূলে বাঘ, সর্ব্বত্রই প্রাণের আশঙ্কা; উড়িষ্যার সীমা না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনারা স্থির হইয়া থাকুন।" নাবিকদিগের কথা শুনিয়া ভক্তগণ নীরব হইলেন। প্রভু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কিসের ভয়, তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর; এই দেখ, সুদর্শন চক্র তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছে।" আবার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নৌকা নির্বিঘ্নে উৎকলের সীমায় আসিয়া পৌছিল। নাবিকের প্রভুকে ভক্তগণের সহিত প্রয়াগঘাটে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

প্রয়াগঘাট ডায়মণ্ড হারবারের নিকটস্থ মন্ত্রেশ্বর নদীর একটি ঘাট। রাজা যুধিষ্ঠির তীর্থভ্রমণকালে এইস্থানে মহেশ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। প্রভু নৌকা হইতে নামিয়া স্নানানন্তর ভক্তগণের সহিত উক্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে ভক্তগণকে একস্থানে রাখিয়া স্বয়ংই ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভক্তগণ বসিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভু ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া ভক্তগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভু যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে প্রচুর। তাঁহারা ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "প্রভু, বোধ হইতেছে, আমাদিগকে পোষণ করিতে পারিবেন। জগদানন্দ ভিক্ষাদ্রব্য সকল লইয়া পাক করিলেন। পাক সমাধা হইলে, প্রভু ভক্তগণের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজনের পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এইভাবে তাঁহাদের এই দিবস ঐ স্থানেই কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যূষে প্রভু ভক্তগণের সহিত পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক দুষ্ট দানী আসিয়া তাঁহাদিগের পথ রোধ করিল। সে

বলিল, "পথকর না পাইলে, আর যাইতে দিবে না।" পরক্ষণেই দুষ্ট দানী প্রভুর তেজ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "গোসাঁই, তোমরা কয়জন?" প্রভু বলিলেন, "আমি একাকী, এ জগতে আমার আমার বলিতে কেহ নাই।" এই কথা শুনিয়া দানী প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিল। প্রভু "গোবিন্দ" বলিয়া যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। দানী বলিল, "তোমরা ত গোসাঁইর লোক নও, তোমাদিগকে দান না দিলে ছাড়িব না।" অগত্যা তাঁহারা বসিয়া রহিলেন। এদিকে প্রভু কিয়দ্দূর যাইয়া স্বর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই রোদনে কাষ্ঠপাষাণাদিও দ্রবীভূত হইতে লাগিল। দানী প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া সবিস্ময়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল, "গোসাঁই, সত্য করিয়া বল, তোমরা কাহার লোক? আর ঐ গোসাঁই বা কে?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "আমরা গোসাঁইরই লোক, উহাঁর নাম কৃষ্ণচৈতন্য। দানী শুনিয়া প্রভুর নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, "প্রভো, অপরাধ ক্ষমা কর, এই দীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর।" প্রভু শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া দানীর প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। দানী কৃতার্থ হইয়া প্রণতি সহকারে প্রভুর ভক্তগণকেও ছাড়িয়া দিল।

অনন্তর প্রভু ভক্তগণের সহিত অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যস্থিত স্নুবর্ণরেখা নাম্নী নদী পার হইয়া বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে জলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া পরদিন বাঁশধা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভু ঐ দিন বাঁশধাতেই থাকিয়া এক শাক্তকে কৃতার্থ করিয়া তৎপরদিবস রেমুণায় গমন করিলেন। রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া ঐ দিবস ঐ স্থানেই অবস্থান করিলেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মাধবেন্দ্র পুরী যখন গোবর্দ্ধনে বাস করেন, তখন তিনি স্বপ্নাদেশে নিবিড় কুঞ্জ হইতে শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবা প্রকট করেন। পরে তিনি ঐ শ্রীগোপালদেবের স্বপ্নাদেশে মলয়জ চন্দন আনয়নার্থ দক্ষিণ দেশে আগমন করিয়া পথিমধ্যে রেমুণায় গোপীনাথকে দর্শন করেন। গোপীনাথ দর্শনের পর তিনি যখন পূজারীর নিকট গোপীনাথের ভোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন পূজারী অপরাপর ভোগের সহিত অমৃতকেলি নামক ক্ষীরভোগের

কথা বলেন। ঐ ক্ষীরভোগের কথা শুনিয়া পুরী গোসাঁই মনে করেন, যদি আমি ঐ ক্ষীরভোগ কিঞ্চিৎ পাই, তবে উহা আস্বাদন করিয়া দেখি, এবং আস্বাদনে ভাল হইলে, আমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমার গোপালকে ঐ প্রকার ক্ষীরভোগ লাগাই। কিন্তু পরে তিনি ঐ ইচ্ছা অসঙ্গত বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক নিজভজনে নিবিষ্ট হয়েন। এদিকে গোপীনাথ ঐ ক্ষীর-ভোগের এক ভাণ্ড চুরি করিয়া পূজারীকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, তুমি উঠিয়া আমার বস্ত্রমধ্য হইতে ক্ষীরভাণ্ড লইয়া মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রদান কর। পূজারী উঠিয়া গোপীনাথের আদেশমত ক্ষীরভাণ্ড লইয়া মাধবেন্দ্রপুরীকে অন্বেষণ করিয়া ঐ ক্ষীরভাণ্ড প্রদান করেন। মাধবেন্দ্রপুরী পূজারীর মুখে গোপীনাথের ক্ষীরচুরির কথা শুনিয়া প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠার ভয়ে ঐ রজনীতেই ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর-ভাণ্ড চুরি করাতেই গোপীনাথের "ক্ষীরচোরা" নাম হয়।

প্রভু রেমুণা হইতে যাজপুরে গমন করিলেন। যাজপুরে বৈতরণী নদীর দশাশ্বমেধ নামক ঘাটে স্নান, ব্রাহ্মণনগরে বরাহমূর্ত্তি দর্শন এবং নাভিগয়াতে বিরজা দেবীকে দর্শন করিয়া দুই এক দিন ঐ স্থানেই বাস করিলেন। পরে কটক নগরে যাইয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন। তৎকালে সাক্ষিগোপাল কটকেই ছিলেন। সাক্ষিগোপালের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা করেন। উহাঁদের একজন অধিকবয়স্ক ও একজন অল্পবয়স্ক ছিলেন। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ তীর্থে যাইয়া অধিকবয়স্ক ব্রাহ্মণের অনেক সেবা করেন। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গোপালদেবের সাক্ষাতে তাঁহাকে নিজ কন্যা সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু তিনি তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে কন্যাদান প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করেন। শেষে, গোপালদেব স্বয়ং আসিয়া যদি সাক্ষী দেন, তবে আমি ছোট বিপ্রকে কন্যা দান করিব, এই কথা বলেন। তদনুসারে ছোট বিপ্র গোপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদ্যানগরে লইয়া আইসেন। গোপাল আসিয়া সাক্ষী দিয়া বড়বিপ্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। তদবধি গোপাল "সাক্ষিগোপাল" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উক্ত ভক্ত বিপ্রদ্বয়কে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত বিদ্যানগরেই বিরাজ করিতে থাকেন। পরে উৎকলরাজ পুরুষোত্তম বিদ্যানগর জয় করিয়া গোপালকে কটকে

লইয়া যান। সম্প্রতি গোপাল যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানও সাক্ষিগোপাল নামেই উক্ত হইয়া থাকে।

দণ্ডভঙ্গ।

সাক্ষিগোপাল দর্শনের পর প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। ভুবনেশ্বর একাম্রকাননে অবস্থিত। প্রভু একাম্রকাননে উপনীত হইয়া তত্রত্য বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিলেন। পরে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দর্শন করিয়া পুরীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পথে কমলপুর নামক স্থানে ভাগী নাম্নী নদীতে স্নান করিবার সময় প্রভু নিজের দণ্ডটি নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ দণ্ডটি প্রভুর অজ্ঞাতসারে ভগ্ন করিয়া ভাগীনদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রভু স্নানানন্তর কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়াই আবিষ্ট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, দণ্ডের কথা মনে হইল না। পরে যখন আঠারনালার নিকট পৌছিলেন, তখন দণ্ডের কথা মনে পড়িল। দণ্ডের কথা মনে হইলে, নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" প্রভু শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে বলিলেন, "নীলাচলে আসিয়া তোমরা আমার বিশেষ হিতসাধন করিলে, সবে ধন একটি দণ্ড ছিল তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে; অতএব আর আমি তোমাদিগের সঙ্গে যাইব না, হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাইব।" প্রভুর ভাবগতি বুঝিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "প্রভুই অগ্রে গমন করুন, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" মুকুন্দের কথা শুনিয়া প্রভু দ্রুতপদে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়াই প্রভু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গ হারাইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন।

এদিকে প্রভু একদৌড়ে আসিয়াই শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশমাত্রই জগন্নাথ দর্শন হইল। দর্শনমাত্র আবিষ্ট হইয়া প্রভু জগন্নাথকে ক্রোড়ে লইবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইলেন, কিন্তু ক্রোড়ে লইতে

পারিলেন না, পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথের অজ্ঞ প্রহরিগণ প্রভুকে তদবস্থ দেখিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। দৈবযোগে ঐ স্থানে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি জগন্নাথকে দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, একজন নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রহরিগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে তিনি প্রহরী-দিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। পরে ঐ নবীন সন্ন্যাসীর অদ্ভুত অশ্রু কম্প ও পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল দেখিতে লাগিলেন। তিনি প্রভুর ঐ সকল অদ্ভুত প্রেমবিকার নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ চলিয়া গেল, জগন্নাথদেবের ভোগের কাল উপস্থিত হইল, কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর চৈতন্যোদয় হইল না। তখন সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মনে মনে উপায় চিন্তা করিয়া প্রহরীদিগের সাহায্যে প্রভুকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন। তিনি বাটীতে আনিয়া প্রভুকে একটি পবিত্র নির্জন স্থানে শয়ন করাইলেন। তখনও প্রভুর চৈতন্যোদয় লক্ষিত হইল না। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, সন্ন্যাসীর উদর স্পন্দিত হইতেছে না, শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি সন্ন্যাসীর শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে নাসাগ্রে তূলা ধরিলেন। তূলাটুকু ঈষৎ চলিতে দেখা গেল। তদ্দর্শনে ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এরূপ অদ্ভুত বিকার ত আর কখন দেখি নাই। শাস্ত্রে যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখা যায়, এই সন্ন্যাসীর সেই লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে।

সার্ব্বভৌমমিলন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর সঙ্গিগণ আসিয়া জগন্নাথদেবের সিংহ-দ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সিংহদ্বারে আসিয়াই লোকমুখে শুনিলেন, আজ এক নবীন সন্ন্যাসী জগন্নাথের মন্দিরে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ শুনিয়াই বুঝিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুই। অনন্তর তাঁহারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনেই যাইবার মনস্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বঙ্গদেশীয়। ইহাঁর নাম বাসুদেব এবং জন্মস্থান নবদ্বীপ। ইনি নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ইনিই মিথিলা হইতে ন্যায়ন্যায় কণ্ঠে

করিয়া আনয়ন করেন এবং ইনিই নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম নব্যন্যায়ের প্রচলন করেন। ইনি বঙ্গদেশীয় নব্যন্যায়ের আদিগুরু ও আদিগ্রন্থকার। নব্যন্যায়ের প্রসিদ্ধ টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ইহাঁরই ছাত্র। স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং তান্ত্রিকচূড়ামণি কৃষ্ণানন্দও ইহাঁরই ছাত্র ছিলেন। তৎকালে ইহাঁর তুল্য পণ্ডিত ভারতে অত্যল্পই ছিলেন। ইহাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াই রাজা প্রতাপরুদ্র ইহাঁকে উড়িষ্যায় আনয়ন ও রাজপণ্ডিতপদে বরণ করেন। এই কারণেই ইহাঁর পুরীতে বাস হইয়াছিল। নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ যখন প্রভুর অনুসন্ধানার্থ ইহাঁর আলয়ে যাইতে অভিলাষ করিলেন, সেই সময়েই তাঁহাদের গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি, নিবাস নবদ্বীপেই। মুকুন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মুকুন্দ গোপীনাথ আচার্য্যকে দেখিয়াই নমস্কার করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য মুকুন্দকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানেই আসিয়াছেন। তিনি অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন, আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। এখানে আসিয়া শুনিতেছি, প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই মনে করিতেছিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ভাল হয়, দৈবযোগে তাহাই ঘটিল, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভাল হইল, এখন চল, সকলে মিলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটী যাই। অগ্রে প্রভুকে দর্শন করি, পরে আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিব।" গোপীনাথ আচার্য্য প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে মুকুন্দ প্রভৃতিকে লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রভু তখনও সংজ্ঞারহিত অবস্থাতেই আছেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুকে নমস্কার করিলেন এবং মুকুন্দ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। পরে যখন শুনিলেন, তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শন হয় নাই, তখন নিজের পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শন করিতে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধে উদ্বেগরহিত হইলেন। এদিকে নিত্যানন্দও জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর ন্যায় আবিষ্ট ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

মুকুন্দাদি তাঁহাকে সুস্থ করিয়া জগন্নাথের মালাপ্রসাদ লইয়া সত্বর সার্ব্বভৌম-ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনার্থ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর বাহ্য হইল। বাহ্য হইলে, প্রভু হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে প্রভুকে সমুদ্রে স্নান করিতে পাঠাইয়া তাঁহাদিগের ভিক্ষার নিমিত্ত মহাপ্রসাদান্ন আনাইলেন। প্রভু সঙ্গিগণের সহিত স্বর্গদ্বারে যাইয়া স্নান করিলেন। স্নানানন্তর বাটীতে আসিয়া ভক্তগণের সহিত মহা-প্রসাদান্ন ভোজন করিতে বসিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বয়ং কেবল অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া পিষ্টকাদি সঙ্গিগণকে দিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকেও পিষ্টকাদি দিবার চেষ্টা করিলেন, প্রভু গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কর-যোড়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনাকেও পিষ্টকাদি গ্রহণ করিতে হইবে, জগন্নাথ কিরূপ ভোজন করিয়াছেন, আজ তাহা আস্বাদন করিয়া দেখিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্যের আগ্রহে ও অনুরোধে প্রভু সমস্তই ভোজন করিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাদিগকে আচমন ও উপবেশন করাইয়া স্বয়ং গোপী-নাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ভোজন করিয়া পুনশ্চ দুইজনেই প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে দেখিয়া "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নমস্কার করিলেন। প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভট্টাচায্য আশীর্ব্বাদবাক্য দ্বারা প্রভুকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বুঝিয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিলেন, "শ্রীপাদের পূর্ব্বাশ্রম কোন্ স্থানে জানিতে অভিলাষ করি।" গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন, "ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রম নবদ্বীপে, ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, ইহাঁর নাম বিশ্বম্ভর।" নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিশেষ আনন্দ পাইলেন; কারণ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার পিতার সহাধ্যায়ী। প্রভুর পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "শ্রীপাদ আমার পিতৃ-সম্বন্ধ-হেতু স্বভাবতই পূজ্য, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, আমাকে আপনার নিজ দাস বলিয়াই জানিবেন।" ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক সহজ-বিনয়সহকারে বলিলেন, "আপনি জগতের গুরু, সর্ব্বলোকের হিতকারী, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা; আমি বালক সন্ন্যাসী, ভালমন্দ জ্ঞান নাই, গুরুজ্ঞানে আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনার সহিত সঙ্গ করিবার

নিমিত্তই আমার এই স্থানে আসা, আপনি আমাকে সর্ব্বপ্রকারেই পালন করিবেন ; আজ আপনি আমাকে কি ঘোরতর বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়াছেন।” ভট্টাচার্য্য প্রভুর সেই বিনয়মধুর বচনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুমি আর একাকী দর্শন করিতে যাইও না, আমার সঙ্গে বা আমার লোকের সঙ্গেই যাইও।” প্রভু বলিলেন, “আর আমি মন্দিরের ভিতর যাইব না, বাহিরে থাকিয়াই প্রভুকে দর্শন করিব।”

অনন্তর ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিলেন, “আমার মাতৃস্বসার ভবন অতি নির্জ্জন স্থান, সেই স্থানেই ইহাঁর বাসা দাও এবং জলপাত্রাদি যে কিছুর প্রয়োজন হয় তাহারও সমাধান করিয়া দাও।” ভট্টাচার্য্যের আদেশ মত গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে লইয়া তাঁহার মাতৃস্বসার ভবনে বাসা দিলেন এবং জলপাত্রাদিরও সমাধান করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রভাতে গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে লইয়া প্রথমতঃ জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন। পরে রত্নবেদীর উপর সপ্তশ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। দক্ষিণে বলদেব, তদ্বামে সুভদ্রা, তদনন্তর শ্রীজগন্নাথ। জগন্নাথের দক্ষিণে রজতময়ী সরস্বতী ও বামে সুবর্ণময়ী লক্ষ্মী। পশ্চাতে নীলমাধব, তৎপশ্চাতে সুদর্শন। ইহাই সপ্ত শ্রীমূর্ত্তি। অনন্তর সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তভাবে অন্তর্বেদী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অপরাপর দেবমূর্ত্তি সকল দর্শন করাইলেন। প্রথমতঃ অগ্নিকোণে চতুর্ভুজ সত্যনারায়ণ, তৎপশ্চিমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তৎপশ্চিমে অক্ষয়বট, তৎপূর্ব্বে বটপত্রশায়ী বালমুকুন্দ, অক্ষয়বটের দক্ষিণে বিঘ্নহর বিনায়ক, অক্ষয়বটের মূলে মঙ্গলাদেবী, বায়ুকোণে মার্কণ্ডেশ্বর লিঙ্গ, তৎপার্শ্বে ইন্দ্রাণী। তদনন্তর অশ্বদ্বার বা দক্ষিণদ্বার। তৎপশ্চিমে সূর্য্যদেব, তৎপশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ, তৎপশ্চিমে লক্ষ্মীনৃসিংহ, তৎপশ্চিমে সিদ্ধিদাতা গণেশ, তৎপার্শ্বে রৌহিণকুণ্ড ও চতুর্ভুজ কাক, তৎপশ্চিমে বিমলাদেবী, তাঁহার দক্ষিণে ভাণ্ডার গৃহ, উত্তরে গোপরাজ নন্দ, তদুত্তরে কৃষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা, তদুত্তরে ভাণ্ডগণেশ। তদনন্তর খাঞ্জাদ্বার বা পশ্চিমদ্বার। তদুত্তরে মাখন চোর, তদুত্তরে গোপীনাথ, তদুত্তরে সরস্বতীর মন্দির, তদুত্তরে নীলমাধবের মন্দির, তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির, পরে ভদ্রকালী, তৎপরে সূর্য্যনারায়ণ, তৎপূর্ব্বে সূর্য্যদেব, তৎপূর্ব্বে পাতালেশ্বর মহাদেব, তৎপার্শ্বে বলিরাজা। তদনন্তর হস্তিদ্বার বা উত্তরদ্বার। তদ্বামে শীতলা, তৎপশ্চিমে স্বর্গকূপ, তৎপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরী, পরে স্নানবেদী। এইরূপে শ্রীমূর্ত্তি সকল

দর্শনের পর, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বাংশে ভোগমন্দির, তৎপশ্চিমে নাটমন্দির ও গরুড়-স্তম্ভ, তৎপশ্চিমে জগমোহন এবং আনন্দ বাজার প্রভৃতিও দর্শন করাইলেন। দর্শন সমাধা হইলে, গোপীনাথাচার্য্য প্রভুকে বাসায় রাখিয়া মুকুন্দের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীটির যেমন রূপ, স্বভাবও তেমনি, যেন মূর্ত্তিমান্ বিনয়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই প্রীতি হয়। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং নামই বা কি হইয়াছে?" গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন, "ইহাঁর গুরু কেশবভারতী, এবং নাম হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" ভট্টাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন, "নামটি অতি সুন্দর হইয়াছে, সম্প্রদায়টি কিন্তু ভাল হয় নাই।" গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন, "ইহাঁর কিছুমাত্র বাহ্যাপেক্ষা নাই, অতএব বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইহাঁর এই যৌবন বয়স, কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হইবে, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিতেছি, ইহাঁকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব। আর যদি বলেন, তবে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া পুনর্ব্বার যোগপট্ট* দিয়া সংস্কার করাইব।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ উভয়েই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। গোপীনাথাচার্য্য কিছু অধীর হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি ইহাঁর মহিমা জান না, তাই এমন কথা বলিলে। তোমার দোষও নাই; ভগবান্ আপনাকে না জানাইলে, কেহই তাঁহার মহিমা বিদিত হইতে পারে না।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যগণও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা গোপীনাথাচার্য্যের মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "আপনি কোন্ প্রমাণে ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছেন?" গোপীনাথাচার্য্য উত্তর করিলেন,—"আপ্তবাক্যই ইহাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ; বিজ্ঞলোকেরা ইহাঁকে ঈশ্বরই বলিয়া থাকেন।" ভট্টাচার্য্যের দাম্ভিক শিষ্যগণ পুনশ্চ বলিলেন, "ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া অনুমান করিবার পূর্ব্বে, ঈশ্বরত্বসাধক লিঙ্গ অবধারিত

---

* যোগপট্ট সন্ন্যাসীদিগের বস্ত্রবিশেষ। সন্ন্যাসীরা ঐ বস্ত্র দ্বারা জানু ও পৃষ্ঠ বন্ধন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীগণ যে সম্প্রদায়ে সংস্কারিত হইয়া যোগপট্ট গ্রহণ করেন, সেই সম্প্রদায়েরই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হওয়ার প্রয়োজন।" গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন, "ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝা যায় না; অনুমান ঈশ্বরের প্রমাণ নহে। সাবয়বত্বাদি লিঙ্গ দ্বারা বিশ্বকারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইতে পারিলেও, ঈশ্বরতত্ত্ব সাধিত হইতে পারে না। সাবয়ব বস্তুমাত্রই কর্ত্তৃসাপেক্ষ; বিশ্ব সাবয়ব, অতএব বিশ্বও কর্ত্তৃসাপেক্ষ; এইরূপ ব্যাপ্তিলিঙ্গক অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রই সাধিত হইয়া থাকে, ঈশ্বরতত্ত্ব সাধিত হইতে দেখা যায় না, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বরতত্ত্বের অনুভব তৎকৃপা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না।" শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥"

হে দেব, যদিও তোমার মহিমা জগতে সুপ্রচারিত রহিয়াছে, তথাপি যিনি তোমার চরণ-কমল-যুগলের কৃপাকণিকালাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন, তিনিই তোমার মহিমার স্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি তোমার কৃপাকণা লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি চিরদিন অন্বেষণ করিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

"ভট্টাচার্য্য, তুমি জগদ্‌গুরু, শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতপ্রধান হইয়াও, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে বিদিত হইতে পার না। ইহা তোমার দোষ নহে। পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করা যায় না, ইহা শাস্ত্রই বলিতেছেন।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এতাবৎকাল নীরব ছিলেন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন,—"আচার্য্য, যথেষ্ট হইয়াছে, সাবধানে কথা কও। আমি ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানিতে পারি নাই। তুমি যে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি?" গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন,—"যে বস্তু যাদৃশ, তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞানই বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান। বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞানই কৃপাতে প্রমাণ। আমি যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছি, তখন অবশ্য ঈশ্বরের কৃপাও লাভ করিয়াছি। ইঁহাতে প্রলয়াখ্য সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবরূপ ঈশ্বরের লক্ষণ সকল পরিস্ফুটই হইতেছে। তথাপি যে তুমি ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হইতে পার নাই, ইহা মায়ারই প্রভাব জানিবে।" ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন,—"আচার্য্য, রাগ করিও না, বিচারে দোষও গ্রহণ

করিও না; কারণ, শাস্ত্রবিচারে কাহারও দোষ গ্রহণ করা উচিত হয় না। আমি যাহা কিছু বলিব, শাস্ত্রমতই বলিব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে মহাভাগবত, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। কলিযুগে ঈশ্বরের অবতার স্বীকৃত হয় না। কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার হয় না বলিয়াই তাঁহাকে "ত্রিযুগ" বলা হয়।" আচার্য্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"কলিযুগে বিষ্ণুর অবতারমাত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। কলিযুগে লীলাবতার হয় না বলিয়াই তাঁহাকে "ত্রিযুগ" বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। এই দুই প্রধান শাস্ত্রেই কলিযুগের যুগাবতার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"
"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥"
"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"
"সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"

প্রতিযুগে শরীরধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ ছিল। সম্প্রতি দ্বাপরান্তে ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দ্বাপরযুগে লোক সকল এই বলিয়া জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া থাকেন। কলিযুগেও লোক সকল নানাতন্ত্রোক্তবিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন শ্রবণ কর। তৎকালে সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সকল কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারাই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

তাঁহার সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, সম, শান্ত, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ প্রভৃতি নাম সকলও উক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল শাস্ত্র জাজ্বল্যমান থাকিলেও যে তোমার শিষ্যগণ ঘোর কুতর্ক উত্থাপন করিতেছেন, সে মায়ারই মহিমা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥"

যাঁহার মায়াশক্তির বৃত্তি সকল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ও সম্বাদের কারণ হয়, এবং আত্মজিজ্ঞাসুরও আত্মবিষয়ক মোহ উৎপাদন করে, আমি সেই অনন্তগুণাকর ভূমা পুরুষকে নমস্কার করি।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথাচার্য্যকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, এখন যাও, গোসাঁইকে সগণে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আইস, প্রসাদ আনাইয়া ভিক্ষা করাও। পরে স্থির হইয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করিও।"

গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দের সহিত প্রভুর বাসায় যাইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। পরে দুঃখিতহৃদয়ে মুকুন্দের সহিত ভট্টাচার্য্যের কথাও শুনাইলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্যের কথায় তোমরা দুঃখ বোধ করিতেছ কেন? তাঁহার কথায় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে চান, সে ত ভাল কথা। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্যই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে তাঁহার কিছুই দোষ হয় নাই।" পরে প্রভু ভক্তগণের সহিত যাইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্নেহ সহকারে প্রভুকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইয়া বৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইয়া তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম সংরক্ষণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রভুও 'অনুগৃহীত হইলাম' বলিয়া তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন। গোপীনাথাচার্য্য রাগে ও দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বেদান্তব্যাখ্যান।

একদিবস প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। দর্শনের পর ভট্টাচার্য্য প্রভুকে নিজভবনে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বসিতে আসন দিয়া স্বয়ং শিষ্যগণকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঠারম্ভ করিয়াই প্রভুকে বলিলেন, "তুমিও পাঠ শ্রবণ কর; বেদান্ত শ্রবণ

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।" প্রভু "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিঃশব্দে ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাতদিন পর্য্যন্ত প্রভু ভট্টাচার্য্যের বেদান্তব্যাখ্যান শ্রবণ করিলেন, একদিনও ভাল মন্দ কোন কথাই বলিলেন না। অষ্টম দিবসে অধ্যাপনার পর শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "তুমি সাত দিন হইল বেদান্ত শ্রবণ করিতেছ, একদিনও ভালমন্দ কিছুই বলিতেছ না, নীরবে শুনিতেছ, বুঝিতেছ কি না তাহাও বুঝিলাম না।" প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ, আমার কিছুই অধ্যয়ন নাই, কেবল আপনার আজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়াই বেদান্ত শ্রবণ করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ভাল, শ্রবণও কর, আর সঙ্গে সঙ্গে যাহা না বুঝ তাহা জিজ্ঞাসাও কর, বুঝিবার চেষ্টা কর, ক্রমেই বুঝিবে।" প্রভু বলিলেন, "কিছুই বুঝি না, কি জিজ্ঞাসা করিব? সূত্রের অর্থ বরং কিছু কিছু বুঝিতে পারি, আপনার ব্যাখ্যানের কিছুই বুঝিতে পারি না।" প্রভুর এই শেষ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বজনসম্মত পাণ্ডিত্যের প্রতি আঘাত অসহ্য হইল। গুরুগম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি সূত্রের অর্থ কি বুঝিয়াছ এবং সূত্রের সহিত ব্যাখ্যানের কি অসঙ্গতি দেখিতেছ, তাহাই বল শুনি।"

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥

স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥"

প্রভু বলিলেন,—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥"

লঘু অর্থাৎ অনতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্প পদ যুক্ত, অনেক অর্থের সূচক ও সর্ব্বতোভাবে সারভূত বাক্যকেই পণ্ডিতেরা সূত্র বলিয়া থাকেন। সূত্রবোধ ব্যাখ্যানসাপেক্ষ।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি র্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ, প্রত্যেক পদের অর্থনির্দ্দেশ, সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাসকরণ, বাক্যের যোজনা অর্থাৎ বাক্যঘটক পদসমূহের অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন ও আক্ষেপের অর্থাৎ আশঙ্কার বা আপত্তির সমাধান অর্থাৎ নিরসন, এই পাঁচটি ব্যাখ্যানের লক্ষণ।

ঐ ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সংক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে।

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকেই ভাষ্য বলা হয়।

ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিবে। আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। ভবদুক্ত ভাষ্য সূত্রের মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে। উপনিষদের যাহা মুখ্যার্থ, তাহাই বেদান্তসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ভবদুক্ত ভাষ্য ঐ মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে। আপনার ভাষ্য উপনিষদুক্ত শব্দ সকলের অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অর্থ-নির্ণয় করিতেছে। প্রমাণের মধ্যে বেদই প্রধান প্রমাণ। বেদ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা সাধারণতঃ অপবিত্র। বেদ বলিতেছেন,

শঙ্খ ও গোময় পবিত্র। বেদ বলাতেই শঙ্খ ও গোময় জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা হইয়াও পবিত্র হইয়াছে। দৃষ্টাদৃষ্টার্থক বেদ লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের নিদান। বেদ আত্মার সত্তা ও স্বরূপ, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক গতি, দেহের সহিত সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ, জীবের পরমপুরুষার্থ ও তৎসাধনোপায় প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানের আকর। যাহা এই সকল জ্ঞানের আকর, তাহা অবশ্য পরতঃ প্রমাণ না হইয়া স্বতঃপ্রমাণ হওয়াই উচিত। বেদ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াই আপনার প্রমাণ হয়েন। মুখ্যার্থ ই স্বতঃপ্রমাণ—স্বপ্রকাশ বেদের প্রাণ। মুখ্যার্থ ত্যাগ করিলে, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের—স্বপ্রকাশত্বের হানি হয়। বেদশব্দে লক্ষণা স্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থ প্রকাশক বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয়, অনুমানাদির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তরূপ স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মুখ্যার্থরূপ কিরণ ভবদুক্ত ভাষ্যরূপ মেঘের লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত অতএব স্বপ্রকাশতারহিত অর্থাৎ পরপ্রকাশ্য হইয়া বুদ্ধিকেও আচ্ছাদন করিতেছে।

"বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান-করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥”

বেদে ও তদর্থনির্ণায়ক পুরাণাদিতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ নিরতিশয় বৃহৎ বস্তুই উক্ত হইয়াছেন। যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যিনি অন্যকে বৃহৎ করেন অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপে ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ। ঐ অর্থে ব্রহ্মবস্তু সশক্তিক বা সবিশেষই হইতেছেন। শক্তিরহিত—ধর্ম্মরহিত—গুণরহিত—বিশেষরহিত বস্তু নিরতিশয় বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন না। বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ তদ্গত ধর্ম্ম দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বৃহৎ ও সর্ব্বাশ্রয় হইলে, তাঁহাতে বৃহত্ত্ব ও সর্ব্বধারকত্ব রূপ ধর্ম্ম স্বীকার্য্য হইতেছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্গুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“যা যা শ্রুতি র্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥”

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে নির্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে সবিশেষও বলিতেছেন। অতএব বিচারে সবিশেষ পক্ষই অধিকাংশ স্থলে বলবান্ হইতেছে।

শ্রুতি সামান্যতঃ দ্বিবিধা; ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী ও নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। ত্রৈগুণ্য-বিষয়িণী শ্রুতি সকল আবার তিন প্রকার। প্রথম প্রকার তল্লক্ষক, দ্বিতীয় প্রকার তন্মহিমাপ্রদর্শক, তৃতীয় প্রকার পরম বস্তুর উদ্দেশক। সৃষ্ট্যাদি-বোধিকা শ্রুতি সকল ব্রহ্মের সৃষ্টি পালন ও সংহার রূপ তটস্থলক্ষণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার লক্ষক হয়েন। যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যবর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করেন, তাঁহারাই তন্মহিমাপ্রদর্শক বেদ। আর যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের ত্রৈগুণ্যের নিষেধ দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশমাত্র করেন, তাঁহারই পরম বস্তুর উদ্দেশক বেদ। এই শেষোক্ত শ্রুতিও আবার দুইপ্রকার। একপ্রকার শ্রুতি গুণনিষেধ দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন এবং অপরপ্রকার শ্রুতি গুণসামানাধিকরণ্য দ্বারা পরমবস্তুর উদ্দেশক বেদ হয়েন। নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী শ্রুতি সকলও দুইপ্রকার। প্রথম প্রকার নির্গুণ বেদ কেবল বিশেষ্যের নির্দ্দেশ

করিয়া ব্রহ্মপর হয়েন এবং দ্বিতীয় প্রকার নির্গুণ বেদ স্বরূপশক্তিবিশিষ্টের নির্দ্দেশ করিয়া ভগবৎপর হয়েন।

ক্রমিক উদাহরণ যথা—

১ ক। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি।

১ খ। "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা" ইত্যাদি।

১ গ ১। "অস্থূলমণনু" ইত্যাদি।

১ গ ২। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি।

২ ক। "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

২ খ। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে স্থষ্ট্যাদি তটস্থ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যবর্ণন দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রচার করা হইয়াছে। "অস্থূলমণম্নু" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণের নিরাস দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে জগদ্রূপা বহিরঙ্গা শক্তির ও জীবরূপা তটস্থা শক্তির সহিত সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ তাদাত্ম্য দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশ অর্থাৎ নাম করা হইয়াছে। আর "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে কেবল বিশেষ্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ দ্বারা ব্রহ্মপরতা এবং "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের নির্দ্দেশ দ্বারা ভগবৎপরতা উক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিপ্রকার শ্রতি ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী এবং শেষোক্ত দুইপ্রকার শ্রুতি নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়িণী। এই ছয় প্রকার ভিন্ন আর কোন প্রকার শ্রুতি নাই। সমস্ত শ্রুতিই এই ষড়্বিধা শ্রুতির অন্তর্গতা। অতএব সকল শ্রুতিরই সার্থকতা হইতেছে, কোন শ্রুতিই নিরর্থক হইতেছেন না।

ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানই বোধিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান্ কখনই নির্বিশেষ হইতে পারেন না। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিতে দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য সামান্যতঃ বিশেষের নিষেধে নহে, প্রাকৃত বিশেষের নিষেধে। প্রথম প্রকার শ্রুতিতে, যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভূত জীবনধারণ করিতেছে ও যাঁহাতে এই সকল ভূত লয় পাইতেছে, এইপ্রকার উক্তি দেখা যায়। এইপ্রকার উক্তি হইতে ব্রহ্মের অপাদানত্ব করণত্ব

ও অধিকরণত্ব রূপ তিনটি অর্থাৎ উপাদানত্ব, নিমিত্তত্ব ও ব্যাপকত্ব রূপ তিনটি সবিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ইন্দ্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্ম জঙ্গম ও স্থাবরের রাজা অর্থাৎ নিয়ন্তা, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উক্তি হইতে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা মহত্ত্ব অর্থাৎ বিশেষত্বই পরিব্যক্ত হইতেছে। তৃতীয় প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম স্থূল নহেন, ব্রহ্ম সূক্ষ্ম নহেন, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত স্থৌল্যাদি গুণের নিরাস দ্বারা তাঁহার উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। চতুর্থ প্রকার শ্রুতিতে, এই সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য নির্দ্দেশ সহকারে তাঁহার উদ্দেশমাত্রই করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। পঞ্চম প্রকার শ্রুতিতে, ব্রহ্ম আনন্দমাত্র, এইপ্রকার বলিয়া কেবল বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষের নিষেধ করা হয় নাই। আর ষষ্ঠ প্রকার শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের শক্তির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের ত্রিপাদৈশ্বর্য্য এবং পাদৈশ্বর্য্য উভয়ই শক্তির বিলাস। শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের ত্রিপাদৈশ্বর্য্যের প্রকাশ এবং পাদৈশ্বর্য্যের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অনুপপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মের শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য।

বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তত্তৎকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত তত্তৎকারণের তত্তৎকারণত্বরূপ ধর্ম্মবিশেষ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সকল উপাদানকারণে এবং সকল নিমিত্তকারণেই উক্ত প্রকার ধর্ম্ম স্বীকার্য্য। ঐ ধর্ম্মই শক্তি। উহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু কারণেরই স্বরূপ। বিবর্ত্তবাদেও রজতাদিস্ফূর্ত্তিবিষয়ে শুক্ত্যাদিকেই অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, অঙ্গারাদিকে রজতাদিস্ফূর্ত্তির অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। শুক্ত্যাদি ভিন্ন অঙ্গারাদিতে রজতাদির স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রস্তুত বিষয়ে ব্রহ্মকেই জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, অন্য কাহাকেও উহার অধিষ্ঠান বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় না। অতএব জগৎকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের কারণত্বরূপ ধর্ম্ম বা শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। শক্তিস্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বেরও হানি হইতেছে না; কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশ তত্ত্বান্তরের অভাব হেতু এবং স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্ব হেতু ও পরমাশ্রয় ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ঐ সকল শক্তির অসিদ্ধত্ব হেতু ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ত্রিবিধ ভেদেরই অভাব হইতেছে। ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুন্তর হইলে, উহার সহিত ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ ঘটিত।

উহা ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর হইলে, ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ ঘটিত। আর ঐ শক্তি ব্রহ্মের ধর্ম্ম না হইয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর হইলে বা ব্রহ্মের অনধীন স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর হইলে, ব্রহ্মের স্বগতভেদের আপত্তি হইতে পারিত। জীবশক্তি ব্রহ্মসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সজাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তন্তর না হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের সহিত মায়ার বিজাতীয় ভেদ ঘটিতেছে না। আর স্বরূপশক্তি ব্রহ্মানতিরিক্ত ও ব্রহ্মাধীন ব্রহ্মধর্ম্ম হওয়ায়, উহার স্বীকারে, ব্রহ্মের স্বগত ভেদের আপত্তি ঘটিতেছে না। স্বরূপের অন্তর্গত না হইয়াও, সামানাধিকরণ্য দ্বারা স্বরূপের লক্ষয়িত্রী জীবশক্তি ব্রহ্মের তটস্থ প্রকাশ; অঘটনঘটনাপটীয়সী বিচিত্রজগজ্জননী মায়াশক্তি ব্রহ্মের অপ্রকাশ; আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশ। জীবশক্তি ব্রহ্মরূপ রবির বহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়া; মায়াশক্তি তমঃস্থানীয়া; স্বরূপশক্তি মণ্ডল-স্থানীয়া। তন্মধ্যে মায়াশক্তি ও জীবশক্তি বিশ্বের উপাদানকারণ এবং স্বরূপশক্তি নিমিত্তকারণ। অতএব উক্ত শক্তিত্রয়ের অনঙ্গীকারে জীবজড়াত্মক জগতের সৃষ্টি অনুপপন্ন হয়। এই নিমিত্তই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মনার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী কার্য্যং নিষচ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তে-শ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি" (২।১।১৮)—শক্তি কারণের অতিশয় বা ধর্ম্ম। উহা কারণে থাকিয়া কার্য্যকে নিয়মিত করে। উহা কার্য্যের নিয়মনার্থ কারণে কল্পিত হয়। উহা কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে এবং অসৎও নহে। উহা যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং অসৎ হইত, তবে কার্য্যকে নিয়মিত করিত না, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে এরূপ একটি নিয়ম হইত না। কার্য্য সকল কারণের অপরিবর্ত্তনীয় ও অবশ্য-ম্ভাবী শক্তির বিকাশ।

বিশেষতঃ যাহাতে জ্ঞান, তাহাতেই অজ্ঞান, ইহাই নিয়ম। উক্ত নিয়ম দর্শনে জ্ঞানের সত্তাতেই অজ্ঞানের সত্তা—জীবজড়াত্মক জগতের সত্তা পর্য্যবসিত হয়। ঐ সত্তার স্ফোরকতারূপ লিঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তির অনুমান করা যায়। অতএব "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি" এই শ্রুতি এবং "বৃহত্ত্বাদ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই স্মৃতি, বৃদ্ধি ও বর্দ্ধন দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি-মত্ত্ব দেখাইতেছেন। এই নিমিত্তই শারীরকভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—

"নমু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ, ন, অয়স্কান্তাদিবদ্রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ" (২।২।২)—যদি বলেন,—আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত, সত্য; কিন্তু তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি নাই; কেবল বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না; অতএব তাঁহার প্রবর্ত্তকতাও নাই;—তাহার উত্তর এই যে, অয়স্কান্ত মণি ও রূপ প্রভৃতি প্রবৃত্তিরহিত বস্তুর প্রবর্ত্তকতার দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবৃত্তিরহিত আত্মারও—ব্রহ্মেরও প্রবর্ত্তকতারূপ স্বরূপসামর্থ্য উপপন্ন হয়। তথাপি যদি বলেন,—যে জগদ্রূপ কার্য্য দ্বারা যে অজ্ঞান অঙ্গীকার করা হয়, সেই জগৎ ও সেই অজ্ঞান এতদুভয়েরই অসত্ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব হেতু তদুভয়ের প্রবর্ত্তকতা দ্বারা লক্ষিতা শক্তিও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাই হইতেছে;—তাহা হইলে, তাদৃশ অসৎ জগতের সৃষ্ট্যাদি দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্মেরও অসত্ত্বপ্রসঙ্গ হইতেছে। আর যদি ব্রহ্মের অসত্তার পরিবর্ত্তে সত্তাই স্বীকার করা হয়, তবে সেই ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত তৎপ্রবর্ত্তকতারূপা স্বরূপশক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। অজ্ঞানের নাশে ঐ স্বরূপশক্তির নাশ হয় না। প্রকাশ্যের নাশে প্রকাশেরও নাশ হয়, কেবল প্রকাশকই থাকেন, এরূপও বলা যায় না; কারণ, প্রকাশরহিত প্রকাশক থাকেন বলিলে, অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়। স্বয়ং শারীরকভাষ্যকারই বলিতেছেন,—

"অসত্যপি কর্ম্মণি সবিতা প্রকাশতে ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ। এবমসত্যপি জ্ঞানকর্ম্মণি ব্রহ্মণস্তদৈক্ষতেতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্তবৈষম্যম্" (১।১।৫)—যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, তখন যেমন সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন, এইরূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্বের উল্লেখ হয়, তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলেও, তৎ ঐক্ষত—তিনি ঈক্ষণ করিলেন—এইরূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্বের উপপত্তি হয় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য ঘটিতেছে না। এই নিমিত্তই সহস্রনামভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে,—"স্বরূপসামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চবিষ্যত ইত্যচ্যুতঃ শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতিশ্রুতেঃ।"

অতএব, যেরূপ বস্তুর ক্রিয়াসামর্থ্যরূপা শক্তি কার্য্যের পূর্ব্বে এবং পরেও মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় বস্তুতে থাকেই, কার্য্যকাল পাইয়া ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মেরও তাদৃশী শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্যা। এই নিমিত্তই শারীরকভাষ্যকারও বলিতেছেন,—

"বিষয়াভাবাদিয়মচেতয়মানতা ন চৈতন্যাভাবাৎ" (২।৩। ২৮)—"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই বুঝা যায় যে, জ্ঞাতা যখন দেখেন না, তখন দ্রষ্টব্যের অভাবেই দেখেন না, দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধের অভাবেই দেখেন না, সামর্থ্যের অভাবে দেখেন না এমন নয়। জ্ঞাতার জ্ঞান-শক্তি অবিনাশিনী, বিশেষতঃ শক্তির উৎপত্তি ও নাশ হয় বলিলে, কার্য্যত্বনিবন্ধন কারণস্বরূপা শক্তির হানি হইয়া উঠে।

আরও দেখুন, আশ্রয়তত্ত্ব সত্তামাত্র না হইয়া জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়াই সঙ্গত; কারণ, যিনি অজ্ঞানের আশ্রয়, তিনি উক্ত অজ্ঞানের বিরোধি জ্ঞানেরও আশ্রয়, ইহা নিয়মিতই আছে। নিয়ম অপরিহার্য্য। আবার যিনি জ্ঞানাশ্রয়, তিনি অবশ্য জ্ঞানশক্তিসমন্বিত। অথবা যখন চিন্মাত্র-ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বিষয়ের নিষেধ করা হয়, অর্থাৎ যখন তাদৃশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয় নাই বলা হয়, তখন, তাদৃশ নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা কে হইবেন? অধ্যাসকেই জ্ঞাতা বলিব? অধ্যাস কখনই জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্ত্তা হইতে পারে না; কারণ, ঐ অধ্যাসও নিষেধের বিষয় হওয়ায় উহা তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্ম্মই হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই জ্ঞাতা হইতেছেন। ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা হয়েন, তবে আমাদিগের পক্ষই পরিগৃহীত হইল। প্রকাশস্বরূপ বস্তুর স্বপ্রকাশশক্তির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃস্বরূপা জ্ঞানশক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; ব্রহ্মের চিদানন্দসত্তা বা চিদানন্দস্ফূর্ত্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। উহার অস্বীকারে মুক্তিতে জীবের স্বরূপাবস্থানরূপ পুরুষার্থও শূন্য হইয়া উঠে। কেবল জড়দুঃখপ্রতিযোগিনী সত্তা বা শূন্যত্ব একই কথা নয় কি? শক্তিপক্ষে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা ও স্বরূপসামর্থ্য একই। ঐ স্বরূপশক্তি অহিকুণ্ডলের ন্যায় ভেদ ও অভেদ উভয়লক্ষণসমন্বিত। অহিকুণ্ডলাধিকরণে স্বয়ং বাদরায়ণ ঐরূপই বলিয়া-ছেন। সবিতা ও তৎপ্রকাশ যেমন বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও, সবিতা তৎপ্রকাশের আশ্রয়রূপে উহা হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিও তদ্রূপ অভিন্ন হইয়াও আশ্রয়া-শ্রিতভাবে পরস্পর ভিন্ন। এই অচিন্ত্য ভেদ থাকাতেই প্রকাশৈকরূপ ব্রহ্মকে স্বপরপ্রকাশনশক্তিসমন্বিত বলা হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দস্বরূপ হইয়াও স্বপর-জ্ঞানানন্দের হেতু হয়েন। বস্তুতঃ একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব এবং ঐ স্বরূপত্বের অপরিত্যাগেই স্বরূপশক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মের কার্য্যোন্মুখ স্বরূপই ব্রহ্মের শক্তি। অন্তরঙ্গকার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম অন্তরঙ্গা শক্তি; বহিরঙ্গকার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম বহিরঙ্গা শক্তি; আর মিশ্রকার্য্যোন্মুখ স্বরূপের নাম তটস্থা শক্তি। উক্ত ত্রিবিধশক্তিমদ্ ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং তাঁহার কার্য্যোন্মুখস্বরূপ শক্তিত্রয় তাঁহার

বিশেষণ। উহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন রূপে চিন্তার অযোগ্য বলিয়া, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকৃত হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধর্ম্মভেদই উক্ত হইয়াছে। অসত্য জড় ও পরিচ্ছেদের ব্যাবর্ত্তনও ধর্ম্মবিশেষই। যদি বলেন, অসত্যের ব্যাবর্ত্তনরূপ সত্য, জড়ের ব্যাবর্ত্তনরূপ জ্ঞান এবং পরিচ্ছেদের ব্যাবর্ত্তনরূপ অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ, ধর্ম্মান্তর নহে, তাহা হইলে, তত্তদ্ব্যাবৃত্তির যোগ্যতাও ব্রহ্মে আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। ঐ যোগ্যতাই কি শক্তি নয়? ঘুরিয়া ফিরিয়া শক্তিই উপস্থিত হইতেছেন।

জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অজ্ঞান সম্ভব হয় না। অথচ ব্রহ্মের অজ্ঞানকৃত শুক্তিতে রজতের ন্যায় কল্পিত জীবত্ব স্বীকৃত হয়। অতএব ব্রহ্ম স্বগত অজ্ঞান দ্বারা আপনাতে জীবত্ব কল্পনা করেন ইহাই বলিতে হয়। ঐ কল্পনাও অবশ্য ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বের অভাবে উপপন্ন হয় না। অতএব পারিশেষ্যপ্রমাণ দ্বারা স্বমতেও ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি অপরিহার্য্য হইতেছে। এই অপরিহার্য্য শক্তির অনঙ্গীকারে বেদান্তের অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বেদান্তের অনুবন্ধ চারিটি;—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। উক্ত অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ই শাস্ত্র-প্রবৃত্তির হেতু। উহাদের অনুরোধেই শাস্ত্রসমূহের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকারী বা প্রথম অনুবন্ধের অনুরোধেই শাস্ত্রের আরম্ভ হয়। অধিকারী না থাকিলে, কাহার জন্য শাস্ত্র আরব্ধ হইবে? অতএব প্রথম অনুবন্ধ অধিকারী অবশ্য অপেক্ষিত। অভিলষিত বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। এই শাস্ত্র অনুশীলন করিলে, এই বিষয় জানিতে পারিব বুঝিয়াই লোকে শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধও অবশ্য অপেক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় বিষয় জানিয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহা না জানিয়া বিবেচক ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রয়োজনের জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। প্রয়োজনও প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া প্রয়োজনরূপ চতুর্থ অনুবন্ধও অবশ্য অপেক্ষিত। সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অনুবন্ধটি পূর্ব্বোক্ত বিষয় ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব উহাও যে অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এক জীবশক্তিরূপ অধিকারীর অস্বীকারে উক্ত চারিটি অনুবন্ধই অসঙ্গত হইয়া যায়। এই অনুবন্ধের সিদ্ধির নিমিত্ত মায়াবাদীরাও কাল্পনিক অধিকারী স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিক্ষা, কল্প,

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে। বেদ অধীত হইলে, আপাততঃ বেদার্থের অবগতি হইবে। জন্মবন্ধের মোচনের নিমিত্ত কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। অন্তঃকরণের মালিন্য দূরীকরণার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনারূপ চিন্তাবিশেষ দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তদনন্তর নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষা এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তন্মধ্যে স্বরূপতঃ অধিকারী না থাকিলেও, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বেদান্তানুশীলনরূপ ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত উল্লিখিত-গুণাবলী-সমন্বিত অধিকারী জীব কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবরূপ অধিকারী সত্যই, কল্পিত নহেন। তিনি জন্মান্তরীয় কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গের পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বা বেদান্তানুশীলনের অধিকারী হইয়া থাকেন। সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে উক্ত সাধনচতুষ্টয় দুর্লভ; সাধুসঙ্গের পরই ঐ সকল সাধনসম্পত্তি লাভ হইতে দেখা যায়। সাধুসঙ্গের পর সাধুর ভাব অনুসারে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে, অর্থাৎ জ্ঞানী সাধুর সঙ্গে জ্ঞান বা ভক্ত সাধুর সঙ্গে ভক্তি লাভ হইলে, শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞানী মুমুক্ষুকে বা ভক্ত মুমুক্ষুকে দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জ্ঞানী মুমুক্ষু ব্রহ্মানুভব দ্বারা ব্রহ্মভাবাপন্ন এবং ভক্ত মুমুক্ষু শ্রীভগবদনুভব দ্বারা শ্রীভগবদ্ভাবাপন্ন হয়েন।

সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্মাখ্য শ্রীভগবানই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। বিবর্ত্তবাদীর মতে, সর্ব্ববিধ-বিশেষণ-রহিত নির্বিশেষ ব্রহ্মই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ, যাঁহার কোন বিশেষণ নাই, তিনি কখন শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারেন না। জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞারহিত বস্তুকেই নির্বিশেষ বস্তু বলা হয়। শাস্ত্র শব্দাত্মক। শব্দ কখনই জাতিরহিত, গুণরহিত, ক্রিয়ারহিত ও সংজ্ঞারহিত বস্তুর বাচক হইতে পারে না। শাস্ত্র জাত্যাদিরহিত বস্তুর বাচক না হইতে পারিলেও, উহার লক্ষক হউক, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, লক্ষণা যে শব্দের শক্তি সেই শব্দই যদি ব্রহ্মের বাচক না হইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণা দ্বারাই বা কিপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারিবে? বিশেষতঃ "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে"—যিনি সকল বেদ কর্ত্তৃক গীত হয়েন, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—

সকল বেদ যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, ইত্যাদি শ্রুতি সকল ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্বই বলিয়া থাকেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার মহত্ত্বপ্রযুক্ত। বেদ সকল ব্রহ্মের মহিমা সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই উহাদের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা-লক্ষণ বা বাচ্য-বাচকতা-লক্ষণ সম্বন্ধও নির্ণীত হইল।

ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষই জীবের প্রয়োজন। বিবর্ত্তবাদীর মতে ঐ প্রয়োজন নিরূপণ করা যায় না। যাঁহার ব্রহ্মভাবাপত্তিলক্ষণ মোক্ষ প্রয়োজন, সেই আত্মা এক বা অনেক? আত্মা এক হইলে, একের মুক্তিতে সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ হয়; অনেক হইলে, অদ্বৈতভঙ্গ হয়। তদ্দোষবারণার্থ ঔপাধিক ভেদের স্বীকারেও উপাধির মিথ্যাত্ব নিবন্ধন মিথ্যোপাধিকৃত বন্ধনের অনুসন্ধান অনুপপন্ন হওয়ায় মোক্ষও অনুপপন্ন হয়। স্বপ্নের ন্যায়, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান সেই পর্য্যন্তই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এরূপও বলা যায় না; কারণ, ঐরূপ বলিলে, একের সুপ্তিতে বা অজ্ঞানে সকলের সুপ্তিসম্ভাবনা বা অজ্ঞানসম্ভাবনা বশতঃ সর্ব্বজগতের অন্ধত্ব বা অপ্রতীতি ঘটে। সর্ব্বজগৎ অন্ধ হইলে, উপদেষ্টার অভাবে মোক্ষ অসম্ভব হয়। সমষ্ট্যভিমানী ঈশ্বরের সুপ্ত্যভাব বা অজ্ঞানাভাব স্বীকার দ্বারা জগৎপ্রতীতির—চক্ষুষ্মত্তাপ্রতীতির উপপাদন করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তাহা হইলে, সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত তাদৃশ ঈশ্বরের অসুপ্তিতে ব্যষ্ট্যভিমানী জীবেরও অসুপ্তিনিবন্ধন বা অজ্ঞানাভাবনিবন্ধন অজ্ঞানকৃত বন্ধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদ্দোষনিবারণার্থ জীবকেই জগতের কল্পক বলিলে, জীবেশ্বরভেদের অভাবে জীবেরই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাপত্তি হেতু, "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ" (৪।৪।১৭)—জগৎসৃষ্টি জীবের কার্য্য নহে, ব্রহ্মেরই কার্য্য; কারণ, যে সকল শ্রুতিতে জগৎসৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, ঐ সকল শ্রুতি ব্রহ্ম-প্রকরণের, জীব-প্রকরণের নহে এবং তৎসন্নিধানে জীবসম্বন্ধীয় কোন কথাই পাওয়া যায় না।—এই সূত্রের সহিত বিরোধ ঘটে। অধিকন্তু একই জীবের যুগপৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব বা মায়েশ্বরত্ব এবং অজ্ঞত্ব বা মায়াধীনত্ব অসম্ভব লইলেও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। অতএব ব্যবহারিকী সত্তার স্বীকার দ্বারা অনুবন্ধের সঙ্গতি করা যায় না। যিনি যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কখন তাহার সত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া তন্মূলক উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। কল্পিত আচার্য্যের কল্পিত উপদেশ দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কল্পিত প্রয়োজন ভিন্ন প্রকৃত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও যে,

তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যজন্ত জ্ঞানকে বন্ধের নিবর্ত্তক বলা হয়, তাহাই যখন অবিদ্যা-কল্পিত, তখন তদ্দ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট সিংহের ভয়ে জাগরণবৎ অবিদ্যাকল্পিত তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না; কারণ, দৃষ্টান্তে স্বপ্নঘটক বায়ুাদিদোষ পারমার্থিক বস্তু এবং স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষও মিথ্যা নহেন, কিন্তু দার্ষ্টান্তে জীবজগদাদি সমস্তই মিথ্যা, অতএব দৃষ্টান্তেরই অনুপপত্তি হইতেছে। শেষ কথা, প্রথম গুরু নারায়ণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কল্পিত, এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ দ্বিতীয় গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কল্পিত; সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা শ্রীকৃষ্ণ-কল্পিতা, ইহাই যাঁহার মত, তাদৃশ প্রজ্ঞামানী বিবর্ত্তবাদী কি কখন তাদৃশী গীতার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন?—কখনই না। অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা যাঁহার মূল অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কি আবার দ্বৈতদর্শন পূর্ব্বক গীতাশাস্ত্রের উপদেশ সম্ভব হয়? বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েও অর্থাৎ মিথ্যার স্মরণ করিয়াও উক্ত উপদেশের সম্ভাবনা করা যায় না। যদি বলেন, সম্ভাবনা করা যায়, তবে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সম্যক্ জ্ঞানের সময়ে ঐ বাধিতানুবৃত্তি অর্থাৎ মিথ্যার স্মৃতি থাকে কি না? থাকে বলিলে, "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" ইত্যাদি গীতোক্তির সহিত বিরোধ ঘটে। গীতায় সম্যক্ জ্ঞানের পর মিথ্যার স্মৃতি স্বীকৃত হয় না। উহা অনুভববিরুদ্ধও বটে। রজ্জুর সাক্ষাৎকারের পর সর্পভ্রমের অনুবৃত্তি কেহই স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের সময়ে মিথ্যার স্মৃতি থাকে না বলিলে, তৎকালে দ্বৈতদর্শনকৃত উপদেশ যে অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ "নষ্টোমোহঃ স্মৃতি র্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" এই গীতোক্তির অনুসারে, সাক্ষাৎ-কার দ্বারা অজ্ঞানের নাশের পর, অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের যুদ্ধানুজ্ঞা, অর্জ্জুনের তদাদেশানুরূপ ভবিষ্যৎকরণীয়প্রতিজ্ঞা ও যুদ্ধাদিপ্রবৃত্তি প্রভৃতি কি সম্ভব হয়?

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র হয়॥

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥"

তার পর, সঙ্ঘাতবাদ, আরম্ভবাদ বা বিবর্ত্তবাদ, এই তিন বাদের কোন বাদেই বেদান্তসূত্রের অভিপ্রায় দেখা যায় না। বেদান্তসূত্র বৌদ্ধের সঙ্ঘাতবাদ এবং তার্কিকের আরম্ভবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে পরিণামবাদ স্থাপন করিলেও, বিবর্ত্তবাদী আচার্য্য সূত্রকারকে ভ্রান্ত মনে করিয়া "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) এই সূত্রোক্ত পরিণামের উপর দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) সূত্রের ভাষ্যে "ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্"—একই ব্রহ্মের যুগপৎ পরিণাম ও অপরিণাম বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উক্ত প্রয়াস কি ব্যর্থ হয় নাই? পরিণামবাদের কি সঙ্গতি হয় না, সামঞ্জস্য হয় না? পরিণাম দ্বিবিধ; স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপলক্ষণপরিণাম। তন্মধ্যে স্বরূপপরিণাম সাংখ্যসিদ্ধান্ত। সাংখ্যেরা বলেন, ব্রহ্মানধিষ্ঠিত-স্বতন্ত্র-প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হয়। আর শেষোক্ত পরিণামই বেদান্তসিদ্ধান্ত। বেদান্তমতে, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম স্বাত্মকত্বাধিষ্ঠিত-নিজশক্তি-বিক্ষেপ দ্বারা জগজ্জন্মাদি সাধন করিয়া থাকেন। যেমন আকাশ হইতে শব্দ ও উর্ণনাভি হইতে সূত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনি তাদৃশ পুরুষোত্তম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত তদীয় শক্তিবিশেষ বিক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হইয়া উক্ত স্পন্দনের তারতম্যে বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই স্বশক্তিবিক্ষেপ দ্বারা বিচিত্রজগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন।

আরও এক কথা, শ্রুতিতে যখন জীবব্রহ্মের অভেদের ন্যায় ভেদও স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে, তখন সর্ব্ববেদবীজভূত প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন পূর্ব্বক তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ব অবধারণ করিয়া তদ্বলে মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ পুরুষোত্তমের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে।

যে বাক্যে উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ অবধারিত হয়, তাহাকেই মহাবাক্য বলা যায়। প্রণব সকল বেদের বীজ। প্রণব হইতেই

সকল বেদের আবির্ভাব। প্রণবেই সকল বেদের পর্য্যবসান। প্রণব ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ নাম ও ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি। প্রণবকে কোথাও কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপও বলা হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের বাচক প্রণবই একমাত্র মহাবাক্য। শঙ্করাচার্য্য প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন করিয়া সামাদিবেদচতুষ্টয়োক্ত তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টয়কেই মহাবাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয় জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক। জীবব্রহ্মের উক্তপ্রকার ঐক্য তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্যচতুষ্টয় ভিন্ন বেদের অপর কোন বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু বেদের সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বেদার্থনির্ণায়ক বেদান্তসূত্র বা ইতিহাসপুরাণাদিতেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, জীবব্রহ্মের ঐক্য নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই। অতএব তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয়ের সর্ব্ববেদার্থে সমন্বয় না থাকায় এবং প্রণবের সর্ব্ববেদার্থে সমন্বয় থাকায়, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যচতুষ্টয়ের মহাবাক্যত্ব না হইয়া একমাত্র প্রণবেরই মহাবাক্যত্ব হওয়াই সঙ্গত। এইরূপে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদি মহাবাক্য না হইল, তবে তদ্বলে মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলা কি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইল না? আরও "যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি" "বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে বুদ্ধিমান্ মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বানিতি" "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি" প্রভৃতি শ্রুতি সকলে ও তদর্থনির্ণায়ক স্মৃতি সকলে যখন শ্রীভগবানের স্বরূপভূত শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপশক্তি-বিলাসভূত ধামাদি স্পষ্টাক্ষরেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তখন উহাদের মায়িকত্ব নির্দ্দেশ করায়, শারীরকভাষ্যকার কি অপরাধী হয়েন নাই?

"অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যাঁরে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥"

পাণিপাদাদি ইন্দ্রিয় সকলের মুখ্যার্থ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে। অপ্রাকৃত পাণিপাদাদিতে উহাদের মুখ্যা বৃত্তি স্বীকৃত হয় না, লক্ষণাবৃত্তিই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা" প্রভৃতি শ্রুতি সকল ব্রহ্মের প্রাকৃত পাণিপাদাদির নিষেধ করিয়া গ্রহণচলনাদি কর্ম্ম দ্বারা অপ্রাকৃত পাণিপাদাদির বিধান করিয়াছেন বলাই সঙ্গত। নঞর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও উহাই স্থির হইয়া থাকে। তথাপি আচার্য্য ঐ সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ, সেই ভগবান্‌কে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা কি সাহসের কার্য্য নহে? শ্রুতি ও স্মৃতি একবাক্যে যাঁহার স্বাভাবিক শক্তিত্রয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিঃশক্তি বলিয়া নিশ্চয় করা কি দুর্ব্বুদ্ধি নয়? ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁহার সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকেন। একই পরমেশ্বর যেমন সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, তেমনি

একই স্বরূপশক্তি সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী স্বরূপা। এই ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের আরও দুইপ্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়েন। একপ্রকার শক্তির নাম মায়াশক্তি ও অপরপ্রকার শক্তির নাম জীবশক্তি। স্বরূপাদি শক্তিত্রয় ভক্তপর্য্যায়, অতএব ঐ তিন শক্তিই পরমেশ্বরে প্রেমভক্তি করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ও তদীয় ধামপরিকরাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বৈচিত্র্য। পরমেশ্বরের এই সকল শক্তি স্বীকার না করা নিতান্ত সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। মায়া যাঁহার অধীন, তিনিই পরমেশ্বর; আর যিনি মায়ার অধীন, তিনিই জীব; ইহাই জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ। এইরূপ স্পষ্ট ভেদ সত্ত্বেও জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ বলা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ জীবকে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার মধ্যবর্ত্তিনী শক্তিরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই ভগবদুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ কল্পনা করা কি অসঙ্গত হইতেছে না? পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার বলাও কি সঙ্গত হইতেছে? যিনি পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়িক বলেন, তিনি কি পাষণ্ডীর মধ্যে গণ্য হয়েন না? এই সকল আচরণে বস্তুতঃ আচার্য্যেরও কোন দোষ দেখা যায় না; কারণ, সাময়িক প্রয়োজন অনুসারেই আচার্য্য এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

হে শঙ্কর, তুমি কল্পিত নিজতন্ত্র দ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর, এইরূপেই উত্তরোত্তর সৃষ্টি চলিবে।

হে দেবি, মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র, যাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়, তাহা আমিই শঙ্করাচার্য্যরূপে কলিকালে জগতে প্রচার করিয়াছি।

বৌদ্ধমতে বিশ্ব অসৎ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, বিশ্ব সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসদ্‌বিলক্ষণ। সদসদ্‌বিলক্ষণা মায়ার অসত্ত্বেই তাৎপর্য্য। মায়াপ্রতিবিম্বিত ঈশ্বর ও তদ্‌বৃত্তিরূপা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত জীবেরও অসত্ত্বেই পর্য্যবসান হয়। সত্তামাত্র ব্রহ্মেরও শূন্যত্বই দেখা যায়। অতএব সূক্ষ্মবিচারে বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ একই।

মায়াবাদের উপর এইপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব দোষারোপ শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় মুখ দিয়া একটিও বাক্য নিঃসৃত হইল না। ভট্টাচার্য্যকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ভট্টাচার্য্য, বিস্মিত হইবেন না, শ্রীভগবানে ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। শ্রীভগবানের এমনই অচিন্ত্য গুণ যে মুক্তপুরুষ সকলও তাঁহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"

শ্রীহরির এমনই গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও সেই উরুক্রমে ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্লোকটি শুনিয়া ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন, আমার শুনিতে বাসনা হইতেছে।" প্রভু বলিলেন, "আপনিই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করুন।" ভট্টাচার্য্য বাক্যস্ফূর্ত্তির অবসর পাইয়া বিনষ্টপ্রায় পণ্ডিত্যাভিমানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তর্ক-শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের উত্থাপন সহকারে উক্ত শ্লোকটিকে নয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, শাস্ত্রব্যাখ্যানবিষয়ে আপনার তুল্য পণ্ডিত আর কে আছে? আপনি যে সকল অর্থ করিলেন, সে সকলই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিল। কিন্তু শ্লোকটির এতদ্ব্যতীত আরও কিছু নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে।"

ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিস্মিত হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য স্বয়ংই অধিকতর বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "শ্রীপাদ, শ্লোকটির আরও কি অভিপ্রায় আছে, তাহা আমার শ্রীপাদের মুখে শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।" প্রভু শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্য্যকৃত নববিধ অর্থের একটিও স্পর্শ করিলেন না। প্রভু বলিলেন,—"শ্লোকটিতে আত্মারামাঃ, চ, মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থাঃ, অপি, উরুক্রমে, কুর্ব্বন্তি, অহৈতুকীং, ভক্তিম্, ইত্থম্ভূতগুণঃ, হরিঃ, এই সর্ব্বসমেত একাদশটি পদ আছে। তন্মধ্যে আত্মা শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব, এই সাতটি। বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে উক্ত হইয়াছে, আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ। চ শব্দের অর্থ একতরের প্রাধান্য,

সমাহার, পরস্পর প্রাধান্য, সমুচ্চয়, যত্নান্তর, পাদপূরণ ও অবধারণ। মুনি শব্দের অর্থ মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি ও মুনি, এই সাতটি। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ধনসঞ্চয়ী ও নির্ধন। নির্ উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়, নিষ্ক্রম, নির্ম্মাণ ও নিষেধ, এবং গ্রন্থ শব্দের অর্থ ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণসংগ্রথনাদি। নির্ উপসর্গের সহিত গ্রন্থ শব্দের সমাসে উক্ত অর্থ-চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি হইয়াছে। গ্রন্থ অর্থাৎ গ্রন্থি নাই যার এই প্রকার সমাসবাক্য দ্বারা প্রথম অর্থের প্রাপ্তি। গ্রন্থ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান নাই যার এই প্রকার সমাস-বাক্য দ্বারা দ্বিতীয় অর্থের প্রাপ্তি। গ্রন্থ অর্থাৎ ধন যাহার নিশ্চিত হইয়াছে এই প্রকার সমাসবাক্য দ্বারা তৃতীয় অর্থের প্রাপ্তি। আর গ্রন্থ অর্থাৎ ধন নাই যার এই প্রকার সমাসবাক্য দ্বারা চতুর্থ অর্থের প্রাপ্তি। অপি শব্দের অর্থ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ ও কামাচারক্রিয়া, এই সাতটি। উরুক্রম শব্দের অন্তর্গত উরু শব্দের অর্থ বড়, এবং ক্রম শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটী, চলন ও কম্প। উরুক্রম শব্দের অর্থ বৃহৎ পাদবিক্ষেপ, শক্তি দ্বারা বিভুরূপে ব্যাপন ধারণ ও পোষণ, পরিপাটীরূপে ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি। কুর্ব্বন্তি ক্রিয়াপদ, কৃ ধাতু পরস্মৈপদী বর্ত্তমানকালের প্রথম পুরুষের বহুবচনে নিষ্পন্ন। কুর্ব্বন্তি এই ক্রিয়াপদটি আত্মনেপদী না হইয়া পরস্মৈপদী হওয়ায়, উক্ত ক্রিয়ার ফল কর্ত্তৃগামি নয়, অর্থাৎ ভজনের তাৎপর্য্য স্বসুখে নয়, পরন্তু কৃষ্ণসুখে, ইহাই বোধ করাইতেছে। কারণ, যজাদি স্বরিত ধাতু এবং সুঞাদি ঞিত ধাতু সকলের উত্তর কর্ত্তৃগামি ক্রিয়াফল বুঝাইতে আত্মনেপদেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে, পরস্মৈ-পদের প্রয়োগ হয় না। এখানে পরস্মৈপদ হওয়ায় ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামি না হইয়া অন্যগামি হইতেছে। অহৈতুকী শব্দের অর্থ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-রহিতা। ভক্তি শব্দের অর্থ শ্রবণাদি সাধনভক্তি ও নবলক্ষণা প্রেমভক্তি। ইত্থম্ভূতগুণঃ শব্দের অর্থ ঈদৃশগুণশালী। গুণ কীদৃশ ?—সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, সর্ব্ববিস্মারক, সর্ব্বত্যাজক ও সর্ব্ববিস্মাপক পূর্ণানন্দময়। হরিশব্দ নানার্থ। উহার মুখ্য অর্থ দুইটি ; অমঙ্গলহারী ও চিত্তহারী।"

তদনন্তর প্রভু শ্লোকোক্ত একাদশ পদের মধ্যে আত্মারাম পদের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করিয়া প্রত্যেক অর্থের সহিত অপর দশটি পদের অর্থ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার অর্থ উদ্ভাবন করিলেন। উদ্ভাবিত প্রত্যেক অর্থেই শ্রীভগবানের শক্তি ও গুণ সকলের অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা সিদ্ধ ও সাধকের আকর্ষণ উক্ত হইল। ভট্টাচার্য্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি অলৌকিকী প্রতিভা দ্বারা

প্রভুকে শ্রীভগবান্ বুঝিয়া, পূর্ব্বকৃত অবজ্ঞা হেতু নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া মনে মনে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইলেন। পরক্ষণেই প্রকাশ্যভাবে আত্মগ্লানি করিতে করিতে প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে অগ্রে নিজের ঐশ্বর্য্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ ও তৎপশ্চাৎ মধুর বংশীধর দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য তদ্দর্শনে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর করুণায় ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তিনি নাম ও প্রেমের মাহাত্ম্যসম্বলিত শতসংখ্যক স্বরচিত শ্লোক দ্বারা প্রভুর স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ভট্টাচার্য্যের দেহে অশ্রুকম্পাদি বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। প্রভু পদ্মহস্ত দ্বারা ভট্টাচার্য্যের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া গোপীনাথাচার্য্যের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি সানন্দে প্রভুকে বলিলেন, "করুণাময় প্রভো, তোমার অপার করুণা; তুমি সেই ভট্টাচার্য্যকে এইরূপ করিলে!" প্রভু বলিলেন, "তুমি শ্রীজগন্নাথের ভক্ত, তোমার সঙ্গের গুণে ভট্টাচার্য্য জগন্নাথের কৃপা পাইয়া এইরূপ হইয়াছেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভট্টাচার্য্যকে স্থির করিলেন। ভট্টাচার্য্য ধৈর্য্যলাভের পর বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আমি তর্কজড়, তুমি আমাকেও উদ্ধার করিলে। যিনি আমাকেও উদ্ধার করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জগদুদ্ধার অল্প কার্য্য।" প্রভু নিজ বাসভবনে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্য দ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন।

সার্ব্বভৌমের ভক্তি।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্রভু এক দিবস জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিলেন। জগন্নাথের পূজারি প্রভুকে জগন্নাথের প্রসাদ মালা ও অন্ন প্রদান করিলেন। প্রভু উহা সানন্দে অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া সত্বর ভট্টাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। প্রভু যখন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে গেলেন, তখন সবে অরুণোদয় হইয়াছে। তখনই ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জাগরিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গৃহের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে প্রভুকে দর্শন

করিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। পরে প্রভুকে বসাইয়া নিজেও বসিলেন। প্রভু অবসর বুঝিয়া অঞ্চল হইতে প্রসাদান্ন লইয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি না হইলেও,—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে প্রসাদ ভোজন করিলেন। প্রভুও—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ভট্টাচার্য্যের হাত ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়নের নীরে উভয়েই অভিষিক্ত হইলেন। পরে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আজি আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করিলাম; আজি আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম; আজি আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য, আজি তুমি অকপটে কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে, কৃষ্ণও অকপটে তোমার প্রতি সদয় হইলেন। যে পর্য্যন্ত আত্মাতে দেহবুদ্ধি ও দেহে আত্মবুদ্ধি, সেই পর্য্যন্তই জীবের দেহবন্ধন। ঐ দেহবন্ধনের মূল অবিদ্যা। জীব যে পর্য্যন্ত অবিদ্যার অধিকারে থাকে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়া প্রত্যবায়ী হইতে হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হয় না। আজি তোমার দেহবন্ধন ছিন্ন হইল; আজি তোমার রজোগুণের ও তমোগুণের নিবৃত্তি হইয়াছে। আজি তোমার মায়াবন্ধনও ছিন্ন হইল; আজি তোমার সত্ত্ববৃত্তিরও নিবৃত্তি হইয়াছে। তোমার মন ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য হইয়া পবিত্র হইয়াছে। আজি তোমার মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইল। আজি তুমি কর্ম্মকাণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে। আজি তুমি বেদধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে।"

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

"সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগকে দয়া করেন, তাঁহারা যদি সর্ব্বতোভাবে অকপটে তাঁহার চরণতরি আশ্রয় করেন, তবে দুস্তর মায়াসাগর পার হইতে ও অনন্তরূপে তাঁহার তত্ত্বও বিদিত হইতে পারেন। আর তাঁহাদিগের শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অহংমমতাও থাকে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। তদবধি সার্ব্বভৌমেরও সকল অভিমান বিগত হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে একান্ত অনুরক্ত হইলেন। আর ভক্তি ভিন্ন অন্যরূপ শাস্ত্রার্থ করেন না। গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত বৈষ্ণবতা দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একদিন ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শনের পূর্ব্বেই প্রভুকে দর্শন করিতে গেলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও বহু স্তবস্তুতি করিলেন। পরে প্রভুর মুখে ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠ সাধন শ্রবণের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। প্রভু—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভু বলিলেন,—"কলিকালে নামরূপেই কৃষ্ণের অবতার। ঐ নাম হইতেই সর্ব্বজগতের নিস্তার হয়। উহার দৃঢ়তার জন্যই তিনবার 'হরের্নাম' বলা হইয়াছে। জড়বুদ্ধি লোক সকলকে বুঝাইবার জন্য পুনশ্চ 'এব' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে অতিশয় দৃঢ়তা সম্পাদিত হইল। জ্ঞান-যোগাদি গতি নয়, হরিনামই একমাত্র গতি, এইটি বুঝাইবার জন্য কেবল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরিশেষে এব-কারের সহিত 'নাস্তি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে, ইহার অন্যথা করিলে, নিস্তার নাই। তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদা নাম গ্রহণ করিতে হইবে। স্বয়ং মানাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অন্যকে মান প্রদান করিতে হইবে। তরুর তুল্য সহিষ্ণু হইয়া তাড়ন-ভর্ৎসন সহ্য করিতে হইবে। অযাচিত-বৃত্তি হইয়া যথা-লাভে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। এইপ্রকার আচরণেই ভক্তি পরিপুষ্ট হইয়া প্রেমফল প্রসব করিয়া থাকে।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চমৎকার বোধ করিলেন। ভট্টাচার্য্যকে চমৎকৃত হইতে দেখিয়া গোপীনাথাচার্য্য বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তোমার তাহাই ঘটিল।" ভট্টাচার্য্য আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি তর্কান্ধ, তুমি পরম ভাগবত, তোমার সম্বন্ধ হেতু প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন।" ভট্টাচার্য্যের বিনয় শুনিয়া

প্রভু তুষ্ট হইয়া ভট্টাচার্য্যকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। পরে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শন কর।" ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত নিজ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুর নিমিত্ত প্রচুর প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিলেন। আর দুইটি শ্লোক লিখিয়া প্রভুকে দিবার নিমিত্ত জগদানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। মুকুন্দ দেখিয়া ঐ শ্লোক দুইটি অগ্রে গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিয়া পরে প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু শ্লোক দুইটি পড়িয়া পত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটি এই,—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

যে কৃপাম্বুধি পুরাণপুরুষ বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীর ধারণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম।

যিনি কালবশে বিলুপ্ত নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার চরণারবিন্দে গাঢ়রূপে লীন হউক।

আর একদিন ভট্টাচার্য্য প্রভুকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মস্তবের অন্তর্গত—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন। প্রভু শ্লোক শুনিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, ঐ শ্লোকের 'মুক্তিপদে' স্থানে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিলে কেন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"যিনি একমাত্র তোমার কৃপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিয়া

জীবনধারণ করেন, তিনি অবশ্য দায়াধিকার স্বরূপে তোমাতে প্রেমই লাভ করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি কথনই মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না, পরন্তু ঘৃণাই করিয়া থাকেন। এই ভাবিয়াই আমি 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়াছি।" প্রভু বলিলেন,—"মুক্তিপদ শব্দের অর্থ ঈশ্বর; কারণ, মুক্তি তাঁহার পদে থাকে; অথবা, মুক্তিপদ শব্দের অর্থ মুক্তির আশ্রয়, এই অর্থেও ঈশ্বরকেই বোধ করায়; অতএব পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "যদিও মুক্তিপদ শব্দের কথিত অর্থও করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু মুক্তিশব্দের রূঢ়ার্থ সাযুজ্যই, ঐ সাযুজ্য ভক্তের ঘৃণ্য বস্তু, অতএব পাঠপরিবর্ত্তনই উচিত বোধ হইতেছে।" প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। যিনি মায়াবাদের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সেই ভট্টাচার্য্যের ঈদৃশ ভক্তি-পক্ষপাত শ্রীচৈতন্যেরই প্রসাদের ফল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বলিয়াই স্থির করিলেন। কাশীমিশ্র প্রভৃতি নীলাচলবাসী বৈষ্ণবগণ ক্রমে ক্রমে প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন।

দক্ষিণভ্রমণ।

এইরূপে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু দক্ষিণদেশ গমনের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই দক্ষিণদেশে যাইবার মানস করিলেন। দক্ষিণদেশে যাইবার মানস করিয়া প্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তোমাদিগের বিচ্ছেদ আমার নিতান্ত অসহ্য, অসহ্য হইলেও বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিবার নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দক্ষিণ গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তোমরা সকলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অনুমতি কর।" প্রভু বিশ্বরূপের উদ্দেশ ছল করিয়া দক্ষিণদেশ কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত গমনে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন বুঝিয়া ভক্তগণ প্রভুর বিরহচিন্তায় কাতর হইলেন। কেহই সাহস করিয়া কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ বলিলেন,—"প্রভো, তুমি ইচ্ছাময়, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পার। তোমার ইচ্ছায় বাধা দেয় এমন কে আছে? কিন্তু একটি কথা, একাকী যাওয়া হইতে পারে না, দুই একজন ভক্তকে সঙ্গে লউন। আমি দক্ষিণদেশের পথ ঘাট সকলই জানি, ইচ্ছা হইলে

আমাকেই সঙ্গে লইতে পারেন। আর যদি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা না হয়, তবে অন্য যাঁহাকে ইচ্ছা হয় তাঁহাকে লইতে পারেন।" প্রভু বলিলেন,—"আমি সন্ন্যাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলাম, তুমি কৌশল করিয়া আমাকে ফিরাইয়া আনিলে। পরে যখন নীলাচলে আসিলাম, তখন দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তোমাদিগের প্রগাঢ় স্নেহে আমার কার্য্যভঙ্গ হয়। এই জগদানন্দ আমাকে বিষয় ভোগ করাইতে চান। মুকুন্দ আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম দেখিয়া দুঃখ পান। দামোদর সদাই আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরিয়া আছেন। উনি লোকাপেক্ষার ধার ধারেন না। আমি কিন্তু লোকাপেক্ষা না করিয়া পারি না। অতএব তোমরা এই নীলাচলেই থাক। আমি সত্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। তোমরা আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান কর।" প্রভুর একাকী তীর্থপর্য্যটনের নিতান্ত আগ্রহ বুঝিয়া নিত্যানন্দ পুনশ্চ বলিলেন,—"যদি একান্তই আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না, তবে এই কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লউন। এই ব্রাহ্মণ নিতান্ত সরলপ্রকৃতি, আপনার ইচ্ছামতই কার্য্য করিবে, আপনার ইচ্ছায় কোন বাধা দিবে না। পরন্তু আপনি পথে প্রেমাবেশে অচেতন থাকিবেন, কৃষ্ণদাস আপনার সঙ্গে থাকিলে অন্ততঃ জলপাত্র ও বহির্বাস রক্ষণাবেক্ষণেরও সাহায্য হইবে।" নিত্যানন্দের এই শেষ কথাটি প্রভু অঙ্গীকার করিলেন। কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুর দক্ষিণগমনের কথা শুনিলেন। তিনি শুনিয়া গমনে বাধা দিবারও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরে গমনবিষয়ে প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্প বুঝিয়া অগত্যা অনুমোদন করিলেন। শেষে বলিলেন,—"এই প্রদেশের রাজা প্রতাপরুদ্র। তিনি সম্প্রতি রাজধানীতে উপস্থিত নাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে অবশ্য আপনাকে এখান হইতে বিদায় দিতেন না, রাখিবার জন্যই বিশেষ আগ্রহ করিতেন। তিনি যুদ্ধার্থ বিজয়নগরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্য সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরে তাঁহার একজন প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আছেন। তাঁহার নাম রামানন্দ রায়। তিনি জাতিতে শূদ্র। শূদ্র বিষয়ী হইলেও, আমার যতদূর বিশ্বাস, তিনি একজন উচ্চ অধিকারী। আমার ইচ্ছা, আপনি গমনকালে তাঁহাকে দর্শন দিয়া যান। আমরা পূর্ব্বে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া অনেক পরিহাস করিয়াছি, কিন্তু এখন আপনার কৃপায় বোধ হইতেছে, তিনি একজন রসতত্ত্ববেত্তা পরম বৈষ্ণব।" প্রভু ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত দেখা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

প্রভু জগন্নাথ দর্শনের পর প্রসাদী আজ্ঞাসূচক মাল্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সমুদ্রতীরপথে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমপ্রদত্ত প্রভুর কৌপীন ও বহির্বাসাদি লইয়া অপরাপর ভক্তগণের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া আপনারা কয়েকজন প্রভুকে লইয়া পুরীর নৈঋর্তকোণে আলালনাথে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের সহিত তত্রত্য চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। দর্শনের পর প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্যারম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে বহুতর লোকের সমাগম হইল। সমাগত লোক সকলও প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই প্রেমে ভাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ সঙ্গী ভক্তগণকে বলিলেন, "গ্রামে গ্রামেই এইরূপ নৃত্যগীত হইবে এবং যাহার সৌভাগ্য সেই দেখিবে।" পরে তিনি "বেলা অনেক হইল, লোকের সমাগম কমিল না" এই কথা বলিয়া প্রভুকে লইয়া মাধ্যাহ্নিক স্নানকার্য্য করিতে গেলেন। তখন লোক-সমাগম কমিয়া গেল। গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া আপনারা তাঁহাদিগের প্রসাদ পাইলেন। ঐ দিবস ঐ স্থানেই যাপিত হইল। পরদিন প্রভাতে প্রভু স্নান করিয়া কৃষ্ণদাসকে লইয়া যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর বিরহে কাতর ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টি না করিয়াই আপনমনে গমন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সেই দিবস সেইখানেই উপবাসী রহিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা নীলাচলে পুনরাগমন করিলেন। এদিকে প্রভু ভক্তগণকে রাখিয়া—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

এই কয়েক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। পথে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন, "বল হরি।" যিনি প্রভুর কথা শুনিয়া "হরি" বলেন, তিনি "হরি বলা" হইয়া যান। তাঁহার জিহ্বা আর হরিনাম ত্যাগ করিতে চায় না। যে আবার সেই "হরি বলা" সাধুর সঙ্গ করে, সেও তাঁহারই মত

"হরি বলা" হইয়া যায়। ক্রমে গ্রাম শুদ্ধ "হরি বলা" হইয়া যায়। প্রভু এইরূপে দক্ষিণদেশে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার করিতে করিতে পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

প্রভু ক্রমে চিল্‌কা হ্রদ অতিক্রম করিয়া কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কূর্ম্মক্ষেত্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরসীমাস্থ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত এবং চিকাকোল হইতে আট মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ঐস্থানে কূর্ম্মাবতার শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। প্রভু কূর্ম্মদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে প্রণতি স্তুতি ও নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। কূর্ম্মের সেবকগণ প্রভুকে বিশেষ সম্মান করিলেন। ঐ গ্রামেই কূর্ম্ম নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রভুকে বিশেষ ভক্তি সহকারে নিজের গৃহে লইয়া পাদ-প্রক্ষালনাদির পর ভিক্ষা করাইলেন। বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া সপরিবারে প্রভুর চরণোদক ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গে গমন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন,—"বিপ্র, এরূপ করিও না; গৃহে থাকিয়াই লোক সকলকে কৃষ্ণোপদেশ কর। যিনি গৃহে থাকিয়া ভক্তিমার্গ যাজন করেন, আমার আজ্ঞায় তাঁহাকে বিষয়তরঙ্গ কখনই কোন বাধা প্রদান করে না।" প্রভুর উপদেশে বিপ্রের প্রভুর সহিত গমনবাসনার নিবৃত্তি হইল। তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া প্রভুকে ঐ দিবস ঐ স্থানেই রাখিলেন। প্রভু ঐ দিবস ঐ স্থানে থাকিয়া একটি অলৌকিক কার্য্য করিলেন। ঐ স্থানে বাসুদেব নামে একজন গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রভুর আগমন শুনিয়া কূর্ম্মবিপ্রের ভবনে আসিয়া তাঁহার চরণদর্শন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া নীরোগ ও কৃতার্থ করিয়া পরদিন প্রভাতেই কূর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিজয়নগর হইয়া সীমাচলে আগমন করিলেন। সীমাচল একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ। সীমাচল নামক পর্ব্বতটি আটশত ফুট উচ্চ। পর্ব্বতের উপর শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রভু বিবিধফল-কুসুমসমাকীর্ণ ও প্রস্রবণান্বিত সীমাচল ও তৎশিখরবিরাজিত শ্রীনৃসিংহদেবকে
তাঁহাকে দ ...য়া প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্যগীতাদি করিলেন। শ্রীনৃসিংহের সেবকগণ
করিয়াছি, বি ...দর করিয়া প্রভুকে মালা ও প্রসাদ দিলেন। প্রভু এক ব্রাহ্মণের
পরম বৈষ্ণ ...ভিক্ষা করিয়া পরদিন প্রভাতে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন।
বলিয়া

রামানন্দমিলন।

প্রভু নৃসিংহক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিন চলিয়া গোদাবরী প্রাপ্ত হইলেন। পবিত্রসলিলা গোদাবরীকে দর্শন করিয়া প্রভুর মনে শ্রীযমুনার এবং তীরবর্ত্তী উপবন সকল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণ হইল। শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীতাদির পর প্রভু গোদাবরী পার হইলেন। পার হইয়া স্নান করিলেন। স্নানের পর ঘাটের অনতিদূরে যাইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন লোক দোলায় চড়িয়া বাজনা বাদ্য সহকারে স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ব্রাহ্মণও আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বিধিমত স্নান ও তর্পণাদি করিয়া তীরে উঠিলেন। প্রভু দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনিই রামানন্দ রায়। রামনন্দ রায়ের সহিত মিলিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল, কিন্তু উঠিলেন না, ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক বসিয়া থাকিলেন।

এদিকে রামানন্দ রায় তীরে উঠিয়াই প্রভুকে দেখিলেন। তিনি সেই শতসূর্য্যসমকান্তি, অরুণবসনপরিহিত, সুবলিত-দেহ-সমন্বিত, কমললোচন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর প্রভুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ পতিত দেখিয়া বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" ইচ্ছা হইল, রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, বলিলেন, "তুমি কি রামানন্দ রায়?" রামানন্দ রায় বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই শূদ্রাধম দাস।" শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্র প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই প্রেমাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই অশ্রুকম্পাদি বিকার সকলের আবির্ভাব হইল। দেখিয়া রামানন্দ রায়ের সঙ্গের লোক সকল বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, এই সন্ন্যাসীকে ত মহাতেজস্বী দেখিতেছি, ইনি কেন শূদ্র বিষয়ীকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন? আর এই মহারাজও ত পরমগম্ভীর ও মহাপণ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত ও অস্থির হইলেন? প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই বিজাতীয় লোক সকল দেখিয়া আপন আপন ভাব সম্বরণ করিলেন। সুস্থ হইয়া উভয়েই বসিলেন। বসিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া আমাকে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ

করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্তই এই স্থানে আসিয়াছি। অনায়াসেই তোমার দর্শন পাইলাম, ভাল হইল।” রাম রায় বলিলেন, “সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া পরোক্ষেও আমার হিতসাধনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপাতেই আপনার চরণদর্শন লাভ হইল। আজ আমার মানবজন্ম সফল হইল। আপনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কৃপা করিয়া তাঁহারই প্রেমের অধীন হইয়া এই অস্পৃশ্য অধমকে স্পর্শ করিলেন। কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর কোথায় আমি রাজসেবী অধম বিষয়ী শূদ্র। আপনি আমাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বা শাস্ত্রের ভয় করিলেন না। আপনার স্বাভাবিকী করুণার বশে আপনি সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। আপনি স্বীয় করুণার গুণেই নিন্দ্য কর্ম্ম আচরণ করেন। আপনি পরম দয়ালু ও পতিতপাবন বলিয়া আমার নিস্তারার্থ এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। মহতের স্বভাব এই যে, তাঁহারা নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও পরোপকারার্থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নানা-জাতীয় লোক সকল রহিয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিয়া সকলেরই মন দ্রবীভূত হইয়াছে। সকলেরই অঙ্গে পুলক ও নেত্রে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হইতেছে। আপনার আকার প্রকারে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হইতেছে। জীবে এইরূপ অপ্রাকৃত গুণ সম্ভব হয় না।” প্রভু বলিলেন, “তুমি মহাভাগবতোত্তম, তোমার দর্শনেই সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি কঠোর মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তোমার দর্শনে আমারও মন গলিত হইয়াছে, তোমার স্পর্শে আমাতেও কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব বোধ হয়, আমার কঠিন হৃদয় কোমল করিবার নিমিত্তই সার্ব্বভৌম আমাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।” এইপ্রকার পরস্পর স্তুতিবাদ হইতেছে, এমন সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। পরে হাসিয়া রাম রায়কে বলিলেন, “তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আবার দর্শন পাইবার ইচ্ছা করি।” রাম রায় বলিলেন, “যদি এই পামরকে শোধন করিবার নিমিত্ত আগমন হইল, তবে দিন পাঁচ সাত অবস্থান করিতে অনুমতি হয়; কারণ, দর্শনমাত্র এই দুষ্ট চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না।” এই কথা বলিয়া রাম রায়, ত্যাগ অসহ্য হইলেও, প্রভুকে ছাড়িয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ বিশেষ ভক্তি সহকারে

প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই পরম উৎকণ্ঠার সহিত দিবস অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া প্রভু সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া বসিলেন। এই সময়ে রামরায়ও একজনমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। রামরায় আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু উঠিয়া প্রণত ভৃত্যকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে উভয়েই আসন গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণের পর প্রভু রাম রায়কে বলিলেন, "পুরুষের প্রয়োজন যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, এমন একটি শ্লোক পাঠ কর।"

রাম রায় পাঠ করিলেন,—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

মনুষ্য যে অধিকারানুরূপ বর্ণাশ্রমাচার পালন করেন, সেই আচার পালনেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ইহাই বিষ্ণুসন্তোষের উপায়, এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

প্রভু বলিলেন,—"বিষ্ণুর আরাধনা বা বিষ্ণুভক্তিই সাধ্যবস্তু ইহা ঠিক, এবং অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাচার পালন করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তমালিন্যকর রজস্তমোগুণের অভিভবের অনন্তর মহৎসঙ্গাদি দ্বারা ভক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে ইহাও স্থির; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার, সাধ্যভক্তির সাক্ষাৎ সাধন না হইয়া, পরম্পরায় সাধন হওয়ায়, উহাকে অন্তরঙ্গ সাধন না বলিয়া বাহ্য বা বহিরঙ্গ সাধনই বলা যায়; অতএব উক্ত শ্লোক দ্বারা সাধ্যের নির্ণয় না হইয়া সাধনেরই নির্ণয় হইল। সাধনের নির্ণয়ে সাধ্যের নির্ণয় স্বীকার করিয়া লইলেও, অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না; কারণ, উক্ত বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক দ্বারা যে সাধনের নির্ণয় হইল, তাহাও বহিরঙ্গ সাধনমাত্র; অতএব অন্য শ্লোক পাঠ কর।"

রাম রায় পাঠ করিলেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

কৌন্তেয়, তুমি ভোজন, হবন, দান, তপ ও অপর যে কিছু কর্ম্ম কর, সে সকল আমাতে অর্পণ কর।

রামরায়ের এই গীতার শ্লোকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—শ্রীভগবানের আজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার পরিপালন সাধ্যভক্তির

বহিরঙ্গ সাধন ; কারণ, উহা, ফলকামনারহিত বলিয়া উক্ত হইলেও, ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত—আগ্রহরহিত না হওয়ায় সকামবৎ, অতএব কঠোর ; কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন ; কারণ, উহা ফলের প্রতি দৃষ্টিরহিত—আগ্রহরহিত হওয়ায়, নিষ্কাম, অতএব হৃদ্য। উক্ত কর্ম্মের ফল কর্ম্মের সহিত প্রিয় শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায়, উহা সাধ্যভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন হওয়াই সঙ্গত।

প্রভু বলিলেন, "উহাও অন্তরঙ্গ সাধন নহে, পরন্তু বাহ্যই। ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন ভক্তিই হওয়া উচিত। কৃষ্ণার্পিত কর্ম্মও কর্ম্মই, ভক্তি নহে। কি ভগবদাজ্ঞাবোধে বা কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত, ফলের প্রতি দৃষ্টিযুক্ত বর্ণাশ্রমাচারপালনরূপ কঠোর সকাম কর্ম্ম, কি ফলের প্রতি লক্ষ্যরহিত কৃষ্ণার্পিত হৃদ্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উভয়ই কর্ম্ম, উভয়ই আরোপসিদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি নহে। উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মই ভক্তির ন্যায় চিত্তশুদ্ধিকর হওয়ায় ভক্তির আকারে দৃষ্ট অতএব ভক্তিনামেই অভিহিত হইয়া থাকে। উহারা ভক্তি না হইয়াও ভক্তিত্বের আরোপ হেতু ভক্তিনামে উক্ত হয় বলিয়াই উহাদিগকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। আরোপসিদ্ধা ভক্তি কখনই পরমপুরুষার্থের অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারে না। অতএব এই কর্ম্মযোগরূপ বাহ্য সাধনও ত্যাগ করিয়া, যাহা অন্তরঙ্গ সাধন তাহাই বল।"

রাম রায় পাঠ করিলেন,—

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

সখে, স্বধর্ম্মের গুণদোষ বিচার করিয়া মদুপদিষ্ট স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

রাম রায়ের উক্ত শ্লোকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—

সাধকের দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মাচরণ ও আচরিত স্বধর্ম্মের ফলার্পণই কর্ত্তব্য। পরে যখন দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তদুপদিষ্ট কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া থাকেন। কর্ম্ম সকল আরোপসিদ্ধা, শরণাপত্তি স্বরূপসিদ্ধা।

প্রভু বলিলেন,—"শরণাপত্তি স্বরূপসিদ্ধা একথা সত্য ; কিন্তু শরণাপত্তিতেও দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, সাধক দুঃখনিবারণার্থই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন

হয়েন বলিয়া, শরণাপত্তিও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণরহিত অন্যাভিলাষশূন্যা ভক্তিকেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়। শরণাপত্তি জ্ঞানকর্ম্মের আবরণরহিত হইতে পারিলেও দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায় অন্যাভিলাষশূন্যা হইতে পারে না। অতএব শরণাপত্তিকেও বাহ্য জানিয়া অন্তরঙ্গ সাধন বল।"

রাম রায় পাঠ করিলেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

যিনি শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপসাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মভূত অতএব প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, পরন্তু সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

রাম রায়ের উক্ত শ্লোকটি পাঠ করিবার অভিপ্রায় এই—

শরণাপত্তির দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, উহা উত্তমাভক্তির মধ্যে গণ্য হইল না। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দুঃখনিবারণেও তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না; কারণ, জ্ঞানমার্গে সুখ ও দুঃখ বাস্তব নহে। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন হউক।

প্রভু বলিলেন,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য না থাকিলেও, জ্ঞানের আবরণ থাকায়, উহাও উত্তমা ভক্তির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা স্বরূপসিদ্ধাই নহে, পরন্তু সঙ্গসিদ্ধা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞানই অঙ্গী, ভক্তি উহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গী জ্ঞান অঙ্গ ভক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ভক্তির ফল মোক্ষ সাধন করিতে পারিলেও ভগবৎসাক্ষাৎকার দ্বারা প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। অতএব উহাও বাহ্য জানিয়া, উহার পর যাহা তাহাই পাঠ কর।"

রাম রায় পাঠ করিলেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

যিনি তোমার স্বরূপৈশ্বর্য্যের বিচারবিষয়ে প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুনিবাসে অবস্থিতি করিয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক উক্ত ও অনায়াসে কর্ণপথপ্রবিষ্ট তোমার কথাকে কায়মনোবাক্য দ্বারা সৎকার করিয়া জীবনধারণ করেন, তুমি ত্রিলোক-

মধ্যে অন্যের অজেয় হইলেও, তিনি তোমাকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া থাকেন।

রাম রায় যে অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলেন, তাহা এই,—

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও যখন উত্তমাভক্তি বলিয়া গণ্য হইল না, তখন অন্যাভিলাষবর্জ্জিত ও জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণরহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তিই উত্তমাভক্তি হইতেছেন।

প্রভু বলিলেন,—"হাঁ, ইহাই উত্তমা ভক্তি, কিন্তু এই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিও সাধ্যভক্তি নহে, পরন্তু সাধনভক্তি। সাধনভক্তি শুনিলাম। অতঃপর সাধ্যভক্তি যাহা, তাহাই বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"প্রেমভক্তিই সকল সাধ্যের সার।"

"নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্বু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

কারণ, বিবিধ উপচার দ্বারা করণীয় আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করিয়াও, কেবল প্রেম দ্বারাই ভক্তের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখদায়ক হয়। প্রেমের লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের শূন্যতা বশতঃ উপচারকৃত পূজনের যাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে, প্রেমের লাভ হইলে হৃদয়ের পূর্ণতা বশতঃ আর উপচারকৃত পূজনের তাদৃশ সুখপ্রদত্ব থাকে না, প্রেমিক ভক্ত প্রেম দ্বারাই কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

ঐ প্রেমও আবার অতীব দুর্লভ বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে,—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

কৃষ্ণভক্তিরস দ্বারা ভাবিত মতি যদি কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাও, তবে উহা যত্ন করিয়া ক্রয় কর; উহার মূল্য একমাত্র লালসা, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতিদ্বারাও ঐ মতি লাভ করা যায় না।

প্রভু বলিলেন,—"প্রেমভক্তি সাধ্যের সার তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে প্রেম বলিলে, উহা মমত্ববর্জ্জিত শান্তপ্রেম। উহা হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেম যাহা, তাহাই বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥"

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মনুষ্য নির্ম্মল হয়েন, সেই তীর্থপাদ প্রভুর দাসগণের আর কি অলভ্য থাকে?

প্রভু বলিলেন,—"দাস্যপ্রেম মমতাযুক্ত বলিয়া মমতারহিত শান্তপ্রেম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব উহা হইতে উৎকৃষ্ট যাহা তাহাই বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

প্রভু বলিলেন,—"গৌরবভাবময় দাস্যপ্রেম হইতে বিশ্বাসভাবময় সখ্যপ্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব উহা হইতে উৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

প্রভু বলিলেন,—"বিশ্বাসভাবময় সখ্যপ্রেম হইতে অনুগ্রাহ্যভাবময় বাৎসল্য-প্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, অতএব তদপেক্ষা যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

অনুগ্রাহ্যভাবময় বাৎসল্যপ্রেম হইতে স্বসুখতাৎপর্য্যবর্জ্জিত সম্ভোগভাবময় কান্তাপ্রেমের উৎকৃষ্টতা অপরিহার্য্য। কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন বহুবিধ, অতএব সাধনানুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্যও বহুবিধ। যাঁহার যে ভাবে নিষ্ঠা, তাঁহার সেই ভাবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে, ভাব সকলের তারতম্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তদনুসারে কান্তাপ্রেমকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। গুণাধিক্য ও স্বাদাধিক্য বশতঃ কান্তাপ্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, আকাশ ও বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ বায়ু তেজ ও জলের গুণ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শান্তের গুণ দাস্যে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে, শান্ত দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং শান্ত দাস্য

সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ কান্তাপ্রেমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কান্তাপ্রেমে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও সেবা, সখ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা ও অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অসঙ্কোচ ও মমতাধিক্য, এই সমস্ত গুণই দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু কান্তাপ্রেমে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবারূপ গুণটি অধিক দেখা যায়। গুণাধিক্য হেতু প্রতিরসে উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য হয়। মধুর রস সর্ব্বগুণের আঁকর, অতএব উহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু। মধুররসে স্থায়ী ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ভাবাবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ঐ ভাবাবস্থা এক কান্তাপ্রেম ভিন্ন অপর কোন প্রেমেই দেখা যায় না। অতএব সীমান্তপ্রাপ্ত কান্তাপ্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কান্তাপ্রেমেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

যিনি যেরূপ ভজনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ইহা স্থির; কিন্তু ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমের অনুরূপ ভজন আবার অপর কেহই করিতে পারেন না; অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমের নিকট ঋণী।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

তোমরা নিরুপাধিভজনপরায়ণা। তোমাদিগের সাধুকৃত্য অসাধারণ। ঐরূপ অসাধারণ সাধুকৃত্য আমি সুচিরকালেও সাধন করিতে পারিব না। তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমার ভজন করিয়াছ। আমি কিন্তু কেবল তোমাদিগকে ভজন করিতে পারিলাম না। অতএব তোমাদিগের নিজ সাধুকৃত্যই ঐ সাধুকর্ম্মের প্রতিকার সাধন করুক। আমি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের নিকট ঋণীই রহিলাম জানিও।

শ্রীকৃষ্ণ অপরিসীম মাধুর্য্যের আশ্রয় হইয়াও ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব পর্য্যন্ত ভাবের অধিকারিণী ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই অধিকতর শোভা ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রভু বলিলেন,—"ব্রজদেবীনিষ্ঠ কান্তাপ্রেমই যে সাধ্যের সীমা, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু ইহার পর যদি আরও কিছু বলিবার থাকে, কৃপা করিয়া তাহাও বল।"

রায় রামানন্দ বলিলেন,—"ইহার পরও প্রশ্ন করেন, এমন লোক পৃথিবীতে

আছেন, এতদিন আমি জানিতাম না। আপনি যখন প্রশ্ন করিলেন, তখন বলিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। বেদে বেদান্তে পুরাণেতিহাসে ও তন্ত্রে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধামাধবের প্রেমমহিমা উক্ত হইয়া থাকে।"

ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে,—

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা।"

গোপালতাপনীয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ন্ চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

বৃহদ্‌ গোতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

শ্রীমাধব শ্রীরাধার সহিত ও শ্রীরাধা শ্রীমাধবের সহিত সকল লোকেই বিরাজিত আছেন।

বিকসিত-পুণ্ডরীক-নয়ন, নবীননীরদসমকান্তি, বিদ্যুল্লতাসদৃশ-পীতবাস-পরিহিত, বনমালাবিরাজিতগলদেশ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, দ্বিভুজ, গোপগোপীগোধনমণ্ডিত, সুরদ্রুমলতামণ্ডপাশ্রিত, দিব্যালঙ্কারভূষিত, রত্নপঙ্কজাসীন, কালিন্দীসলিলসংসক্ত-বায়ুসেবিত শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া মনুষ্য সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রিয়া, তদীয় সরোবরও তাদৃশ প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

দেবী শ্রীরাধিকা অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী, সর্ব্বারাধ্যা, লক্ষ্মীগণের মূলস্বরূপা, সর্ব্বশোভার একমাত্র আশ্রয় ও মদনমোহনমোহনকারিণী। এই নিমিত্তই তিনি পরাশক্তি বলিয়া অভিহিতা হয়েন।

প্রভু বলিলেন,—"আরও বল, আমার শুনিয়া বিশেষ সুখোদয় হইতেছে। তোমার মুখে অমৃতময়ী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে শ্রীরাধাকে সর্ব্বসমক্ষে লইতে না পারিয়া গোপনে লইয়া গেলেন। ইহাতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীতে অপেক্ষা আছে। অন্যাপেক্ষা থাকিলে, প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। অতএব এই বিষয়ের মীমাংসা কি বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর অপেক্ষায় শ্রীরাধাকে গোপনে লইয়া যান নাই। শ্রীরাধাই মান করিয়া রাস ত্যাগ করিয়া যান। শ্রীরাধিকা রাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করেন।"

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্-সারভূত-রাসলীলা-বাসনাতে বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খলরূপিণী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অন্য ব্রজসুন্দরীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের কান্তা সকল সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে ত্রিবিধা। এই ত্রিবিধা কান্তারই কান্তাভাব স্থায়ী। তন্মধ্যে সাধারণীর কান্তাভাব সম্ভোগেচ্ছা-নিদান, সমঞ্জসার কান্তাভাব ক্বচিৎ ভেদিতসম্ভোগেচ্ছ এবং সমর্থার কান্তাভাব স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছ। সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবের নিদান অর্থাৎ মূল, তাহাকেই সম্ভোগেচ্ছানিদান কান্তাভাব বলা যায়; সম্ভোগেচ্ছা যে কান্তাভাবে কখন কখন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই নাম ক্বচিৎ ভেদিতসম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব; আর যে কান্তাভাবে সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্বরূপের সহিত অভেদে প্রকাশ পায়, তাহার নাম স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব। কুব্জাদি সাধারণী কান্তার কান্তাভাবই সম্ভোগেচ্ছানিদান কান্তাভাব; কারণ, তাঁহাদিগের প্রেম সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সমঞ্জসা মহিষীগণের কান্তাভাবই ক্বচিৎ ভেদিতসম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব; কারণ, তাঁহাদিগের কান্তাভাব কখন সম্ভোগেচ্ছা ভিন্ন প্রকাশ পায় না এবং কখন তদ্ভিন্নও প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর সমর্থা ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবই স্বরূপাভিন্নসম্ভোগেচ্ছ কান্তাভাব; কারণ, তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা নিত্যই স্থায়ী ভাবের সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের অন্তর্ভূত হইয়া কেবল শুদ্ধ-স্থায়িভাব-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাঁহাদিগের

সম্ভোগেচ্ছা কখনই স্থায়ী ভাবের স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশ পায় না। সাধারণী কান্তাদিগের বলবতী সম্ভোগেচ্ছা সকল সময়েই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে বিভিন্নাকারে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য-স্বসুখ-বাসনা-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধারণী কান্তা সকল স্বরূপতঃ স্বসুখতাৎপর্য্যবর্জ্জিত হইলেও, তাঁহাদিগের প্রেম কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য-স্বসুখ-বাসনার আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াতে, উহার কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় স্বরূপের প্রকাশ থাকে না, স্বসুখতাৎপর্য্যময় রূপান্তরই লক্ষিত হইয়া থাকে। সমঞ্জসা কান্তাদিগের ঐ সম্ভোগেচ্ছা কখন কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য-স্বসুখ-বাসনার আকারে উত্থিত হইয়া সাধারণীর ন্যায় স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে এবং কখন কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া উক্ত প্রেমের অন্তর্ভূত হইয়া সমর্থার ন্যায় স্বরূপাভিন্নরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমর্থা ব্রজদেবীগণের সম্ভোগেচ্ছা সর্ব্বদাই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী। তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা কখনই কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য-স্বসুখ-বাসনা-রূপে উত্থিত হয় না। ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণসুখ ভিন্ন আত্মসুখের অনুসন্ধানই থাকে না। তাঁহাদিগের আত্মসুখের অনুসন্ধান না থাকাতেই তাঁহাদিগের সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধ কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়া কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই ব্রজদেবীগণের কান্তাভাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। যদি কেহ আপত্তি করেন—সমর্থা ব্রজদেবীগণের আত্মসুখে তাৎপর্য্য না থাকুক, কিন্তু সঙ্গকালে আত্মসুখ অপরিহার্য্য—আমরা তাহা স্বীকার করি না; কারণ, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সুখের অনুভব সম্ভব হয় না। অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগে সুখোৎপত্তির দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না; কারণ, যাঁহার অযাচিত অন্নপানাদির উপভোগে সুখ জন্মে, তিনি যে সুখানুসন্ধানরহিত, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কিন্তু সর্ব্বথা সুখানুসন্ধানরহিত ব্যক্তির অন্নপানাদির উপভোগে সুখানুৎপত্তি বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়। জাগ্রদবস্থায় বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ান্তরের অনুভবাভাব সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। সুষুপ্তির ত কথাই নাই। ব্রজদেবীগণ সদাই তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদিগের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের অনুভব থাকে না। তাঁহারা নিত্য তুরীয় অবস্থায় থাকিয়া স্থূলসূক্ষ্মাদির কোন সমাচারই রাখেন না। এক্ষণে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, তাঁহাদিগের স্থূলসূক্ষ্মাদির অনুভব না থাকিলেও, তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখবিশেষের অনুভব হউক? এরূপ আপত্তি আমরা ইষ্টাপত্তি মনে করি। তুরীয়স্থা ব্রজদেবীগণ তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখবিশেষের অনুভব করেন, ইহা

আমরা অস্বীকার করি না। তবে ঐ সুখ যে এই সুখ নহে, উহা যে প্রাকৃত সুখ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেরূপ স্থূলে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে সূক্ষ্মে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার ভিন্ন, যেরূপ সূক্ষ্মে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে কারণে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার ভিন্ন, তদ্রূপ তুরীয়ে বা সিদ্ধদেহে পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও তৎপ্রকার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান ও তৎপ্রকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুখ জ্ঞানবিশেষ। অতএব সিদ্ধদেহসম্পন্না ব্রজদেবীগণের তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখের অনুভব যে স্থূলাদিসংস্পর্শ-জনিত সুখানুভব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা স্থির। উহা সমাধিসুখ হইতে বা ব্রহ্মানুভবজনিত সুখ হইতেও স্বতন্ত্র।

সাধারণ ব্রজদেবীগণের প্রেম হইতে আবার শ্রীরাধাপ্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ আছে। সাধারণ ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ পাইয়া আর কোন দিকে চাহিলেন না, আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। শ্রীরাধা কিন্তু সেরূপ বিভোর হইলেন না। শ্রীরাধা দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বেই এক এক কৃষ্ণ, ঠিক সেইরূপ সাধারণভাবে তাঁহার পার্শ্বেও এক কৃষ্ণ রহিয়াছেন। এই দেখিয়াই শ্রীরাধার মান হইল, তিনি মানিনী হইয়া রাস ছাড়িয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাস ছাড়িয়া গেলেন, চন্দ্রহারের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল, চন্দ্র সকল ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা। শ্রীরাধিকা চলিয়া গেলেই শ্রীকৃষ্ণও চলিয়া গেলেন, রাসমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রীরাধিকা রাস-মণ্ডল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মধ্যমণির অভাবে মণির মালা শোভাচ্যুত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আর রাস ভাল লাগিল না, তিনিও শ্রীরাধিকার অনুসরণ করিলেন।

রাম রায়ের কথা শুনিয়া প্রভুর মুখকমল উৎফুল্ল হইল। তিনি প্রীত হইয়া বলিলেন,—"ইহা শুনিবার নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। এখন আমি সাধ্যসাধনের তত্ত্ব জানিলাম। কিন্তু আরও কিছু শুনিবার অভিলাষ হইতেছে। কৃপা করিয়া কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বল। এই সকল বিষয় তোমার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট শুনিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি ভিন্ন অপর কেহই এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ নহে।"

রাম রায় প্রভুর ঈদৃশ বিনয়মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, আমি ত কিছুই জানি না; তুমি যাহা বলাইলে, তাহাই

বলিলাম। লোকে যেমন শুকপক্ষীকে পাঠ পড়াইয়া তাহার মুখ হইতে ঐ পাঠ শ্রবণ করিয়া সুখ পায়, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে বলাইয়া শুনিতেছেন এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ আমি ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহার কিছুই জানি না।"

প্রভু বলিলেন,—"আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না। মায়াবাদে আমার চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সঙ্গগুণে ঐ মন কিছু নির্ম্মল হইলে, আমি তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ভক্তিতত্ত্ব আমিও জানি না, এক রামানন্দ জানেন, তিনিও এখানে নাই। তাঁহার মুখে তোমার মহিমা শুনিয়াই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্তুতি করিতেছ, কিন্তু বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন বা শূদ্রই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু। আমি সন্ন্যাসী বলিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার তত্ত্ব বলিয়া আমাকে পূর্ণ-মনোরথ কর।"

রাম রায় বলিলেন,—"আমি নট, তুমি সূত্রধার; তুমি আমাকে যেমন নাচাইতেছ, আমিও তেমনি নাচিতেছি; আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণা-ধারী, তোমার যাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমিও তাহাই উচ্চারণ করিতেছি।"

যদিও রামানন্দ রায় বুঝিতেছেন যে, আমি যাঁহার সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করিতেছি, ইনি স্বয়ং ভগবান্, তথাপি তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

"সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, তাঁহার আদি নাই। তিনি কারণ সকলেরও কারণ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বরস-পূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত অপ্রাকৃত নবীন মদন। তিনি অন্য প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মদন সকলের মূলাশ্রয়। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত হইয়া নিত্য নূতনরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। তিনি কোটিকন্দর্প-লাবণ্য এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত কন্দর্প সকলের মূলস্থানীয়। শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্তই কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা তাঁহার উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রী, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলেরই, চিত্ত আকর্ষণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ কামকেও মোহিত করিয়া থাকেন। নানাভক্তের আস্বাদ্য রস নানা-

বিগ; তিনি ঐ সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয়। তিনি শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধারী। আত্ম পর্য্যন্ত সকলের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীনারায়ণাদিরও চিত্ত হরণ করেন। তিনি লক্ষ্মী প্রভৃতি নারীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের মাধুর্য্য নিজের চিত্তকেও হরণ করে, তিনি আপনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।"

"এই সঙ্ক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিলাম। অতঃপর শ্রীরাধার স্বরূপ বলিতেছি।"

"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। ঐ অনন্ত শক্তি সকল সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। উক্ত ভাগত্রয় যথা,—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তিই স্বরূপশক্তি ও সর্ব্বশক্তির প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, অতএব তদীয় স্বরূপশক্তিও ত্রিরূপাত্মিকা। ঐ সচ্চিদানন্দময়ী ত্রিরূপাত্মিকা স্বরূপশক্তি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপিণী এবং অধিষ্ঠাতৃরূপতঃ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। তত্তৎপ্রাধান্যে সন্ধিন্যাদি নাম জানিতে হইবে। সন্ধিনীপ্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ধামাদি ও গুরুবর্গ; সম্বিৎপ্রধানা অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান ও সখিবর্গ; আর হ্লাদিনীপ্রধানা অধিষ্ঠাত্রী ভক্তি ও কান্তাবর্গ। শান্ত ও দাস সকল কেহ সন্ধিনীপ্রধান ও কেহ সম্বিৎপ্রধানের মধ্যে নিবিষ্ট। হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী দ্বারাই সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিজানন্দাধিষ্ঠাত্রী হ্লাদিনীশক্তি দ্বারা নিজানন্দ অনুভব করেন। এই হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। হ্লাদিনীর সারাংশই প্রেম। সারাংশ শব্দের অর্থ আনুকূল্যাভিলাষ। ঐ আনুকূল্যাভিলাষাত্মক প্রেমকে আনন্দচিন্ময় রসও বলা যায়। ঐ রসাত্মক প্রেমের পরম সার মহাভাব। শ্রীরাধাই মহাভাবস্বরূপিণী। তিনিই কান্তাবর্গের অংশিনী, অতএব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত। তিনি চিন্তামণিসারসদৃশী, শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণই তাঁহার কার্য্য। লক্ষ্মীগণ তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, মহিষীগণ তাঁহার প্রতিবিম্ব, ললিতাদি গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ। বহুকান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না বলিয়া তিনিই সকল কান্তার আকারে বিরাজ করেন। তন্মধ্যে ব্রজে স্বপক্ষবিপক্ষাদি নানা ভাবভেদে ও রসভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকান্তার শিরোমণি।

তিনি দেবী অর্থাৎ দীপ্তিমতী অতএব পরমসুন্দরী। অথবা তিনি কৃষ্ণারাধন-ক্রীড়ার নিবাসনগরী বলিয়াই তাঁহাকে দেবী বলা হয়। তিনি কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন। যেখানে যেখানে তাঁহার নেত্র পড়ে, সেইখানে সেইখানেই কৃষ্ণমূর্ত্তি স্ফুরিত হইয়া থাকেন। অথবা,শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময়, তিনিও প্রেমরসময়ী কৃষ্ণশক্তি, অতএব কৃষ্ণাভিন্না, এই নিমিত্তই তাঁহাকে কৃষ্ণময়ী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণই তাঁহার আরাধনা বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা। তিনি পরমদেবতা। তিনি লক্ষ্মীবর্গের অধিষ্ঠান; তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের মূলাশ্রয়; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববাঞ্ছার আশ্রয়, অর্থাৎ সর্ব্ববাঞ্ছাপূরণসমর্থা। তিনি জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মোহিনী। অতএব শ্রীরাধিকাই সকলের পরা ঠাকুরাণী। রাধা পূর্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। অগ্নি ও অগ্নিশিখার যেরূপ ভেদ নাই, মৃগমদ ও উহার গন্ধে যেরূপ ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত রূপভেদমাত্র। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘন। আনন্দাধিষ্ঠাত্রী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার দেহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময় ও তাদৃশ প্রেম দ্বারা বিভাবিত। শ্রীকৃষ্ণের স্নেহই শ্রীরাধার সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। উক্ত উদ্বর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার দেহ সুগন্ধ ও উজ্জ্বল হয়। তাঁহার কারুণ্যামৃত দ্বারা প্রাতঃস্নান, তারুণ্যামৃত দ্বারা মধ্যাহ্নস্নান এবং লাবণ্যামৃত দ্বারা সায়াহ্নস্নান বিহিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার দেহ করুণা, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মূলাশ্রয়। লজ্জা তাঁহার শ্যাম বসন। কৃষ্ণানুরাগ তাঁহার রক্তবর্ণ উত্তরীয়। প্রণয়মান তাঁহার কঞ্চুলিকা। সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম, সখীপ্রণয়রূপ চন্দন ও স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর তাঁহার অঙ্গের বিলেপন। শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ, প্রচ্ছন্নমানরূপ বাম্য কেশবিন্যাস, ধীরাধীরাত্বরূপ গুণ অঙ্গের পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণ, রাগ তাম্বূলরাগ, প্রেমকৌটিল্য নয়নযুগলের কজ্জল, সুদ্দীপ্ত অষ্ট সাত্বিক ভাব, হর্ষাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ও কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি অলঙ্কারই অঙ্গের অলঙ্কার। মধুরত্বাদি চতুর্বিধ গুণগ্রাম পুষ্পমালা, সৌভাগ্য তিলক, প্রেমবৈচিত্ত্য হারের মধ্যমণি, মধ্যবয়স সখীর স্কন্ধে করবিন্যাস, কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তি সখী, নিজাঙ্গসৌরভ গৃহ এবং গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক। শ্রীরাধিকা তাদৃশ গৃহে ও পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ তাঁহার কর্ণভূষণ। তাঁহার মুখে,শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের প্রবাহই বাক্যরূপে প্রবাহিত হয়। তিনি সদাই শ্রীকৃষ্ণকে মধুররসরূপ মধু

পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূরণ করিতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর ও অনুপমগুণ দ্বারা পূর্ণকলেবর। সত্যভামাদি মহিষীগণ তাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছা করেন, ব্রজরামাগণ তাঁহার নিকট কলাবিলাস শিক্ষা করেন, লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী তাঁহার সৌন্দর্য্যাদি গুণ কামনা করেন, অরুন্ধতী তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্ম অভিলাষ করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার গুণগণের পার পান না, ছার জীব কি করিয়া সেই শ্রীরাধিকার গুণের ইয়ত্তা করিবে!"

প্রভু বলিলেন,—"প্রেমতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব জানিলাম। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার বিলাসমহত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করি।"

রামরায় বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, কেলিনিপুণ ও নিশ্চিন্ত ধীরললিতাখ্য নায়ক, নিরন্তর কামক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য। তিনি রাত্রিদিন শ্রীরাধার সহিত কুঞ্জমধ্যে বিহার করিয়া থাকেন। এইপ্রকার ক্রীড়াতেই তাঁহার কৈশোর-বয়স সফল হয়।"

প্রভু বলিলেন,—"ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস সত্য; কিন্তু আরও যদি কিছু বলিবার থাকে বল।"

রাম রায় বলিলেন,—"ইহার পর আর বুদ্ধির গতি হয় না। উক্ত প্রেম-বিলাসের বিবর্ত্ত বলিয়া যে এক সামগ্রী আছে, তাহা শুনিয়া তোমার সুখ হইবে কি না জানি না; কারণ, উহা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বৈতভাব। ঐ ভাবেই তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিশ্রান্তি বলিয়া বোধ হয়।" এই কথা বলিয়া রামরায় স্বরচিত নিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী;
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।
এ সখি, সে সব প্রেমকাহিনী;
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন;
দুঁহুকে মিলনে মধত পাঁচবাণ।
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী;
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি!"

প্রেমবিলাস শব্দের অর্থ প্রেমবৈচিত্র্য বা প্রেমের বহির্বিলাস। বিবর্ত্ত

শব্দের অর্থ সমবায়িকারণের বিসদৃশকার্য্যোৎপত্তি বা অন্যথাখ্যাতি। অতএব প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত শব্দের অর্থ প্রেমের বহির্বিলাসের পুনর্ব্বার অন্তর্মুখতা। প্রেম প্রথমতঃ বহির্বিলাসে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনর্ব্বার অন্তর্মুখতায় তদুভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক হয়েন। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়াই যখন বিপ্রলম্ভে বিয়োগাভাসরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তখন আদৌ ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাকেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত বলা যায়।

শ্রীমতী বলিতেছেন,—প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া উত্তরোত্তর পরিপাকে ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাবে পরিণত হইল। তদবস্থায় আর স্ত্রীপুরুষভেদভাব রহিল না। কাম উভয়ের মন পেষণ করিয়া একীভূত করিল। সখি, সেই সকল প্রেমকাহিনী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিবে, বোধ হয়, তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। আমাদের রাগাবস্থায় সাহায্যার্থ দূতী অথবা অন্য কাহাকেও অন্বেষণ করিতে হয় নাই, পঞ্চবাণই মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের বিরাগাবস্থায় তোমাকে দূতী হইতে হইল। সুপুরুষের প্রেমের রীতি এইরূপই বটে।

প্রভু প্রেমাবেশে হস্ত দ্বারা রামানন্দ রায়ের মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক বলিলেন,—"সাধ্যবস্তুর ইহাই অবধি বটে। আমি তোমার প্রসাদে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তকেই সাধ্যবস্তুর অবধি বলিয়া জানিলাম। কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে সাধ্যবস্তুর লাভ হয় না, অতএব তাদৃশ সাধ্যবস্তুর লাভের উপায় যাহা, তাহাই বল।"

রামরায় বলিলেন,—"তুমি আমাকে যাহা বলাইতেছ, আমি তাহাই বলিতেছি। ভাল বলিতেছি কি মন্দ বলিতেছি, তাহা জানি না। ত্রিভুবনমধ্যে এমন কে ধীর আছেন, যিনি তোমার মায়ানাটে স্থির থাকিবেন? তুমিই বক্তা হইয়া আমার মুখ দিয়া বলিতেছ এবং তুমিই আবার শ্রোতা হইয়া শুনিতেছ। সাধনের রহস্য অতি গূঢ়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ়তর লীলা দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের অগম্য। কেবল সখীগণেরই এই লীলায় অধিকার দেখা যায়। সখীগণ হইতেই এই লীলার বিস্তার হয়। সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট হয় না। সখীগণই লীলা বিস্তার করিয়া সখীগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন। সখী বিনা অন্যের এই লীলায় প্রবেশই হয় না। যিনি সখীভাবে সখীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ

করিয়া থাকেন। উক্ত সাধ্যবস্তুর লাভের উপায়ান্তর নাই। সখীগণের এক অকথ্য স্বভাব এই যে, তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজলীলায় মন নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার লীলা করাইয়া যে সুখ লাভ করেন, তাহা নিজলীলার সুখ হইতে কোটিগুণ অধিক। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা-স্বরূপা; সখীগণ ঐ শ্রীরাধারূপা প্রেমকল্পলতার পল্লব, পুষ্প ও পাতা; অতএব শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত দ্বারা যদি ঐ লতাকে সেচন করা হয়, তবে পল্লবাদির নিজ-সেচন হইতে কোটিগুণ সুখ হইয়া থাকে। যদিও সখীগণের কৃষ্ণসঙ্গমে মন নাই, তথাপি শ্রীরাধিকা যত্ন করিয়া সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করাইয়া থাকেন। তিনি নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া সখীগণের সহিত সঙ্গম করাইয়া থাকেন এবং তাহাতে নিজসঙ্গম হইতে কোটিগুণ সুখ বোধ করেন। এইরূপ পরস্পর বিশুদ্ধ প্রেমে রসের পোষণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রেম দেখিয়া তুষ্ট হয়েন। আপনা হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে প্রতি-বেশিমণ্ডলে, প্রতিবেশিমণ্ডল হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে দেশে, দেশ হইতে ভূমণ্ডলে প্রসৃত হইলে, প্রাকৃত প্রেমও পূজ্য হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেমও শান্ত হইতে দাস্যে, দাস্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে বাৎসল্যে ও বাৎসল্য হইতে কান্তাভাবে প্রসৃত হইয়া পূজ্য হইয়া থাকেন। বৈষয়িক প্রেমের ন্যায় ভগবৎপ্রেমেরও বিষয় ও আশ্রয়ের মহত্ত্ব অনুসারেই পূজ্যত্ব জানিতে হইবে। গোপীপ্রেমে সেই মহত্ত্ব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। মহত্ত্বের সীমান্তপ্রাপ্ত গোপীপ্রেম স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাম্য বশতই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়। বস্তুতঃ কামের নিজেন্দ্রিয়সুখেই তাৎপর্য্য, আর গোপীপ্রেমের কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখেই তাৎপর্য্য। গোপীদিগের নিজেন্দ্রিয়সুখে বাঞ্ছা দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাঁহার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ গোপীভাবমৃতে যাঁহার লোভ হয়, তিনি লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন। যিনি রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তিনিই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজলোকের কোন একটি ভাব লইয়া ভজনই রাগানুগামার্গের ভজন। এই প্রকার ভজন-কারী ব্যক্তিই অন্তে ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতিচরী দেবীগণই ইহার প্রমাণ। শ্রুতিচরী দেবীগণ রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া ভাবযোগ্য গোপীদেহ পাইয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।”

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্-
মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥"

"বিধিমার্গে ভজন করিয়া ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করা যায় না। অতএব, যিনি গোপীভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক রাত্রিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করেন, যিনি নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনানন্তর ঐ দেহে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়া থাকেন। গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে কেবল ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।' স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাহার দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিয়াও গোপীর অনুগতি ব্যতিরেকে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে লাভ করিতে পারিলেন না।"

রাম রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। দুইজনে গলাগালি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রকার প্রেমাবেশে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে উভয়েই নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন। যাইবার সময় রামানন্দ রায় প্রভুর চরণে ধরিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—"প্রভো, যদি শুভাগমন হইয়াছে, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে শুদ্ধ কর। তুমি ভিন্ন আর জীবের উদ্ধারকর্ত্তা নাই। তুমি ভিন্ন আর কেহই কৃষ্ণপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহে।" প্রভু বলিলেন,—"আমি তোমার গুণ শুনিয়াই এইস্থানে আসিয়াছি। কৃষ্ণকথা শুনিয়া মন শুদ্ধ করিব ইহাই আমার অভিলাষ। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি তোমার মহিমা দেখিলাম। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসজ্ঞানের তুমিই অবধি। দশদিনের কথা কি, আমি যতদিন জীবনধারণ করিব, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। নীলাচলে তুমি ও আমি একত্র বাস করিব। কৃষ্ণকথারঙ্গে আমাদিগের কাল যাপন হইবে।" এই কথার পর উভয়েই নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলেন।

সন্ধ্যার পর পুনর্ব্বার উভয়ের মিলন হইল। নির্জ্জনে পরস্পর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত প্রশ্নোত্তরের সারসঙ্ক্ষেপ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ বিদ্যা বিদ্যার সার?"

রাম রায় উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্ববিদ্যার সার।"

প্রশ্ন।—"জীবের কোন্ কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ ?"

উত্তর।—"কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলিয়া খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।"

প্রশ্ন।—"সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ ?"

উত্তর।—"রাধাকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।"

প্রশ্ন।—দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ গুরুতর ?"

উত্তর।—"কৃষ্ণভক্তিবিরহই গুরুতর দুঃখ।"

প্রশ্ন।—"মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?"

উত্তর।—"কৃষ্ণপ্রেমভক্তই মুক্তশ্রেষ্ঠ।"

প্রশ্ন।—"গানের মধ্যে কোন্ গান শ্রেষ্ঠ ?"

উত্তর।—"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলিবিষয়ক গানই শ্রেষ্ঠ গান।"

প্রশ্ন।—"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ প্রধান ?"

উত্তর।—"কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের প্রধান শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন।—স্মরণের মধ্যে কোন্ স্মরণ উৎকৃষ্ট ?"

উত্তর।—"কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলার স্মরণই উৎকৃষ্ট স্মরণ।"

প্রশ্ন।—"ধ্যানের মধ্যে কোন্ ধ্যান উত্তম ?"

উত্তর।—"রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মধ্যানই উত্তম ধ্যান।"

প্রশ্ন।—"বাসস্থানের মধ্যে কোন্ বাসস্থান উৎকৃষ্ট ?"

উত্তর।—"শ্রীবৃন্দাবন।"

প্রশ্ন।—"শ্রোতব্যের শ্রেষ্ঠ কি ?"

উত্তর।—"রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতব্য।"

প্রশ্ন।—"উপাস্যের মধ্যে প্রধান কি ?"

উত্তর।—"যুগল রাধাকৃষ্ণ নামই প্রধান উপাস্য।"

প্রশ্ন।—"মুমুক্ষুর গতি কীদৃশী ?"

উত্তর।—"স্থাবরসদৃশী।"

প্রশ্ন।—"ভক্তীচ্ছুর গতি কীদৃশী ?"

উত্তর।—"দেবসদৃশী। অরসজ্ঞ কাক যেমন নিম্বফল আস্বাদন করে, দুর্ভাগ্য জ্ঞানীও তেমনি শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকে। যিনি ভাগ্যবান্, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদন করেন।" এইরূপে প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠীতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে উভয়েই নিজ নিজ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলেন।

সন্ধ্যার পর আবার দুইজনে মিলিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর রামানন্দ রায় প্রভুর চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রভো, নারায়ণ যেমন ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যয়ন করান, আপনিও তেমনি আমার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকাশ করিলেন। অন্তর্যামী ভগবানের উপদেশ দিবার রীতিই এই, বাহিরে কিছু না বলিয়া হৃদয়েই বস্তু প্রকাশ করেন। এখন আমার একটি ঘোরতর সংশয় দূর করুন। প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসিরূপেই দর্শন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্যামসুন্দর গোপরূপ দেখিতেছি। আরও একটি অদ্ভুত দেখিতেছি এই যে, আপনার সম্মুখে একটি সুবর্ণপ্রতিমা এবং ঐ প্রতিমার অঙ্গকান্তি দ্বারা আপনার ঐ শ্যামরূপ আচ্ছাদিত। এই প্রকার দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ঘোরতর সংশয়াকুল হইতেছে। আপনি অকপটে উহার কারণ বিবৃত করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ করুন।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি মহাভাগবত, তোমার প্রেমও প্রগাঢ়। প্রগাঢ়-প্রেমসমন্বিত মহাভাগবত সকল স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বত্রই, শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায়, ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রেমবশতঃ আমাকেও তদ্রূপেই দেখিতেছ।"

রাম রায় বলিলেন,—"প্রভো, যদি কৃপা করিয়া অধমকে দর্শন দিলেন, তবে আর বঞ্চনা করিবেন না।" প্রভু ঈষৎ হাসিয়া রামরায়কে নিজস্বরূপ অনুভব করাইলেন। রাম রায় দেখিলেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা উভয়ে একীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইয়াছেন। দেখিয়াই রাম রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু শ্রীকরস্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে চেতন করাইয়া বলিলেন,—

"তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোনজন ॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥
গৌর দেহ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন ॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম ॥

গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাউল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥
আমি এক বাউল তুমি দ্বিতীয় বাউল।
অতএব তোমায় আমায় সব সমতুল ॥"

এই রাত্রিও এই ভাবেই অতিবাহিত হইল। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে নয় রাত্রি অতিবাহিত হইলে, দশম রাত্রিতে প্রভু রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ রায় বিদায়ের কথা শুনিয়া কাতরভাবাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বলিলেন,—"রায়, তুমি বিষয়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর। আমিও তীর্থভ্রমণ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিতেছি। সেই স্থানেই উভয়ে কৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে কাল-যাপন করিব।" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু রাম রায়কে বিদায় দিয়া শয়ন করিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া সম্মুখে হনুমানকে দেখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

সেতুবন্ধ-যাত্রা।

প্রভু আপনমনে কৃষ্ণনাম লইতে লইতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে যিনি একবার প্রভুকে দর্শন করিলেন, তিনিই বৈষ্ণব হইলেন। তাঁহার সংসর্গে অপর শত শত লোক বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। দক্ষিণদেশে নানা শ্রেণীর লোকের বাস। উহাঁদের মধ্যে কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা পাষণ্ডী। কিন্তু যিনি একবার প্রভুর দর্শন পাইলেন, তিনিই নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত হইলেন। আবার বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রীরামোপাসক অথবা তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব সকলও প্রভুর দর্শনপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

প্রভু যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কৃষ্ণানদী প্রাপ্ত হইয়া উহাতে স্নান করিলেন। পরে মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাইয়া মহেশ্বর দর্শন করিলেন। তদনন্তর অহোবল নামক নৃসিংহের স্থানে যাইয়া শ্রীনৃসিংহ দর্শন করিলেন। নৃসিংহস্থান হইতে সিদ্ধবটে যাইয়া শ্রীসীতাপতিকে দর্শন করিলেন। ঐ সিদ্ধবটে এক রঘুনাথোপাসকের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ঐ রঘুনাথোপাসকের গৃহে ভিক্ষা ও তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্কন্দক্ষেত্রে যাইয়া স্কন্দকে

দর্শন করিলেন। স্কন্দক্ষেত্র হইতে ত্রিমঠে যাইয়া ত্রিবিক্রম দর্শন করিলেন। ত্রিবিক্রম দর্শন করিয়া পুনশ্চ সিদ্ধবটে আগমন করিলেন। এবারও পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথোপাসকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহারই গৃহে ভিক্ষা করিলেন। প্রভু দেখিলেন, সেই রঘুনাথোপাসক নিজ অভ্যস্ত রামনাম না করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতেছেন। তদ্দর্শনে প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রবর, অতিশয় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, তুমি পূর্ব্বে নিরন্তর রামনাম গ্রহণ করিতে,' এখন দেখিতেছি. তৎপরিবর্ত্তে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ .করিতেছ, ইহার কারণ কি বল ?" রঘুনাথোপাসক বলিলেন, "তোমার দর্শনপ্রভাবেই আমার এইপ্রকার ভাবান্তর ঘটিয়াছে। বাল্যাবধি আমার রামনাম গ্রহণই স্বভাব। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্র আমার ইষ্টদেব। অতএব আমি রামনাম লইয়া বিশেষ সুখ পাইতাম। নামমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করাও আমার অভ্যাস ছিল। ঐ সকল শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, রামশব্দেও পরব্রহ্মকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ-শব্দেও পরব্রহ্মকেই বুঝায়। অথচ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখা যায় যে, একবার রামনাম উচ্চারণ করিলে, সহস্রনাম পাঠের ফল হয়, আর একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে, তিনবার সহস্রনাম পাঠের ফল হয়। এইরূপে কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্য হইলেও, আমি অভ্যাস বশতঃ রামনামই জপ করিতাম। তোমার দর্শনাবধি আমার কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে। তদবধি কৃষ্ণনামের মহিমাও আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, তুমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ।" এই কথা বলিয়াই বিপ্র প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া বৃদ্ধকাশীতে গমন ও শিবদর্শন করিলেন।

বৃদ্ধকাশীর বর্ত্তমান নাম পুদুবেলি গোপুরম্। এইটি বৌদ্ধদিগের স্থান। বৌদ্ধগণ প্রভুর বৈষ্ণবতার প্রভাব দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে আপনাদিগের নববিধানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা আপনা-দিগের মতের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত প্রভুর সহিত অনেক তর্ক অনেক বাদবিতণ্ডা করিলেন। প্রভু তর্ক দ্বারাই তাঁহাদিগের মত খণ্ডন করিয়া গর্ব্বও খর্ব্ব করিয়া দিলেন। বৌদ্ধগণ তর্কে পরাস্ত হইয়া শেষে কি এক কুমন্ত্রণা করিয়া একপাত্র অপবিত্র অন্ন বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া প্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীভগবানের কি লীলা, অকস্মাৎ কোথা হইতে এক বৃহৎকায় পক্ষী আসিয়া পাত্রসমেত অন্ন লইয়া গেল। ঐ অন্ন আকাশ হইতে বৌদ্ধসমাজের মস্তকো-পরি পতিত হইতে লাগিল। আর অন্নপাত্রটি বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে পতিত

হইল। পাত্রের পতনে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা কাটিয়া গেল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিল। অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া অপরাধ ক্ষমাপণার্থে প্রভুর শরণাগত হইল। প্রভু বলিলেন, "উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইলেই তোমাদিগের আচার্য্য চৈতন্য লাভ করিবেন।" তদনুসারে বৌদ্ধাচার্য্যের শিষ্যগণ গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে বৌদ্ধাচার্য্য কৃষ্ণ রাম হরি বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্য প্রভুর কৃপায় বৈষ্ণব হইলেন। প্রভু বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ঐ স্থান হইতে অন্তর্ধান করিলেন। আর কেহই তাঁহার দর্শন পাইল না। প্রভু বৌদ্ধস্থান হইতে অন্তর্ধানের পর পথে অনেকানেক নাস্তিক ও পাষণ্ডীকে তর্ক দ্বারা পরাজয় পূর্ব্বক কৃপা করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর প্রভু বর্ত্তমান উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত ত্রিপদী নামক স্থানে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। ঐ স্থান হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে শেষাচল নামক পর্ব্বতের উপর বালাজীকে দর্শন করিলেন। ঐ শেষাচলই ত্রিমল্ল। প্রভু ত্রিমল্ল হইতে পানানৃসিংহ নামক স্থানে যাইয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন করিলেন। পরে কাঞ্চীপুরীতে গমন করিলেন। কাঞ্চীপুরীর বর্ত্তমান নাম কন্‌জীভরম্। কাঞ্চীপুরী দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগের নাম শিবকাঞ্চী এবং দক্ষিণভাগের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। প্রভু শিবকাঞ্চীতে শিব এবং বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিয়া ত্রিকালহস্তীতে ও পক্ষতীর্থে মহাদেব দর্শন করিলেন। পরে বৃদ্ধকাল তীর্থে শ্বেতবরাহ, পীতাম্বর শিব, শিয়ালী ভৈরবী দেবী, গোসমাজ শিব, অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষ্ণু, কম্বুকোণমে কুম্ভকর্ণকপাল নামক সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব ও পাপনাশনে বিষ্ণু দর্শন করিয়া কাবেরীর তীরে উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কাবেরীতে স্নান ও পরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম শ্রীরঙ্গপত্তন। প্রভু ঐ স্থানে রঙ্গনাথ নামক বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে অনেকক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তত্রত্য লোক সকল আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু কিঞ্চিৎ স্থৈর্য্যধারণ করিলে, বেঙ্কটভট্ট নামক এক বিপ্র আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কটভট্ট প্রভুকে গৃহে আনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ঐ জল সবংশে গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুকে বিশেষ যত্ন সহকারে

ভিক্ষা করাইলেন। ভট্ট প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত, অতএব এই চারিমাস এই স্থানে থাকিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন। প্রভু চারিমাস বেঙ্কটভট্টের গৃহে রহিয়া গেলেন। প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন, প্রেমাবেশে নর্ত্তনকীর্ত্তন ও বেঙ্কটভট্টের সহিত কৃষ্ণ-কথালাপে কালাতিপাত হইতে লাগিল। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র রামানুজীয় বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। নানাস্থান হইতে সমাগত লোক সকল প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী এক এক বিপ্র এক এক দিন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল, অনেকেরই প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার সুযোগ লাভ হইল না। ঐ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের কোন এক দেবালয়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গীতা পাঠ করিতেন। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল না, অতএব অশুদ্ধ পাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠ অশুদ্ধ হইত বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে উপহাস করিতেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, আবিষ্টচিত্তে আপনমনে পাঠ করিয়া যাইতেন। পাঠকালে তাঁহার অশ্রু, কম্প ও পুলকাদির উদ্গম হইত। তদ্দর্শনে এক দিবস প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কোন্ অর্থে আপনার এই প্রকার সুখবোধ হয়?" বিপ্র বলিলেন, "আমি মূর্খ, শব্দার্থ-জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, শুদ্ধাশুদ্ধও বুঝি না, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে গীতা পাঠ করি মাত্র। তবে বলিতে কি, পাঠ আরম্ভ করিলেই অর্জ্জুন-সারথির শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, এবং তিনি যেন সখা অর্জ্জুনকে হিতোপ-দেশ করিতেছেন এইরূপই মনে হয়। এই ভাবের উদয়েই আমার অদ্ভুত আনন্দাবেশ হইয়া থাকে।" প্রভু বলিলেন, "আপনারই গীতাপাঠে অধিকার, আপনিই গীতার্থের সারজ্ঞ।" এই কথা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া বিপ্র তাঁহার চরণধারণ পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু গোপনে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া বেঙ্কটভট্টের আলয়ে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়া প্রভুর অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন না, নিত্যই প্রভুর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বেঙ্কটভট্টের সহিত প্রভুর প্রতিদিনই কৃষ্ণকথার আলাপ হইত। বেঙ্কটভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। প্রভু ভট্টকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্ট,

তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পতিব্রতার শিরোমণি হইয়াও আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গম প্রার্থনা করেন, ইহার কারণ কি?" ভট্ট বলিলেন, "লক্ষ্মীশ ও কৃষ্ণ একই স্বরূপ হইলেও, কৃষ্ণে বৈদগ্ধ্যাদি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে বলিয়াই লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কৃষ্ণসঙ্গম প্রার্থনায় তপস্যা করিয়া থাকেন, এবং এইরূপ করাতেও কোন দোষ দেখা যায় না; কারণ, তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ অভিন্ন।" প্রভু বলিলেন, "ভট্ট, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, কিন্তু লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন, ইহার কারণ কি?" ভট্ট বলিলেন, "আমি উহা বুঝিতে পারি না, তুমি আমাকে বলিয়া কৃতার্থ কর।" প্রভু বলিলেন, "শ্রুতিগণ ব্রজদেবীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলেন; লক্ষ্মী ব্রজদেবীগণের অনুগত না হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই নিমিত্ত লাভ করিতে পারিলেন না। নারায়ণ ও কৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। ঐ অসাধারণ গুণ থাকাতেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর মন হরণ করেন। শ্রীনারায়ণ ব্রজদেবীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপীগণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই।" বেঙ্কট-ভট্ট শুনিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বিবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। গোপাল ভট্ট নামে বেঙ্কটভট্টের একটি পুত্র ছিলেন। গোপালভট্ট প্রভুর বিশেষ অনুগত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা প্রভুর তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রভুও বালক গোপালভট্টের আচরণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইলে, কিছুই অলভ্য থাকে না। প্রভুর প্রসাদে বালক গোপাল-ভট্টও কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে সপুত্র বেঙ্কটভট্টকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু চাতুর্মাস্যের পর পুনশ্চ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমেই ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ঋষভ পর্ব্বত মতুরার নিকট। উহার বর্ত্তমান নাম পালনি হিল্। প্রভু ঋষভ পর্ব্বতে শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিলেন। ঐ স্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুরী গোঁসাই চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভু পুরী গোসাঁইকে দেখিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। পুরীগোসাঁই প্রভুকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে তিন দিন কাটিয়া গেল। তদনন্তর পুরীগোসাঁই উত্তরমুখ হইয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন। প্রভু দক্ষিণদিকে সেতুবন্ধের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রভু ঋষভ পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীশৈলে গমন করিলেন। শ্রীশৈল মলয় পর্ব্বতের বা পশ্চিম ঘাটের, অংশ। তৎকালে হরপার্ব্বতী বিপ্রবেশে শ্রীশৈলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রভুকে তিনদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর সহিত তাঁহাদিগের নিভৃতে অনেক কথোপকথন হইল। পরে প্রভু তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কামকোষ্ঠীতে আগমন করিলেন। কামকোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ মথুরায় আগমন করিলেন। বর্ত্তমান মদুরাই দক্ষিণ মথুরা। দক্ষিণ মথুরায় এক রামভক্ত বিপ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। ঐ বিপ্র বিশেষ যত্ন সহকারে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু কৃত-মালা নদীতে স্নান ও তত্রত্য মীনাক্ষী নাম্নী দেবীকে দর্শন করিয়া ভিক্ষার্থ উক্ত বিপ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু পাকাদির আয়োজন করেন নাই। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, "বিপ্র, মধ্যাহ্ন হইল, এখনও পাক করিতেছ না কেন?" বিপ্র বলিলেন, "আমার অরণ্যে বাস, সম্প্রতি পাকের সামগ্রী মিলে না, লক্ষ্মণ বন্যশাকাদি আনয়নার্থ গমন করিয়াছেন, তিনি আসিলে সীতা ঠাকুরাণী পাক করিবেন।" প্রভু বিপ্রের উপাসনার ভাব বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণও বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সত্বর পাকের আয়োজন পূর্ব্বক তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। কিন্তু স্বয়ং ভোজন না করিয়া উপবাসী রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে দেখিয়া, উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিপ্র বলিলেন, "আমার এই জীবনের প্রয়োজন নাই, অগ্নিতে বা জলে দেহ ত্যাগ করিব। জগন্মাতা সীতাঠাকুরাণীকে রাক্ষসাধম রাবণ স্পর্শ করিয়াছে। হায়! এই দুঃখ আমার অসহ্য হইয়া উঠি-য়াছে।" প্রভু বিপ্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, "বিপ্র, তুমি অনর্থক শোক করিও না। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী চিদানন্দময়ী। তাঁহাকে কি কখন রাক্ষসে স্পর্শ করিতে পারে! স্পর্শ করা দূরের কথা, দর্শনই করিতে পারে না। তবে যে সীতাদেবীর হরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, সে প্রকৃত সীতাদেবীর হরণ নহে, পরন্তু মায়াসীতারই হরণ জানিবে।" প্রভুর বাক্যে বিপ্রের বিশ্বাস হইল। তিনি তখন হা হুতাশ ত্যাগ করিয়া ভোজন করিলেন। তাঁহার জীবনের আশা হইল। প্রভু এইরূপে বিপ্রের জীবন রক্ষা করিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। পথে দুর্বেসনে রঘুনাথকে ও মহেন্দ্রশৈলে বা পূর্ব্বঘাটে পরশুরামকে দর্শন করিয়া সেতুবন্ধে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধের বর্ত্তমান নাম পামবান। প্রভু সেতুবন্ধে উপনীত হইয়া প্রথমেই রামেশ্বর দর্শন করিলেন। ঐ দিবস

ঐ স্থানেই স্থিতি হইল। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণসভায় কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যান পাঠ হইতেছিল, প্রভু তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সীতাহরণের কথা উত্থিত হইল। পাঠক মায়াসীতা হরণ ব্যাখ্যা করিলেন। শুনিয়া প্রভু বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে প্রভুর দক্ষিণ মথুরায় রামদাস বিপ্রের কথা মনে হইল। প্রভু উক্ত পুরাণপাঠকের নিকট মায়াসীতাহরণবৃত্তান্তটি যে পত্রে লিখিত ছিল, ঐ পত্রখানি প্রার্থনা করিলেন। পাঠক একটি নূতন পত্র লিখিয়া লইয়া ঐ পুরাতন পত্রটি প্রভুকে অর্পণ করিলেন। রামদাস বিপ্রের দৃঢ় প্রতীতির নিমিত্ত প্রভু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই উক্ত পুরাতন পত্রটি চাহিয়া লইলেন। পরদিবস ধনুস্তীর্থে যাইয়া স্নান করিলেন। তদনন্তর পুনশ্চ সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। প্রভু ভারতে পুনরাগমন করিয়া সমুদ্রতীরপথে চিয়ড়তালায় শ্রীরামলক্ষ্মণ, তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষ্ণু, পানাগড়িতে সীতাপতি, চামতাপুরে শ্রীরামলক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, মলয়পর্ব্বতে অগস্ত্য, কন্যাকুমারীতে দেবী ও আমলিতলায় শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। পরে মল্লার হইয়া পথিমধ্যে তমালকার্ত্তিক ও বেতাপাণিতে শ্রীরঘুনাথ দর্শন করিয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানেই অবস্থান করিলেন। প্রভু যখন মল্লার আগমন করেন, তখন ঐ স্থানে ভট্টমারী নামক বামাচারী সন্ন্যাসীদিগের সহিত দেখা হয়। ভট্টমারীরা কামিনী ও কাঞ্চন দ্বারা প্রভুর সঙ্গী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে প্রলোভিত করে। প্রভু বেতাপাণিতে আসিয়া শয়ন করিলে, কৃষ্ণদাস প্রভুকে না বলিয়াই ভট্টমারীদিগের নিকট গমন করে। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ঐ সরলমতি ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুনশ্চ ভট্টমারীদিগের নিকট গমন করিলেন। ভট্টমারীরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রভুকে মারিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। কিন্তু এমনই ভগবানের মায়া, তাহাদিগের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিল এবং তাহাদিগকেই খণ্ড খণ্ড করিল। ইত্যবসরে প্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পয়স্বিনীর তীরে আসিয়া আদিকেশবকে দর্শন করিলেন। আদিকেশবের মন্দিরে অনেক বিষ্ণুভক্তের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। উহাঁরা ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। প্রভু তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ লিখাইয়া লইলেন। অনন্তর ত্রিবাঙ্কুরে যাইয়া অনন্তপদ্মনাভ দর্শন করিলেন। অনন্তপদ্মনাভ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণমথুরায় আগমন করিলেন। দক্ষিণমথুরায় পুনরাগমনের কারণ, রামদাস বিপ্রকে কূর্ম্মপুরাণের পত্রখানি প্রদান করা। প্রভু দক্ষিণমথুরাতে আসিয়াই

রামদাস বিপ্রের গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কূর্ম্মপুরাণের সেই পুরাতন পত্রখানি প্রদান করিলেন। পত্রখানিতে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি লিখিত ছিল।

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥"

শ্লোক দুইটি পাইয়া রামদাস বিপ্র অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। পরে তিনি প্রভুর চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন, সন্ন্যাসীর বেশে আমাকে দর্শন প্রদান করিয়াছ। তুমি এই পত্রখানি আনিয়া আমাকে মহাদুঃখ হইতে নিস্তার করিলে। আজ তোমাকে আমার ঘরে ভিক্ষা করিতে হইবে। গতবারে মনোদুঃখে তোমাকে ইচ্ছামত ভিক্ষা করাইতে পারি নাই। ভাগ্যক্রমে পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইয়াছি, ভিক্ষা না করাইয়া ছাড়িব না।" এই কথা বলিয়া বিপ্র সত্বর নানাবিধ পাক করিয়া প্রভুকে উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ঐ রাত্রি ঐ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তাম্রপর্ণীর তীরবর্ত্তী পাণ্ড্যপ্রদেশে গমন করিলেন। পরে ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া মৎস্যতীর্থে উপনীত হইলেন। তদনন্তর তুঙ্গভদ্রার তীরে গমন করিলেন। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণানদীরই একটি শাখা। ঐ শাখার উত্তরতীরে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী। কিষ্কিন্ধ্যাপুরী বর্ত্তমান গন্টাকোল নামক রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে বেলারি নামক প্রদেশের অন্তর্গত। প্রভু কিষ্কিন্ধ্যায় যাইয়া প্রথমতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। পরে পম্পাসরোবর, অঞ্জনগিরি, ঋষ্যমুখ গিরি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন করিলেন। পরে মধ্বাচার্য্যের স্থানে যাইয়া তত্ত্ববাদীদিগকে বিচারে পরাজয় পূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন। তদনন্তর উড়ুপকৃষ্ণ, ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, আর্য্যা দ্বৈপায়নী, সূর্পারক, কোলাপুরে লক্ষ্মীদেবী, ক্ষীরভগবতী ও লাঙ্গাগণেশ দেখিয়া পাণ্ডুপুরে বিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করিলেন। ঐ পাণ্ডুপুরে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভু লোকমুখে শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত দেখা করিলেন। তিনি শ্রীরঙ্গপুরীকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কম্পাশ্রুপুলকাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীরঙ্গপুরী বিস্মিত হইয়া প্রভুকে উঠাইয়া বলিলেন, "শ্রীপাদের বোধ হয় পুরী গোসাঁইর সহিত সম্বন্ধ আছে, অন্যথা এরূপ

প্রেম সম্ভব হয় না।” তিনি এই কথা বলিয়া প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনের পর উভয়ে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের পর উভয়েই ধৈর্য্যধারণ করিলেন। প্রভু শ্রীরঙ্গপুরীকে নিজের ঈশ্বরপুরীর সহিত সম্বন্ধ জানাইলেন। উভয়ের একস্থানেই অবস্থিতি হইল। কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। একদিন শ্রীরঙ্গপুরী প্রভুর জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, নবদ্বীপ। শ্রীরঙ্গপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত একবার নবদ্বীপে যাইয়া জগন্নাথমিশ্রের বাটীতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবী তাঁহাকে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট খাওয়াইয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক কথার পর, বলিলেন, “ঐ জগন্নাথ মিশ্রের এক পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া এই স্থানে আসিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অল্প বয়স, নাম শঙ্করারণ্য।” প্রভু বলিলেন, “আপনি যাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা বলিলেন, তিনি আমার পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা।” এই প্রকার ইষ্টগোষ্ঠীর পর শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। প্রভুও ঐ স্থান হইতে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে গমন করিলেন। কৃষ্ণবেণ্বা কৃষ্ণা নদীরই শাখাবিশেষ। উহা বর্ত্তমান হায়দরাবাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কৃষ্ণবেণ্বার তীরে অনেক বৈষ্ণবের সহিত প্রভুর আলাপ হইল। প্রভু ইহাঁদিগের নিকট হইতে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

অনন্তর প্রভু উত্তরমুখ হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। তিনি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া নাসিক, পঞ্চবটী ও গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান প্রভৃতি দর্শন করিলেন। পরে তাপ্তীনদী পার হইয়া নর্ম্মদার তীরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রভু নর্ম্মদা প্রাপ্ত হইয়া স্নান ও মাহিষ্মতী পুরী দর্শন করিলেন। তদনন্তর পূর্ব্বমুখ হইয়া গোদাবরীর কূল ধরিয়া পুনশ্চ বিদ্যানগরে আগমন কবিলেন। রায় রামানন্দ প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সানন্দে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু চরণ-পতিত রাম রায়কে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই প্রেমাবেশে অধীর হইলেন। পরে ধৈর্য্যধারণ করিয়া রামরায় প্রভুর ভ্রমণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই গ্রন্থদ্বয় রামরায়কে প্রদান করিলেন। রামরায় ঐ দুইখানি পুস্তক লিখাইয়া লইয়া প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পাঁচ সাত দিন কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে রামরায় বলিলেন, “প্রভো, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি রাজা প্রতাপ-রুদ্রকে বিনয় করিয়া অবসরগ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন এবং নীলাচলে যাইয়া বাস

করিবারই অনুমতি করিয়াছেন। আমি সত্বর নীলাচলে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি।" রামরায় বলিলেন, "প্রভো, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে আপনার ক্লেশ হইতে পারে। আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" রামরায়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রভু তাঁহাকে পশ্চাৎ আসিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অগ্রেই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নীলাচলে প্রত্যাগমন।

প্রভু যখন প্রথম পুরীতে আগমন করেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র নিজ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, যুদ্ধার্থ বিজয় নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন। প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া লোকপরম্পরায় প্রভুর আগমনবৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়াই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আমি শুনিলাম, গৌড় হইতে এক মহাত্মা আসিয়া আপনার গৃহেই না কি অবস্থান করিতেছেন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "রাজন্, আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ঠিক, কিন্তু তিনি এখন এখানে নাই, ভ্রমণার্থ দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন।" প্রতাপরুদ্র বলিলেন, "শুনিয়াছি, তিনি পরম দয়াল, আপনাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই আমার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে এখানে না রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "সাধারণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকেই ধরিয়া রাখা যায় না, তিনিত ঈশ্বর, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি আমি তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, তিনি শুনিলেন না, আপনার ইচ্ছামত চলিয়া গেলেন।" প্রতাপরুদ্র বলিলেন, "হায় হায়! আমি কি হতভাগ্য! আপনি পরম বিজ্ঞ হইয়াও যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছেন, তখন তিনি সত্যই ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ঘটিল না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।" প্রতাপরুদ্র বলিলেন, "এবার আগমন হইলে, আমি যেন তাঁহার দর্শন পাই।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তিনি পরম বিরক্ত, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না. তথাপি কোনপ্রকারে আপনাকে দর্শন করাইব। আপনি তাঁহার জন্য একটি নির্জ্জন বাসস্থান স্থির করিয়া

রাখুন। স্থানটি নির্জ্জন অথচ জগন্নাথের নিকট হইলেই ভাল হয়।" প্রতাপরুদ্র বলিলেন, কাশীমিশ্রের ভবনেই প্রভুর বাসস্থান স্থির করিয়া রাখা হউক।" এই কথার পর ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর বাসস্থান সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার ভবনে প্রভুর বাসস্থান হইবে শুনিয়া কাশীমিশ্র আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন এবং যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। প্রভুর দর্শনার্থ পুরুষোত্তমবাসী ভক্ত সকল বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত হইলেন। এই সময়েই প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রভু বিদ্যানগর পশ্চাৎ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই আলালনাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া আলালনাথে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। প্রভু তাঁহার আগমনসংবাদ প্রদানের নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে অগ্রেই নীলাচলে পাঠাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দাদি প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর আগমনসংবাদ শ্রবণমাত্র আলালনাথের অভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। পথিমধ্যেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুর আগমনসংবাদ পাইয়া মহানন্দে অগ্রসর হইলেন। সমুদ্রের কূলেই তাঁহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে দেখিয়াই চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে সকলে মিলিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন। জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে প্রসাদমালা প্রদান করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া নিজভবনে গমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুকে ইচ্ছানুরূপ ভিক্ষা করাইলেন। ভিক্ষার পর প্রভুকে শয়ন করাইয়া ভট্টাচার্য্য স্বয়ং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে ভোজন করিতে প্রেরণ করিলেন। ঐ রাত্রি প্রভু নিজগণ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহেই অবস্থান করিলেন। রাত্রিকালে তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, ভক্তগণ একমনে প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলেন। জাগরণেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। শেষে প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "আমি অনেক স্থানই ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু তোমাদিগের তুল্য ভক্ত কোথাও দেখিলাম না। কেবল এক রামানন্দ রায়ের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সুখবোধ করিয়াছিলাম।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এই নিমিত্তই আমি রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম।" এই সময়ে জগন্নাথদেবের শঙ্খধ্বনি হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া প্রভু

বলিলেন, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, চল, সকলে মিলিয়া জগন্নাথের শয্যোত্থানলীলা দর্শন করি।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত জগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রভু গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সস্পৃহনয়নে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান, মুখপ্রক্ষালন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান, বাল্যভোগ, হরিবল্লভ ভোগ ও ধূপাখ্য আরাত্রিক সমাধা হইলে, জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে ও প্রভুর ভক্তগণকে প্রভুর প্রসাদ ও মালা প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। প্রভু অবনত মস্তকে মালা গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথের একজন সেবক প্রভুর বহির্ব্বাসের অঞ্চলে প্রসাদাদি অর্পণ করিলেন। প্রভু প্রসাদান্ন লইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে লইয়া কাশীমিশ্রের ভবনে গমন করিলেন। কাশীমিশ্র প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। পরে গৃহ ও আত্মা প্রভৃতি সমস্তই প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে বাসস্থান দর্শন করাইলেন। প্রভু বাসস্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর কাশী-মিশ্রকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। কাশীমিশ্র তদ্দর্শনে চরিতার্থ হইলেন। একে একে ভক্তগণ আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর পার্শ্বে বসিয়া উৎকলবাসী ভক্তগণকে একে একে প্রভুর পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই জনার্দ্দন নামক জগন্নাথসেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইহাঁর নাম জনার্দ্দন, ইনি প্রভুর অঙ্গসেবা করিয়া থাকেন।" পরে সুবর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখিমাহাতী, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পাচক জগন্নাথ, মুরারি মাহাতী, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, বিষ্ণুদাস, মুরারি ব্রাহ্মণ, প্রহররাজ মহাপাত্র প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে পরিচিত করাইলেন। এই সময়ে রায় ভবানন্দ চারি পুত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইনিই রায় ভবানন্দ, রামানন্দ রায়ের পিতা।" প্রভু রায় ভবানন্দকে সাদরে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "তুমি পাণ্ডু, তোমার পাঁচটি পুত্র সাক্ষাৎ পঞ্চ পাণ্ডব।" ভবানন্দ বলিলেন, "প্রভো, আমি বিষয়ী শূদ্রাধম, আপনার চরণে শরণাগত, পরিবারবর্গের সহিত শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। এই বাণীনাথ প্রভুর চরণসমীপে থাকিয়া আজ্ঞাপালন করিবে, প্রভু অসঙ্কোচে ইহাকে যথেচ্ছ আদেশ করিবেন।" এই কথা বলিয়া ভবানন্দ বাণীনাথকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে প্রভুর আপ্ত কয়েকজন

ভিন্ন অপর সকলেও চলিয়া গেলেন। তখন প্রভু কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণদাস, আমি তোমাকে বিদায় দিলাম, তুমি যথেচ্ছ গমন কর।" কৃষ্ণদাস শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু বলিলেন, "ইনি আমাকে ছাড়িয়া ভট্টমারীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, আমি কোনমতে ইহাঁকে তাহাদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।" এই কথা বলিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া গেলে, নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ ও দামোদর এই চারিজনে যুক্তি করিয়া কৃষ্ণদাসকে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ প্রেরণের নিমিত্ত নবদ্বীপে পাঠানই স্থির করিলেন। পরে তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা লইয়া কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে যাইয়া মহাপ্রসাদ প্রদানের পর শচীদেবীকে প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ জানাইলেন। শচীদেবী প্রভুর সমাচার পাইয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তবর্গ প্রভুর নিমিত্ত বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত ছিলেন, এক্ষণে সমাচার পাইয়া পুরী যাইবার নিমিত্ত অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্যরত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্যনিধি, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, বিজয়, শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত ও আচার্য্য নন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কুলীন গ্রামের সত্যরাজ খান ও বসু রামানন্দ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। খণ্ডবাসী মুকুন্দ, নরহরি এবং রঘুনন্দনও তাঁহাদিগের সঙ্গ লইলেন। এই সময়ে পরমানন্দ পুরীও দক্ষিণ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি শচীমাতার গৃহে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মুখেই প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমনের কথা শ্রবণ করিলেন। পরে তিনি প্রভুর ভক্তগণের নীলাচলে যাইবার উদ্‌যোগ শুনিয়া ও সত্বর গমনার্থ তাঁহাদিগের অপেক্ষা না করিয়াই প্রভুর এক ভক্ত কমলাকার দ্বিজকে সঙ্গে লইয়াই নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বৈষ্ণব সম্মিলন।

পরমানন্দ পুরী নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত দেখা করিলেন। প্রভু পুরী গোসাঁইকে দেখিয়া প্রেমাবেশে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। পুরী গোসাঁইও প্রেমাবেশে প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রভু পুরী গোসাঁইকে নিজের নিকট রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোসাঁই বলিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গে থাকিব মনে করিয়াই এখানে আসিয়াছি। আমি দক্ষিণ হইতে আসিয়া নদীয়ায় গিয়াছিলাম। সেইখানেই শচীদেবীর মুখে তোমার নীলাচলে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সত্বর চলিয়া আসিলাম। তোমার ভক্তগণ এখানে আসিবার জন্ত উদ্‌যোগী হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছি।" প্রভু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কাশীমিশ্রের বাটীতেই একখানি নিভৃত গৃহে পুরীগোসাঁইর বাসা এবং সেবার জন্য একজন ভৃত্য দেওয়াইলেন।

দুই এক দিনের মধ্যেই স্বরূপ দামোদর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি প্রভুর একজন প্রধান ভক্ত ও রসের সাগর। ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। ইনি নদীয়ায় অধ্যয়নকাল হইতেই প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। পরে প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া বারাণসীধামে গমন পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহাঁর গুরুর নাম চৈতন্যানন্দ। গুরু ইহাঁকে সন্ন্যাস দিয়া বেদান্তের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে বলিলেন। ইনি বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত, বেদান্তের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ইহাঁর ভাল লাগিল না। ইনি যেমন বিরক্ত, তেমনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যেই ইহাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসগ্রহণকালে শিখা ও সূত্র ত্যাগ করিলেন, যোগপট্ট লইলেন না। এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম হইল স্বরূপ। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণের পর বেদান্তের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা না করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। স্বরূপ দামোদর নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, তোমার দয়ায় অতি সহজেই লোকের সকল সন্তাপ দূরে যায়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের প্রকাশ হয়। তোমার দয়ায় শাস্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয়, এবং উহা চিত্তে রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর ভক্তিসুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা সকল মাধুর্য্যের সার। তুমি করুণা করিয়া এই অধমজনে সেই দয়া প্রকাশ কর।

প্রভু চরণপতিত স্বরূপ দামোদরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়ে প্রেমে অবশ ও অচেতন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া প্রভু বলিলেন,—"তুমি যে এখানে আসিবে, ইহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। তুমি আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে, তুমি আমার নেত্র।" দামোদর বলিলেন,—"প্রভো, আমি বড় অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, তুমি আমাকে কৃপারজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া আনিলে।" পরে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। তদনন্তর দামোদর পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম করিয়া জগদানন্দাদি প্রভুর অপরাপর ভক্তবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকেও একটি নিভৃত বাসাঘর ও জলাদি পরিচর্য্যার নিমিত্ত একজন ভৃত্য দেওয়াইলেন।

স্বরূপ দামোদরের আগমনের কয়েকদিন পরে গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন,—"আমি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ, আমি তাঁহারই আজ্ঞানুসারে প্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পুরীগোসাঁই সিদ্ধিপ্রাপ্তির সময় আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন,—"পুরীগোসাঁই আমার প্রতি বাৎসল্য বশতঃ কৃপা করিয়া তোমাকে আমার নিকট আসিতে আদেশ করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে।" এই ঘটনার সময় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোবিন্দের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"পুরীগোসাঁই শূদ্রসেবক রাখিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?" প্রভু উত্তর করিলেন,—"পুরীশ্বর পরম স্বতন্ত্র, ঈশ্বরের কৃপা শাস্ত্রপরতন্ত্র নহে; শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। পরে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য, তুমি ইহার বিচার কর। গোবিন্দ গুরুর সেবক, অতএব আমার মান্য, ইহা দ্বারা নিজের সেবা করান কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? অথচ গুরুর আজ্ঞা, উপায় কি করি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গুরুর আজ্ঞাই বলবতী, শাস্ত্রও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।" ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রভু গোবিন্দকে নিজের সেবাধিকার প্রদান করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হইলেন।

আর একদিন প্রভু ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ দত্ত আসিয়া বলিলেন.—"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, অনুমতি হইলে, তাঁহাকে লইয়া আসি।" প্রভু বলিলেন, "তিনি গুরুস্থানীয়, আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে লইয়া আসিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে প্রভুর মনে কিছু দুঃখ হইল। তিনি ভারতী গোসাঁইকে দেখিয়াও না দেখার মত বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি বলিলে, ভারতী গোসাঁই আসিয়াছেন, কৈ, তিনি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ যে ভারতী গোসাঁই আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি অজ্ঞ, ভারতী গোসাঁইকে জান না, ভারতী গোসাঁই চর্ম্ম পরিধান করিবেন কেন?" প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী গোসাঁই বুঝিলেন যে, তাঁহার চর্ম্মাম্বর প্রভুর ভাল লাগে নাই। তিনি ইহা বুঝিয়াও বিরক্ত হইলেন না, বরং সন্তুষ্টই হইলেন, এবং আজি হইতে আর দম্ভের কারণ-স্বরূপ চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন না, ইহাও স্থির করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু ভারতী গোসাঁইর মন জানিয়া তখনই বহির্বাস আনাইলেন। ভারতী গোসাঁই চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া বহির্বাস পরিধান করিলেন। তখন প্রভু ভারতী গোসাঁইর চরণবন্দন করিলেন। প্রভু চরণবন্দন করিলে, ভারতী গোসাঁই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কিছু আচরণ কর, তাহা অবশ্য লোক-শিক্ষার নিমিত্তই করিয়া থাক, কিন্তু তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে আমার অন্তরে ভয় জন্মে, অতএব তুমি আর আমাকে প্রণাম করিও না। এই নীলাচলে একমাত্র অচল ব্রহ্ম ছিলেন, সম্প্রতি আর এক সচল ব্রহ্ম হইলেন। সচল ব্রহ্ম গৌরবর্ণ এবং অচল ব্রহ্ম শ্যামবর্ণ। উভয়েই জগতের নিস্তারার্থ নীলাচলে বাস করিতেছেন।" প্রভু বলিলেন, "সত্য, আপনার শুভাগমনে নীলাচলে দুই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হইল।" ভারতী গোসাঁই বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি মধ্যস্থ হইয়া বিচার কর, জীব ব্যাপ্য—অধীন, ব্রহ্ম ব্যাপক—অধীশ্বর, ইনি আমাকে চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করাইয়া শোধন করিলেন, ইনি ব্রহ্ম, না আমি ব্রহ্ম?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ভারতী গোসাঁইরই জয় দেখিতেছি।" প্রভু বলিলেন,

"শিষ্যের নিকট গুরুর পরাজয় চিরপ্রসিদ্ধ।" ভারতী গোসাঁই বলিলেন, "ভক্তের নিকট প্রভু পরাজয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমি আজন্ম নিরাকারের ধ্যান করিয়া আসিতেছিলাম, তোমাকে দেখিয়া অবধি শ্রীভগবান্ সাকার বলিয়াই জ্ঞান হইয়াছে, মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের কথাই সদা স্মরণ হয়।" বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥"

আমরা অদ্বৈতমার্গের পথিকগণের উপাস্য ছিলাম এবং আত্মানন্দসিংহাসনে পূজিত হইতাম। সম্প্রতি কোন গোপবধূলম্পট শঠ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণে আপনার প্রগাঢ় প্রেম, অতএব সর্ব্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "উভয়ের কথাই সত্য; কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইলে, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়; কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় না।" প্রভু বলিলেন, "বিষ্ণু বিষ্ণু, সার্ব্বভৌম, কি বলিতেছ, অতিস্তুতি নিন্দার লক্ষণ।"

অনন্তর প্রভু ভারতী গোসাঁইকে লইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন। ভারতী গোসাঁই প্রভুর নিকটেই রহিলেন। পরে রামভদ্র আচার্য্য, ভগবান্ আচার্য্য ও কাশীশ্বর গোসাঁই আসিয়া প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকেও সম্মান করিয়া আপনার নিকট রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা স্থান হইতে নানা ভক্ত আসিয়া প্রভুর শরণাগত হইতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগকে নীলাচলে আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র।

প্রভু যখন দক্ষিণদেশ হইতে আগমন করেন, তখন রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন, প্রভুর অনুমতি হইলে, তিনি কটক হইতে পুরীতে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। ভট্টাচার্য্য তদনুসারে একদিন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্য কিছু না বলিয়া অভয়

প্রার্থনা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, কিছু ভয় নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা বল, আমি যোগ্য বোধ করিলে করিব, অযোগ্য বোধ করিলে করিব না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।" প্রভু কর্ণদ্বয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম, তুমি এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছ কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অধিক।" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক ও পরমভক্ত।" প্রভু বলিলেন,—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠময়ী নারীর স্পর্শে যেরূপ বিকার জন্মে, রাজসংসর্গেও সেইরূপ বিকার জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীর এবং বিষয়ীর আকারও ভীতিপ্রদ। প্রকৃত সর্পের ন্যায় কৃত্রিম সর্পও ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব তুমি ঐরূপ কথা আর কখন মুখেও আনিও না। পুনর্ব্বার ঐরূপ অনুরোধ করিলে, আমাকে এইস্থানে দেখিতে পাইবে না।" প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভীত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং রাজাকেও পত্র দ্বারা প্রভুর অভিপ্রায় বিদিত করিলেন। রাজা ভট্টাচার্য্যের পত্র পাইয়া পুনশ্চ ভট্টাচার্য্যকে লিখিলেন, "আপনি প্রভুর ভক্তগণকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন।" ভট্টাচার্য্য রাজার ঐ শেষ পত্রখানি প্রভুর ভক্তগণকে দেখাইলেন। পত্রে লেখা ছিল, প্রভু কৃপা না করিলে, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইবেন। ভক্তগণ পত্র পাঠ করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুর চরণে ভক্তি দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন এবং সার্ব্বভৌমের আগ্রহে প্রভুকে ঐ বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অন্তর্যামী প্রভু ভক্তগণের আগমনের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে কি বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছ, তাহা বল।" তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, "বলিতে ভয় হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না;

যোগ্যাযোগ্য সকল বিষয়ই আপনাকে নিবেদন করা উচিত বলিয়াই নিবেদন করিতেছি। রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার চরণদর্শন না পাইলে, সন্ন্যাসী হইতে চাহেন, এখন আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয়।" প্রভু শুনিয়া অন্তরে কোমল হইয়াও বাহিরে কঠোরভাবে বলিলেন, "তোমরা কোন্ দিন আমাকে রাজদর্শনার্থ কটকে লইয়া যাইতেও চাহিবে। রাজদর্শনে পরমার্থের হানি ত দূরের কথা, এই দামোদরই আমাকে ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যাহা হউক, আমি তোমাদিগের কথায় রাজার সহিত মিলিতে পারিব না। দামোদর কি বলেন দেখি।" দামোদর শুনিয়া বলিলেন, "তুমি ঈশ্বর, সর্ব্বথা স্বাধীন। কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে কি উপদেশ করিব? তবে রাজা তোমাকে স্নেহ করেন, তুমিও স্বভাবতঃ স্নেহের বশ, রাজার স্নেহই তোমাকে রাজার সহিত মিলন করাইবে, ইহাও দেখিব।" দামোদরের কথা শেষ হইলে, নিত্যানন্দ পুনশ্চ বলিলেন, আমরা আপনাকে রাজদর্শন করিতে অনুরোধ করিব, ইহা কি কখন সম্ভব হয়? তবে যাঁহার যাঁহাতে অনুরাগ, তিনি তাঁহাকে না পাইলে, জীবনও ত্যাগ করিতে পারেন, বজ্রপত্নীগণই তাহার নিদর্শন। অতএব, আপনাকেও রাজার সহিত মিলিতে বলি না, রাজারও জীবন যায় এরূপ ইচ্ছা করি না, যাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পায় এইরূপ করিতে বলি। আমি এই বলি, কৃপা করিয়া একখানি বহির্ব্বাস প্রদান করুন, উহাই রাজার জীবন রক্ষা করিবে।" তখন প্রভু বলিলেন, "তোমরা সকলেই জ্ঞানী, যাহাতে ভাল হয়, তাহাই কর।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্তে প্রদান করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ঐ বহির্ব্বাসখানি লোক দ্বারা কটকে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা প্রভুর বস্ত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। প্রভুর স্বরূপেই প্রভুর বসনখানিকে পূজা করিয়া আশার আশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রায় রামানন্দ কটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রায় রামানন্দকে প্রভুর কৃপাপাত্র জানিয়া তাঁহাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন এবং তিনি যাহাতে প্রভুকে জানাইয়া তাঁহাকে প্রভুর চরণ দর্শন করাইতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে বলিলেন। পরে উভয়েই একসঙ্গে কটক হইতে পুরীতে আগমন করিলেন।

রামানন্দ রায় পুরীতে আসিয়া প্রথমেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন।

তিনি আসিয়া প্রভুর চরণবন্দন করিলে, প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনেই প্রেমাবেশে কিয়ৎকাল রোদন করিলেন। রামানন্দের প্রতি প্রভুর স্নেহব্যবহার দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। রামানন্দ বলিলেন, "প্রভুর আজ্ঞানুসারে দাস রাজাকে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, তিনি আমাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়াছেন। রাজা প্রভুর ইচ্ছানুসারেই আমাকে বিষয় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আমি যখন রাজাকে জানাইলাম, আমি আর বিষয়কর্ম্ম করিতে পারিব না, আজ্ঞা দিন, প্রভুর চরণতলে পড়িয়া থাকি, রাজা প্রভুর নাম শুনিয়া তখনই আনন্দে আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি প্রভুর নাম শুনিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—তোমাকে আর রাজকর্ম্ম করিতে হইবে না, তুমি যাহা বেতন পাইতে, তাহাই পাইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া প্রভুর চরণসেবা কর। আমি অতি অধম, প্রভুর দর্শনলাভেরও যোগ্য নহি। যিনি প্রভুর চরণসেবা করেন, তাঁহারই জন্ম সফল, জীবন সফল। যাহাই হউক, ব্রজেন্দ্রনন্দন পরম-কৃপালু, কোন না কোন জন্মে অবশ্য আমাকে দর্শন দিবেন। রাজার যেরূপ আর্ত্তি দেখিলাম, আমাতে তাহার একবিন্দুও নাই।" প্রভু বলিলেন, "তুমি ভক্ত-প্রধান, তোমাতে যে প্রীতি করে, সে'ও অবশ্য ভাগ্যবান্; রাজা যখন তোমাকে এতাদৃশী প্রীতি করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণও অবশ্য তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবেন।"

প্রভুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রামানন্দ পুরীগোসাঁই, স্বরূপদামোদর ও নিত্যানন্দ প্রভুর চরণবন্দনা করিলেন। পরে অপরাপর ভক্তগণের সহিত মিলন হইল। মিলনের পর প্রভু বলিলেন, "রায়, তোমার জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে ত?" রামানন্দ বলিলেন, "না, এখন যাইয়া দর্শন করিব।" প্রভু বলিলেন, "রায়, এ কি কর্ম্ম করিলে? তুমি জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই এখানে আসিয়াছ?" রামানন্দ বলিলেন, চরণরূপ রথ ও হৃদয়রূপ সারথি জীবরূপ রথীকে যেখানে লইয়া যায়, জীব সেই স্থানেই গমন করে; আমি কি করিব, আমার মন আমাকে এইখানেই আনিল, জগন্নাথ দর্শনের বিচারই করিল না।" প্রভু বলিলেন, "যাও, শীঘ্র যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর; পরে গৃহে যাইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ কর।" রামানন্দ প্রভুর আদেশানুসারে জগন্নাথ দর্শনের পর গৃহে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে

ডাকাইলেন। সার্ব্বভৌম উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি পরে প্রভুর চরণে আমার বিষয় নিবেদন করিয়াছিলেন কি ?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমি আপনার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই রাজদর্শনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন, আমি যদি পুনশ্চ ঐরূপ অনুরোধ করি, তবে তিনি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। পরিশেষে ভক্তগণের সাহায্যে অনেক অনুরোধের পর একখানি বহির্বাস লইয়া তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবেন।" ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া রাজার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি বিষাদের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু নীচ পাপীর উদ্ধারার্থ অবতার স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি, জগাই এবং মাধাইকেও উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব কেবল প্রতাপরুদ্রকে ত্যাগ করিয়া জগতের উদ্ধার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই বোধ হয় প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, তিনি রাজদর্শন করিবেন না; আমারও প্রতিজ্ঞা, তিনি কৃপা না করিলে, জীবন ত্যাগ করিব; প্রভুর কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে আমার রাজ্যাদি সমস্তই বৃথা।" রাজার খেদোক্তি শুনিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলেন। পরে বলিলেন, "দেব, বিষাদ করিবেন না, আপনার প্রতি অবশ্য প্রভুর প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনারও তাঁহাতে প্রগাঢ় প্রেম দেখিতেছি। তথাপি একটি উপায় অবলম্বন করুন। রথযাত্রার দিন প্রভু ভক্তবর্গের সহিত প্রেমাবেশে রথাগ্রে নৃত্য করিবেন; নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন; আপনি সেই সময়ে রাজবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর চরণে পতিত হইবেন। প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না, বৈষ্ণবজ্ঞানে আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। রামানন্দ আসিয়া আপনার প্রেমের ও গুণের কথা শুনাইয়া প্রভুর মন কিঞ্চিৎ ফিরাইয়াছেন দেখিয়াছি।" ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া রাজা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও সুখী হইলেন। তিনি অগত্যা ভট্টাচার্য্যের পরামর্শই প্রভুর সহিত মিলনের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। যুক্তি দৃঢ় হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নানযাত্রা কবে ?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্নানযাত্রার আর তিন দিন আছে।"

পরদিবস আবার রামানন্দ প্রসঙ্গক্রমে রাজার প্রেমের কথা নিবেদন করিয়া প্রভুর মন আরও কোমল করাইলেন। তখন প্রভু রামানন্দকে বলিলেন,—"যদিও প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণে গুণবান্, তথাপি তাঁহার এক রাজোপাধিই তাঁহাকে

মলিন করিয়াছে। আমি রাজদর্শন কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে যখন সার্ব্বভৌম ও তুমি পুনঃ পুনঃ নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, তখন এই এক উপায় হইতে পারে, পিতা ও পুত্র একই বস্তু, পুত্রের মিলনে পিতার মিলন সিদ্ধ হইবে, রাজপুত্রকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করাও।” প্রভুর আদেশ পাইয়া রামানন্দ তখনই যাইয়া রাজাকে প্রভুর আদেশ জানাইলেন। রাজা শুনিয়া সানন্দে রামানন্দের সহিত নিজ পুত্রকে প্রভুর চরণসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র পরম সুন্দর; শ্যামলবর্ণ, কৈশোর বয়স, দীর্ঘচঞ্চল নয়নযুগল, পীতাম্বর পরিধান, অঙ্গে রত্নময় আভরণ সকল শোভা পাইতেছে। রাজপুত্র রামানন্দের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। রাজপুত্রের দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হইল। প্রভু প্রেমাবেশে রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“যাঁহার দর্শনে ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মরণ হয়, তিনিই মহাভাগবত। ইঁহার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম।” রাজপুত্র প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইলেন। অঙ্গে স্বেদ, কম্প ও পুলকাদি উদ্গত হইতে লাগিল। তিনি আবিষ্ট অবস্থায় ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া রোদন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ রাজপুত্রের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভু রাজপুত্রকে শান্ত করিয়া বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় রামানন্দকে বলিয়া দিলেন, ইহাঁকে নিত্য আমার সহিত মিলিতে বলিবে।

রামানন্দ রাজপুত্রকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা পুত্রের অদ্ভুত চেষ্টা সকল দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। পরে তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ংও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শের ন্যায় সুখানুভব হইল। তদবধি রাজপুত্র প্রভুর একজন ভক্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন।

স্নানযাত্রা উপস্থিত হইল। প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন। স্নানের পর জগন্নাথের দর্শন বন্ধ হইল, প্রভুর মনে মহাদুঃখ উপস্থিত হইল। প্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। পুরীতে অবস্থান কষ্টকর হইয়া উঠিল। সকলকে ছাড়িয়া প্রভু আলালনাথে গমন করিলেন। প্রভুর

গমনের পর গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। সার্ব্ব-ভৌমাদি ভক্তগণ যাইয়া প্রভুকে গৌড়ের ভক্তগণের আগমনসংবাদ জানাইলেন। প্রভু শুনিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনশ্চ ক্ষেত্রে আগমন করিলেন। প্রভু আসিলে, ভট্টাচার্য্য রাজাকে প্রভুর আগমনসংবাদ জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথাচার্য্য যাইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ পুরঃসর বলিলেন,—"গৌড় হইতে দুইশত বৈষ্ণব আসিয়াছেন, সকলেই পরম ভাগবত ও মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহারা নরেন্দ্রে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান ও প্রসাদের সমাধান করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমি পড়িছাকে আদেশ করিতেছি, সেই সমস্ত সমাধান করিবে।" পরে ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, গৌড়দেশ হইতে প্রভুর যে সকল ভক্ত আসিয়াছেন, আপনি আমাকে দেখান।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি প্রাসাদের ছাদোপরি আরোহণ করুন, আমি ত প্রভুর ভক্ত সকলকে জানি না, এই গোপীনাথ আচার্য্য সকলকেই জানেন, ইনিই আমাদের উভয়কেই দেখাইবেন।" এই কথার পর তিনজনেই প্রাসাদের ছাদোপরি আরোহণ করিলেন। ইতিমধ্যে গৌড়ের ভক্তগণও নিকটবর্ত্তী হইলেন। এদিকে স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা লইয়া তাঁহাদের অভি-মুখীন হইলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এই যিনি মালা লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহাঁর নাম স্বরূপদামোদর, আর এই যিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, ইহাঁর নাম গোবিন্দ, প্রভু ইহাঁদের মালা দিয়া ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিতে পাঠাইয়াছেন। তদনন্তর গোপীনাথ আচার্য্য একে একে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, আচার্য্য পুরন্দর, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, নৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, নন্দন আচার্য্য, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্ত, নারায়ণ, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, বিজয়, বল্লভসেন, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, সত্যরাজখান, রামানন্দ, মুকুন্দদাস, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন প্রভৃতি ভক্তবর্গের সজ্ঞিপ্ত পরিচয় দিলেন। শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবের এরূপ তেজ আমি আর কখনও দেখি নাই, এবং এরূপ মধুর কীর্ত্তনও আর কখন শুনি নাই।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছেন, এরূপ কীর্ত্তনের এই প্রথম সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন, তাহা এই শ্রীচৈতন্যাবতারেই প্রকাশ হইল। এই সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা যিনি শ্রীচৈতন্যের

আরাধনা করিতে পারেন, তিনিই সুমেধা বলিয়া উক্ত হয়েন।" রাজা বলিলেন, "নামসঙ্কীর্ত্তনই যদি কলিযুগের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে পণ্ডিত সকল কেন ইহাতে বিতৃষ্ণ হয়েন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যের কৃপা ভিন্ন কেহই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে বা বুঝিয়া তাঁহার ভজন করিতে সমর্থ হয়েন না।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়া প্রভুর বাসার দিকে যাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, ইহাঁরা অগ্রে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া প্রভুর বাসার দিকে যাইতেছেন কেন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইহাঁরা সকলেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, অতএব অগ্রে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই জগন্নাথ দর্শন করিবেন।" রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, ঐ দেখুন, ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোক দ্বারা প্রচুর মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছে, ইহারই বা কারণ কি?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভুর আদেশানুসারে বাণীনাথ ভক্তগণের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছে।" রাজা বলিলেন, "ইহাঁরা তীর্থে আসিয়াছেন, উপবাস ও ক্ষৌর প্রভৃতি বিধান সকল পালন না করিয়াই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিবেন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা বিধিমার্গের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু রাগমার্গের নিয়ম অতিশয় সূক্ষ্ম। ক্ষৌর ও উপবাস প্রভৃতি বিধান সকল পরোক্ষ আজ্ঞা। আর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা। বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে করিয়া মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিবেন, এই লাভ ত্যাগ করিয়া কি উপবাস পালন সঙ্গত হয়? যেখানে মহাপ্রসাদ নাই, সেইখানেই উপবাসের বিধান। মহাপ্রসাদ ত্যাগে অপরাধ হয়, ইহাই প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা। প্রভুর কৃপা হইলেই লোকের লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায়।" এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর রাজা ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্যের সহিত ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। পরে পড়িছা ও কাশীমিশ্রকে ডাকিয়া প্রভুর ভক্তগণের যথাযোগ্য বাসস্থান ও প্রসাদাদির আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্যকে বিদায় দিলেন।

রাজার নিকট হইতে বিদায়ের পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথাচার্য্য দূর হইতেই দেখিলেন, অদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া কাশী-মিশ্রের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন। এই সময়ে প্রভুও নিজের বাসা হইতে বাহির হইয়া ভক্তগণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভক্ত-

গণের সহিত মিলন হইল। প্রথমেই অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই প্রেমানন্দে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রভু সময় বুঝিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ একে একে প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। প্রভুও একে একে সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। অনন্তর সকলকে বসাইয়া স্বহস্তে মালা ও চন্দন পরাইয়া দিলেন। মালাচন্দন প্রদানের পরে অদ্বৈতাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আচার্য্যের আগমনে আমি পূর্ণ হইলাম।" পরে বাসুদেবের অঙ্গে হস্ত দিয়া বলিলেন, "যদিও মুকুন্দ আমার বাল্যবন্ধু, তথাপি তোমাকে দেখিলে, আমার অতিশয় সুখোদয় হয়।" বাসুদেব বলিলেন, "যদিও আমি বয়সে জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ, কিন্তু মুকুন্দ অগ্রে তোমার কৃপাপাত্র হইয়া গুণতঃ আমার জ্যেষ্ঠ হইয়াছে।" বাসুদেবের কথা শেষ হইলে, প্রভু ব্রহ্ম-সংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত এই দুইখানি পুস্তক তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই পুস্তক দুইখানি আমি দক্ষিণদেশ হইতে লইয়া আসিয়াছি, পুস্তক দুইখানি সিদ্ধান্তের সার।" ভক্তগণ পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইলেন, এবং সকলেই এক একখানি লিখিয়া লইলেন। পুস্তক প্রদানের পর প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগের চারি ভ্রাতার মূল্যক্রীত।" শ্রীবাস বলিলেন, "এ বিপরীত কথা, আমরা চারি ভ্রাতা আপনার কৃপামূল্যে ক্রীত।" অনন্তর প্রভু শঙ্কর ও শিবানন্দ প্রভৃতি অপরাপর ভক্তবৃন্দের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রভু মুরারিকে না দেখিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু মুরারির অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণ বাহিরে যাইয়া মুরারিকে লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু মুরারিকে আসিতে দেখিয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। মুরারি দৈন্যবশতঃ দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অধম পামর, আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি।" প্রভু বলিলেন, "মুরারি, দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এই কথা বলিয়া প্রভু মুরারিকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। পরে তাঁহাকে নিজের নিকটে বসাইয়া তাঁহার অঙ্গ সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর হরিদাসকে না দেখিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস রাজপথে দণ্ডবৎ পতিত ছিলেন। ভক্তগণ যাইয়া হরিদাসকে প্রভুর মিলনেচ্ছা বিদিত করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "আমি নীচজাতি, প্রভুর মন্দিরের নিকট যাইবার

অধিকার নাই। যদি কোন টোটায় নিভৃত স্থান পাই, সেই স্থানেই থাকিয়া কালযাপন করি। জগন্নাথের সেবক সকল আমার অঙ্গস্পর্শ না করেন, এমন স্থানই আমার উপযুক্ত।" ভক্তগণ হরিদাসের অভিপ্রায় প্রভুকে বিদিত করিলেন। প্রভু শুনিয়া সুখী হইলেন।

এই সময়ে কাশীমিশ্র একজন পরীক্ষাপাত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণ-বন্দন করিলেন। পরে তাঁহারা প্রভুর ভক্তবর্গের যথাযোগ্য সম্মাননা করিয়া প্রভুকে বলিলেন, "সমস্ত বৈষ্ণবেরই বাসার আয়োজন করা হইয়াছে, প্রভুর অনুমতি হইলে, ইহাঁদিগকে লইয়া যাইতে পারি, এবং মহাপ্রসাদেরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "গোপীনাথাচার্য্য, তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া যাঁহার যে বাসা উপযুক্ত হয়, তাঁহাকে সেই বাসা দেওয়াও।" পরে কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "মহাপ্রসাদ বাণীনাথের নিকট দেওয়া হউক, বাণীনাথই উহার সমাধান করিবেন; আর এই পুষ্পোদ্যানে যে ক্ষুদ্র গৃহখানি আছে, ঐখানি হরিদাসের বাসার নিমিত্ত আমাকে দিতে হইবে।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "গৃহ আপনারই, আমার নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, আপনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন।" এই কথা বলিয়া কাশীমিশ্র গোপীনাথাচার্য্য ও বাণীনাথকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি গোপীনাথকে বাসাগুলি দেখাইয়া দিলেন এবং বাণী-নাথকে মহাপ্রসাদগুলি দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য বাসাগুলি সংস্কার করাইয়া এবং বাণীনাথ মহাপ্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তখন প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা নিজ নিজ বাসায় যাইয়া বস্ত্রাদি রাখিয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া মন্দিরের চূড়া দর্শন পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন কর।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ গোপীনাথাচার্য্যের সহিত নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। ভক্তগণ চলিয়া গেলে, প্রভু উঠিয়া হরিদাসের নিকট গমন করিলেন। হরিদাস নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, প্রভুকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "আমি অস্পৃশ্য পামর, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" প্রভু বলিলেন,—"আমি পবিত্র হইবার নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। তুমি পরম পবিত্র। তোমার পবিত্রতা আমাতে নাই। তুমি ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বতীর্থে স্নান, জপ, যজ্ঞ, তপ, দান ও বেদা-ধ্যয়ন করিতেছ। তুমি দ্বিজ হইতে এবং ন্যাসী হইতেও পরম পবিত্র।" এই কথা বলিয়া প্রভু হরিদাসকে কথিত পুষ্পোদ্যানে লইয়া গেলেন। পুষ্পোদ্যানের নিভৃত ঘরখানি হরিদাসের বাসস্থান হইল। পরে প্রভু বলিলেন, "হরিদাস,

তুমি এই স্থানে থাকিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন কর; আমি প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া তোমার সহিত দেখা করিব; তুমি শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিবে; তোমার প্রসাদ এই স্থানেই আসিবে।" প্রভুর কথা শেষ হইলে, হরিদাস নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রণাম করিলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ হরিদাসের সহিত মিলনে পরমানন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর প্রভু নিত্যানন্দাদির সহিত সমুদ্রে স্নান করিয়া বাসায় আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে অদ্বৈতাদি ভক্তগণও নিজ নিজ বাসা হইয়া স্নান ও চূড়া দর্শন করিয়া প্রভুর বাসায় আগমন করিলেন।

ভক্তবর্গ সমবেত হইলে, প্রভু তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া স্বয়ং পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু অল্প প্রসাদ দিতে পারেন না, এক এক জনের পাতে দুই তিন জনের অন্ন দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু ভোজন না করিলে, কেহই ভোজন করিবেন না, সকলেই হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, আপনি পরিবেষণ ছাড়িয়া ভোজনে বসুন; আপনি ভোজন না করিলে, কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না; গোপীনাথ আপনার সঙ্গী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাঁহারাও আপনার অপেক্ষা করিতেছেন'; অতএব নিত্যানন্দকে লইয়া আপনি ভোজন করুন, আমি পবিবেশন করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া প্রভু হরিদাসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিয়া স্বয়ং নিত্যানন্দের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। গোপীনাথাচার্য্য সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রভুদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁই, দামোদর ও জগদানন্দ অপর সকলকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন ও মধ্যে মধ্যে উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভোজন সমাধা হইলে, সকলে উঠিয়া আচমন করিলেন। আচমনের পর প্রভু সকলকে বসাইয়া মালা চন্দন পরাইলেন। অনন্তর সকলেই বিশ্রামার্থ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন।

সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার ভক্তগণ প্রভুর বাসায় সমবেত হইলেন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রায় রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু সকল বৈষ্ণবের সহিত তাঁহাদের মিলন করাইলেন। পরে সকলকে লইয়া জগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকালীন ধূপারাত্রিক দর্শনের পর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জগন্নাথের পড়িছা আসিয়া সকলকে মালা ও চন্দন প্রদান করিলেন।

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু মধ্যে থাকিয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইখানি দুইখানি করিয়া আটখানি মৃদঙ্গ এবং আটজোড়া আটজোড়া করিয়া বত্রিশ জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের সুমঙ্গল ধ্বনি মন্দির পূর্ণ করিয়া দশদিক ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। ক্রমে উহা চতুর্দ্দশ ভুবন ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিল। পুরুষোত্তমবাসী লোক সকল অপূর্ব্ব কীর্ত্তন দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই অদ্ভুত কীর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু ভক্তগণকে লইয়া মন্দির-প্রদক্ষিণচ্ছলে বেড়াকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য, ঘন ঘন অশ্রু কম্প ও পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকার সকল দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে পতনকালে নিত্যানন্দ পশ্চাতে থাকিয়া প্রভুকে ধরিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল নর্ত্তন-কীর্ত্তনের পর প্রভু স্বয়ং ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক মহান্ত সকলকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীবাস পণ্ডিত এই চারিজন চারিসম্প্রদায়ে নৃত্যারম্ভ করিলেন। প্রভু ঐ চারি সম্প্র-দায়ের মধ্যে থাকিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সকলেই আপন আপন সম্মুখে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর নর্ত্তন ও কীর্ত্তন দেখিয়া দর্শকমাত্রই প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র প্রাসাদের ছাদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন। প্রভুর সেই অপূর্ব্ব নর্ত্তন ও কীর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভুর সহিত মিলনের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের পর প্রভু জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত বাসায় গমন করিলেন। পড়িছা বিস্তর মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভু ঐ প্রসাদ সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া নিজ নিজ বাসায় যাইয়া শয়ন করিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যাদি প্রভুর ভক্তগণ এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ক্রমে রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। প্রভু কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও পড়িছাপাত্রকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে গুণ্ডিচামার্জ্জন সেবা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"প্রভুর যাহা অভিলাষ, তাহাই আমাদের সম্পাদনীয়। বিশেষতঃ রাজার আদেশ, আপনার যখন যাহা আজ্ঞা, তখন তাহা পালন করিতে হইবে। কিন্তু মন্দিরমার্জ্জন

আপনার যোগ্য হয় না। তবে আপনার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহাই হইবে। আমরা ঐ কার্য্যের নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন, সেই সেই বস্তুর আয়োজন করিয়া রাখিব।” প্রভু শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

গুণ্ডিচামার্জ্জন।

পরদিন প্রভাতে ভক্তগণ একত্র সমবেত হইলে, প্রভু স্বহস্তে সকলের অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া কাহারও হস্তে সম্মার্জ্জনী ও কাহারও হস্তে কলস প্রদান করিলেন। পরে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গুণ্ডিচামন্দিরে যাইয়া মন্দিরমার্জ্জন কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। মন্দিরের ভিতর বাহির অঙ্গন ও ভিত্তি প্রভৃতি সমস্তই শোধন করা হইল। প্রভু স্বয়ং বহির্বাসে করিয়া ধূলিকঙ্করাদি লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও প্রভুর সহিত ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভক্তের নিক্ষিপ্ত ধূলি একত্র করিয়াও প্রভুর নিক্ষিপ্ত ধূলির সহিত সমান হইল না। ধূলিনিক্ষেপের পর জল দ্বারা মন্দিরের ভিতর বাহির অঙ্গন বেদী ও অন্তঃপুর প্রভৃতি সমস্ত ধৌত করা হইল। কেহ বা মন্দির প্রক্ষালনের ছলে প্রভুর চরণে জল ঢালিয়া দিয়া ঐ জল পান করিতে লাগিলেন। প্রভু তদ্দর্শনে অন্তরে সন্তোষ পাইয়াও লোকশিক্ষার্থ বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ সহকারে স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ, তোমার গৌড়ীয় সকল শ্রীমন্দিরের ভিতর আমার পায়ে জল ঢালিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছে।” স্বরূপ দামোদরও প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া প্রথমতঃ তাদৃশ অপরাধকারীকে তিরস্কার করিয়া পরে তাহার অপরাধ ক্ষমাপণ করাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নৃত্যগীতও চলিতে লাগিল। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র গোপাল প্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে আচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নৃসিংহমন্ত্র পাঠ সহকারে তাঁহার মুখে ও পেটে জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। অনেক যত্নেও গোপালের চৈতন্যোদয় হইল না। আচার্য্য কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের ক্রন্দন দেখিয়া ভক্তগণও তাঁহার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন প্রভু গোপালের বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, “গোপাল, উঠ উঠ।” প্রভুর কথা কর্ণে প্রবেশমাত্র গোপালের চৈতন্য হইল। ভক্তগণ আনন্দে ‘হরি হরি’ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মন্দির শোধন সমাধা হইলে, প্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভক্তগণের সহিত

সরোবরে যাইয়া স্নান ও জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ ক্রীড়ার পর সকলে তীরে উঠিয়া নিজ নিজ বসন পরিধানানন্তর নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে বাণীনাথ প্রচুর মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচশত লোকের উপযুক্ত মহাপ্রসাদ দেখিয়া প্রভুর মনে বিশেষ সন্তোষ হইল। প্রভু স্বয়ং পুরীগোসাঁই, ভারতী গোসাঁই, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর, শঙ্করারণ্য, ন্যায়াচার্য্য, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া বারাণ্ডার উপর বসিলেন। তার তলে সমস্ত উদ্যান ভরিয়াই ভক্তগণের পাতা হইল। প্রভু 'হরিদাস হরিদাস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হরিদাস দূর হইতে বলিলেন, "প্রভু ভক্তগণের সহিত প্রসাদ অঙ্গীকার করুন, আমার এই সঙ্গে বসা উচিত হয় না, গোবিন্দ আমাকে বহির্দ্বারে পশ্চাৎ প্রসাদ দিবেন।" প্রভু হরিদাসের মন বুঝিয়া আর কিছুই বলিলেন না। স্বরূপগোসাঁই, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর এই সাত জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজন লীলা প্রভুর স্মৃতিপথে উদিত হইল। প্রেমাবেশ বশতঃ অধীর হইয়াও প্রভু সময় বুঝিয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেন। পরিবেশনকালে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে নাফরা ব্যঞ্জন দাও, আর সকলকে পিষ্টক ও মিষ্টান্নাদি প্রদান কর।" কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, যিনি যাহা ভালবাসেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু স্বরূপাদি দ্বারা তাঁহাকে তাহাই দেওয়াইতে লাগিলেন। জগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে যাহা কিছু উত্তম সামগ্রী তাহা প্রভুর পাতে দিতে লাগিলেন। বলিয়া দিতে গেলে প্রভু পাছে রাগ করেন ভাবিয়া না বলিয়াই দিতে লাগিলেন। যাহা কিছু দিলেন, তাহা প্রভু ভোজন করিলেন কি না মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রভুও জগদানন্দের স্বভাব জানেন, ভোজন না করিলে, জগদানন্দ রাগ করিয়া ভোজন করিবেন না এই ভয়ে, সকল বস্তুরই একটু একটু ভোজন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁইও মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল মিষ্ট প্রসাদ আনিয়া প্রভুর পাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, অল্প অল্প আস্বাদন করুন, জগন্নাথ কিরূপ ভোজন করিয়াছেন দেখুন।" প্রভু স্বরূপের প্রতি স্নেহবশতঃ উহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়াছিলেন। স্নেহ করিয়া তাঁহাকে বার বার উত্তম উত্তম প্রসাদ দেওয়াইতে

লাগিলেন। গোপীনাথাচার্য্য উত্তমোত্তম মহাপ্রসাদ আনয়ন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কোথায় ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়ব্যবহার, আর কোথা এই পরমানন্দ, একবার বিচার করিয়া দেখ।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমি কুবুদ্ধি তার্কিক, তোমার প্রসাদেই আমার এই সম্পদের সিদ্ধি। মহাপ্রভুর তুল্য দয়াময় আর কেহ নাই। কাঁককে গরুড় করিতে পারে, এমন আর কে আছে? কোথায় আমি তার্কিক শৃগালের সহিত হুয়া হুয়া করিতাম, আর এখন কি না সেই মুখে হরি কৃষ্ণ রাম নাম বলিতেছি। কোথায় বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণের সঙ্গ, আর কোথায় এই সঙ্গসুধাসমুদ্র!" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তোমার কৃষ্ণপ্রীতি পূর্ব্বসিদ্ধা; তোমার সঙ্গে আমাদেরও কৃষ্ণে মতি হইয়াছে।" ভক্তের মহিমা বাড়াইতে ও ভক্তে সুখ দিতে মহাপ্রভুর সমান আর কে আছে?

এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ দুইজনে পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। ভোজন করিতে করিতে উভয়ে ক্রীড়া কলহ বাধিয়া গেল। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "অবধূতের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে বসিয়াছি, না জানি আমার গতি কি হইবে? প্রভু সন্ন্যাসী, উহাঁর উহাতে কিছুই আসে যায় না, সন্ন্যাসীর অন্নদোষ হয় না; আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, অবধূতের জাতি, কুল, শীল ও আচার কিছুই জানি না, উহাঁর সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন অতিশয় অনাচার।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "তুমি অদ্বৈতাচার্য্য, অদ্বৈত সিদ্ধান্তে শুদ্ধ ভক্তির বাধ হয়, তোমার সিদ্ধান্ত ও তোমার সঙ্গ সর্ব্বনাশকর, যে এক বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় মানে না, তাহার সঙ্গে একত্র ভোজন করিয়া আমারও কি দশা হয় জানি না।" এই রূপে দুই প্রভুতে ব্যাজস্তুতি হইতে লাগিল। ভোজন সমাপ্ত হইলে, সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। উঠিয়া সকলেই আচমন করিলেন। আচমন শেষ হইলে, প্রভু স্বহস্তে সকলকেই মালাচন্দন পরাইয়া দিলেন। স্বরূপাদি পরিবেষকগণ গৃহমধ্যে বসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর ভোজনাবশেষ ধরিয়া রাখিলেন, এবং উহার কিয়দংশ হরিদাসকে প্রদান করিলেন। ভক্তগণ প্রভুর প্রসাদকণিকা গোবিন্দের নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। পশ্চাৎ গোবিন্দ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

গুণ্ডিচামার্জ্জনের পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নামক উৎসব। স্নানের পর একপক্ষ জগন্নাথের দর্শন হয় নাই। এই দিন লোক সকল জগন্নাথ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনার্থ

গমন করিলেন। কাশীশ্বর অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। পশ্চাতে গোবিন্দ জলপাত্র লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভুর অগ্রে পুরী ও ভারতী, দুই পার্শ্বে স্বরূপ ও অদ্বৈত, অপর ভক্ত সকল কেহ পার্শ্বে কেহ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু দর্শনলোভে নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভোগমণ্ডপে যাইয়া জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। প্রভুর তৃষ্ণার্ত্ত নেত্রভ্রমর-যুগল নিমেষরহিত হইয়া জগন্নাথের বদনকমলের মধুপান করিতে লাগিল। জগন্নাথের নয়নযুগল প্রফুল্ল কমল সদৃশ, অধররাগ বান্ধুলির পুষ্পকেও পরাজয় করিয়াছে, ঈষৎ হাস্যের কান্তি যেন অমৃতের তরঙ্গ। কোটি কোটি ভক্তের নেত্রভৃঙ্গ যত পান করিতে লাগিল, শ্রীমুখের সৌন্দর্য্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভু ভক্তগণের সহিত জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মুহুর্মুহু স্বেদ, কম্প, পুলক ও অশ্রু প্রকাশ পাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে মধ্যে দর্শন হয়। ভোগের সময় প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করেন। ভোগ হইয়া গেলে, আবার দর্শন করেন। এইরূপে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত স্নানাদি মধ্যাহ্নকর্ম্ম করিতে গমন করিলেন।

রথযাত্রা।

রথযাত্রার দিন প্রাতঃকালে প্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয়াখ্য রথারোহণলীলা দর্শন করিতে গেলেন। জগন্নাথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক রথারোহণ করিতে চলিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং অনুচরবর্গের সহিত মহাপ্রভুর ভক্তগণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করাইতে লাগিলেন। বলবন্ত পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে ধরাধরি করিয়া রথস্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণসম্মার্জ্জনী লইয়া পথমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজার উক্ত নীচজনোচিত সেবাকার্য্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। মার্জ্জিত পথে চন্দনজল সেচন করা হইল। জগন্নাথ তুলার গদির উপর থাকিয়া থাকিয়া রথে আরোহণ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে বিপণী। মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল। প্রভু ভক্তগণকে মাল্যচন্দন দিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের চারিটি সম্প্রদায় হইল। এক এক সম্প্রদায়ে ছয়জন করিয়া গায়ক ও দুইজন করিয়া বাদক দেওয়া হইল। অদ্বৈত, নিত্যা-

নন্দ, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারিজন চারি সম্প্রদায়ে নৃত্যারম্ভ করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর প্রধান গায়ক এবং দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচজন তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রধান গায়ক এবং গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুভানন্দ ও শ্রীরামপণ্ডিত এই পাঁচজন তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ে মুকুন্দ প্রধান গায়ক এবং বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দঘোষ প্রধান গায়ক এবং হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব তাঁহার সাহায্যকারী গায়ক হইলেন। এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল, একটি কুলীনগ্রামের, একটি শান্তিপুরের ও অপরটি শ্রীখণ্ডের। রথের অগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রথ কখন শীঘ্র কখন মন্দ চলিতে লাগিল। কখন স্থির হইয়া থাকে, টানিলেও চলে না। যখন কোন রূপেই রথ চলে না, তখন মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে যাইয়া মাথা দিয়া রথ ঠেলেন, আবার রথ চলিতে থাকে। প্রভু কখন সাত সম্প্রদায়ে পৃথক্ পৃথক্ নৃত্য করেন, কখন যুগপৎ সাত সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতে থাকেন। স্বয়ং জগন্নাথ প্রভুর নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত রথ স্থগিত রাখেন। প্রতাপরুদ্র প্রভুর ঈদৃশ অদ্ভুত কীর্ত্তন দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী কাশী-মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর প্রেমমহিমা বলিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্রও রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে যুগপৎ সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও উহা দেখাইলেন। প্রভুর প্রসাদের অদ্ভুত রীতি, সাক্ষাতে রাজার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে এই প্রকার দয়া প্রকাশ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীমিশ্র রাজার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন।

প্রভু কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার লীলা করিয়া সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া স্বয়ং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক সকল পাঠ সহকারে প্রণতি ও স্তুতি করিতে লাগিলেন।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

যিনি ব্রহ্মণ্যগণের পূজ্য, যিনি গোব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি জগতের কল্যাণদায়ক, যিনি গোগণের পালয়িতা, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

বৃষ্ণিকুলপ্রদীপ, মেঘশ্যামল, কোমলাঙ্গ, ভূভারহারী, মুক্তিদাতা, পূজ্য, দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"

যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে বাস করিতেছেন, যিনি নন্দভার্য্যা ও বসুদেবভার্য্যা হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়েন, ব্রজবাসী গোপগণ ও পুরবাসী ক্ষত্রিয়গণ যাঁহার সভাসদ, যিনি নিজভুজতুল্য অর্জ্জুনাদি দ্বারা অধর্ম্ম নিরসন করেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমের দুঃখহন্তা, যিনি সহাস্য বদন দ্বারা ব্রজবনিতা ও পুরবনিতা সকলের প্রেমরূপ অপ্রাকৃত কামের বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়-যুক্ত হউন।

পরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া পুনশ্চ প্রণাম করিলেন।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনবাসী নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃত-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীগোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসানুদাস।

প্রভু মধ্যে মধ্যে এতাদৃশ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বশরীরে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত স্তম্ভ স্বেদ ও পুলকাদি দৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রভু ভাবাবেশে কখন ভূমিতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, কখন বা নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে লাগিলেন;

এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেশ আরম্ভ হইলে, ভক্তগণ তিনটি মণ্ডল করিয়া লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ, দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর ও গোবিন্দাদি ভক্তগণ এবং তৃতীয় মণ্ডলে পাত্রমিত্রাদি সহিত স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র লোকের ভিড় নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র নিজমন্ত্রী হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও ভাবাবিষ্ট হইয়া রাজার অগ্রে থাকিয়া প্রভুর নৃত্যাবেশ দেখিতেছেন। হরিচন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতের গাত্রে হস্ত দিয়া তাঁহাকে রাজার সম্মুখভাগ হইতে একটু পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত হরিচন্দনের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "তুমি ভাগ্যবান্, শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তস্পর্শ লাভ করিয়াছ, আমার ভাগ্যে ঐরূপ হস্তস্পর্শ লাভ হয় না।" হরিচন্দন রাজার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও শান্ত হইলেন। এদিকে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত বিকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাংসব্রণের সহিত রোমবৃন্দ উত্থিত হইতে লাগিল, দন্ত সকল চলিত হইতে লাগিল, রোমকূপ দিয়া রক্তোদ্গম হইতে লাগিল, নয়নযুগল হইতে প্রস্রবণের ন্যায় বারিধারা ছুটিতে লাগিল। তিনি কখন বা নিস্পন্দ হইয়া ভূমিতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার ভাবাবেশ প্রকাশের পর প্রভু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেন। তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। তখন স্বরূপ দামোদরকে গান করিতে আদেশ করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই প্রভুর মন বুঝিয়া নিম্নলিখিত পদটি গান করিতে লাগিলেন,—

"সেইত পরাণনাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ।"

স্বরূপ গোসাঁই উচ্চকণ্ঠে উক্ত ধুয়া গাইতে লাগিলেন। প্রভু প্রেমানন্দে মধুর মধুর নাচিতে লাগিলেন। প্রভু যখন নৃত্য করেন, তখন জগন্নাথ রথ থামাইয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে থাকেন। আবার যখন প্রভু রথের অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন, তখন রথও চলিতে থাকে। নাচিতে নাচিতে আবার প্রভুর এক ভাবতরঙ্গ উঠিল। নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

রেবাতীরে কৃতক্রীড়া কোন এক নায়িকা ঐ স্থানের প্রতি সমুৎসুক হইয়া নিজগৃহে সখীকে বলিতেছেন,—যিনি আমার কৌমারসহচর অভিমত পতি ছিলেন, এখনও তিনিই আছেন; কালও সেই চৈত্ররজনী; সেই প্রফুল্ল মালতী কুসুমের সুগন্ধহারী কদম্ববনবায়ু বহন করিতেছে; আমিও সেই আছি; তথাপি রেবাতটস্থ বেতস কাননের সুরতব্যাপার সকল স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

পূর্ব্বে যেমন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন,— "সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনই আমার মন আকর্ষণ করিতেছে; অতএব সেই স্থানেই নিজ চরণ দর্শন করাও। এখানে লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া ও রথের ধ্বনি; বৃন্দাবনে পুষ্পারণ্য, ভ্রমর কোকিল ও ময়ূরাদির ধ্বনি। এখানে তোমার রাজবেশ, ক্ষত্রিয় সকল সহচর; বৃন্দাবনে গোপবেশ, গোপ সকল সহচর। এখানে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত; সেখানে মুরলী-বদন। ব্রজে তোমার সঙ্গে যে সুখ আস্বাদন হয়, এখানে তাহার কণামাত্রও হয় না; অতএব পুনশ্চ যদি আমাকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাবিহার কর, তাহা হইলে, আমার মনোরথ পূর্ণ হয়।—তদ্রূপ, প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া উল্লিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গান করিলেন।

স্বরূপের গীত শেষ হইলে, প্রভু পুনশ্চ নৃত্য করিতে করিতে আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। উক্ত শ্লোক যথা—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ র্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত গোপীগণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলে, উহা শ্রবণ করিয়া সেই গোপীগণ বলিতেছেন,—তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরসন বিষয়ে ভাস্করসদৃশ, ইহা আমরা বিদিত আছি। আমরা

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের পাত্র নহি। আমরা চকোরী, তোমার মুখচন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারাই জীবন ধারণ করি। ত্বদুপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরূপ আতপ আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব শ্রীবৃন্দাবনে সমুদিত হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা কর। হে নলিননাভ, যোগেশ্বরগণ তোমার চরণারবিন্দ হৃদয়ে চিন্তা করেন, আমরা উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি। যোগেশ্বরগণ অগাধবুদ্ধি, তাঁহারা তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে পারেন, আমরা বুদ্ধিহীনা অবলা, উহা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াই মূর্চ্ছাসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি। তোমার ঐ পাদপদ্ম সংসারকূপে পতিত লোক সকলকে অবলম্বনরূপে উদ্ধার করিয়া থাকে, ইহাও আমরা জানি; কিন্তু আমরা ত সংসারকূপে পতিত হই নাই, বিরহসাগরে পতিত হইয়াছি, অতএব ত্বচ্চিন্তন আমাদিগের পক্ষে ব্যর্থই হইতেছে। দ্বারকায় আসিয়া তোমার সহিত বিহারও আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব; কারণ, আমরা শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় আগমন করিতে অক্ষম। তোমার বৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যই আমাদিগের রুচিকর, দ্বারকৈশ্বর্য্য আমাদিগের রুচিকর হয় না। অতএব শ্রীবৃন্দাবনেই তোমার শ্রীচরণারবিন্দ উদয় কর। আমরা শ্রীবৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইব, স্মরণে কৃতার্থ হইতে পারিব না।

প্রভুর ভাবগতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বরূপ গোসাঁই পুনশ্চ গান করিতে লাগিলেন। উক্ত গীত যথা—

অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।

তারে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচার ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটি,
শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ্ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে লেহ তার পার ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, মাতা পিতা মিত্রগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা ॥
বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তাহে তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস ॥
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥
তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥

শুনিয়া রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবেতে ব্যাকুল হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আঁপনাকে ঋণী মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥

প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোনজন ॥ ধ্রু ॥

ব্রজবাসী যতজন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল।
প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥
রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।

লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥
যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাঙ জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হৈঞা।
যে স্ত্রী পুত্র ধন করি, বাহ্য আবরণ ধরি,
যদুগণের সন্তোষ লাগিঞা ॥
তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমাসনে,
বিলসিব রাত্রিদিবসে ॥
এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥

প্রভু স্বরূপের গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভাবাবেশে পতিতপ্রায় হইলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দও ভাবাবিষ্ট ছিলেন, প্রভু পড়িয়া যান তাহা দেখিতে পাইলেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পশ্চাতে ছিলেন, প্রভুকে পতিতপ্রায় দেখিয়া ধরিলেন। প্রতাপরুদ্রের অঙ্গস্পর্শমাত্র প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি হইল। প্রভু বিষয়ীর স্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিলেন। প্রভুর বিরক্তিতে প্রতাপরুদ্র কিছু ভীত হইলেন। তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আপনি ভীত হইবেন না, প্রভু আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হন নাই, ভক্তগণকে অসাবধান দেখিয়া শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অবসর বুঝিয়া আপনাকে ইঙ্গিত করিব, আপনি সেই সময় যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন।" এইপ্রকার কথোপকথন হইতে হইতেই রথ বলগণ্ডিস্থানে উপনীত হইল। ঐস্থানে রথ রাখিয়া পুরুষোত্তমবাসীরা জগন্নাথের ভোগ লাগাইয়া থাকেন। রথ থামিলে, ভোগের

আয়োজন হইতে লাগিল। ভোগের সময় লোকের ভিড় দেখিয়া প্রভু নৃত্য ত্যাগ পূর্ব্বক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রভু প্রেমাবেশে উদ্যানমধ্যবর্ত্তী গৃহের বারাণ্ডায় যাইয়া উপবেশন করিলেন। নর্ত্তনশ্রমে প্রভুর কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। উদ্যানের শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিল। ভক্তগণও নৃত্যগীতশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তরুতলে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ইঙ্গিত পাইয়া একাকী বৈষ্ণবের বেশে প্রভুর সমীপস্থ হইলেন। প্রভু তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। রাজা যাইয়া প্রভুর চরণযুগল ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সম্বাহন এবং রাসলীলার অন্তর্গত গোপীগীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। গোপীগীতা শ্রবণ করিতে করিতে প্রভুর অপার সন্তোষ হইল। বার বার উচ্চস্বরে 'বোল বোল' বলিতে লাগিলেন। পরে যখন রাজা প্রতাপরুদ্র—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, তখন প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আমাকে বহু অমূল্য রত্ন প্রদান করিলে, আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিলাম না, এই আলিঙ্গনমাত্র দিলাম।" তখনই উভয়ের অঙ্গে কম্প ও পুলকের সহিত নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজার পূর্ব্বসেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই কৃপা করিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি কে? তুমি আমার অনেক হিত করিলে, অকস্মাৎ আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে।" রাজা বলিলেন, "আমি আপনার দাসানুদাস।" প্রভু শুনিয়া তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "যাহা দেখিলে, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিও না।" প্রভু রাজাকে চিনিয়াও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন না, অজ্ঞাতের ন্যায় বিদায় দিলেন। রাজা বাহিরে আসিয়া প্রভুর ভক্তগণের চরণবন্দন করিলেন। ভক্তগণ রাজার প্রতি প্রভুর প্রসাদ দেখিয়া আনন্দ সহকারে রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র বাণীনাথ দ্বারা বলগণ্ডি ভোগের উত্তম উত্তম প্রসাদ সকল প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত ঐ

স্থানেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। পরে ভক্তগণকে বসাইয়া পাত দেওয়াইলেন, এবং স্বয়ংই প্রসাদ পরিবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানিয়াই ভক্তগণের পরিতোষার্থ স্বয়ং পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রভু ভোজন না করিলে ভক্তগণ ভোজন করিবেন না। অগত্যা প্রভুকে পরিবেশন ছাড়িয়া ভোজনে বসিতে হইল। ভোজন করিতে করিতেই প্রভু ভক্তগণকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। প্রসাদ অনেক থাকিয়া গেল। প্রভু উপস্থিত দীনদরিদ্রগণকে ঐ প্রসাদ দেওয়াইলেন। ভক্তগণ কাঙ্গালীদিগের ভোজনরঙ্গ দর্শন করিয়া মহানন্দে প্রভুর সহিত হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এদিকে পুনর্ব্বার রথ চলনের সময় হইল। মল্লগণ রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও রথকে একপদও চালাইতে পারিল না। রাজাদেশে হস্তী সকল আনাইয়া তদ্দ্বারা রথচালনের ব্যবস্থা করা হইল, তাহাও নিষ্ফল হইল, রথ নড়িল না। তদ্দর্শনে প্রভু নিজ ভক্তগণকে রজ্জু দিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ হইতে রথ ঠেলিতে লাগিলেন। রথ নিমেষমধ্যে গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল। দর্শকমাত্র পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বলবন্ত মল্লগণ ও মত্ত হস্তিগণ যে রথ একপদও নড়াইতে পারিল না, সেই রথ প্রভুর স্পর্শমাত্র গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারে উপনীত হইল; লোক সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রথ গুণ্ডিচার দ্বারে উপনীত হইলে, পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে নামাইয়া গুণ্ডিচামন্দিরস্থ সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। প্রভু সায়ংকালীন আরাত্রিক দর্শন করিয়া জুঁইফুলের বাগানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরদিন অদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় প্রভুর নিমন্ত্রণ হইল। প্রভু প্রাতঃকালে ভক্তবর্গের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান ও কিয়ৎক্ষণ জলবিহার করিলেন। লিখিত আছে, প্রভু জলবিহারকালে অদ্বৈতাচার্য্যকে জলের উপর শয়ন করাইয়া স্বয়ং তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক শেষশায়ীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জল-বিহারের পর, প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিলেন। পরে পুরী ও ভারতী প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য ভক্তগণের সহিত আচার্য্যের বাসায় যাইয়া ভোজন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণ বাণীনাথ কর্ত্তৃক আনীত মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। ভোজনের পর অপরাহ্নে প্রভু পুনশ্চ জগন্নাথ দর্শন ও কীর্ত্তন করিলেন। নিশায় পূর্ব্ববৎ উদ্যানে যাইয়া শয়ন করিলেন।

———•

লক্ষ্মীবিজয়।

দেখিতে দেখিতে পঞ্চম দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিবসের নাম হেরা পঞ্চমী। রথযাত্রার দিন হইতে গণনায় পঞ্চম দিবসে লক্ষ্মীদেবী রথস্থ জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন বলিয়াই ইহার নাম হেরা পঞ্চমী বলা হয়। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর সন্তোষার্থ বিশেষ সমারোহে লক্ষ্মীবিজয় করাইবার মানস করিলেন। তদনুরূপ আয়োজনও হইল। কাশীমিশ্র প্রভুকে লক্ষ্মীবিজয়লীলা দর্শন করাইবার নিমিত্ত একটি উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত করিলেন। প্রভুকে ভক্তগণের সহিত ঐ স্থানে বসান হইল। প্রভু উপবিষ্ট হইয়া রসবিশেষ শ্রবণাভিলাষে স্বরূপ দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"জগন্নাথদেবের এই লীলা অবশ্য দ্বারকালীলা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বিহার করিতে করিতে বৎসরের মধ্যে এক-বার শ্রীবৃন্দাবনের তুল্য উপবন সকল দর্শন করিবার নিমিত্ত রথযাত্রাচ্ছলে নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন। গমনাগমনে পথে কয়েকদিন ঐ সকল উপ-বনেই বিহার করিয়া থাকেন। বিহারকালে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লয়েন না, ইহার কারণ কি?" স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন,—"কারণ ত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। উপবনবিহার অবশ্য শ্রীবৃন্দাবনবিহার। শ্রীবৃন্দাবনবিহারে লক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। এই নিমিত্তই লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লয়েন না।" প্রভু পুনশ্চ বলিলেন,—"শ্রীবৃন্দাবনবিহারে লক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই সত্য, কিন্তু এই উপ-বনবিহার যাত্রাচ্ছলে প্রকাশ্যবিহার, গুপ্তবিহার নহে, সঙ্গে সুভদ্রা ও বলরাম, লক্ষ্মীদেবীকেও সঙ্গে লওয়ায় দোষ কি ছিল?" স্বরূপগোসাঁই উত্তর করিলেন, "প্রকাশ্যবিহারে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লওয়ায় কোনরূপ দোষ স্পর্শ হয় না সত্য, কিন্তু জগন্নাথের অন্তরে শ্রীবৃন্দাবনবিহারই বিভাত হয় বলিয়া তৎকালে ঐশ্বর্য্যা-ধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গ শোভা পায় না। এই নিমিত্তই উপবনবিহারে লক্ষ্মী-দেবীকে সঙ্গে লওয়া হয় না।" প্রভু বলিলেন,—"আচ্ছা, এই নিমিত্তই যেন লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লওয়া হয় না, লক্ষ্মীদেবীর তাহাতে রোষ হয় কেন? জগন্নাথ-দেবের অন্তরে যাহাই থাকুক, তাহা ত অন্য কেহ জানিতে পারেন না, প্রকাশ্যে উপবনবিহারমাত্র, উপবনবিহারে লক্ষ্মীদেবীর রাগের কারণ কি?" স্বরূপ-গোসাঁই বলিলেন,—"প্রেমবতীর প্রকৃতিই ঈদৃশী। তাঁহারা কান্তের ঔদাস্যা-ভাস দেখিলেও ক্রোধ করিয়া থাকেন।"

ইত্যবসরে লক্ষ্মীদেবী সুবর্ণনির্ম্মিত দোলায় আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

তাঁহার পরিচারিকাগণ জগন্নাথের সেবকগণকে বন্ধন করিয়া বিবিধ তাড়ন ও ভর্ৎসন সহকারে তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। তদ্দর্শনে প্রভু ভক্তগণের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রভুকে হাস্য করিতে দেখিয়া দামোদর বলিলেন, "প্রভো, হাসিবারই কথা বটে। ইহা মান নয়, প্রচণ্ড রৌদ্ররস। এই প্রকার মান আমি আর কখন দেখি নাই বা শুনিও নাই। দ্বারকায় সত্যভামা দেবীর মানের কথা শুনা যায়, সেও এরূপ নহে। সত্যভামা দেবী যখন মানিনী হইতেন, তখন তিনি ভূষণাদি ত্যাগ করিয়া মলিন বসনে অধোমুখে ভূমিলিখন করিতেন। আর লক্ষ্মীদেবী কি না মানিনী হইয়া নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশ পুরঃসর সৈন্যসামন্ত লইয়া জগন্নাথদেবকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন।"

হরিবংশে সত্যভামাদেবীর ঈর্ষামান বর্ণনার সময় তাঁহাকে রোষবতী না বলিয়া রোষবতীর ন্যায়ই বলিয়াছেন,—

"রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব।
ভীতভীতোঽতি শনকৈ র্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা।
অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশং গতা॥"

একদা দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে একটি পারিজাত কুসুম আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পুষ্পটি রুক্মিণীদেবীকে প্রদান করেন। রূপযৌবন-সম্পন্না সত্যভামাদেবী শ্রীকৃষ্ণকৃত আদর হেতু অতিশয় গর্ব্বিতা ছিলেন। তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের প্রধানই বিবেচনা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার রুক্মিণীদেবীর প্রতি ঈর্ষা জন্মিল। তিনি ঐ ঈর্ষার বশীভূত হইয়া মানিনী হইলেন। মানিনী হওয়ায় তিনি রোষবতীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি স্নেহযুক্ত ছিলেন। অতএব তাঁহাকে রোষবতীর ন্যায় দেখিয়া পাছে তাঁহার স্নেহের শৈথিল্য হয় ভাবিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

হরিবংশের ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, স্নেহশালী কৃতাপরাধ নায়কের নায়িকাকে ভয় হয়, এবং প্রণয়িনী নায়িকার কৃতাপরাধ নায়কের প্রতি ঈর্ষাজনিত মান উৎপন্ন হয়। মান উৎপন্ন হইলে, নায়িকাকে রোষবতীর ন্যায় দেখা যায়। এই মানের নাম ঈর্ষামান। ইহা সহেতু, অর্থাৎ কান্তের অপরাধ বা অপরাধা-ভাসই এই মানের হেতু। এই সহেতু মান সত্যভামাদি মহিষীবর্গে এবং চন্দ্রাবল্যাদি গোপী সকলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার

মান আছে। ঐ মানের নাম প্রণয়মান। ঐ মান কারণনিরপেক্ষ, কান্তের অপরাধ বা অপরাধাভাসরূপ কারণের অপেক্ষা করে না। উহা প্রণয়াধিক্যে স্বতঃই উত্থিত হয়। উহা প্রণয়েরই বিলাস। ঐ মান কেবল ব্রজদেবীতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও মহিষীগণের সহেতুক মানের ন্যায় নহে। ব্রজদেবীগণের সহেতুক মানও অন্যত্র দুর্লভ এবং রসের নিধান।

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রজের মান কি প্রকার?"

স্বরূপ গোসাঁই বলিতে লাগিলেন,—মহিষীগণের মানের মূল, অন্যের সৌভাগ্য সহনে অসহিষ্ণুতা। আর ব্রজদেবীগণের মানের মূল, কান্তের অসুখাশঙ্কা। কান্তের অসুখ আশঙ্কায় ব্রজদেবীগণের প্রেমপ্রবাহ মানরূপ বাধা দ্বারা বাধিত হইয়া শতধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। ব্রজদেবীগণের প্রেম মানের আকারে প্রকাশিত হইয়া প্রেয়সীকে প্রিয়ের পূজ্য করায়, প্রেমের অনুভব ও পরিমাণ করায় এবং স্বয়ং প্রিয়রূপে অনুভূত হয়। এই নিমিত্তই অলঙ্কারশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"মান্যতে প্রেয়সা যেন যৎ প্রিয়ত্বেন মন্যতে।
মনুতে বা মিমীতে বা প্রেমমানঃ স কথ্যতে।
মহাভাষ্যকৃতঃ কোঽসাবনুমান ইতি স্মৃতে-
র্ল্যুড়ন্তোঽপি ন পুংলিঙ্গো মানশব্দঃ প্রদুষ্যতি॥"

যে মান হেতু প্রেয়সী প্রিয় কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন, যাহা স্বয়ং প্রিয়রূপে অনুভূত হয়, যাহা হইতে প্রেমের অনুভব বা পরিমাণ করা যায়, তাহাকেই প্রেমমান বলা হয়। মহাভাষ্যকার "কোঽসৌ অনুমানঃ" এইরূপ পুংলিঙ্গ মান শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব অনট্‌প্রত্যয়ান্ত মা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইলেও, মানশব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। মন ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় দ্বারাও মান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ঈর্ষাজনিত বা প্রণয়জনিত কোপই মান। বস্তুতঃ মান ও কোপ স্বতন্ত্র বস্তু। মান প্রণয়াখ্য প্রেমেরই বিলাস বিশেষ। প্রেম কুটিলস্বভাব। প্রেম কুটিলস্বভাব বলিয়াই বৃদ্ধির অবস্থায় কখন ঈর্ষারূপ কারণ হইতে কখন বা কারণনিরপেক্ষভাবে স্বতঃই মানাকারে উত্থিত হইয়া থাকে। যখন উহা ঈর্ষারূপ কারণ হইতে উত্থিত হয়, তখন উহাকে সহেতুক, এবং যখন উহা অকারণে উত্থিত হয়, তখন উহাকে নির্হেতুক মান বলা যায়। কোপ কটু ও

সন্তাপজনক, মান মধুর ও স্নিগ্ধতাসম্পাদক। এইপ্রকার স্পষ্ট ভেদলক্ষণ সত্ত্বেও মান ক্রিয়াবিশেষসাম্যে কোপের আকারে দৃষ্ট হয় বলিয়া মানকে কোপই বলা হয়। বস্তুতঃ মান কোপ নহে, কোপাভাসমাত্র।

ব্রজদেবীগণের স্বভাবভেদে তাঁহাদিগের প্রেমেরও বৃত্তিভেদ হইয়া থাকে। ঐ প্রেমবৃত্তির ভেদ অনুসারেই মানেরও প্রকারভেদ হয়। অসংখ্য ব্রজদেবীর অসংখ্য স্বভাব ভেদে অসংখ্য প্রেমবৃত্তির প্রকাশভেদ হইতে অসংখ্য মানের উদ্ভব হইয়া থাকে। উহা বর্ণনা করা নিতান্ত অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়াই উহার দুই চারিটি মাত্র বর্ণন করিব।

মানবতী নায়িকা ধীরা অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে তিন প্রকার। ধীরা মানিনী হইলে, কৃতাপরাধ নায়ককে সোপহাস বক্রোক্তি দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

"ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান ॥
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন ॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন ॥"

অধীরা রোষ সহকারে কঠোর বাক্য দ্বারা বল্লভকে নিরাস করিয়া থাকেন।

"অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভৎর্সন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥"

ধীরাধীরা অশ্রুমোচন সহকারে বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

"ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥"

বয়স ভেদে নায়িকা তিন প্রকার; মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। নবীনযৌবনা, ঈষৎ কামবতী, রতিবিষয়ে বামা, সখীজনের অধীনা, রতিচেষ্টায় লজ্জাশীলা অথচ তদ্বিষয়ে গোপনে যত্নবতী, সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি সলজ্জদৃষ্টিসঞ্চারিণী, প্রিয় ও অপ্রিয় বচনে অশক্ত এবং মানবিষয়ে সর্ব্বদা পরাঙমুখী নায়িকাকেই মুগ্ধা বলা যায়।

"মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী বিভেদ ॥

মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন ॥"

যাঁহার লজ্জা ও কাম সমান, যিনি স্পষ্টযৌবনা, যিনি কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভবচনা, মোহ পর্য্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখন কোমল কখন কর্কশা, তিনিই মধ্যা।

আর যিনি পূর্ণযৌবনা, মদান্ধা, বিপরীতসম্ভোগেচ্ছাশালিনী, ভুরি ভাঁবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, রস দ্বারা বল্লভকে স্বায়ত্তীকরণে সমর্থা, যাঁহার উক্তি ও চেষ্টা প্রৌঢ়ভাবাপন্ন, এবং যিনি মানবিষয়ে অতিশয় কর্কশা, তিনিই প্রগল্‌ভা।

এই মধ্যা ও প্রগল্‌ভাই মানে ধীরা অধীরা বা ধীরাধীরা হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে স্বভাবানুসারে কেহ মৃদু, কেহ প্রখরা, কেহ সমা হয়েন। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সকলেই নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা তদনুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রভু অপার আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং আরও অধিক শুনিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রবণাগ্রহ বুঝিয়া স্বরূপ গোসাঁই পুনশ্চ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, গোপীগণও শুদ্ধ প্রেমরসগুণে প্রবীণ। গোপীগণের প্রেমে রসাভাসরূপ দোষের সম্বন্ধ নাই। এই নিমিত্তই গোপীগণের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের পরম সন্তোষ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥"

সত্যকাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুরতসম্বন্ধী হাবভাবাদি অন্তরে অবরোধ পূর্ব্বক অনুরাগিণী অবলাগণের সহিত উক্তপ্রকারে কাব্যমধ্যে কথ্যমান, শরৎকালীন রস সকলের আশ্রয়ভূত ও চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল রাত্রি সকল উপভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যকাম, তাঁহার কামের অর্থাৎ সঙ্কল্পের কখনই ব্যভিচার হয় না। এই নিমিত্তই তিনি অনুরাগিণী অবলাগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তিনি বিহারকালে সেই অনুরাগিণী অবলাগণের সুরতসম্বন্ধী হাবভাবাদি নিজ অন্তরে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের হাবভাবাদি দ্বারা এতই আকৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

অবলাগণ তাঁহাতে অনুরাগিণী, অতএব তিনি কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবেন? অনুরাগিণী অবলাগণকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের সহিত শরৎকালীন রস সকলের আশ্রয়ভূত রাত্রি সকল ব্যাপিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শরৎশব্দে যেমন শরৎঋতুকে বুঝায়, তেমনি বৎসরাত্মক কালকেও বুঝায়। অতএব শরৎকালীন রস সকলের আশ্রয়ভূত রাত্রি সকল ব্যাপিয়া বিহার বলিতে অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিহারই বুঝিতে হয়। কাব্যমধ্যে কথ্যমান অর্থাৎ কবিগণ যাহা উৎকৃষ্টবোধে গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রস সকলের আশ্রয়ভূত এবং চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল বলিতে রসাভাসাদি দোষবিবর্জ্জিত এবং উদ্দীপনান্বিত। রস অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়; অর্থাৎ যে রসের যে ভাবে প্রবৃত্তি হওয়া অনুচিত, সেই রস যদি সেই ভাবে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহাকে রসাভাস বলা যায়। শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব বা রতি যদি উপপতিবিষয়িণী মুনিপত্নীবিষয়িণী বা গুরুপত্নীবিষয়িণী হয়, অথবা যদি নায়কনায়িকার তুল্যানুরাগ না থাকে, কিম্বা ঐ রতি যদি বহুনায়কনিষ্ঠ বা নীচগত হয়, তবে ঐ রস রসাভাস বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অতএব ব্রজাবলাদিগের রতি যে উপপতিবিষয়িণী হয় নাই, ইহা অবশ্য বক্তব্য; কারণ, উহা তাদৃশী হইলে, রস সকলের আশ্রয়ভূত বলিতেন না।

যিনি রসাস্বাদনে পরম প্রবীণ, যিনি রসের নির্যাস অর্থাৎ সার আস্বাদন করেন, তাঁহাকেই রসিকশেখর বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, অতএব তিনি যে রসাভাস আস্বাদন করেন নাই, তিনি যে রসের নির্যাসই আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইহা স্থির। শ্রীকৃষ্ণ রসের সার আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইহা স্থির হইলে, তিনি ঐ রসের সার কোথায় আস্বাদন করিয়াছিলেন, ইহাও নির্ণয় করিতে হয়। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন জগতেই হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত জগৎই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত। জগতের সকল ভক্তই বিধি-মার্গের পথিক। বিধিমার্গের পথিক সকল শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভজন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তের সঙ্কোচগৌরবাদি স্বাভাবিক। সঙ্কোচ-গৌরবাদি হইতে প্রেমের শৈথিল্য ঘটে। শিথিল প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না। যে ভক্ত আপনাকে হীন ও ভজনীয় বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন না। যিনি যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই ভাবেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। বিধিভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরই থাকেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত ভক্তিই শুদ্ধভক্তি। রাগমার্গের পথিক

সকল শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র সখা বা পতি বুদ্ধিতেই ভজন করিয়া থাকেন। পুত্র সখা বা পতি বুদ্ধিতে সঙ্কোচগৌরবাদি থাকে না। সঙ্কোচগৌরবাদি রহিত হইলে, প্রেমের গাঢ়তা জন্মে। এই গাঢ় প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়। যে ভক্ত আপনাকে বড় ও ভজনীয় বস্তুকে সম বা হীন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত বা প্রীত হয়েন। এই শুদ্ধপ্রেম বৈকুণ্ঠাদিরও দুর্লভ। ইহা একমাত্র গোলোকের নিজ সম্পত্তি। এই গোলোকের শুদ্ধ প্রেম করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখনই তিনি জগতে উক্ত রস-নির্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। তখন সখ্যভক্ত সকল শুদ্ধসখ্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার সমান জ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধারোহণ করিয়া তাঁহাকে রসনির্যাস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তখন বাৎসল্যভক্ত সকল শুদ্ধবাৎসল্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনা হইতে হীন জ্ঞানে তাঁহার লালনপালন করিয়া তাঁহাকে রস-নির্যাস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তখন মধুরভক্ত সকল শুদ্ধমাধুর্য্য বশতঃ সম্ভোগদশায় শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমজ্ঞানে এবং বিরহে আপনা হইতে হীনজ্ঞানে সেবা করিয়া তাঁহাকে রসনির্যাস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। কান্তা সকল বিরহে মান করিয়া যে ভর্ৎসন করেন, তাহা বেদস্তুতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে।

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥"

গোলোকের শুদ্ধ প্রেম প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসেরই সার আস্বাদন করাইয়া থাকেন। উক্ত পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধুর রসের আবার স্বকীয় ও পরকীয় এই দুইভাবে অবয়বসন্নিবেশ স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরকীয়ভাবেই রসের অতিশয় উল্লাস দেখা যায়। শ্রীবৃন্দাবনই ঐ পরকীয়-ভাবের একমাত্র স্থান।

"করগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥"

যাঁহারা পাণিগ্রহণবিধ্যনুসারে পরিণীতা হয়েন এবং পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে অবিচলিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই রসশাস্ত্রে স্বকীয়া বলা হয়।

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥"

আর যাঁহারা পাণিগ্রহণধর্ম্মানুসারে পরিণীতা নহেন এবং ইহলোক-পরলোক-নিরপেক্ষ রাগের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারাই পরকীয়া বলিয়া উক্ত হয়েন।

এই পরকীয়ভাব নিয়ত বর্দ্ধনশীল বলিয়া ইহার অবধি নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহা কেবল শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ ব্রজবধূগণেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রজবধূগণের মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধাতেই এই ভাব সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রজবধূগণ পরকীয়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে তদ্ভাবেই অঙ্গীকার করেন। উহা তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দাম্পত্যেরই আবরক ভাববিশেষ। উহা দাম্পত্য হইতে পৃথক নহে, দাম্পত্যেরই পরিপাকবিশেষ।

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয়প্রেমসর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥"

কিন্তু, পরকীয়া রমণীর প্রতি আসক্তিজনক রাগের প্রেরণায় যিনি পাণি-গ্রহণধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ পরকীয়া রমণীর প্রেমের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ পাত্র হয়েন, রসজ্ঞগণ তাঁহাকে উপপতি বলিয়া থাকেন।

উপপতিবিষয়ক মধুর রস আবার রসাভাস বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অথচ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ভাবেই মধুর রসের পরমোৎকর্ষ অঙ্গীকৃত হয়। অতএব ঔপপত্যভাবের যে লঘুত্ব, তাহা, প্রাকৃতনায়কপর, শ্রীকৃষ্ণপর নহে। ঔপপত্য ভাবের লঘুত্ব যে শ্রীকৃষ্ণপর নহে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে বিশেষ বলও আছে। যিনি সর্ব্বাবতারের মূল, তাঁহাতে কি কখন লঘুত্ব সম্ভব হয়? বিশেষতঃ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণে লঘুত্ব আরোপিত হইলে, রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থ শ্রীভগবানের অবতার মিথ্যা হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণের নিত্যপতি এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা হইলেও, শ্রীকৃষ্ণে গোপী-গণের ঔপপত্যভাব এবং গোপীগণে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ভাব অসম্ভব নহে; অঘটনঘটনাপটীয়সী শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রয়োজিতা যোগমায়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে স্বাভাবিক দাম্পত্যের আবরণ পূর্ব্বক ঔপপত্যের প্রকটনরূপ অঘটনঘটনা করিয়া থাকেন। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে পরস্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই স্বকীয়াতে পরকীয়ভাব দাম্পত্যে ঔপপত্যভাব উৎপাদন করিয়া থাকেন। পতি ও পত্নী ধর্ম্মের অনুরোধে যে পরস্পরকে ভজনা করেন, তাহাতে বিধিবাধ্যতা থাকায় সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হয় না; কিন্তু পরকীয়াভাবে উৎকট রাগ বশতঃ যে পরস্পর পরস্পরকে ভজন করেন, তাহাতে বিধিবাধ্যতা না থাকায় সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হয়। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে এই স্বকীয়াতে পরকীয়াভাবের দাম্পত্যে ঔপপত্যভাবের সঙ্ঘটনরূপ অসাধ্যসাধন করিয়া থাকেন। যোগমায়ার সেই অঘটনঘটনায় মুগ্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ প্রবলরাগ বশতঃ পাণিগ্রহণবিধিরূপ সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকেন। ফলতঃ তাঁহাদের স্বাভাবিক দাম্পত্যই ঔপপত্যরূপে সোপানীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোপণ করাইয়া থাকে।

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমি হ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥"

শুদ্ধপ্রেমরসপ্রবীণ গোপীগণ আবার দক্ষিণা ও বামা ভেদে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে যাহাদের শ্রীকৃষ্ণে তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহ, যাঁহারা মাননির্ব্বন্ধে অসমর্থা, যাঁহারা নায়কের প্রতি যুক্তবাদিনী এবং নায়ক যুক্তি দ্বারা যাঁহাদের মানভঞ্জনে সমর্থ, তাঁহারাই দক্ষিণা বলিয়া উক্ত হয়েন। আর যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় মধুস্নেহ, যাঁহারা মান গ্রহণার্থ সদা উদ্‌যোগবতী, যাঁহারা মানের শৈথিল্যে কোপনা হয়েন, যাঁহারা নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনার ন্যায় আচরণ করেন এবং নায়ক যাঁহাদের মানপ্রসাদনে অসমর্থ, তাঁহারাই বামা বলিয়া উক্ত হয়েন। এই বামাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠ। তিনি নির্ম্মল উজ্জ্বলরসের ও প্রেমরত্নের খনি। তিনি বয়সে মধ্যমা ও স্বভাবে সমা। তাঁহার প্রেমভাব প্রগাঢ় বলিয়া তিনি সদাই বামা। তাঁহার বাম্য স্বভাব বশতঃ নিরন্তর মান

উত্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার বাম্যপ্রধান মানে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবগম্ভীর আনন্দ-সাগর উথলিয়া উঠে। তাঁহার প্রেমকে অধিরূঢ় মহাভাব বলা হয়। উহা দশধা দগ্ধ নির্ম্মল কাঞ্চনের তুল্য। শ্রীরাধিকা যদি হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন, তবে বিবিধ ভাববিভূষণে বিভূষিতা হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব এবং ভাবহাবাদি বিংশতি ভাবালঙ্কার প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীরাধাকে এই সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেখিলে, শ্রীকৃষ্ণের সুখাব্ধিতরঙ্গ উথলিয়া উঠে। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে যখন এই সকল অলঙ্কার দৃষ্ট হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ সুখ পাইয়া থাকেন।

"বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥"

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার পথরোধ করেন, তখন রোদন রোষ ও ভয় প্রযুক্ত বাষ্পব্যাকুল, অরুণপ্রান্ত ও চঞ্চল নয়ন বিশিষ্ট, গর্ব্ববশতঃ রসোল্লাসময়, অভিলাষ বশতঃ হেলার উদয়ে চঞ্চল অধর বিশিষ্ট, অসূয়া বশতঃ ভ্রুকুটিযুক্ত ও মৃদুহাস্যসম্বলিত, অতএব কিলকিঞ্চিতাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীরাধার বদন অবলোকন করিয়া তিনি যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের অগোচর এবং সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক। প্রভু শুনিয়া সানন্দে দামোদরকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দামোদর, তোমার শ্রীবৃন্দাবনের সম্পৎ কেবল পুষ্প, কিশলয়, গৈরিক, গুঞ্জা ও শিখিপুচ্ছ, আর আমার লক্ষ্মীর সম্পৎ কত দেখ। ঐ দেখ, জগন্নাথ এই সকল সম্পৎ ছাড়িয়া বৃন্দাবনের পুষ্পোদ্যান দেখিতে যাওয়ায় আমার লক্ষ্মী দুঃখিত হইয়া জগন্নাথের কি লাঞ্ছনা করিতেছেন। ঐ দেখ, লক্ষ্মীর দাসীগণ তোমার প্রভুর পরিজনদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর চরণে প্রণতি করাইতেছে। ঐ দেখ, তোমার প্রভুর সেবকগণ করযোড়ে প্রভুকে আনিয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, উহাদের প্রতিজ্ঞায় শান্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবী গৃহে গমন করিলেন, তবে তোমার প্রভুর পরিজন সকল মুক্তি পাইলেন। আমার লক্ষ্মী রাজমহিষী, আর তোমার গোপীগণ দধিমন্থনকারিণী।" শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ভক্তগণ হাস্য সম্বরণ

করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, "শ্রীবাস, তোমার নারদস্বভাব, সুতরাং ঐশ্বর্য্যই তোমার চিত্তে উদিত হইয়া থাকে; আর দামোদর স্বরূপ শুদ্ধ ব্রজবাসী, মাধুর্য্যই ভালবাসেন।"

স্বরূপ গোঁসাই বলিলেন,—"শ্রীবাস সাবধানে শুন। তোমার দ্বারকা-বৈকুণ্ঠের সম্পৎ আমার শ্রীবৃন্দাবনসম্পদের কণামাত্রও নহে। স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ধনী, সেইস্থানের সম্পত্তি কি অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির সহিত উপমিত হইতে পারে?"

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥"
চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরব স্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদি পরমরমা সকল কান্তা এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসকল সকলফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন সকল চিন্তামণিময়, জল সকল অমৃতময়, কথা সকল দিব্যগীতময়ী, গতি বিচিত্রনৃত্যময়ী, বংশী প্রিয়সখী, জ্যোতিষ্ক সকল চিদানন্দময়। শ্রীবৃন্দাবনের সমস্তই চিদানন্দময়।

শ্রীবৃন্দাবনের দাসীগণের চরণভূষণ চিন্তামণিময়, দেবতরু সকল বসনভূষণ-প্রসবকারী। ব্রজবাসিগণ তরুলতাপ্রসূত পুষ্পফল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। কামধেনু সকলই শ্রীবৃন্দাবনের ধেনু। ব্রজবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। অহো শ্রীবৃন্দাবনের সুখসিন্ধুময়ী বিভূতি!

স্বরূপ গোঁসাইর কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। প্রভুও রসাবেশে নৃত্যারম্ভ করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই গান ধরিলেন। তাঁহার ব্রজরসগীতে প্রভুর প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। প্রভুর প্রেমবন্যায় পুরুষোত্তমক্ষেত্র ভাসিতে লাগিল। চারি সম্প্রদায়ের সহিত প্রভুর নর্তনকীর্তনে দিবা অবসানপ্রায় হইল। সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। স্বরূপ গোঁসাই

ভক্তগণকে ক্লান্ত দেখিয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন। তখন প্রভুর ভাবাবেশ ও বাহ্যানুসন্ধান হইল। প্রভু বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভক্তগণের সহিত পুষ্পোদ্যানে গমন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর মধ্যাহ্নস্নানাদি সমাপন করিলেন। এই সময়ে জগন্নাথের ও লক্ষ্মী দেবীর প্রচুর প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু ভক্তগণের সহিত ভোজন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। সায়ংকাল সমাগত হইল। প্রভু সন্ধ্যাকালীন স্নান সমাধা করিয়া ভক্তগণের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিলেন। এইরূপে আট দিন কাটিয়া গেল। নবম দিবসে জগন্নাথের পুনর্যাত্রা হইল। প্রভু ভক্তগণের সহিত পূর্ব্ববৎ রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিতে করিতে পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন করিলেন। পুনর্যাত্রার দিন জগন্নাথের একটি রজ্জু ছিন্ন হইল। তদ্দর্শনে প্রভু ঐ ছিন্ন রজ্জুটি দিয়া কুলীনগ্রামের রামানন্দ ও সত্যরাজকে বলিলেন, "আগামী বৎসর হইতে তোমরা জগন্নাথের বন্ধনার্থ ইহা অপেক্ষা দৃঢ় রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া আনিবে।" রামানন্দ ও সত্যরাজ প্রভুর সেবাদেশ পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং প্রতিবৎসর রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া আনয়ন করিতে লাগিলেন।

রথযাত্রা চলিয়া গেল। গৌড়ের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই বাস করিলেন। প্রভু প্রতিদিন প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করেন। উপন ভোগ অর্থাৎ অন্নব্যতিরিক্ত অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ সরিয়া গেলে মন্দির হইতে বাহির হইয়া হরিদাসকে দর্শন দেন। পরে বাসায় যাইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা প্রভুর পূজা করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন প্রভু আবার সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আচার্য্যকেও পূজা করেন। আচার্য্য মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দেন। অপরাপর ভক্ত সকলও বিশেষ আগ্রহ করিয়া এক এক দিন প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া থাকেন। এইরূপে জন্মাষ্টমী আগত হইল। প্রভু নন্দোৎসবের দিন ভক্তগণের সহিত গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভার স্কন্ধে করিয়া ও লগুড় ফিরাইয়া ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিলেন। পরে বিজয়া দশমী উপস্থিত হইলে, ভক্তগণের সহিত লঙ্কাবিজয়লীলা করিলেন। ঐ দিবস প্রভু স্বয়ং হনুমানের ভাবে আবিষ্ট হইয়া বৃক্ষশাখা লইয়া লঙ্কার দুর্গভঞ্জনরূপ অদ্ভুতলীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে যথেষ্ট আনন্দ দিলেন। এইরূপে রাসযাত্রা দীপাবলী ও উত্থানদ্বাদশী অতিবাহিত হইল।

গৌড়ীয় ভক্তগণের বিদায়।

অতঃপর প্রভু একদিন নিত্যানন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া কি যুক্তি করিলেন। তাঁহারা দুইজনে কি যুক্তি করিলেন, তাহা অপর কেহই জানিলেন না। কিন্তু ফলে ভক্তগণকে বিদায় দিবার যুক্তিই বুঝা গেল। কারণ, যুক্তির পরেই প্রভু ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অনেক দিন হইয়া গেল, এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। তোমরা বৎসর বৎসর রথের সময় আসিবে এবং গুণ্ডিচা দেখিয়াই চলিয়া যাইবে, এই বৎসরের ন্যায় অধিককাল বিলম্ব করিবে না। পরে অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মান করিয়া বলিলেন, "তুমি গৌড়ে যাইয়া আচণ্ডাল সকলকেই কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিবে।" নিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি গৌড়ে যাইয়া নিরন্তর প্রেমভক্তি প্রচার কর; রামদাস ও গদাধর প্রভৃতি তোমার সহকারী রহিলেন; আমিও মধ্যে মধ্যে তোমার নিকট যাইয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে তোমার নৃত্য দর্শন করিব।" শ্রীবাস পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"আমি নিত্য তোমার গৃহে যাইয়া কীর্ত্তনে নৃত্য করিব, উহা আর কেহ দেখিবে না, কেবল তুমিই দেখিবে। আর তুমি এই বস্ত্রখানি ও এই সকল মহাপ্রসাদ আমার জননীকে দিয়া তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবে ও অপরাধ ক্ষমা করিতে বলিবে। আমি তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছি। আমি বাতুল, তিনি যেন এই বাতুল পুত্রের দোষ গ্রহণ না করেন। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারেই এই নীলাচলে বাস করিতেছি। মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিব। আমি নিত্যই তাঁহার চরণ দর্শনার্থ যাইয়া থাকি, তিনি তাহা স্ফূর্ত্তি ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। একদিন তিনি অন্ন ও পাঁচ সাতটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নারায়ণের ভোগ লাগাইয়া আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি আমার প্রিয় অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমি সত্বর যাইয়া ঐ সকল অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিলাম। তিনি পাত শূন্য দেখিয়াও আমি খাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বালগোপালই খাইলেন বা অন্য কোন জীব জন্তুতে খাইয়া গেল মনে করিলেন। মনে মনে নানাপ্রকার বিতর্কের পর রন্ধনগৃহে যাইয়া পাকপাত্র দেখিলেন। পাকপাত্র পূর্ব্ববৎ অন্নব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ দেখিয়া সংশয়ান্বিত হইলেন। মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। ভোগ

লাগাইয়াছিলেন কি না ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। পরে ঈশান দ্বারা স্থালী ও রন্ধনস্থান সংস্কার করাইয়া পুনর্ব্বার রন্ধন পূর্ব্বক গোপালকে অর্পণ করিলেন। এই একবার নহে, অনেকবারই এইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি যখন যখন উত্তম বস্তু রন্ধন করিয়া আমার নিমিত্ত রোদন করেন, আমি তখন তখনই যাইয়া ভোজন করিয়া থাকি। তাঁহার প্রেমে অনেকবারই আমাকে লইয়া গিয়া ভোজন করাইয়াছে। তিনিও পাত্র শূন্য দেখিয়া অন্তরে সন্তোষ পাইয়াছেন, কিন্তু বাহিরে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। গত বিজয়ার দিন এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তুমি এই সকল কথা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদনের চেষ্টা করিও।" রাঘব পণ্ডিতকে বলিলেন,—"তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি তোমার বশীভূত হইয়া আছি। তুমি প্রেমে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নারিকেল আনিয়া কৃষ্ণে সমর্পণ কর, কৃষ্ণও উহা গ্রহণ করিয়া কখন জলশূন্য করিয়া রাখেন, কখন বা আবার জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, আবার কখন তোমার আগ্রহ বশতঃ শস্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি নানাস্থান হইতে আম্র, কাঁঠাল, শাক, মূল, চিপিটক ও ক্ষীর প্রভৃতি আনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাও, শ্রীকৃষ্ণও তোমার প্রীতে ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু রাঘব পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে শিবানন্দ সেনকে বলিলেন,—"এই বাসুদেব দত্ত তোমার প্রতিবেশী ও অত্যন্ত উদারস্বভাব। ইহাঁর আয়ব্যয়ের স্থিরতা নাই, কিছুই সঞ্চয় করেন না, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলেন। গৃহস্থের এইরূপ ব্যবহার উচিত হয় না; ইহাতে কুটুম্বভরণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে; অতএব তুমি ইহাঁর আয়ব্যয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিবে। আর তুমি প্রতিবর্ষেই পথে ভক্তগণকে পালন করিয়া লইয়া আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিবে।" কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে জগন্নাথের পট্টডোরী দিয়াছি, প্রতিবর্ষে ঐরূপ পট্টডোরী লইয়া আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিবে। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সত্যরাজ ও রামানন্দ বলিলেন, "আমরা গৃহস্থ, আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীমুখে উপদেশ করুন।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন ও নামসঙ্কীর্ত্তন, ইহাই তোমাদিগের কর্ত্তব্য জানিবে।"

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥"

তাঁহারা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণব চিনিব কি লক্ষণে?"

প্রভু বলিলেন,—"যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন, তিনিই পূজ্য। কারণ, কৃষ্ণ-নাম দীক্ষা ও পুরশ্চরণের অপেক্ষা করেন না। কৃষ্ণনাম রসনাস্পর্শনমাত্র আচণ্ডাল জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনামের মুখ্যফল চিত্তের আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রেম প্রদান, সংসারক্ষয় আনুসঙ্গিক অর্থাৎ গৌণফল। এক কৃষ্ণনামে সর্ব্বপাপের ক্ষয় ও নববিধ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।"

"আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥"

"এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র পুণ্যাত্মা জনগণের আকর্ষক, মহা মহা পাতকের নাশক, আচণ্ডাল সকল লোকের পক্ষে সুলভ, মোক্ষসম্পত্তির বশীকারক, দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধান-নিরপেক্ষ, এবং রসনাস্পর্শমাত্রই ফলদায়ক। অতএব যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিবে।"

অনন্তর প্রভু শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুন্দ, রঘুনন্দন তোমার পিতা, কি তুমি রঘুনন্দনের পিতা?" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘুনন্দনই আমার পিতা; রঘুনন্দন হইতেই আমাদিগের কৃষ্ণভক্তি; অতএব রঘুনন্দন পুত্র হইয়াও পিতা।" প্রভু শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, "মুকুন্দ, সত্যই বলিয়াছ, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই গুরু।" পরে ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই মুকুন্দের প্রেম দগ্ধ সুবর্ণের সদৃশ নির্ম্মল ও গূঢ়। ইনি বাহিরে রাজবৈদ্য এবং অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমিক। ইনি একদিন উচ্চ রাজকীয় মঞ্চে আরোহণ করিয়া রাজার সহিত চিকিৎসার কথা কহিতে কহিতে রাজশিরোপরি ময়ূরপুচ্ছের ছত্র দেখিয়া প্রেমাবেশে মঞ্চ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা যান। রাজা ভাবিলেন, মুকুন্দের মরণ হইল। তিনি সত্বর মঞ্চ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অনেক যত্নে ইহাঁর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। সংজ্ঞা-লাভের পর ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পতনে ইহাঁর ব্যথা জন্মে নাই। তখন পুনশ্চ সবিস্ময়ে অকস্মাৎ পতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি উত্তর দিলেন, মৃগীরোগই পতনের কারণ। মহাবিজ্ঞ রাজা আর কিছু না বলিয়া ইহাঁকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই অবধারণ করিলেন। ইহাঁর পুত্র রঘুনন্দনও ইহাঁ-রই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সেবাই রঘুনন্দনের কার্য্য।" অনন্তর মুকুন্দকে বলিলেন,

"মুকুন্দ, তুমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক সংসার প্রতিপালন কর; আর রঘুনন্দন কৃষ্ণসেবায় রত থাকুক।" নরহরিকে বলিলেন, "তুমি আমার ভক্তগণের সহিত অবস্থান কর।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি পুরুষোত্তমে থাকিয়া দারুব্রহ্মের আরাধনা কর; আর তোমার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে থাকিয়া জলব্রহ্মের আরাধনায় রত থাকুন।" অনন্তর মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"ইনি সাক্ষাৎ হনুমান, রঘুনাথের সেবক। ইহাঁর রঘুনাথে যাদৃশী নিষ্ঠা, তাহা একমুখে বলা যায় না। আমি একদা ইহাঁর রঘুনাথনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইনিও আমার প্রতি গৌরব হেতু উহা অঙ্গীকার করিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরদিন আসিয়া বলিলেন, আমি রঘুনাথের চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, তাঁহাকে কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারিব না। শুনিয়া আমার অতিশয় সুখোদয় হইল।" পরিশেষে বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু তাঁহার গুণবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, জগতের নিস্তারার্থ তোমার অবতার। তুমি তদ্বিষয়ে সমর্থও। অতএব আমার নিবেদন এই, আপনি সকল জীবের নিস্তার করুন। জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি সকল জীবের পাপ লইয়া নরক ভোগ করি, তুমি তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিয়া উদ্ধার কর।" বাসুদেবের কথা শুনিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি প্রহ্লাদ, অতএব তোমার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত; কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা পূরণ করিবেন। তোমাকে জীবের পাপফল ভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাহার নিস্তার বাঞ্ছা করিবে, সেই নিষ্পাপ হইয়া উদ্ধার পাইবে। তোমার ইচ্ছা হইলে, ব্রহ্মাণ্ডই নিস্তার পাইতে পারিবে। কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের নিস্তারে ক্লান্ত হইবেন না বা নিজের কোন হানি বোধ করিবেন না।" প্রভু এইরূপে প্রত্যেক ভক্তের গুণ বর্ণন করিয়া একে একে সকলকেই আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। ভক্তগণ প্রভুর বিরহ ভাবিয়া বিষাদে রোদন করিতে লাগিলেন। গদাধর পণ্ডিত নীলাচলেই রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে যমেশ্বরে রাখিয়া দিলেন। আর পুরী গোসাই, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর, এই কয়জন প্রভুর নিকটেই রহিলেন।

সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ।

গৌড়ের ভক্তগণ গমন করিলে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একদিন প্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন, "প্রভো, এতদিন গৌড়ের ভক্তগণ থাকায় আমি প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অবসর পাই নাই। সম্প্রতি তাঁহারা গিয়াছেন, আমার অবসর হইয়াছে। এইবার এক মাস আমার গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে।" প্রভু উত্তর করিলেন, "একমাস একস্থানে ভিক্ষা করিলে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম থাকে না।" শেষে কমাইয়া কমাইয়া পাঁচদিন ভিক্ষায় প্রভুর সম্মতি হইল। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অনুমতি পাইয়া গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে পাকের আয়োজন করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ষাঠীর মাতা পাককার্য্যে সুনিপুণা। তিনি পবিত্র হইয়া পাককর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ভট্টাচার্য্য স্বয়ং পাকের দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্যের পাকশালার দুই পার্শ্বে দুই খানি গৃহ। উহার একখানি নারায়ণের ও অপর খানি ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিমিত্ত নূতন প্রস্তুত করাইয়াছেন। যে গৃহখানি প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়াছেন, তাহার দ্বার দুইটি; একটি দ্বার পাকশালার ভিতর দিয়া পরিবেষণের নিমিত্ত এবং অপরটি বাহির দিয়া প্রভুর গমনাগমনের নিমিত্ত। ভট্টাচার্য্য শ্রদ্ধা সহকারে গৌড়ের ও উৎকলের উত্তমোত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া পাকশালা হইতে প্রভুর ভিক্ষার গৃহে লইয়া সাজাইতে লাগিলেন। গৃহপক্ক দ্রব্য সকল সজ্জিত হইলে, জগন্নাথের মহাপ্রসাদও উহার সহিত সাজান হইল। এই সময় প্রভুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া প্রভুকে ভোজনগৃহে লইয়া গেলেন। প্রভু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভট্টাচার্য্যের আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে বলিলেন, "দুই প্রহরের মধ্যে এত অন্নব্যঞ্জনাদি কিরূপে পাক করাইলে? ভোগের উপর তুলসী মঞ্জরীও দেখিতেছি, কৃষ্ণের ভোগ লাগিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরম ভাগ্যবান্, রাধাকৃষ্ণে এই সকল অপূর্ব্ব অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ লাগাইয়াছেন।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমার কি শক্তি যে আমি এই সকল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করি, যাহার ভোগ তাঁহারই শক্তিতে এই সকল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়াছে। এখন এই আসনে বসিয়া প্রভু ভোজন করুন।" প্রভু বলিলেন, "ইহা কৃষ্ণের আসন, ইহা উঠাইয়া রাখ, এবং এই কৃষ্ণের প্রসাদ হইতে কিঞ্চিৎ আমাকে দাও, আমি ভোজন করি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "অন্ন ও আসন উভয়ই কৃষ্ণের

প্রসাদ, অন্নও ভোজন করুন, আসনেও উপবেশন করুন ; অন্ন ভোজনেও যখন কোন অপরাধ হয় না, তখন আসনে উপবেশন করিলেও কোন অপরাধ হয় না।" প্রভু বলিলেন, "হাঁ, কৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া পীঠাদিও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। পীঠেই যেন বসিলাম, এত অন্ন কে খাইবে, আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দাও।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তুমি এই নীলাচলে বায়ান্নবার ভার ভার অন্ন ভোজন করিয়া থাক, দ্বারকাতে ষোড়শসহস্র মহিষীর গৃহে এবং শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যেক গোপের গৃহে ভোজন করিয়া থাক, গোবর্দ্ধনযজ্ঞে রাশি রাশি অন্ন ভোজন করিয়াছিলে, আর এই ক্ষুদ্র জীবের গৃহে একমুষ্টি অন্ন ভোজন করিতে পার না।" ভট্টাচার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে ভোজন করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্যের গৃহে ষাঠীনাম্নী তাঁহার এক কন্যা ছিলেন। ভট্টাচার্য্য ঐ কন্যাকে কুলীনপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতাও গৃহেই থাকিতেন। জামাতার নাম অমোঘ। অমোঘ বিশ্বনিন্দক। অমোঘের নিতান্ত অভিলাষ, প্রভুর ভোজন দর্শন করেন। ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্বভাব সবিশেষ বিদিত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রভুর ভোজন দর্শন করিতে দিলেন না, দ্বার অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি যখন দৈবাৎ অন্যমনস্ক হইলেন, সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর ভোজন দেখিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। অমোঘ বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী ঠাকুরটি সাধারণ নহে, একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস, একাকী দশবিশজনের অন্ন ভোজন করিতেছেন।" ভট্টাচার্য্য শুনিয়া ক্রোধভরে যষ্টি লইয়া অমোঘকে তাড়া করিলেন। অমোঘ ভয়ে পলায়ন করিলেন। প্রভু দেখিয়া শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার গৃহিণী উভয়েই জামাতাকে যথেষ্ট তিরস্কারের সহিত শাপ দিতে লাগিলেন। ষাঠীর মাতা বার বার "ষাঠী বিধবা হউক" বলিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া ভোজনান্তে আচমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে তুলসীমঞ্জরী ও এলাচী প্রভৃতি মুখবাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "আজ আমি আপনাকে নিন্দা করিবার নিমিত্তই আনিয়াছিলাম, নিজ গুণে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" প্রভু বলিলেন, "অমোঘ যাহা বলিল, তাহা নিতান্ত সহজ কথা ; তুমি যেরূপ অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়াছ, তাহা যে দেখিবে, সেই এইরূপ বলিবে, অতএব ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা কি ?" এই কথা বলিয়া প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিলেন। প্রভু বাসায়

গিয়া ভট্টাচার্য্যকে শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য কিন্তু গৃহে আসিয়া ভোজন করিলেন না, উপবাসী রহিলেন. ষাঠীর মাতাও উপবাসী থাকিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহিণীকে বলিলেন, "আমি আজ কি কুক্ষণেই জাগরিত হইয়াছিলাম, প্রভুর নিন্দা শুনিতে হইল। নিন্দুকের জিহ্বাচ্ছেদন বা নিজের জীবন ত্যাগ ব্যতিরেকে এই অপরাধের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। ব্রহ্মহত্যা করাও উচিত হয় না। আমি আর ঐ জামাতার মুখদর্শন করিব না। ও পতিত হইয়াছে, ষাঠীকে বল, ঐ পতিত পতিকে পরিত্যাগ করুক।"

অমোঘের প্রভুভক্তি।

এদিকে ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘ ঐ রাত্রি অন্য কোন স্থানে যাইয়া অতিবাহিত করিল, ভট্টাচার্য্যের ভয়ে গৃহে আগমন করিল না। প্রাতঃকালে গৃহে আসিয়াই বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইল। ভট্টাচার্য্য শুনিলেন, অমোঘ বিসূচিকা রোগে মরণাপন্ন হইয়াছে। তিনি শুনিয়াই বলিলেন,—"মহতা হি প্রযত্নেন সন্নহ্য গজবাজিভিঃ অস্মাভি র্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্।"—আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছিলাম, দৈব অনুকূল হইয়া তাহাই সাধন করিলেন।" গোপীনাথাচার্য্য প্রাতঃকালে প্রভুর চরণদর্শনার্থ গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার মুখে সস্ত্রীক ভট্টাচার্য্যের উপবাস ও অমোঘের সঙ্কট পীড়া উভয়েই শুনিলেন। করুণাময় প্রভু শুনিয়াই ভট্টাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ অমোঘের নিকট যাইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাবতঃ নির্ম্মল, কৃষ্ণের আসনের যোগ্য,মাৎসর্য্যচণ্ডাল প্রবেশ করিয়া উহাকে অপবিত্র করিয়াছিল, ভট্টাচার্য্যের সঙ্গবশতঃ এখন নির্ম্মল হইয়াছে। হৃদয় নির্ম্মল হইলে জীব কৃষ্ণনাম লইয়া থাকে। অতএব অমোঘ উঠ, কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। কৃষ্ণ তোমাকে অচিরেই কৃপা করিবেন।" প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে পবিত্র হইয়া অমোঘ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিল। পরক্ষণেই প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অমোঘের অশ্রু কম্প ও পুলকাদি দর্শন করিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন। অমোঘ নিজের অপরাধ ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "দয়াময় প্রভো, এই পাপিষ্ঠের অপরাধ ক্ষমা কর।" পরে "আমি এই মুখেই তোমার নিন্দা করিয়াছি" বলিয়া দুই হাতে নিজের গাল নিজেই চড়াইতে আরম্ভ করিল। চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলিয়া উঠিল। গোপীনাথাচার্য্য অমোঘের

হাত দুইটি ধরিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন, প্রভু তখন অমোঘকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য উঠিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তদ্দত্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য, অমোঘ শিশু, তাহার কথায় দোষ ভাবিয়া উপবাস করা তোমার উচিত হয় নাই। উঠ, স্নান কর, জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখিয়া ভোজন কর। তোমার ভোজন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বসিয়া থাকিলাম।" ভট্টাচার্য্য রোষভরে বলিলেন, "অমোঘ মরিলেই ভাল হইত, কেন তাহার জীবন দান করিলেন?" প্রভু বলিলেন, "পিতা কখন সন্তানের দোষ গ্রহণ করেন না, তাহার অপরাধ গিয়াছে, সে বৈষ্ণব হইয়াছে, এখন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্নানাদি কর।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভু চলুন, জগন্নাথ দর্শন করি।" প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি এইস্থানে থাক, ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শনের পর আসিয়া ভোজন করিলে, আমাকে তাঁহার ভোজনসংবাদ জানাইবে।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভট্টাচার্য্যের সহিত গমন করিলেন। অমোঘ তদবধি পরম শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণব ও প্রভুর ভক্ত হইলেন।

প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমনাভিলাষ।

অতঃপর প্রভু বৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু যাহাতে নীলাচল ছাড়িয়া অন্যত্র গমন না করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে; প্রভু না থাকিলে, আমার রাজ্যেও সুখ হইবে না।" তাঁহারা রাজার ইচ্ছামত প্রভুকে রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া প্রভু আগামিনী রথযাত্রা পর্য্যন্ত নীলাচলে থাকিতে সম্মত হইলেন। দেখিতে দেখিতে রথযাত্রা সমাগত হইল। পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা দর্শন ও নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিলেন। কার্ত্তিকমাসে প্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন স্থির হইল। কিন্তু এবারও গৌড়ের ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস নীলাচলে রহিলেন, সুতরাং প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। ক্রমে চাতুর্ম্মাস্য কাটিয়া গেল। চাতুর্ম্মাস্য অতীত হইলে, প্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ, আমার অনুরোধ, তুমি প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিবে না, গৌড়ে থাকিয়া আমার অভিলাষ সফল

করিবে।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "আসা যাওয়ার কর্ত্তা আমি নহি, তুমি যেমন করাও তেমনি করি।" প্রভু আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। ক্রমে ক্রমে অপরাপর ভক্তগণকেও বিদায় দিলেন। বিদায়-কাল উপস্থিত হইলে, কুলীনগ্রামের ভক্তগণ পূর্ব্ববৎ নিবেদন করিলেন, "আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, তাহা উপদেশ করুন।" প্রভুও পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "বৈষ্ণবসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য; এই দুইটিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।" কুলীনগ্রামী ভক্তগণ পুনশ্চ বলিলেন, "বৈষ্ণবের লক্ষণ কি?" প্রভু তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনিই বৈষ্ণব।"

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন। ভক্তগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকাতরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে, প্রভু পুনর্ব্বার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের ও রামানন্দের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন যাওয়া হইল না। শীতের পর যাইবেন স্থির হইল। শীত কাটিয়া গেল, ভক্তানুরোধে যাওয়া হইল না। দোলযাত্রার পর যাইবেন স্থির হইল, পূর্ব্ববৎ যাওয়া ঘটিল না। পুনর্ব্বার রথের পর যাইবেন সুস্থির হইল। প্রভু সন্ন্যাসের পর দুইবৎসর দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করেন। দুই বৎসর গৌড়ের ভক্তগণের সহিত রথযাত্রা দর্শন করেন। এইরূপে চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। এইটি পঞ্চম বৎসর। এই বৎসরও রথযাত্রার সময় গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ রথযাত্রা দর্শন করিলেন এ বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে বাস করিলেন না, রথযাত্রা দেখিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের সময় কুলীনগ্রামের ভক্তগণ পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ নিবেদন করিলেন, "আমাদিগের কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।" প্রভুও পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ উপদেশ করিলেন, "বৈষ্ণবসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।" অধিকন্তু বৈষ্ণবের তারতম্য শিখাইবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও সবে বৈষ্ণবপ্রধান॥"

প্রভু ক্রম করিয়া বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম উপদেশ করিলেন।

উপদেশ পাইয়া ভক্তগণ বিদায় হইলেন। গৌড়ের ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে, প্রভু সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে বলিলেন,—"আমার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। তোমাদিগের আগ্রহে দুই বৎসর যাইতে পারি নাই। এইটি তৃতীয় বৎসর। এবৎসর আর তোমরা নিবারণ করিও না, আমি এবার অবশ্য যাইব। গৌড়দেশে আমার জননী ও জাহ্নবী আছেন, আমি গৌড়দেশ হইয়াই শ্রীবৃন্দাবনে যাইব, তোমরা প্রসন্ন হইয়া অনুমোদন কর।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দ ভাবিলেন, বার বার প্রভুর ইচ্ছায় বাধা দেওয়া উচিত হইতেছে না। তাঁহারা এইপ্রকার বিচার করিয়া বলিলেন, "প্রভো, এবার আর আমরা বাধা দিব না, আপনি নিশ্চয় যাইবেন, কিন্তু এখন অতিশয় বর্ষা, বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করিবেন।" প্রভু তাহাতেই সম্মত হইয়া বর্ষা অতিবাহিত করিলেন।

প্রভুর গৌড়দেশ যাত্রা।

বিজয়া দশমী উপস্থিত হইল। প্রভু গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। জগন্নাথের প্রসাদ যাহা কিছু পাইলেন, তাহা সঙ্গে লইলেন। প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর অনুসরণ করিলেন। কিছুদূর যাইয়া প্রভু উড়িষ্যার ভক্তগণকে বিদায় দিয়া গৌড়ের ভক্তগণের সহিত যাইতে লাগিলেন। প্রভু যখন ভবানীপুরে আগমন করিলেন, তখন রামানন্দ রায় দোলারোহণে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বাণীনাথ প্রভুর নিকট প্রচুর প্রসাদ পাঠাইলেন। প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত ঐ সকল প্রসাদ ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চলিয়া চলিয়া প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া কটকে আগমন করিলেন। প্রভুর কটকে পদার্পণ হইলে, স্বপ্নেশ্বর নামক এক বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিপ্রের বাহির উদ্যানে প্রভুর বাসা হইল। প্রভু সাক্ষি-গোপাল দর্শনের পর বাসায় যাইয়া ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর একটি বকুলতরুর তলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রামানন্দ রায় যাইয়া রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর আগমনসংবাদ জানাইলেন। রাজা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া প্রভুর চরণসমীপে আগমন করিলেন। তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াই

দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইল, নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর স্তুতি করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভুর করুণাবারিতে রাজার দেহ অভিষিক্ত হইল। রামানন্দ রায় রাজাকে সুস্থ করিয়া বসাইলেন। প্রভুও রাজাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়া বিদায় করিলেন। প্রতাপরুদ্র বাহিরে আসিয়া গ্রামে গ্রামে প্রভুর পরিচর্য্যার নিমিত্ত গ্রামবাসিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। পরে হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামক প্রধান পাত্রদ্বয়কে আদেশ করিলেন, "নদীতীরে প্রভুর পারগমনের নিমিত্ত একখানি নূতন নৌকা সজ্জিত করিয়া রাখ এবং যে ঘাটে প্রভু স্নান করিয়া পার হইবেন সেই ঘাটে একটি স্তম্ভ স্থাপন কর, আমি প্রতিদিন ঐ ঘাটে স্নান করিব ও মৃত্যুকালে ঐ ঘাটেই দেহ ত্যাগ করিব।" অনন্তর রাজাদেশে প্রভুর গমনপথের উভয়পার্শ্বে হস্তী ও ঘোটক সকল সজ্জিত করা হইল। কুলকামিনী সকল বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত যাত্রা করিলেন। রাজমহিষীগণ দূরে থাকিয়াই প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। প্রভুর আগমনে রাজপথ ও নগর আনন্দময় হইল। সকলেরই মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ ও নয়নে বারিধারা বহির্গত হইতে লাগিল। প্রভু রাজপথ দিয়া মহানদীরই অংশবিশেষরূপা চিত্রোৎপলা নাম্নী নদীর তীরে শুভাগমন করিলেন। রামানন্দ, হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ প্রভুর সেবা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন। পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন। কেবল গদাধর পণ্ডিতকে প্রভু গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। গদাধর কিন্তু প্রেমে প্রভুর নিষেধ না মানিয়াই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথক্‌ভাবে একাকী গমন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্নান করিয়া নৌকায় উঠিবার সময় গদাধরকে সঙ্গে লইলেন না, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অগত্যা গদাধর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত কটক হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে প্রভু ভক্তগণের সহিত নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দেখিয়া আরও কতকদূর গমন করিলেন। চতুর্দ্বার নামকস্থানে রাত্রিবাস হইল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন।

ঐ সময়ে পূর্ব্বপূর্ব্বদিবসের ন্যায় মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। এইরূপে চলিয়া চলিয়া যাজপুর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। যাজপুরে আসিয়া হরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে বিদায় দিলেন। রেমুণায় আসিয়া রামানন্দকেও বিদায় দিলেন। বিদায়ের সময় রামানন্দ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রভু অনেক যত্নে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যার সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা আসিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, রাজা প্রতাপরুদ্রের অধিকারের এই শেষ সীমা। অতঃপর পিছলদা পর্য্যন্ত এক সুরাপায়ী যবনের অধিকার। সে অতি দুর্দ্দান্ত। তাহার সহিত আমাদের বিবাদ চলিতেছে। অতএব আমি তাহার সহিত কোন একটা বন্দোবস্ত না করিয়া প্রভুকে পাঠাইতে সাহস করি না। প্রভু দুই চারি দিন এই অধমের সেবা গ্রহণ করুন। ইতিমধ্যে গমনের সুযোগ করা যাইবে।" অগত্যা প্রভু ঐস্থানেই রহিয়া গেলেন। কিন্তু এমনই প্রভুর মহিমা, অকস্মাৎ ঐ যবনরাজের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া হিন্দুরাজপ্রতিনিধিকে বলিল,—"আপনার অনুমতি হইলে, যবনরাজ স্বয়ং এই স্থানে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করেন। তাঁহার একজন চর প্রভুকে দর্শন করিয়া যাইয়া প্রভুর মহিমা বর্ণন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণদর্শনার্থ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আপনি যদি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন সম্বন্ধে সহায়তা করেন, তবে আপনাদিগের পরস্পর বিবাদ এইস্থানেই নিষ্পত্তি পায়, যুদ্ধবিগ্রহও এইস্থানেই ক্ষান্ত হইয়া যায়।" হিন্দুরাজপ্রতিনিধি শুনিয়াই অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি, অকস্মাৎ যবনরাজের ঈদৃশ মতিপরিবর্ত্তন প্রভুরই লীলা বুঝিয়া, তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, যবনরাজের যদি এরূপ সৌভাগ্য হইয়া থাকে, তবে তিনি আসিয়া যথেচ্ছ প্রভুকে দর্শন করুন; কিন্তু সঙ্গে অধিক লোক থাকিবে না এবং যাহারা থাকিবে, তাহারাও নিরস্ত্র হইবে।" যবনরাজের কর্ম্মচারী যাইয়া নিজ প্রভুর নিকট এই বিষয় নিবেদন করিল। যবনরাজ আনন্দে বিভোর হইয়া পাঁচ সাত জন ভৃত্যের সহিত হিন্দুর বেশে আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে পুলক ও নেত্রে অশ্রুধারা দৃষ্ট হইতে লাগিল। হিন্দুরাজপ্রতিনিধি প্রভুকে তাঁহার পরিচয় দিয়া স্বয়ং তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। যবনরাজও, তিনিই প্রভুকে দর্শন করাইলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রভুর

দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আপনি যদি আমাকে অধম যবনকুলে জন্ম না দিয়া হিন্দুকুলে জন্ম দিতেন, তবে আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম করিয়া মানবজীবন সফল করিতাম।" পরে বারংবার প্রণতিপুরঃসর প্রভুকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "প্রভু তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তুমি কৃষ্ণনাম কর।" যবনরাজ শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভো, যদি অধমকে নিজগুণে অঙ্গীকারই করিলেন, তবে কোন একটি সেবাও আদেশ করুন।" মুকুন্দদত্ত বলিলেন, "প্রভু গঙ্গাতীরে গমন করিবেন, তুমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর।" যবনরাজ এই সেবাদেশ পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। হিন্দুরাজপ্রতিনিধি ও যবনরাজের পরস্পর মিত্রতা হইল। হিন্দুরাজপ্রতিনিধি যবনরাজকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। যবনরাজ নিজ অধিকারে যাইয়া প্রভুকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু তাহার সহিত যবনরাজের অধিকারে গমন করিলেন। যবনরাজ ইতিপূর্ব্বেই প্রভুর নিমিত্ত একখানি উৎকৃষ্ট নূতন নৌকা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভুর পদার্পণমাত্র তাঁহাকে ভক্তবর্গের সহিত প্রণতিপুরঃসর ঐ নৌকায় আরোহণ করাইলেন এবং পথে জলদস্যু হইতে রক্ষার নিমিত্ত আর দশখানি নৌকায় করিয়া কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক লইয়া স্বয়ংও সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিলেন। তিনি প্রভুকে সগণে মন্ত্রেশ্বর নদী পার করিয়া পিছলদায় পৌঁছিয়া দিলেন। প্রভু পিছলদায় পৌঁছিয়া যবনরাজকে ও তাঁহার সৈনিকদিগকে বিদায় দিলেন। প্রভু যে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন, ঐ নৌকাতেই পানিহাটীতে আগমন করিলেন। তিনি পানিহাটীতে আসিয়া নৌকাখানিকেও বিদায় দিলেন।

প্রভুর শুভাগমন হওয়ায় পানিহাটীর জল ও স্থল লোকে লোকারণ্য হইল। রাঘব পণ্ডিত আসিয়া প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। প্রভু রাঘবপণ্ডিতের ভবনে একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন কুমারহাটীতে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভবনে গমন করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কুমারহাটীর পূর্ব্ববাসস্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহেও একদিনমাত্র বাস করিয়া তৎপরদিন হালিসহর কাঞ্চনপাড়ার শিবানন্দ সেনের ভবনে গমন করিলেন। পরে ঐ

স্থান হইতে বাসুদেবের ভবন হইয়া নবদ্বীপের সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির ভবনে গমন করিলেন। বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে প্রভুর আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চারিদিক হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গায় নৌকা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অপরপারের লোক সকল প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সন্তরণাদি দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। যিনি আসেন, তিনি প্রভুর শ্রীমুখ দেখিয়া আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহেন না। ক্রমে বিদ্যানগরে স্থানের ও খাদ্যসামগ্রীর অভাব হইয়া পড়িল। অগত্যা প্রভু গোপনে বিদ্যাবাচস্পতিকেও না বলিয়া বিদ্যানগর হইতে ফুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন। প্রভু ফুলিয়ায় আসিয়া গোপনে মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিককাল গোপনে থাকিতে পারিলেন না, নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত হাজার হাজার কীর্ত্তনীয়া আসিয়া প্রভুকে প্রকাশ করাইলেন। যেখানে যত পাপী ছিলেন, ফুলিয়ায় প্রভুর প্রকাশ দর্শন করিয়া সকলেই উদ্ধার পাইলেন।

ফুলিয়ায় প্রভু সাতদিন থাকিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ প্রকাশ করিলেন। ফুলিয়ায় অবস্থানকালে এক দিবস এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি শ্রীহরিনামের ও বৈষ্ণবের প্রভাব না জানিয়া অনেক নিন্দা করিয়াছি, এখন তন্নিমিত্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে নিজগুণে উদ্ধার করুন; আমার কি উপায় হইবে বলুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি যে মুখে নামের ও বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছ, সেই মুখেই উহাঁদের গুণগান কর এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই উদ্ধার পাইবে।" প্রভুর শ্রীমুখের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নদীয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া প্রভুর চরণে শরণাগত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানপুরঃসর বলিলেন, "দেবানন্দ, তুমি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তাঁহার প্রসাদে তোমার কৃষ্ণপ্রসাদও লাভ হইয়াছে।" দেবানন্দ কৃতার্থ হইয়া অনেক স্তবস্তুতির পর বিদায় হইলেন। দেবানন্দ বিদায় হইলে, চাপাল গোপাল আসিয়া পুনর্ব্বার প্রভুর শরণ লইলেন। এবার প্রভু তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রত্যাখ্যান না করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রয় লইতে বলিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অপরাধ খণ্ডন করাইয়া তাঁহাকেও কৃতার্থ করিলেন।

প্রভু মথুরায় যাইবেন শুনিয়া প্রভুর ভক্ত নৃসিংহানন্দ কুলিয়া হইতে পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কানাইর নাটশালা

নামক স্থান পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত হইলে, আর তাঁহার অগ্রসর হইতে মন গেল না। নৃসিংহানন্দ তখনই বুঝিলেন, প্রভুর এযাত্রায় শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত শুভাগমন হইবে না, তিনি নাটশালা হইতেই ফিরিবেন।

এদিকে প্রভুও ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। তিনি অদ্বৈতভবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া শচীদেবী তাঁহাকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে আসিলেন। প্রভু জননীকে পাইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তিনি দুই চারিদিন শান্তিপুরে থাকিয়া জননীর অনুমতি লইয়া মথুরা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সহস্রাধিক লোক প্রভুর অনুগামী হইলেন। তদ্ব্যতীত প্রভু যেখানেই রাত্রিবাস করেন, সেইখানেই তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রভূত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এইরূপে গঙ্গাতীরপথে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। এই রামকেলিতে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী বাস করিতেন।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী দাক্ষিণাত্য বিপ্রের কুলে উৎপন্ন হয়েন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রূপেশ্বর কর্ম্মসূত্রে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তদবধি তাঁহারা বঙ্গদেশীয় হইয়া যান। সনাতন গোস্বামীর অনেকগুলি সহোদর। তন্মধ্যে সনাতন রূপ ও বল্লভ এই তিনজনই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা তিনজনই রামকেলি গ্রামে একত্র বাস করিতেন। রামকেলি গ্রাম গৌড়রাজ-ধানীর নিকটবর্ত্তী। গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন সা বা দ্বিতীয় আলাউদ্দীন সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া জ্যেষ্ঠ সনাতনকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া মধ্যম রূপকে তাঁহার সহকারিপদে নিযুক্ত করেন। তিনি সনাতনকে দবির খাস, রূপকে সাকর মল্লিক এবং কনিষ্ঠ বল্লভকে অনুপম মল্লিক উপাধি প্রদান করেন। অনুপম মল্লিকও গৌড়েশ্বরের অধীনে কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনি যে কি কার্য্য করিতেন, তাহা সুবিদিত নহে। তাঁহারা গৌড়েশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামকেলি গ্রামের বিশেষ উন্নতিসাধন পূর্ব্বক আপনাদিগের জ্ঞাতিবর্গকেও ঐ স্থানেই আনয়ন করেন। রামকেলিতে সনাতন গোস্বামী সনাতন সাগর নামে একটি এবং রূপ গোস্বামী রূপসাগর নামে অপর একটি বৃহৎ

জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। ঐ দুই জলাশয় এখনও ঐ দুই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহারা কার্য্যানুরোধে যদিও বাহিরে যবনভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে অহিন্দু হয়েন নাই। লিখিত আছে, তাঁহারা রাজকার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়াও অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই, সময় পাইলেই শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা বিশেষ শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের আবাসে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইত। তাঁহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং সাহায্যও করিতেন। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও ধর্ম্মানুগতই ছিল। তাঁহারা যবনসংসর্গে আপনাদিগের বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রার অভিলাষ করিতেন, কিন্তু অবসরাভাবে ঐ অভিলাষ পূর্ণ হইত না। অগত্যা তাঁহারা স্বস্বজলাশয়ের চারিদিকে কানন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাদেরই পূজা করিতেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাদের কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক ভূমিসম্পত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহারা মদমত্ত হইয়া ধর্ম্মানুশীলন ত্যাগ করেন নাই। জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া তাঁহাদিগের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে জ্ঞানী ভক্ত ও কবি সকল আসিয়া তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রবাদ এই যে, তাঁহারা গৃহাবস্থানকালেও দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, সনাতন গোস্বামী একদা রাত্রিযোগে নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্নটি এই—একটি পরম-সুন্দর নবীন সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সনাতন, আর কালবিলম্ব করিও না, সত্বর শ্রীভগবানের সেবায় মনোনিবেশ কর, শ্রীবৃন্দা-বনে যাইয়া লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর।" এই কয়েকটি কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। তখনই সনাতন গোস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি ঐ স্বপ্নবৃত্তান্তটি মধ্যম রূপ গোস্বামীকে শুনাইলেন। রূপ গোস্বামী শুনিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, নদীয়ায় শ্রীভগবান্ অবতার করিয়া-ছেন। বোধ হয়, তিনিই স্বপ্নে দর্শন দিয়া ঐ প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। আমরা বিষয়ান্ধকূপে পতিত। পতিতপাবন প্রভু কি আমাদিগকে উদ্ধার

করিবেন?" এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। * স্বপ্নদর্শনে সনাতন গোস্বামীরও মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। দুই ভাই নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া দৈন্যবিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে একখানি পত্র লিখিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু ঐ পত্র পাইয়াও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সনাতন গোস্বামী প্রেরিত পত্রের উত্তর না পাইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু ঐ সকল পত্রের উত্তরস্বরূপ নিম্নলিখিত যোগবাশিষ্ঠের শ্লোকটি লিখিয়া প্রেরণ করিলেন।

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী লোকমুখে মহাপ্রভুর গতিবিধি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে গমন ও পুনর্ব্বার নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, এই সংবাদও তাঁহাদিগের অবিদিত রহিল না। পরে যখন মহাপ্রভু বঙ্গদেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হইল, তখন সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনার্থ বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত হইলেন। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রভুও রামকেলিতে পদার্পণ করিলেন।

প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার।

প্রভুর রামকেলিতে পদার্পণ হইলে, গৌড়েশ্বরের একজন কোতোয়াল যাইয়া গৌড়েশ্বরকে প্রভুর আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। কোতোয়াল বলিলেন, "রামকেলিতে একটি হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি নিরবধি কীর্ত্তন করেন; তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য লোক; ঐ সকল লোক তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য; দেখিলে রাজদ্রোহের আশঙ্কা হয়।" গৌড়েশ্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সন্ন্যাসী কেমন? তাঁহার আচার ব্যবহারই বা কিরূপ?" কোতোয়াল উত্তর করিলেন,—"এরূপ অদ্ভুত সন্ন্যাসী আমি আর কখন দেখি নাই। ইহাঁর সৌন্দর্য্য কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছে। অঙ্গকান্তি সুবর্ণের সদৃশ উজ্জ্বল। শরীর প্রকাণ্ড। ভুজযুগল আজানুলম্বিত। নাভি সুগভীর। গ্রীবা সিংহের তুল্য। স্কন্ধ গজেন্দ্রের স্কন্ধ সদৃশ নয়নযুগল কমলদলের ন্যায় বিশাল। কোটি

চন্দ্রও বদনের তুলনা হয় না। অধর রক্তবর্ণ। দন্ত সকল মুক্তার ন্যায় সুগঠিত, ভ্রূযুগল কামধনুর সমান। সুপীন বক্ষঃস্থল চন্দনচর্চ্চিত। কটিদেশে অরুণবর্ণ বসন। চরণযুগল পদ্মের তুল্য। নখগুলি দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। দেখিলে বোধ হয়, কোন রাজার নন্দন সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নবনীতের ন্যায় কোমল। সেই সুকোমল অঙ্গ মুহুর্মুহু কঠিন ভূমিতলে পতিত হইতেছে! কি আশ্চর্য্য, সেই পতনে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, কিন্তু অঙ্গে একটিও ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় না। সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব পুলকাবলী। ক্ষণে ক্ষণে ঘোরতর স্বেদ ও কম্প হইতেছে। হাজার লোকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। নয়নে নদীর স্রোতের ন্যায় বারিধারা বহিতেছে। কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। মূর্চ্ছার সময় শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত থাকে না, দেখিলে ভয় হয়। সদাই বাহু তুলিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন। কখন ভোজন করেন, কখন শয়ন করেন, দেখি নাই। চতুর্দ্দিক হইতে দর্শনার্থ সমাগত লোকে লোকারণ্য হইতেছে। যে আসিতেছে, সে আর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে না। যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম।" এই কথা বলিয়া কোতোয়াল নিরস্ত হইল। গৌড়েশ্বর কোতোয়ালকে বিদায় দিয়া ভাবিলেন, পূর্ব্বে এক ফকিরের মুখে যাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম, বোধ হয়, সেই মহাপুরুষেরই শুভাগমন হইয়াছে। এই প্রকার চিন্তার পর, তিনি কেশব খান নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কেশব, শুনিলাম, রামকেলিতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন, তুমি কি তাঁহার বিষয় কিছু বিদিত আছ?" কেশব খান অতীব সজ্জন, বিশেষতঃ তিনি গৌড়েশ্বরকে হিন্দুর দ্বেষী বলিয়াই জানিতেন, অতএব প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি জানিয়াছি, একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি বৃক্ষতলে বাস করেন, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীমাত্র।" গৌড়েশ্বর কেশবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি গোপন করিলে কি হইবে, আমি বুঝিয়াছি, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নহেন, হিন্দুর যিনি নারায়ণ তিনিই সন্ন্যাসী হইয়া দেখা দিয়াছেন। আমি গৌড়ের রাজা, তিনি বিশ্বের রাজা। অন্যথা লোকে আপনার খাইয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করিবে কেন? তোমরা কি কখন আপনার খাইয়া আমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাক? যাহা হউক, কোতোয়ালকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, যেন কেহ ঐ সন্ন্যাসীর উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে। উনি আমার অধিকারমধ্যে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন।" কেশব

খান "যে আজ্ঞা" বলিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া কোতোয়ালকে রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে তিনি অব্যবস্থিত যবনরাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া গোপনে একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা, রাজধানীর নিকট হইতে অন্যত্র গমন করাই যুক্তিযুক্ত, এই কথা প্রভুর ভক্তগণের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর সেই দিনই সনাতন দবির খাসকে নিভৃতে ডাকাইয়া মহাপ্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সনাতন তদুত্তরে বলিলেন,—

"যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ॥"

গৌড়েশ্বর বলিলেন, "এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাই আমার মনে হয়।" যে যবনরাজ হুসেন সা উড়িষ্যার রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া এক সময়ে শত শত দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনিই এখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদে সবিস্ময়ে তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের চেষ্টা না করিয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন। মন্ত্রী সনাতন শুনিয়া রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন।

মন্ত্রী সনাতন গৃহে আসিয়া ভ্রাতা রূপের সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে প্রভুর চরণদর্শনার্থ গমন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। অর্দ্ধরাত্রির সময় দুই ভাই ছদ্মবেশে প্রভুর স্থানে গমন করিলেন। প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা প্রভুকে জানাইয়া তাঁহার আদেশমত সনাতন ও রূপকে লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সনাতন ও রূপ দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা ভূতলে পড়িয়া প্রভূত আর্ত্তিপ্রকাশ সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু দুই ভাইকে উঠিতে বলিলেন। দুই ভাই উঠিয়া প্রভুর স্তুতিসহকারে প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণ জাতিতে তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥
আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥

বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে যায় করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে॥"

সনাতন ও রূপের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—"দবির খাস ও সাকর মল্লিক, তোমরা দুই ভাই আমার পুরাতন দাস। আজি হইতে তোমরা দুই ভাই মদুক্ত সনাতন ও রূপ এই নামেই পরিচিত হইবে। তোমরা দৈন্য ত্যাগ কর। তোমাদিগের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হইয়াও আপনাদিগকে হীন করিয়া মানিতেছ। তোমরা অনেক দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে বার বার পত্র লিখিয়াছিলে। সেই সকল পত্রেই আমি তোমাদিগের ব্যবহার বিদিত হইয়াছিলাম। আমি তোমাদিগের পত্র হইতেই তোমাদিগের হৃদয় জানিয়াছিলাম। পরে তোমাদিগের শিক্ষার্থ একটি শ্লোকও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে। সম্প্রতি আমার গৌড়ে আগমনও তোমাদিগের জন্যই। আমার এই রামকেলি পর্য্যন্ত আসিবার অপর কোন প্রয়োজনই ছিল না। সকলেই বলেন, রামকেলিতে আসিবার কারণ কি? আমার মনের ভাব কেহই জানেন না। আমি কেবল তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই এই স্থানে আসিয়াছি। তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন গৃহে গমন কর। মনে কোন ভয় করিও না। তোমরা দুই ভাই আমার জন্মজন্মের কিঙ্কর। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রভু দুই ভ্রাতার মস্তকে হস্ত প্রদান পুরঃসর তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে নিজ ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে কৃপা করিয়া সনাতন ও রূপকে উদ্ধার কর।" সনাতন ও রূপের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সনাতন ও রূপ ভক্তগণের চরণতলে পতিত হইলেন। সকলেই দুই ভাইকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু তোমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন।" তদনন্তর সনাতন ও রূপ সকলের নিকট অনুমতি লইয়া গমন করিবার সময় বলিলেন,—"প্রভু এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করুন। যদিও গৌড়েশ্বর প্রভুকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, যবনকে বিশ্বাস করা যায় না। আরও একটি কথা, তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্ট ভাল নয়, শ্রীবৃন্দাবনযাত্রায় এরূপ রীতি নয়। প্রভুর অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু লৌকিক লীলায় লৌকিক চেষ্টাই শোভা পায়, অলৌকিক চেষ্টা শোভা পায় না।" এই কথা বলিয়া সনাতন ও রূপ চলিয়া গেলেন। প্রভুও আর

রামকেলিতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই যাত্রা করিলেন। লোক সকল সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। প্রভু কানাইর নাটশালা যাইয়াই ফিরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

স্বেচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা রোধ করে, কাহার সাধ্য? যেমন ইচ্ছা হইল, শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন না, নীলাচলেই প্রত্যাগমন করিবেন, অমনি পূর্ব্বমুখ হইলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই পুনর্ব্বার শান্তিপুরে আগমন করিলেন। প্রভু শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিত শচীদেবীকে লইয়া অদ্বৈত-ভবনে আগমন করিলেন। প্রভু জননীকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। শচীদেবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুধারা দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে পাইয়া মাধবেন্দ্রপুরীর উৎসব উপলক্ষে মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া লইলেন। শচীদেবী স্বহস্তে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন। দশদিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দের পরিসীমা রহিল না। যিনি কখন প্রভুকে দেখেন নাই বা যিনি দেখিয়াছেন উভয়বিধ ভক্তের সমাগমে শান্তিপুর লোকে লোকারণ্য হইল। রঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার সহিত নীলাচলে যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

রঘুনাথ দাস।

হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুইজন মহাসম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহারা দুই সহোদর, জাতিতে কায়স্থ, উপাধি মজুমদার। তাঁহারা সপ্তগ্রামের জমীদার ছিলেন। ঐ জমীদারী পূর্ব্বে একজন মুসলমানের ছিল; পরে কোন সূত্রে তাঁহাদের হস্তগত হয়। ঐ জমীদারীতে বিংশতিলক্ষ টাকা আদায় হইত। তাঁহারা আট লক্ষ গৌড়েশ্বরকে দিতেন এবং বার লক্ষ আপনারা ভোগ করিতেন। তাঁহারা দুই ভাই সদাচার ধার্ম্মিক ও বদান্য ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশেষরূপ অর্থসাহায্য করিতেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বিশেষ আনুগত্য করিতেন। হিরণ্যদাস জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধনদাস কনিষ্ঠ। রঘুনাথ দাস কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র। ১৪২০ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি আপনাদিগের পুরোহিত, বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন।

তাঁহার অধ্যয়নকালেই আচার্য্য নদীয়া হইতে হরিদাস ঠাকুরকে নিজগৃহে আনয়ন করেন। রঘুনাথ দাস হরিদাস ঠাকুরকে পাইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার অনেক পরিচর্য্যা করেন। হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথ দাসের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করেন। হরিদাস ঠাকুরের কৃপাই রঘুনাথ দাসের প্রভুর চরণলাভের উপায় হয়। রঘুনাথ দাস প্রভুর নাম ও মহিমা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত প্রভুর চরণদর্শনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। প্রভু শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রঘুনাথ পিতার অনুমতি লইয়া আইসেন এবং প্রভুর চরণদর্শনে কৃতার্থ হয়েন।

রঘুনাথ শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন ও সাতদিন প্রভুর নিকট বাস করেন। রঘুনাথের সংসার ভাল লাগিত না। তিনি প্রভুর চরণে ধরিয়া প্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবার অভিলাষ জানাইলেন।

প্রভু বলিলেন,—"রঘুনাথ, স্থির হইয়া গৃহে যাও, পাগলের মত কাজ করিও না। লোক হঠাৎ ভবসাগরের কুল পায় না, ক্রমে ক্রমেই পাইয়া থাকে। তুমি কতবার সংসার ছাড়িয়া পিতামাতাকে ছাড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু একবারও কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। সময় না আসিলে, কিছুই হয় না। অনেকেই লোক দেখাইয়া মর্কট বৈরাগ্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। তুমি তাহা না করিয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিতে থাক। অন্তরে নিষ্ঠিত হইয়া বাহিরে লোকব্যবহার পালন কর। এইরূপ করিতে করিতে কৃষ্ণ অবশ্য তোমাকে কৃপা করিবেন। তাঁহার কৃপা হইলেই সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে। তোমার উদ্ধারের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে, তুমি নীলাচলে আমার নিকট আগমন করিও। তৎকালে কি উপায়ে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা কৃষ্ণের কৃপায় আপনি স্ফুরিত হইবে। কৃষ্ণ যখন কাহাকেও কৃপা করেন, তখন আর তাঁহাকে কেহই ধরিয়া রাখিতে পারে না।" এই কথা বলিয়া প্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ প্রভুর নিকট হইতে গৃহে আসিয়া প্রভুর শিক্ষানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনাথের পিতামাতাও সন্তুষ্ট হইলেন। রঘুনাথ অন্তরে বিরক্তির সহিত বাহিরে যথাযোগ্য বিষয়কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতামাতা বুঝিলেন, রঘুনাথ বৈরাগ্য ছাড়িয়া সংসারী হইয়াছে। রঘুনাথ পাছে সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, এখন তাঁহাকে সংসারী

হইতে দেখিয়া আর সেরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। কাজেই রঘুনাথ অনেকটা মুক্তি পাইলেন।

এদিকে প্রভু নীলাচলে যাইবেন বলিয়া ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। আর তাঁহাদিগকে এবৎসর নীলাচলে যাইতেও নিষেধ করিলেন। সকলকেই বলিলেন, "আমি নীলাচল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিব, অতএব এবৎসর তোমরা কেহই নীলাচলে যাইও না।" অনন্তর প্রভু জননীর নিকট শ্রীবৃন্দাবনগমনের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। পরে স্বয়ং কয়েকজন ভক্তের সহিত নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীবাস পণ্ডিতের ও রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এক একবার পদার্পণ করিলেন। আর কোথাও কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রভুর প্রত্যাগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম, বাণীনাথ ও গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ জগন্নাথের মন্দিরেই প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে আলিঙ্গন ও কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আমি জননীর ও গঙ্গার চরণ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যাই-বার সময় গদাধরকে দুঃখ দিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই যাওয়া হইল না। পথে আমার সঙ্গে অনেক লোকসংঘট্ট হইল। অতিকষ্টে রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করিলাম। ঐ স্থানে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী সনাতন ও রূপ আমার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আসিয়া লোকসংঘট্ট দেখিয়া ঐরূপ ভাবে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে নিষেধ করিল। আমিও বিবেচনা করিলাম, দুর্লভ, দুর্গম ও নির্জ্জন শ্রীবৃন্দাবনে এত লোক লইয়া গেলে যাওয়ায় সুখ হইবে না। মাধবেন্দ্র পুরী একাকী শ্রীবৃন্দা-বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধদানচ্ছলে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, নীলাচলেই ফিরিয়া আসিলাম। এখন তোমরা অনুমতি প্রদান কর, আমি একাকী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করি।" ভক্তগণ বলিলেন, "প্রভু, এই বর্ষা চারিমাস অতিবাহিত করিয়া পরে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন।" প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন। ঐ দিবস গদাধর প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর আগমনসমাচার পাইয়া কটক হইতে পুরীতে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন।

পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা।

বর্ষা চলিয়া গেল। শরতের আগমনে প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত যুক্তি করিয়া পাকাদির নিমিত্ত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে এবং জলপাত্রাদি লইবার নিমিত্ত তাঁহারই অনুচর কৃষ্ণদাস নামক অপর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন স্থির করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ দুই জনকে লইয়া বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুকে না পাইয়া তাঁহার অনুসরণের অভিলাষ করিলেন। স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। প্রভু কটক দক্ষিণে রাখিয়া নির্জ্জন বনপথে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার ও শূকর সকল দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তাহারা প্রভুর প্রতাপে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। একদিন পথিমধ্যে একটি ভীষণাকার ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল। প্রভু ভাবাবেশে বিভোর হইয়া গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চরণ ব্যাঘ্রের গাত্রে লাগিল। প্রভু ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বলিলেন, "ব্যাঘ্র উঠ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" ব্যাঘ্র উঠিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। আর একদিন প্রভু একটি নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এক পাল মত্ত হস্তী জলপানার্থ ঐস্থানে আগমন করিল। প্রভু 'কৃষ্ণ বল' বলিয়া জল লইয়া উহাদের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। হস্তী সকল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অপর একদিন প্রভু চলিতে চলিতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া মৃগীগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ও বামে গমন করিতে লাগিল। পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব হিংস্রজন্তু সকল একত্র মিলিত হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। প্রভু যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিলেন, তখন তাহারাও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বলভদ্রভট্টাচার্য্য প্রভুর এই সকল অদ্ভুত রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রভু যে যে গ্রাম দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই গ্রামের লোক সকল প্রভুর সহিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঝারিখণ্ডের পথে অসভ্য বন্যজাতির বাসই অধিক। সেই সকল বন্যলোকও প্রভুর কৃপায় বৈষ্ণব হইয়া গেলেন।

প্রভু পথের সকলকেই নাম ও প্রেম দিয়া নিস্তার করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।

প্রভু যাইতে যাইতে যে বন দেখেন, তাহাই শ্রীবৃন্দাবন মনে করেন, যে পর্ব্বত দেখেন, তাহাই গিরিগোবর্দ্ধন মনে করেন, যে নদী দেখেন, তাহাই যমুনা মনে করেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বনের শাক ও ফলমূল পাক করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করান। প্রভু যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন, সেই গ্রামে ব্রাহ্মণ থাকিলে, তাঁহারা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া প্রভুর সেবা করেন, ব্রাহ্মণ না থাকিলে, অপর জাতিরাই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া প্রভুর ভিক্ষার সমাধান করিয়া থাকেন। যে দিন পথে কোন লোকালয় না পাওয়া যায়, সে দিন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বসংগৃহীত অন্নাদি পাক করিয়া বনেই প্রভুকে ভিক্ষা করান। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পাকে ও সেবায় প্রভু বিশেষ সুখ বোধ করেন। প্রভু মধ্যে মধ্যে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন, "ভট্ট, আমি পূর্ব্বেও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনই এবারকার মত সুখ পাই নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াল, আমাকে বনপথে আনিয়া বড়ই সুখ দিলেন। তোমার প্রসাদেই আমি ঈদৃশ সুখ পাইলাম।" ভট্টাচার্য্য বলেন, "তুমি স্বয়ং করুণাময় কৃষ্ণ, আমি অধম জীব, আমাকে সঙ্গে আনিয়া কৃতার্থ করিলে। অধম কাককে গরুড়ের সমান করিলে।"

প্রভু এইপ্রকারে ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া বারাণসীধামে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রভু মণিকর্ণিকায় স্নান করিতে নামিলেন। ঐ সময়ে তপনমিশ্রও গঙ্গাতে স্নান করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়াছিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই চিনিলেন। হৃদয় উৎফুল্ল হইল। প্রভুর চরণে ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তপনমিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তিনি প্রভুকে গৃহে পাইয়া পাদপ্রক্ষালনানন্তর ঐ পাদোদক সবংশে ধারণ করিলেন। পরে প্রভুকে আসনে উপবেশন করাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু ভিক্ষার পর শয়ন করিলেন। তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। তপনমিশ্র সবংশে প্রভুর শেষান্ন ভোজন করিলেন। প্রভুর আগমনসমাচার প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রশেখর আসিয়া চরণবন্দনা করিলেন। চন্দ্র-

শেখর তপনমিশ্রের বন্ধু ও প্রভুর পূর্ব্বদাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য, লিখন বৃত্তি। প্রভু চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর প্রসাদ পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু নিজগুণে কৃপা করিয়া ভৃত্যকে দর্শন দিলেন। জীব প্রারব্ধের অধীন। প্রারব্ধের বশে এই বারাণসীধামে বাস করিতেছি। এখানে 'মায়া' ও 'ব্রহ্ম' ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাই না। এই বারাণসীতে ষড়্‌-দর্শনের ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোন কথাই শুনা যায় না। মিশ্র কৃপা করিয়া যখন কৃষ্ণকথা শুনান, তখনই শুনি। আমরা উভয়েই নিরন্তর প্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া থাকি। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, কৃপা করিয়া ভৃত্যকে দর্শন প্রদান করিলেন। শুনিলাম, প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন। দিনকয়েক থাকিয়া ভৃত্যগণকে কৃতার্থ করুন।" প্রভু তাহাতেই সম্মত হইলেন। মিশ্র বলিলেন, "যদি কৃপা করিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন, তবে অন্য কোন স্থানে নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিবেন না, অধমের গৃহেই শাকান্ন ভিক্ষা হইবে।" প্রভু তদ্বিষয়েও সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তপন মিশ্রের ভবনেই প্রভুর ভিক্ষা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। প্রতিদিন কেহ না কেহ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। প্রভুও 'আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন।

তপন মিশ্রের সহিত একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি প্রভুর অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। তাঁহার কাশীবাসী বিখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সভাতেও গতিবিধি ছিল। তিনি একদিন প্রভুর চরণ দর্শনের পর প্রকাশানন্দের সভায় যাইয়া প্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "পুরী হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি তপন মিশ্রের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। আমি যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার অদ্ভুত প্রভাব, প্রকাণ্ড শরীর, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আজানুলম্বিত ভুজযুগল, কমলতুল্য নয়নদ্বয়। দেখিলেই নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার দর্শনমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা হয়। ভাগবতে মহা-ভাগবতের যে কিছু লক্ষণ শুনা যায়, সে সকলই তাঁহাতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছেন। দুই নেত্রে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন রোদন করিতেছেন। নামটিও জগন্মঙ্গল 'কৃষ্ণচৈতন্য'।" প্রকাশানন্দ শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ, শুনিয়াছি, তিনি গৌড়দেশের ভাবুক সন্ন্যাসী, কেশব

ভারতীর শিষ্য, লোকবঞ্চক। তাঁহার নাম চৈতন্যই বটে। তিনি ভাবুকগণ লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ লোক সকল তাঁহাকে ঈশ্বরই বলে। তাঁহার একটা মোহিনী বিদ্যা আছে। তিনি সেই বিদ্যার প্রভাবে অনেককেই মোহিত করিয়াছেন। পুরুষোত্তমের পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহার সঙ্গে পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই কাশীপুরীতে কিন্তু তাঁহার সেই ভাবকালী বিকাইবে না। তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, আর তাঁহার নিকট যাইও না। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গ করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে।" প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কোন উত্তর না করিয়া মনোদুঃখে প্রভুর নিকট আসিয়া সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। তখন ঐ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র পুনশ্চ বলিলেন, "প্রভো, আমার একটি সংশয় দূর করিতে হইবে। আমি যখন প্রকাশানন্দের নিকট প্রভুর নাম করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি চৈতন্যকে জানি।" তিনি দুই তিন বারই 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' বলিলেন, একবারও 'কৃষ্ণচৈতন্য' বলিতে পারিলেন না, ইহার কারণ কি?" তখন প্রভু বলিলেন,—"প্রকাশানন্দ মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কৃষ্ণাপরাধী, নিরন্তর, 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' ও 'চৈতন্য' বলিয়া থাকে, কৃষ্ণনাম মুখে আইসে না। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপ, তিনই এক। তিনের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই। তিনই চিদানন্দাত্মক। তিনের কোনটিই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বেদ্য নহেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা ব্রহ্মজ্ঞানীকেও আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া থাকেন। উহাঁরা ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক। ঐ তিনের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণচরণসম্বন্ধিনী তুলসীর গন্ধও আত্মারামের মনোহরণে সমর্থ। মায়াবাদিগণ বহির্মুখ, বহির্মুখের মুখে কৃষ্ণনাম আসিবে কেন? আমি ভাবকালী বিক্রয় করিতে কাশীপুরে আসিয়াছি, গ্রাহক নাই, ভাবকালী বিকাইবার সম্ভাবনা নাই। যদি না বিকায়, ঘরে ফিরিয়া লইব না, ভারি বোঝা লইতে পারিব না, অল্পস্বল্প মূল্যেই বেচিয়া যাইব।" প্রভু এইরূপে সেই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে প্রবোধ দিয়া সেদিন বিদায় করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই মথুরা যাত্রা করিলেন। গমনকালে তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রভু কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র প্রভুর বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মথুরাগমন।

প্রভু কয়েকদিবস পথপর্য্যটনের পর সঙ্গিদ্বয়ের সহিত প্রয়াগে উপনীত হইলেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীর সঙ্গমে স্নান ও বেণীমাধব দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। অনেকেই প্রভুর সহিত নাচিয়া গাহিয়া বৈষ্ণব হইলেন। প্রভু ত্রিরাত্র বাসের পর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর কোথাও বিলম্ব না করিয়া সত্বর মথুরায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু মথুরাপুরী দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। পরে বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া জন্ম-স্থানে কেশব দর্শন করিলেন। প্রভু কেশব দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন। অকস্মাৎ এক বিপ্র আসিয়া প্রভুর সহিত নাচিতে ও গাহিতে লাগিলেন। কেশবের সেবক প্রভুকে মালা পরাইয়া দিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ নর্ত্তনকীর্ত্তনের পর প্রভু স্থির হইয়া উক্ত নৃত্যকারী ব্রাহ্মণকে নিভৃতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অতি সরলস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আপনার ঈদৃশী প্রেমসম্পত্তি কোথা হইতে লাভ হইল?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।" মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ শুনিয়া প্রভু সানন্দে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণবন্দনা করিলেন। ব্রাহ্মণ তটস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এ কি কর্ম্ম করিলেন?" প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে আপনি আমার গুরুস্থানীয়।" ব্রাহ্মণ আদর সহকারে প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া ভিক্ষা দিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ সনোড়িয়া। সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ অভোজ্যান্ন। সনোড়িয়া অভোজ্যান্ন হইলেও, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া প্রভুর তাঁহার হস্তে ভিক্ষা করার সম্বন্ধে কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু ঐ বিপ্র লোকাচারের অনুরোধে প্রভুকে স্বহস্তে ভিক্ষা না দিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা পাক করাইয়া ভিক্ষা করা-ইলেন। শত শত লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়া কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। উক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভুকে একে একে অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসারমোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন, সংযমন, নাগ, ঘটাভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্বতী, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, ও কোটি এই চব্বিশ ঘাটে স্নান করাইলেন এবং স্বয়ং

বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা ও গোকর্ণাদি দর্শন করাইলেন। পরে প্রভুর দ্বাদশবন দর্শনের ইচ্ছা হইল। মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভুকে লইয়া বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

বনযাত্রা।

প্রভু প্রথম দিন মধুবন, বলদেবের মধুপানস্থান, ধ্রুবের তপস্যার স্থান, তালবন, কুমুদবন ও তত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের সহিত জলবিহারের সরোবর দর্শন করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সান্তনকুণ্ড, বহুলাবন, ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যাঘ্র হইতে রক্ষিতা বহুলা নাম্নী গাভির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তৃতীয় দিবসে শ্রীরাধাকুণ্ড উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে ধেনু সকল চরিতেছিল। তাহারা প্রভুকে দেখিয়া বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার সমীপে আসিয়া অঙ্গলেহন করিতে লাগিল। প্রভু ধেনু সকল দর্শন করিয়া প্রথমে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া উহাদিগের গাত্রকণ্ডূয়ন করিতে লাগিলেন। ধেনুগণ প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, রাখালেরা অতিকষ্টে তাহাদিগকে প্রভুর অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল। প্রভুর সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে মৃগসকল আসিয়া তাঁহার গাত্রলেহন করিতে লাগিল। শিখিগণ প্রভুকে দেখিয়া পুচ্ছ প্রসারণ সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। কোকিলাদি পক্ষী সকল কলধ্বনি করিতে লাগিল। তরুলতা সকল পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহু কম্পাশ্রুপুলকাদি উদ্‌গত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে লাগিল। প্রভু কখন প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত ও ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বারংবার প্রভুকে প্রবোধিত করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রভু অষ্টপ্রহরই ভাবে বিভোর থাকেন। স্নান ও ভোজন অভ্যাস বশতঃ কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

এইরূপে প্রভু চলিয়া চলিয়া আরিটগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। আরিট গ্রামে আসিয়াই প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। বাহ্যদৃষ্টি হইলে, রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কি মাথুর ব্রাহ্মণ, কি গ্রামের লোক সকল, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে বুঝিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে পথমধ্যস্থিত দুইটি ক্ষেত্র হইতে অল্প অল্প জল লইয়া স্নান করি-

লেন। তদ্দর্শনে গ্রামের লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া গদ্‌গদস্বরে কুণ্ডযুগলের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। স্তব-পাঠ শেষ হইলে, কিয়ৎকাল আনন্দে নৃত্য করিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকা লইয়া তিলকধারণ করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করি-লেন। তদবধি কুণ্ডদ্বয় পুনঃ প্রকাশিত হইলেন।

ঐ স্থান হইতে প্রভু কুসুমসরোবরে আগমন করিলেন। কুসুমসরোবর দর্শনের পর গিরিরাজ প্রদক্ষিণের অভিলাষ হইল। প্রভু দূর হইতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে একখণ্ড শিলাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। গিরিরাজ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন গ্রামে যাইয়া হরিদেবকে দর্শন করিলেন। হরিদেবের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। গোবর্দ্ধনের লোক সকল প্রভুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত প্রেমবিকার সকল সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হরিদেবের সেবক আসিয়া প্রভুর সৎকার করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকের আয়োজন করিয়া লইলেন। প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ভিক্ষা করিলেন। ঐ রাত্রি প্রভু ঐ স্থানেই বাস করিলেন। রাত্রিকালে প্রভু মনে মনে বিচার করিলেন, গোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ করা হইবে না, অথচ তত্রত্য গোপালদেবকে দর্শন করিতে হইবে, দর্শনের উপায় কি হইবে? প্রভুর মনের ভাব বিদিত হইয়া গোপালদেব স্বয়ংই এক ছল উঠাইলেন। অকস্মাৎ একজন লোক আসিয়া গোপালের সেবককে বলিলেন, "কল্য যবনেরা আসিয়া এই গ্রাম লুণ্ঠন করিবে, অতএব এই রাত্রিতেই গোপালকে লইয়া অন্যত্র পলায়ন কর।" এই কথা শুনিয়া গোপালের সেবক গ্রামবাসিগণকে জানাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে গোপালকে লইয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিলেন। গোপালের বাসস্থান অন্নকূটগ্রাম লোকশূন্য হইল।

এদিকে প্রভু প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া পুনশ্চ গোবর্দ্ধন পরি-ক্রমায় বহির্গত হইলেন। প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে গিরিরাজকে প্রদ-ক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পথে আনরগ্রাম ও সঙ্কর্ষণকুণ্ড হইয়া গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। প্রভু গোবিন্দকুণ্ডে স্নানানন্তর গোপালদেব অন্নকূট ত্যাগ করিয়া গাঁঠুলিগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে গাঁঠুলি গ্রামে যাইয়া গোপালদেবকে দর্শন করিলেন। গোপালের সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রভু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমাবেশে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিলেন। পরে অপ্সরাকুণ্ড, পুছরি গ্রাম, কদম্বখণ্ডি ও দানঘাট হইয়া গিরিরাজের পরিক্রমা শেষ করিলেন।

অনন্তর লাঠাবন হইয়া কাম্যবনে গমন করিলেন। কাম্যবনে গোবিন্দ ও গোপীনাথ দর্শন করিয়া ঐ বন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণকালে সেতুবন্ধ, লুকলুকিকুণ্ড, ধর্ম্মরাজমন্দির, খিলূসি শিলা, ভোজনস্থলী, মহোদধি, বরাহকুণ্ড, কামেশ্বর ও বিমলাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করিলেন।

এইরূপে কাম্যবন প্রদক্ষিণের পর বৃষভানুপুরে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভানুকুণ্ডে স্নান ও বৃষভানুনন্দিনীকে দর্শন করিয়া নন্দীশ্বরপুরে যাত্রা করিলেন। নন্দীশ্বরে যাইয়া পাবনসরোবর, চরণচিহ্ন ও নিভৃত নিকুঞ্জ দর্শন পূর্ব্বক কিশোরী-কুণ্ড হইয়া যাবটে উপনীত হইলেন।

পরদিন সঙ্কেতবট, চরণপাহাড়ী, কোটবন ও সূর্য্যকুণ্ড হইয়া ক্ষীরসাগরে যাইয়া শেষশায়ীকে দর্শন করিলেন। ঐ দিবস ক্ষীরসাগরের তীরেই বাস করিলেন।

তৎপরদিবস খদিরবন ও খেলাতীর্থ দর্শন করিলেন। খেলাতীর্থ হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া রামঘাট, অক্ষয়বট, চীরঘাট ও নন্দঘাট প্রভৃতি দর্শনানন্তর যমুনা পার হইয়া ভদ্র ও মাঠ বন হইয়া ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। পরে ভাণ্ডীরবন হইতে বিল্ববন, লোহবন, মানসরোবর ও পানিগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে মহাবনে উপনীত হইলেন। মহাবনে বাল্যলীলার স্থান সকল দর্শন করিয়া গোকুলে গমন করিলেন। গোকুল হইতে পুনশ্চ মথুরায় আগমন করিলেন।

প্রভু মথুরায় প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মাথুর ব্রাহ্মণের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রভু মথুরা ছাড়িয়া নির্জ্জন অক্রূরতীর্থে আগমন করিলেন। অক্রূরতীর্থেও জনসংঘট্ট হইতে লাগিল। প্রভু প্রাতঃকালেই অক্রূরতীর্থ ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে ক্রমশঃ বংশীবট, নিধুবন, গহ্বরবন, রাধাবাগ, দাবানলকুণ্ড, কালিয়হ্রদ, নন্দকূপ, দ্বাদশাদিত্যটিলা, দ্বাদশা-দিত্য ঘাট, প্রস্কন্দনতীর্থ, জয়াটবী, অদ্বৈতবট, যুগলঘাট, বিহারিঘাট, ধূসরঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশিঘাট, ধীরসমীর, মণিকর্ণিকার ঘাট, আঁধারিয়া ঘাট, গোবিন্দঘাট, গোপেশ্বর, রাসস্থলী, জ্ঞানগুধরী, পানিঘাট, আম্লিতলা, ব্রহ্মকুণ্ড, যোগপীঠ, সাক্ষিগোপাল, বেণুকূপ, রঙ্গবাটী, গুলালডাঙ্গা, গোবিন্দকুণ্ড, ব্যাসঘেরা, গোলকুঞ্জ, শিঙ্গারবট, নিকুঞ্জবন, লোটনকুঞ্জ, ও বনখণ্ডি প্রভৃতি দর্শন করিলেন। সমস্ত দিবস ভ্রমণ এবং অপরাহ্ণে অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করেন। এই

ভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল। লোকসমাগম কিন্তু দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভু স্বচ্ছন্দে নামসঙ্কীর্ত্তনের ব্যাঘাত হইতে দেখিয়া প্রাতঃকালে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত নির্জ্জনে নামসংকীর্ত্তন করেন এবং অপরাহ্নে অক্রূরতীর্থে যাইয়া ভিক্ষা করেন, তাহাতেও লোকসমাগমের নিবৃত্তি হইল না।

একদিবস প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আম্লিতলায় নির্জ্জনে বসিয়া আপনমনে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস নামক একজন রজপুত বৈষ্ণব যমুনা পার হইয়া কেশীতীর্থে স্নানানন্তর কালিয়হ্রদাভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে প্রভুকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যে সমাকৃষ্ট হইয়া প্রেমাবেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, "কে তুমি প্রণাম কর?" কৃষ্ণদাস বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণদাস নামক রজপুত, যমুনার পরপারে আমার বাসস্থান। আমি গত রাত্রিতে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ হইল।" প্রভু কৃষ্ণদাসকে আলিঙ্গন দিলেন। উভয়েই প্রেমাবেশে কিছুক্ষণ ধরিয়া নৃত্যগীত করিলেন। পরে কৃষ্ণদাস প্রভুর সহিত অক্রূরতীর্থে আসিয়া প্রভুর ভোজনাবশেষ পাইলেন। কৃষ্ণদাস আর গৃহে গেলেন না, প্রভুর সঙ্গেই থাকিয়া গেলেন।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে পুনশ্চ কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব উঠিল। কেহ বা প্রভুর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কেহ বা রাত্রিকালে কালিদহে কালিয়ের ফণায় নৃত্যকারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় এইরূপও প্রচার করিতে লাগিলেন। একদিন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভু, অনুমতি করুন, আমি কালিদহে যাইয়া কৃষ্ণদর্শন করিয়া আসি।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "মূর্খ লোকের কথা শুনিয়া তুমিও মূর্খের মত কার্য্য করিবে? কৃষ্ণ কেন কলিকালে প্রকট হইবেন? অজ্ঞ লোক সকল ভ্রমবশতঃ ঐরূপ জনরব উঠাইতেছে।" প্রভুর নিবারণে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নিরস্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি ভব্য লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন?" তাঁহারা বলিলেন, "রাত্রিকালে কৈবর্ত্ত সকল নৌকায় চড়িয়া মশাল জ্বালিয়া মৎস্য ধরে। তদ্দর্শনে অজ্ঞ লোক সকল কালিদহে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, এইরূপ একটি জনরব উঠাইয়াছে। তাহারা নৌকাকে কালিয় নাগ, মশালকে ফণির মণি ও কৈবর্ত্তকে কৃষ্ণ মনে করিয়া

ভ্রমকে সত্য করিয়া রটাইয়াছে।" প্রভু শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের দিকে দৃষ্টি করিলেন। ভট্টাচার্য্য লজ্জায় বদন অবনত করিলেন।

এদিকে প্রভুর আকৃতি প্রকৃতি ও ভাবাবেশাদি দর্শন করিয়া অনেকেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিনই বহুতর লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রত্যহ কেহ না কেহ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ সাক্ষাতেই প্রভুকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভু সকলকেই বলিতে লাগিলেন, "বিষ্ণু বিষ্ণু, আপনারা ভ্রমে পতিত হইবেন না, আমি জীবাধম, আমাতে কখনই ঈশ্বরবুদ্ধি করিবেন না। ঈশ্বর সূর্য্যসদৃশ এবং জীব তাঁহার কিরণকণা তুল্য। জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়।"

এইরূপ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। প্রভু যত কেন আত্মগোপনের চেষ্টা করুন না, গোপনে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীবৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম তাঁহাকে আত্মবন্ধুর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগের প্রীতি দেখিয়া ভাবাবেশে স্থাবর জঙ্গম যাহাকে দেখেন, তাহাকেই আলিঙ্গন দেন; প্রতি তরুলতাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি ভাবাবেশে 'কৃষ্ণ বোল' 'কৃষ্ণ বোল' বলিলে, স্থাবর জঙ্গম সকলেই তাঁহার অনুকরণ করেন, ধ্বনির প্রতিধ্বনি করেন। একদিন প্রভু অক্রূরতীর্থে বসিয়া ভাবিলেন, এইস্থানে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন; এইস্থানেই ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণদাস দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভু জলে পড়িয়াছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া জল হইতে উঠাইলেন। পরে ভট্টাচার্য্য মাথুর ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রভুকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভো, যেরূপ দিন দিন লোকসংঘট্ট বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আপনারও যেরূপ ভাবাবেশ দেখিতেছি, তাহাতে আর এইস্থানে থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, আপনাকে লইয়া প্রয়াগে যাইয়া মকরে স্নান করি।" প্রভু বলিলেন, "তুমি আমাকে শ্রীবৃন্দাবন দেখাইলে, আমি তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, অতএব তুমি যাহা ভাল হয় তাহাই কর, আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা সেই স্থানেই লইয়া যাও।"

প্রভুর অনুমতি পাইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, তৎসঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ, রাজপুত

কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণ এই চারিজন প্রভুকে লইয়া যমুনাপার হইয়া সোরো-ক্ষেত্রের পথে গঙ্গাতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়া একস্থানে একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। নিকটেই ধেনু সকল বিচরণ করিতেছিল। তদ্দর্শনে প্রভুর চিত্ত উল্লাসিত হইল। দৈবাৎ এই সময়েই একটি রাখাল বংশীধ্বনি করিল। বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রভু প্রেমে আবিষ্ট ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। মুখ দিয়া ফেণ নির্গত হইতে লাগিল। প্রভু তদবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, এমন সময় ঐ স্থান দিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠান সৈনিক গমন করিতেছিল। উহারা প্রভুকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া বিবেচনা করিল, এই সন্ন্যাসীর নিকট অবশ্য কিছু ধন ছিল, এই চারিজন ধনের লোভে সন্ন্যাসীকে ধুতূরা খাওয়াইয়া মারিয়াছে। এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া উহারা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে প্রভুর সঙ্গীদিগকে বন্ধন করিল। পরে বলিল, "তোরা এই সন্ন্যাসীকে মারিলি কেন বল্, নতুবা এখনই কাটিয়া ফেলিব।" বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ হইলেও, অতিশয় সাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমরা এই সন্ন্যাসীকে মারি নাই, ইনি মরেনও নাই, জীবিত আছেন। ইঁহার মৃগী রোগ আছে, সময়ে সময়ে এইরূপ অচেতন হইয়া থাকেন, এখনই সংজ্ঞালাভ করিবেন। তোমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে আমার কথা সত্য কি না দেখিতে পাইবে। ইনি আমাদিগের গুরু, আমরা ইঁহার শিষ্য, শিষ্য কি কখন গুরুকে মারিতে পারে?" এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই প্রভুর চৈতন্য হইল। চৈতন্য হইলে, প্রভু হুঙ্কার সহকারে 'হরি হরি' বলিতে বলিতে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া যবনেরা তাঁহার সঙ্গীদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন। প্রভুও যবনদিগকে দেখিয়া কিছু স্থির হইলেন। তখন যবনেরা প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গীসকল তোমার ধনাপহরণের উদ্দেশে তোমাকে ধুতূরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছে?" প্রভু উত্তর করিলেন, "না, আমার মৃগীরোগ আছে, আমি সময়ে সময়ে এই প্রকার বিহ্বল হইয়া থাকি, ইঁহারা দয়া করিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, আমি সন্ন্যাসী, ধনরত্ন কোথায় পাইব?" যবনদিগের মধ্যে একজন কৃষ্ণবর্ণপরিচ্ছদধারী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রভুর ভাবগতি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্রচিত্ত হইয়া প্রভুর সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আত্মার

অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বাদের কথা উঠাইয়া প্রভুর সহিত তর্কারম্ভ করিলেন। প্রভুও তাঁহারই যুক্তি দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্বচন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"শাস্ত্র সকল একবাক্যে পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও তাঁহাকেই জীবের পরা গতি বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও, অজ্ঞ জীবের সৌভাগ্যের অনুদয় পর্য্যন্ত উহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাঁহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় নাই, তিনি উহা দেখেন না, বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না। এই নিমিত্ত পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ, ব্যর্থ হইলেও, নিবৃত্ত হয় না। উহা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতেও চলিবে বলিয়াই অনুমান করা যায়। পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ যে নিতান্ত নিষ্ফল, তাহা সুনিশ্চিত। জীবের নিজের সত্তাজ্ঞান স্বাভাবিক। নাস্তিকেরও স্বসত্তার জ্ঞান আছে। নাস্তিক পুরুষেরাও যখন নিজের সত্তার অপলাপ করিতে সাহস করেন না, তখন পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব বা অসর্ব্বেশ্বরত্ব লইয়াই প্রকৃত আস্তিকতা বা নাস্তিকতা বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইতেছে। পুরুষের সর্ব্বেশ্বরতা না দেখিয়াই অজ্ঞ লোক সকল তাঁহার অপলাপ করিয়া থাকেন। ঐ অপলাপের ফল কি? পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া কি কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে? অনভীষ্ট দুঃখের নাশ ও অভীষ্ট সুখের লাভেই পুরুষের উদ্দেশ্য দেখা যায়। পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া কি কেহ কখন ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিয়াছেন? কর্ম্মকেই সকল সুখদুঃখের মূল ভাবিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব কর্ম্মে আরোপিত করিয়া যাঁহারা কেবল ঐহিক কর্ম্মেরই পক্ষপাতী হয়েন, তাঁহারা কি তদপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী পারত্রিক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ববাদীর নিকট পরাজিত হয়েন না? আবার যাঁহারা উক্ত মতের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক কি সার্ব্বভৌমত্বফলক ঐহিক কর্ম্মের কি পারমেষ্ঠ্যফলক পারত্রিক কর্ম্মেরও ক্ষয়িত্বাদি দোষ দর্শনানন্তর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কারশালী হইয়া কর্ম্মসাধিকা করণরূপা প্রকৃতিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি কর্ম্মবাদীর মতের উপরি বিরাজমান হয়েন না? ঐইরূপে প্রকৃতি-শ্রেষ্ঠত্ববাদী কর্ম্মবাদী হইতে গৌরবান্বিত হইলেও, তিনি কি কখন স্বাভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন? প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও তৎসঙ্গ বশতঃ কর্ত্তৃত্বের আরোপে তৎকৃত কর্ম্মের ফলভাগী হয়েন, এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাস দ্বারা আপনাকে অকর্ত্তা স্থির করিতে পারিলেই উক্ত ফলভোগের অবসান হয়, ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও, কেবল তাদৃশ

অভ্যাস দ্বারা কি কেহ কখন প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন? প্রকৃতি কি তাদৃশ অভ্যাসকারীকেও পুনঃ পুনঃ বলপূর্ব্বক নিজসঙ্গ করান না? ফলতঃ এই একমাত্র কারণ বশতঃ, অর্থাৎ আপনা হইতে প্রকৃতির বল অত্যন্ত অধিক দেখিয়াই কি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী সকল প্রকৃতির সত্যত্ব অপলাপ করিতে বাধ্য হইয়া মায়াবাদী হয়েন নাই?' এইরূপে উত্তরোত্তর সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইলেও পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্বের অপলাপ হেতু কোন মতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না; কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। লাভের মধ্যে তাঁহারা মোক্ষপথের অন্তরায়-স্বরূপ কিছু কিছু বিভূতি লইয়া, অর্থাৎ কর্ম্মবাদী আধিকারিক পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিকর্ত্রীত্ববাদী আসুরব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং মায়বাদী দৈবব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হইলেন। অধিকন্তু উক্ত ত্রিবিধ মতের দেশব্যাপী বিষময় ফল প্রচ্ছন্নভাবে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিল। কেহ কর্ম্মবাদীর কর্ম্মজালে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে লাগিলেন। কেহ প্রকৃতিকর্ত্রীত্ববাদীর অনুগত হইয়া যথেচ্ছাচার বশতঃ আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হইলেন। কেহ মায়াবাদীর ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়া শূন্যময় সংসারে কেবল আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন। • বিক্ষেপকর কর্ম্মের জাল ছেদন করিবেন কি, তাঁহার আপনার কর্ম্ম আপনাকেই চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রকৃতির কর্ত্রীত্ব ও আপনার অসঙ্গত্ব ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির বলে অসঙ্গকর্ত্তাকে অকর্ম্মকর্ত্তা করিয়া ফেলিল। সংসারকে স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল ভাবিতে গিয়া নিগড়িত দীন পুরুষ আপনাকে মুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ভাবিয়া যেরূপ উপহাসাস্পদ হয়েন, তাঁহাকে তদ্রূপ পদে পদে উপহাসাস্পদ হইতে হইল। পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্বের অপলাপ করিয়া জীবের কিছুই লাভ হইল না, সত্তামাত্রই অবশিষ্ট রহিল। বস্তুতঃ পুরুষ সর্ব্বেশ্বর। তাঁহার কলেবর শ্যামবর্ণ। ঐ কলেবর সচ্চিদানন্দাত্মক। তিনি পূর্ণব্রহ্ম, সকলের আত্মা, সর্ব্বগত, নিত্য ও সকলের আদি। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের আশ্রয়। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য এবং কারণেরও কারণ। তাঁহাতে ভক্তি করিলেই জীবের সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে। তাঁহার চরণে প্রীতিই সকল পুরুষার্থের সার। মোক্ষানন্দ ঐ প্রেমানন্দের কণামাত্র। সর্ব্বেশ্বর পুরুষের চরণসেবাতেই পূর্ণানন্দের লাভ হয়। শাস্ত্র সকল অগ্রে কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান স্থাপন করিয়া, পরে ঐ সকল খণ্ডন পূর্ব্বক, সর্ব্বেশ্বর পুরুষের ভজনই শেষে নিরূপণ করিয়াছেন।"

যবন প্রভুর বিচারনৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন,—"আমার একটি অভিমান ছিল, আমি বড় জ্ঞানী; আজ আমার সে অভিমান ভাঙ্গিয়াছে, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম করিতে ইচ্ছা করিতেছে, গোসাঁই, এক্ষণে আমাকে কৃপা কর।" প্রভু বলিলেন, "উঠ, তুমি কৃষ্ণনাম করিয়াছ, অতএব কৃতার্থ হইয়াছ; তোমার নাম থাকিল, রামদাস।" যবনদিগের সমভিব্যাহারে বিজুলিখান নামে অপর একজন যুবা পুরুষ ছিলেন। তিনিই সঙ্গী যবনদিগের অধিনায়ক। তিনিও প্রভুর প্রভাবে সমাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু তাঁহার মস্তকে চরণ দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে আবার অনেক যবন বৈষ্ণব হইলেন। তাঁহারা সকলে পাঠান বৈরাগী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

এইরূপে যবনদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রভু সঙ্গীদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চলিতে চলিতে সোরোক্ষেত্রে আসিয়া গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া স্নান করিলেন। গঙ্গাতীরপথে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগে উপনীত হইলেন। প্রভু ত্রিবেণীতে মকরে স্নান করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। স্বয়ং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসহচর কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণকে লইয়া দশ দিন পর্য্যন্ত প্রয়াগেই অবস্থিতি করিলেন। প্রয়াগেই রূপগোস্বামীর সহিত প্রভুর পুনর্মিলন হইল।

রূপগোস্বামীর গৃহত্যাগ।

প্রভুর সহিত রামকেলিতে মিলনের পর রূপগোস্বামী জ্যেষ্ঠ সনাতন গোস্বামীর সহিত বিষয়ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিকালে গৌড়েশ্বরমহিষী গৌড়েশ্বরের অঙ্গের একস্থানে কোন একটি চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কিসের চিহ্ন?" গৌড়েশ্বর প্রথমতঃ উহা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। পরে রাজ্ঞীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন,—"আলাউদ্দিন হোসেন সা যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন, তখন আমি তাঁহার অধীনস্থ সুবুদ্ধি রায় নামক একজন হিন্দু জমীদারের অধীনে কর্ম্ম করিতাম। সুবুদ্ধি রায় আমাকে একটি জলাশয় খনন করাইবার ভার দেন। তিনি উক্ত কার্য্যে আমার কোন একটি ছিদ্র পাইয়া আমাকে কশাঘাত করেন। ইহা সেই

কশাঘাতের চিহ্ন।" শুনিয়াই রাজ্ঞী অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ঐ সুবুদ্ধি রায় কি এখনও জীবিত আছে?" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "হাঁ, তিনি এখনও জীবিত আছেন। আলাউদ্দীন হোসেন সার রাজ্যচ্যুতির সম্বন্ধে তিনি আমার একজন প্রধান সহায় এবং চিরদিনই আমার পোষণকর্ত্তা ছিলেন।" রাজ্ঞী বলিলেন, "এখনই সুবুদ্ধিরায়ের শিরশ্ছেদনের আদেশ হউক।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, তিনি আমার পোষণকর্ত্তা, বিনাদোষে আমাকে দণ্ড করেন নাই।" রাজ্ঞী বলিলেন, "যাহাই হউক, সুবুদ্ধিরায়ের প্রাণদণ্ড না হইলে, আমি আত্মহত্যা করিব।" গৌড়েশ্বর অগত্যা সেই রাত্রি-তেই সহকারী মন্ত্রী রূপগোস্বামীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কেশবকে প্রেরণ করিলেন। কেশবের মুখে গৌড়েশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া রূপগোস্বামী তখনই তাঁহার সহিত রাজভবনে গমন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরেরও অধিক হইয়াছিল। বিশেষতঃ মুহুর্মুহু বিদ্যুৎপ্রকাশ ও ঘনগর্জ্জনের সহিত বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতেছিল। তাঁহারা যাইতে যাইতে যখন কোন একটি নীচজাতির গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহস্থিতা নীচকুলোদ্ভবা রমণী তাঁহাদিগের পদশব্দ শুনিয়া নিজ পতিকে বলিলেন, "এই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে কে ঘরের বাহির হইয়াছে?" স্বামী উত্তর করিলেন, "বোধ হয়, কুকুর যাইতেছে।" পত্নী বলি-লেন, "হাঁ, এই রাত্রে কুকুরও ঘরের বাহির হয় না, নিশ্চয় কোন ধনী লোকের ভৃত্য প্রভুর কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিতেছে।" রূপগোস্বামী তাঁহাদিগের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। উহা তাঁহার অন্তরে বিশেষ আঘাত করিল। তিনি আপনাকে উক্ত নীচজাতি হইতেও অধম ও পরাধীন ভাবিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, রাজসদনে উপস্থিত হইয়া গৌড়ে-শ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রির ঘটনা সমস্তই শুনিলেন এবং গৌড়েশ্বরের আন্তরিক অভিপ্রায় বিদিত হইয়া সুবুদ্ধিরায়ের জীবনরক্ষার্থ বহুকষ্টে রাজ্ঞীকে প্রবোধিত করিলেন। সুবুদ্ধিরায়ের প্রাণবধের পরিবর্ত্তে জাতিনাশের পরামর্শই সুস্থির হইল। তদনন্তর তিনি যথাগতপথে নিজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি গৃহে আসিয়াই সংসারত্যাগ মনস্থ করিলেন। পরে জ্যেষ্ঠের অনুমতি অনুসারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা সংসারমুক্তির জন্য বিবিধ পুরশ্চরণ করাইলেন। পরিশেষে নিশ্চিন্ত হইবার নিমিত্ত পরিজনবর্গের কিয়দংশ চন্দ্র-দ্বীপের বাটীতে ও অপর কিয়দংশ ফতোয়াবাদের বাটীতে প্রেরণ করিয়া, যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে দশসহস্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠের প্রয়োজননির্ব্বাহার্থ

গৌড়ের কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সকলের উদ্দেশে বিভাগ করিয়া দিলেন। এই সমস্ত কার্য্য গৌড়েশ্বরের অজ্ঞাতসারেই সমাহিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের গতিবিধি জানিবার নিমিত্ত দুইজন লোক উৎকলে প্রেরিত হইল। স্বয়ং রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ফতোয়াবাদের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন'। এই সময়ে ঐ দুইজন লোক উৎকল হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর রনপথে বৃন্দাবনযাত্রার বিষয় নিবেদন করিল। এই সংবাদ শুনিয়া রূপগোস্বামী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট একখানি পত্র দিয়া স্বয়ং কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সনাতনগোস্বামীর কারাবাস।

সনাতনগোস্বামী তখনও রামকেলিতে থাকিয়া রাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি অন্তরে বিষয়বিরক্ত হইয়াও বাহিরে রূপগোস্বামীর ন্যায় বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। ভ্রাতার পত্র পাইয়া সত্বর বিষয়ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মনে মনে বিষয়ত্যাগের উপায় অবধারণ পূর্ব্বক রাজসভায় গমনে বিরত হইয়া পণ্ডিত-গণের সহিত নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুযোগ পাইলেই প্রভুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইবেন, ইহাই উদ্দেশ্য রহিল। উপর্য্যুপরি তিন দিন মন্ত্রী সনাতনের অনুপস্থিতি দেখিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। ঐ লোক সনাতনগোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপুরঃসর নিবেদন করিল, "গৌড়েশ্বর আপনার তিনদিন সভায় অনুপ-স্থিতির কারণ জানিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যাইয়া কি নিবেদন করিব, বলিতে আজ্ঞা হউক।" সনাতনগোস্বামী বলিলেন, "আমি অস্বাস্থ্য নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, ইহাই নিবেদন করিবে।" গৌড়েশ্বরপ্রেরিত লোক ঐ কথা শুনিয়া রাজভবনে ফিরিয়া গেল এবং গৌড়েশ্বরের নিকট যাইয়া অসুস্থতাই মন্ত্রীর সভায় অনুপস্থিতির কারণ নিবেদন করিল। গৌড়েশ্বর লোকমুখে মন্ত্রীকে অসুস্থ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজবাটীর চিকিৎসককে মন্ত্রীর ভবনে প্রেরণ করিলেন। চিকিৎসক যাইয়া দেখিলেন, মন্ত্রী সনাতন স্বচ্ছন্দে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, মন্ত্রীর শরীর অসুস্থ নহে। তখন বলিলেন, "মন্ত্রিবর, আপনার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আপনাকে দেখিবার

নিমিত্ত গৌড়েশ্বর আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যাইয়া কি বলিব, তাহাই বলুন। আপনার শরীর বোধ হয় সুস্থই আছে?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "মহাশয়, আমার শারীরিক কোন পীড়া হয় নাই; মন নিতান্ত অসুস্থ; আর যে রাজকার্য্য চালাইতে পারি, এরূপ বোধ হয় না; গৌড়েশ্বরকে বলিবেন, আমাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলেই সুখী হইব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সনাতনগোস্বামী নীরব হইলেন। চিকিৎসকও উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "মন্ত্রীর শরীর সুস্থই আছে, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তাঁহার মন নিতান্ত অসুস্থ, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম।" গৌড়েশ্বর চিকিৎসকের মুখে মন্ত্রী সনাতনের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বয়ংই তাঁহার আবাসে গমন করিলেন। সনাতনগোস্বামী গৌড়েশ্বরকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানানন্তর যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃসর আসন প্রদান করিলেন। গৌড়েশ্বর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, "মন্ত্রিন্, কয়েকদিন তোমার অনুপস্থিতি নিবন্ধন রাজকার্য্যের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সত্বর সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করা হউক।" তখন সনাতনগোস্বামী সবিনয়ে বলিলেন, "বঙ্গেশ্বর, আমার চিত্ত নিরতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমি যে এরূপ অবস্থায় তাদৃশ গুরুতর কার্য্য চালাইতে পারি, এমন বোধ করি না।" গৌড়েশ্বর মন্ত্রীর এইপ্রকার প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, "বুঝিলাম, যাহাতে আমার রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাই তোমার অভিপ্রায়। আমিত কখনই তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের বাধক হই নাই, তবে কেন তুমি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবে? রাজকার্য্যও কি ধর্ম্মকর্ম্মের অন্তর্গত নয়?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "রাজন্, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, রাজকার্য্য ধর্ম্মকর্ম্মেরই অন্তর্গত, কিন্তু আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমারস্থানে অপর লোক নিযুক্ত করিয়া আমাকে অবসর প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইব।" মন্ত্রীর এই শেষ কথা শুনিয়া, গৌড়েশ্বর কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তোমার ভ্রাতা দস্যুর ন্যায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তুমিও অসুখের ভান করিয়া সমস্ত রাজকর্ম্ম নষ্ট করিতেছ। তোমরা কি ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্মাচরণেও কুণ্ঠিত হও না? রাজাপরাধ

কি পাপ নহে? ঐ পাপেরও কি দণ্ড নাই?" সনাতনগোস্বামী গৌড়েশ্বরের সেই অযথা তিরস্কারে অন্তরে বিরক্ত হইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি রাজ্যেশ্বর ও সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইচ্ছা হইলেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারেন।" এই কথায় গৌড়েশ্বর অধিকতর রুষ্ট হইয়া আর কোন কথাই না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি মন্ত্রীর আলয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মন্ত্রী যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, এবং মন্ত্রীর মত পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যে কিছু বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ হইল, তাহাও করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। মন্ত্রীর মতের পরিবর্ত্তন হইল না। অগত্যা গৌড়েশ্বর মন্ত্রী সনাতনকে বন্দী করিলেন। সনাতন গোস্বামী বন্দী হইলে, পূর্ব্বমন্ত্রী পুরন্দর বসু, যিনি এতাবৎকাল তাঁহার সহকারিতায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই, কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।, পুরন্দর বসু মন্ত্রিপদের উপযুক্ত হইলেও, স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন বলিয়া, তাঁহার মন্ত্রণা অনেক সময়েই কল্যাণকরী হইত না, ইহা গৌড়েশ্বর বুঝিতেন। ঐ পুরন্দর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকান্ত বসুও গৌড়েশ্বরের অধীনেই কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার কর্ম্ম ছিল, বঙ্গেশ্বরের অধীনস্থ উড়িষ্যাপ্রদেশের করসংগ্রহ করিয়া গৌড়ে প্রেরণ করা। শ্রীকান্ত বসু সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃকই উক্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর কারাবাসকালে উড়িষ্যার করদাতৃগণ শ্রীকান্ত বসুর কোন অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর দিতে অসম্মত হইলে, ঐ সকল করদাতার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পুরন্দর বসু ভ্রাতার দোষ গোপন পূর্ব্বক করদাতৃগণকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন। গৌড়েশ্বর পুরন্দর বসুর মন্ত্রণানুসারে যুদ্ধযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াও সনাতন গোস্বামীর মতামত বুঝিবার নিমিত্ত স্বয়ং কারাগৃহে যাইয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্তই বিদিত করিলেন। সনাতন গোস্বামী শুনিয়াই বলিলেন, "আমার যতদূর বিশ্বাস, শ্রীকান্ত বসুর দোষেই উড়িষ্যার করদাতারা কর দেন নাই। গৌড়েশ্বরের অন্য কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইলেই কর আদায় হইবে, করাদায়ের নিমিত্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। শ্রীকান্ত বসুকে কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর কোন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেই যখন করাদায়ের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন তজ্জন্য বহুব্যয়সাধ্য ও লোকক্ষয়কর যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন দেখা যায় না।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে তুমিই ইহার যেরূপ সুবন্দোবস্ত উচিত তাহা কর।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন,

"নরনাথ, আমার আশা পরিত্যাগ করুন।" গৌড়েশ্বর বলিলেন, "আমি কখনই তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি কল্য কারামুক্ত হইয়া উড়িষ্যার করাদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবে।" এই কথা বলিয়া গৌড়েশ্বর চলিয়া গেলেন। তিনি যাইয়া পুরন্দর বসুকে সনাতন গোস্বামীর মন্ত্রণাও যতদূর বলা উচিত বোধ করিলেন ততদূরই বলিলেন। পুরন্দর বসু কিন্তু ঐ মন্ত্রণা স্বার্থের পক্ষে হানিজনক বুঝিয়া, কৌশলে সনাতন গোস্বামীর পরামর্শ যে কুপরামর্শ এবং রাজ্যের বিশেষ অমঙ্গলকর, ইহাই গৌড়েশ্বরকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। দুঃসময় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে। পুরন্দর বসুর মন্ত্রণাই গৌড়েশ্বরের মনোনীত হইল। রাজার অবাধ্য ও রাজকর্ম্মে সম্পূর্ণ অমনোযোগী সনাতনের মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিলে, উড়িষ্যার রাজ্য হস্তচ্যুত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহাই গৌড়েশ্বরের ধারণা হইল। উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রাই অবধারিত হইল। গৌড়েশ্বর পুরন্দর বসুকে লইয়া উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

গৌড়েশ্বর যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করিলেন। সনাতনগোস্বামী কারাগারেই বাস করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামীর ঈশান নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। ঈশান রূপগোস্বামীর লিখিত একখানি পত্র লইয়া কারাগারে সনাতনগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পত্রে লিখিত ছিল, প্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, আমরা দুই ভাই তাঁহার চরণদর্শনার্থ চলিলাম, গৌড়ে অমুক বণিকের নিকট দশসহস্র মুদ্রা রক্ষিত আছে, আপনি তদ্দ্বারা কোনরূপে মুক্ত হইয়া সত্বর আগমন করুন। পত্র পাইয়া সনাতনগোস্বামী কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেখ হবু অনেক বিষয়ে সনাতন গোস্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়াও প্রথমতঃ রাজভয়ে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে অসম্মত হইল। তখন সনাতন গোস্বামী তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন,— "মিঞা সাহেব, আপনি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক। শাস্ত্রে লিখিত আছে, নিজ ধন দিয়া একজন বন্দীর মোচন করিলে, পরমেশ্বর তাঁহার সংসার-বন্ধন মোচন করিয়া থাকেন। আমি আপনার যে কিছু উপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিদানস্বরূপ আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিন। আমি আপনাকে পাঁচসহস্র মুদ্রা দিতেছি। ইহাতে আপনার পুণ্য ও অর্থ দুই লাভ হইতেছে। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল

করিবেন।” অর্থের লোভে সেখ হবুর চিত্ত কিছু কোমল হইল। সে বলিল, “মহাশয়, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু রাজাকে বড় ভয় হয়।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—“রাজা উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, না আসিতেও পারেন; যদি প্রত্যাগমন করেন, বলিবেন, সনাতন গঙ্গার তীরে বহির্দ্দেশে যাইয়া শৃঙ্খলের সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধানেও তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আপনার কোন ভয় নাই, আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব।” এই কথার পরও সেখ হবুর মন সুপ্রসন্ন হইল না বুঝিয়া সনাতনগোস্বামী সাতহাজার মুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। সেখ হবু সাতহাজার মুদ্রার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, মুদ্রাগুলি লইয়া রাত্রিকালে অতিসংগোপনে সনাতন গোস্বামীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিল।

শ্রীরূপগোস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন।

শ্রীরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর কারাবাস বিদিত ছিলেন, কারামুক্তির বিষয় বিদিত হইতে পারেন নাই। তিনি কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অবিশ্রান্ত চলিয়া প্রয়াগে উপনীত হইলেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াই দেখিলেন, প্রভু ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া মাধবদর্শনে গমন করিতেছেন। শত শত লোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেছে। প্রভু শ্রীমাধবকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়াই প্রভুর প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুর কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিল। প্রয়াগক্ষেত্র প্রভুর প্রেমোচ্ছ্বাসে কাঁপিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াও প্রয়াগকে ডুবাইতে পারেন নাই, প্রভু প্রেমের বন্যায় উহাকে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। রূপগোস্বামী লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রভুর শ্রীচরণদর্শনে সমর্থ হইলেন না, নর্ত্তনকীর্ত্তনের বিরাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কীর্ত্তনকোলাহল মন্দীভূত হইল। এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। প্রভু ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। রূপগোস্বামী ঐ ব্রাহ্মণের বাসস্থান জানিয়া লইয়া স্নানানন্তর কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত অতি দীনহীন, মলিনবসনে [illegible] দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক

প্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতেই প্রভুর অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল। প্রভু বলিলেন, "রূপ, উঠ উঠ, শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা কিছুই বলা যায় না, তোমাদিগের দুইজনকে বিষম বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু ভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তকে চরণ দিলেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে বসাইয়া সনাতনগোস্বামীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপগোস্বামী বলিলেন, "তিনি কারাগারে বন্দী, আপনি উদ্ধার করিলেই তাঁহার উদ্ধার হইতে পারে।" প্রভু বলিলেন, "সনাতনের বন্ধন মোচন হইয়াছে, সত্বরই তাঁহার আমার সহিত মিলন হইবে।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ আসিয়া রূপ ও বল্লভকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ প্রভুর ভোজনাবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রভুর বাসস্থান ত্রিবেণীসঙ্গমের উপরিভাগেই। রূপ গোস্বামী যাইয়া প্রভুর বাসার নিকট বাসা করিলেন। প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথাতেই তাঁহাদিগের পরমানন্দে কালযাপন হইতে লাগিল।

প্রয়াগের অদূরে যমুনার পরপারে আম্বুলী নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বল্লভ ভট্ট নামক এক বৈষ্ণব পণ্ডিত বাস করিতেন। একদিন ঐ বল্লভ ভট্ট আসিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। প্রভুর ভট্টের সহিত কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথার আলোচনা হইল। কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করিতে করিতে প্রভুর প্রেম উথলিয়া উঠিল। ভট্ট থাকায় প্রভু কিন্তু কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। অন্তরের প্রেম অন্তরেই রহিল, বাহিরে প্রকাশ হইল না। প্রকাশ না হইলেও বল্লভ ভট্ট প্রভুর অদ্ভুত প্রেমাবেশ বুঝিয়া তাঁহাকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু রূপ ও বল্লভকে লইয়া ভট্টের সহিত মিলন করাইলেন। রূপ ও বল্লভ দূর হইতেই ভট্টকে প্রণাম করিলেন। ভট্টের ইচ্ছা, দুই ভাইকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাঁহারা "আমরা অস্পৃশ্য পামর" বলিতে বলিতে আরও দূরে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ও প্রভুর আনন্দ হইল। প্রভু ভট্টকে বলিলেন, "আপনি একজন প্রবীণ কুলীন এবং বেদজ্ঞ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিবেন না, ইহাঁরা হীন জাতি।" বল্লভ ভট্ট প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিলেন, "ইহাঁদিগের দুইজনের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিতেছি, ইহাঁরা কখনই অধম হইতে পারেন না, পরন্তু সর্ব্বোত্তম।" প্রভু শুনিয়া ভট্টকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং শাস্ত্রবচন

পাঠ সহকারে কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বল্লভ ভট্ট প্রভুর অদ্ভুত রূপমাধুর্য্য ও অলৌকিক ভাবাবেশ সকল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে তিনি প্রভুর সঙ্গিদ্বয় এবং রূপ ও বল্লভের সহিত প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক কালিন্দীর কৃষ্ণসলিল সন্দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার সহকারে জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুর সঙ্গিদ্বয় শশব্যস্ত হইয়া প্রভুকে ধরিয়া আবার নৌকায় উঠাইলেন। প্রভু নৌকায় উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার পদভরে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। দুই এক ঝলক জলও নৌকায় উঠিল। নাবিকেরা কোনমতে নৌকা লইয়া পরপারে লাগাইল। প্রভু দেশকাল বুঝিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিলেন। বল্লভ ভট্ট প্রভুকে বাটীতে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষালন করাইলেন। পরে ঐ পাদোদক সবংশে গ্রহণ করিয়া প্রভুকে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরাইয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে, বল্লভ ভট্ট প্রভুকে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। রূপ ও বল্লভ প্রভুর অবশেষ পাইলেন। প্রভু ভোজনান্তে আচমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বল্লভ ভট্ট স্বয়ং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামক একজন ত্রিহুতীয় পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া প্রভুর চরণবন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া পণ্ডিত সন্তোষ লাভ করিলেন। পরে উপাধ্যায় উপবেশন করিলে, প্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। উপাধ্যায় নিজকৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ শ্রুতি কেহ স্মৃতি এবং কেহ ভারতের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যিনি যাহা করেন করুন, আমি কিন্তু যাঁহার অঙ্গনে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, সেই গোপরাজ নন্দকেই বন্দনা করি।

প্রভু বলিলেন, "আরও কিছু পাঠ করুন।" উপাধ্যায় পাঠ করিলেন,—

"কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥"

আমি এ কথা কাহার নিকট বলিব এবং বলিলেই বা সম্প্রতি কে বিশ্বাস করিবে যে, যমুনাতীরকুঞ্জে যিনি গোপীগণের সহিত রমণ করেন, তিনিই পরব্রহ্ম ?

উপাধ্যায়ের শ্লোক শুনিয়া প্রভু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উপাধ্যায় প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিজ প্রভু বলিয়াই অবধারণ করিলেন।

অনন্তর,—

"প্রভু কহে, উপাধ্যায়, "শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"শ্যামমেব পরং রূপং" কহে উপাধ্যায়॥
"শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"পুরী মধুপুরী বরা" কহে উপাধ্যায়॥
"বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
"রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"আদ্য এব পরো রসঃ" কহে উপাধ্যায়॥"

প্রভু আনন্দ সহকারে বলিলেন, "উপাধ্যায় আমাকে ভাল তত্ত্ব শিখাইলেন।" এই বলিয়া প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। উপাধ্যায় প্রভুর স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বল্লভ ভট্ট দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজের পুত্র দুইটিকে আনিয়া প্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। প্রভুও তাঁহা-দিগকে কৃতার্থ করিলেন। ক্রমে লোকের সংঘট্ট হইতে লাগিল। অনেকেই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বল্লভ ভট্ট ভাবিলেন, প্রভু আসিবার সময় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, আবার কখন কি করিবেন, অতএব আমি ইহাঁকে যে স্থান হইতে আনিয়াছি, সেই স্থানেই রাখিয়া আসিব। অতঃপর যাঁহার ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি প্রয়াগে যাইয়া লইয়া আসিবেন। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি নিমন্ত্রণকারীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে রাখিয়া আসিলেন। প্রভু ত্রিবেণীতে প্রভূত লোকসমাগম হইতেছে দেখিয়া দশাশ্ব-মেধের ঘাটে যাইয়া বাসা করিলেন। তিনি ঐ দশাশ্বমেধের ঘাটে থাকিয়াই রূপগোস্বামীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান ও শক্তিসঞ্চার করিলেন।

শ্রীরূপশিক্ষা।

প্রভু বলিলেন,—"রূপ, তোমাকে সঙ্ক্ষেপে ভক্তিরসের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভক্তিরসসিন্ধু অপার ও গভীর। তোমাকে উহার একবিন্দু বলিতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য জীবের নিবাসভূমি। প্রত্যেক জীবই চতুরশীতিলক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শতশত ভাগের একভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। ঈশ্বর বিভুচিৎ; জীব অণুচিৎ। জীব অণু না হইয়া বিভু হইলে, নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ-ভাব থাকে না। ঈশ্বর কারণ, জীব কার্য্য। কারণ যেরূপ কার্য্যের নিয়ন্তা হয়, ঈশ্বরও তদ্রূপ জীবের নিয়ন্তা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। জীবকে কার্য্য বলা হইলেও, জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি নাই, জীব অনাদি ঈশ্বরশক্তি। বায়ুর সহযোগে জল হইতে বুদ্বুদের ন্যায়, পুরুষের সহযোগে প্রকৃতি হইতে জীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনশ্চ প্রলয়ে সমুদ্রে নদী সকলের ন্যায় বা মধুর রসে অপর সকল রসের ন্যায় পুরুষেই লীন হইয়া থাকে। নাম ও রূপের সহিত উপাধির উৎপত্তিতেই জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির লয়েই জীবের লয় জানিতে হইবে। উপাধিতে অভিমান ও অভিনিবেশ বশতই উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির নাশেই জীবের নাশ স্বীকৃত হয়। এইরূপে উৎপন্ন জীব সকল স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গম আবার খেচর জলচর ও ভূচর ভেদে ত্রিবিধ। ভূচরের মধ্যে মনুষ্যের ভাগ অতিশয় অল্প। ঐ অল্প মনুষ্যের মধ্যে বৌদ্ধ ও ম্লেচ্ছাদিই অনেক, বেদনিষ্ঠের ভাগ অল্প। বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার মৌখিক বেদনিষ্ঠই অধিক। প্রকৃত বেদনিষ্ঠের মধ্যে আবার কর্ম্মনিষ্ঠের ভাগই অধিক, জ্ঞাননিষ্ঠের ভাগ অল্পই। কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পাওয়া যায়। কোটি মুক্তের মধ্যে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী লোক সকল অশান্ত। কৃষ্ণভক্তের সংসারভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র ত্রাতা জানিয়া তাঁহাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপালক, অভক্তকে রক্ষা করেন না, এই নিমিত্তই অভক্তের সংসারভয় উৎপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ভক্তের কোন ভয়ই উৎপন্ন হয় না।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভাগ্যবান্ জীবের শ্রীগুরু লাভ হয়, তিনিই তৎপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ বীজ রোপণ পূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিলে, উহা অঙ্কুরিত ও দিনে দিনে বর্দ্ধিত;

হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সত্যলোক ও বিরজা পার হইয়া পরব্যোম পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। পরব্যোমের পর গোলোক—বৃন্দাবন। ঐ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-রূপ কল্পবৃক্ষ অবস্থিত। ভক্তিরূপা লতা যাইয়া উক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। তদনন্তর শাখাপল্লবাদি বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে থাকে। মালী এই সংসারে থাকিয়াই লতার মূলে যতই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বাড়িতে থাকে। মালীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, যত্নসহকারে লতাকে আবরণ করিয়া রাখা। অন্যথা বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উত্থিত হইয়া লতার মূলোচ্ছেদ করিলে লতার শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবেরা সংসারকে চিদানন্দময় বোধ না করিলেও, কল্পনাময় বোধ করেন না; অতএব তিনি সংসারে বস্তুতঃ আসক্ত না হইলেও, কার্য্যতঃ আসক্তের ন্যায় থাকায়, তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টি হইলেই বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। এই অপরাধ যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই উচিত। আবার বৈষ্ণবাপরাধের ন্যায় ভোগবাঞ্ছাদি উপশাখার প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সংসারকে সত্য মনে করিয়া ভোগবাঞ্ছা বা মিথ্যা মনে করিয়া মোক্ষবাঞ্ছা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখা সকল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিলে, মূলশাখার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা উৎপন্ন হইতে না দেওয়াই উচিত। যদি অনবধানতা বশতঃ কখন কোন উপশাখা জন্মে, তবে তখনই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। উপশাখা ছেদন করিয়া দিলে, মূলশাখা বৰ্দ্ধিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে। ভক্তিলতা কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিলে, মালী তদব-লম্বনে অনায়াসেই কল্পতরুতে আরোহণ পূর্ব্বক সুপক্ক প্রেমফল পাড়িয়া আস্বা-দন করিতে পারেন। একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, ঐ কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ সেবন ভিন্ন মালীর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বারা প্রেমফলের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্মাদি অপর পুরুষার্থ সকল প্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ।

"ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
ব্র্হ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥"

যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধিরূপ শাস্ত্রাদি যে কোন প্রেমের

লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই সিদ্ধিসমূহের সম্পূর্ণা বিজয়িতা এবং সত্যধর্ম্মরূপ-সাধন-সমন্বিতা সমাধি ও তৎফলভূত গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চিত্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

ঐ প্রেম শুদ্ধা ভক্তি হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণ, স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের আকর্ষণ-কারী, পরমপ্রেমাস্পদ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি আনুকূল্য-ময় অনুশীলনই ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপের পরিচায়ক যে লক্ষণ, অর্থাৎ যে লক্ষণ স্বরূপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাই স্বরূপলক্ষণ বা মুখ্যবিশেষণ। অনুশীলন শব্দটি শীল ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্রিয়া শব্দ দ্বারা যেমন কৃ ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হয়, অনুশীলন শব্দ দ্বারা তদ্রূপ শীল ধাতুর অর্থমাত্রই উক্ত হইয়া থাকে। শীল ধাতুর অর্থ শীলন। ঐ শীলন দ্বিবিধ; প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর মানস ও বাচিক চেষ্টা এবং প্রীতিবিষাদাত্মক প্রসিদ্ধ মানস ভাব। ভাব—বৃত্তি। মানস ভাব—মনোবৃত্তি। প্রসিদ্ধ মানস ভাব—স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব সকল। প্রীতিবিষাদাত্মক—রাগ-দ্বেষাত্মক। বাচিক চেষ্টা—কীর্ত্তন। মানস চেষ্টা—স্মরণ। শারীর চেষ্টা—শ্রবণাদি। নিবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা—ত্যাগচেষ্টা। প্রবৃত্ত্যাত্মক চেষ্টা—গ্রহণচেষ্টা। আনুকূল্যময়—রুচিকর। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা তৎসম্বন্ধি বলিয়া পরম্পরায় তন্নিমিত্ত যে কিছু শারীরাদি চেষ্টা ও ভাব, তাহা যদি তাঁহার অরুচিকর না হইয়া রুচিকর হয়, তাহা হইলে, তাহা ভক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। অরুচিকর চেষ্টার বা ভাবের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ঐ ভক্তি সোপাধিকী ও নিরুপাধিকী ভেদে দ্বিবিধা। ভক্তির উপাধি দুইটি; একটি অন্য অভিলাষ, অপরটি অন্যমিশ্রণ। উপাধিবিশিষ্টা ভক্তির নাম সোপাধিকী বা গৌণী ভক্তি এবং উপাধিশূন্যা ভক্তির নাম নিরুপাধিকী বা মুখ্যা ভক্তি। মূলোক্ত উত্তমা শব্দের অর্থ মুখ্যা। অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি অন্যাভিলাষ-শূন্য ও অন্যমিশ্রণশূন্য হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এইটি ভক্তির তটস্থলক্ষণ বা গৌণবিশেষণ। অন্যাভিলাষ—ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা প্রভৃতি। অন্যমিশ্রণ—জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ। জ্ঞানকর্ম্মাদি—জীবব্রহ্মের ঐক্য-

জ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, সাংখ্য ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি। অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুশীলন যদি ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-রহিত হইয়া কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় হয়, তবে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। এই উত্তমা ভক্তি নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ও স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানাদির মিশ্রণ ও ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষের সম্পর্ক না থাকাতেই ভক্তির উত্তমত্ব বা শুদ্ধত্ব। ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সকামা ভক্তি। মোক্ষবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কামা ভক্তি। সকামা ভক্তি হয় তামস না হয় রাজস হয় বলিয়া উহাকে সগুণ ভক্তিও বলা হইয়া থাকে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তি সকল উহার অধিকারী, এবং স্বর্গাদিভোগ উহার ফল। ঐ সকামা ভক্তিই সাত্ত্বিকী হইলে, মোক্ষবাসনাযুক্ত হইয়া থাকে। তখন আর উহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি সকলই উহার অধিকারী। এই মোক্ষবাসনাযুক্ত নিষ্কামা ভক্তি প্রায়ই জ্ঞান যোগ বা কর্ম্ম দ্বারা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে কর্ম্মমিশ্রা, যোগ দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে যোগমিশ্রা, এবং জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইলে, ইহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির ফল পরমাত্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অনন্তর সদ্যোমুক্তি। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত নিষ্কাম কর্ম্ম সকল সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হয় বলিয়াই উহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে। তদ্রূপ যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত জীবব্রহ্মৈক্য-জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির সঙ্গ বশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে আকারিত হয় বলিয়া উহাদিগকে সঙ্গ-সিদ্ধা বলা হইয়া থাকে। উত্তমা ভক্তি গুণসম্বন্ধরাহিত্য হেতু নির্গুণ এবং উক্ত অপরাপর ভক্তি সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ইহাঁর অধীন, ইহাঁর মুখাপেক্ষী; ইনি কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা মুখাপেক্ষী নহেন, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইনি স্বাধীনভাবেই কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানের ফল সদ্যোমুক্তির সহিত নিজের ফল শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও এই উত্তমা ভক্তির শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ কর্ম্ম বলিয়া ভজনীয়ত্বানুসন্ধানাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ

জ্ঞান বলিয়া এবং ন্যাসমুদ্রাদি অঙ্গ সকলকে আপাততঃ যোগ বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু উহারা কর্ম্মাদি নহে। ঐগুলি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ-শক্তির পরমা বৃত্তি। নিত্যসিদ্ধ যে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি সকল তাঁহারাই ঐ সকল বৃত্তির মূলাশ্রয়। সাধকের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্ররূপেই নির্ম্মিত। সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি ঐরূপে নির্ম্মিত না হইলে অসিদ্ধ অতএব সিদ্ধগণের সহিত একত্র সম্মিলনের অযোগ্য সাধক সকলের সিদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাই থাকিত না। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির বৃত্তি সকল অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণার্থ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়া তত্তদাকারে আকারিত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আনন্দময়ী বৃত্তির অবতারেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধকের সম্বন্ধে আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশ দর্শনেই লোকে উহা-দিগকে জ্ঞানকর্ম্মাদিরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ম্মজ্ঞানাদির অতীত আনন্দময় বস্তু। এই নিমিত্তই ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥"

গুণত্রয়োপাধিক ও শ্রুতিপুরাণাদিগম্যচরিত দেবগণের মধ্যে সত্ত্বে অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুতে একমনা পুরুষের যে ফলাভিসন্ধিরহিতা স্বাভাবিকী বৃত্তি অর্থাৎ তদানুকূল্যাত্মক জ্ঞানবিশেষ, তাহাই ভক্তি। ঐ ভক্তি সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও গরীয়সী। জাঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে, ঐ ভক্তিও তদ্রূপ সত্বর জীবকোশকে জীর্ণ করিয়া থাকে।

ভক্তিলক্ষণোক্ত অনুশীলন শব্দের ভাবরূপ অর্থের ক্রোড়ীকরণে ভক্তির জ্ঞান-বিশেষত্বই সিদ্ধ হইতেছে। ভক্তিকে একবার জ্ঞানাবরণশূন্য বলিয়া আবার জ্ঞান-বিশেষ বলা অযুক্ত হয় নাই। ভাবরূপ বৃত্তি জ্ঞানই। জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি, ভাবও তাহাই। জ্ঞান দ্বিবিধ; বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। অন্তঃকরণ জ্ঞেয় বস্তুর আকারে আকারিত হইলেই, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়, এবং তদনন্তর জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশে যে বিচারজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ফলজ্ঞান বলা যায়। স্বপ্রকাশ বিষয়ী আত্মার জ্ঞানই বৃত্তিজ্ঞান এবং আত্মপ্রকাশ্য ঘটপটাদি বিষয়

সকলের বিচারজনিত জ্ঞানই ফলজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান বিচারনিরপেক্ষ অতএব স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বাভাবিক এবং ফলজ্ঞান বিচারনিষ্পন্ন অতএব পরপ্রকাশ্য বলিয়া কৃত্রিম। নির্ম্মল নির্বিষয় অন্তঃকরণ আত্মাকারে আকারিত হইলেই, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা বৃত্তিজ্ঞান বলা যায়। আত্মার ফলজ্ঞান হয় না। অন্তঃকরণ ঘটপটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হইলে, বুদ্ধিস্থ চিদাভাস কর্ত্তৃক বিচার পূর্ব্বক ঘটপটাদিবিষয়ক অজ্ঞানের অপসারণ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তাহাকেই ফলজ্ঞান বলা যায়। ভাবরূপা অন্তঃকরণের স্বাভাবিকী বৃত্তি আবার পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রকাশ আত্মজ্ঞান হইতেও বিশেষ। আত্মজ্ঞান অন্তঃকরণের চিৎসত্তারূপা বৃত্তি; ভাব উহার চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি। উহা আনুকূল্যাত্মিকা সুখরূপা—আনন্দরূপা বৃত্তি বলিয়াই উহাকে চিৎসত্তাসাররূপা বৃত্তি বলা হয়।

শ্রীভগবানের গুণাদি শ্রবণমাত্র তাঁহাতে যে অবিচ্ছিন্ন মনের প্রবাহরূপা গতি হয়, উহাই ভক্তি, উহাই ভাব। উহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক অর্থাৎ হ্লাদিনী-সমবেত-সম্বিৎসার; উহা প্রেমরূপ অংশুমালীর অংশু; উহা প্রেমের অঙ্কুর; উহা আনুকূল্য অর্থাৎ রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক। উহার অপর নাম রতি।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন শ্রবণাদি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বারা ব্যক্তীকৃত হয়, অর্থাৎ আস্বাদযোগ্যতা প্রাপিত হয়, তখন ঐ ভাবকে বা রতিকে ভক্তিরস বলা যায়। ভক্তিরস সাকল্যে বারটি। তন্মধ্যে সাতটি গৌণ ও পাঁচটি মুখ্য। বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস, এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস। আর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস।

প্রত্যেক রসেরই এক একটি করিয়া স্থায়ী ভাব আছে। উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, হাস, ভয়, ক্রোধ ও জুগুপ্সা, এই সাতটি বীরাদি সাতটি গৌণরসের স্থায়ী ভাব, এবং শান্তি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, এই পাঁচটি শান্তাদি পাঁচটি মুখ্য রসের স্থায়ী ভাব। ঐ সকল স্থায়ী ভাবই শ্রবণাদি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্তীকৃত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা ও যাহাতে স্থায়ী ভাবাদির আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম বিভাব। বিভাব দ্বিবিধ ;—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দুইপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন এবং তদীয় ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রতি উৎসারিত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলা হয়,

এবং ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে রতির আশ্রয়ালম্বন বলা হয়। যদ্দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপনবিভাব। আলম্বনবিভাবের চেষ্টা, রূপ ও ভূষণাদি এবং দেশকালাদি ভাবের উদ্দীপন করে বলিয়াই ঐ সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলা যায়। যাহা অন্তরস্থ ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহার নাম অনুভাব। অনুভাব মিশ্র ও সাত্বিক ভেদে দ্বিবিধ। সত্ত্বমাত্রোদ্ভব অর্থাৎ কেবল মানসিক অনুভাবের নাম সাত্বিক অনুভাব এবং কায়বাঙ্মানসিক মিশ্রিত অনুভাবের নাম মিশ্র অনুভাব। নৃত্য, গীত ও হাস্য মিশ্র অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্চ্ছা, এই আটটির নাম সাত্বিক অনুভাব। আর যে সকল ভাব স্থায়ী ভাবে কখন উন্মগ্ন ও কখন নিমগ্ন হইয়া ঐ ভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই সঞ্চারী ভাব বা ব্যভিচারী ভাব বলা যায়। ব্যভিচারী ভাব নির্ব্বেদাদি ভেদে তেত্রিশটি।

স্থায়িভাবাখ্যা রতি আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধা। গোকুলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা রতি এবং পুরীদ্বয়ে ও বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-যুক্তা মিশ্রা রতি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা মিশ্রা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিতে না পারায় প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা রতিতে প্রেমের বৃত্তি সকল পরাকাষ্ঠা লাভ করে বলিয়া ঐ প্রেমের সঙ্কোচ বা বিকাশ দৃষ্ট হয় না। উহা সদা একরূপেই অবস্থান করে। কেবলার রীতি এই যে, তিনি ঐশ্বর্য্য দেখিলেও মানেন না। মিশ্রা রতিতে শান্ত ও দাস্য রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কোন কোন স্থলে প্রেমের উদ্দীপন হয় এবং বাৎসল্যে সখ্যে ও মধুর রসে কোন কোন স্থলে প্রেমের সঙ্কোচন হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকী ও বসুদেবের চরণবন্দন করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া মনে ভয় পাইলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভীত হইয়া নিজের ধৃষ্টতার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে ত্যাগ-ভয়ে ভীত হইলেন। গোকুলে কিন্তু এইপ্রকার প্রেমের সঙ্কোচবিকাশাদি দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাহা মনে স্থান দেন না। মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাঁহাকে আত্মজবোধে বন্ধন করিতেন। গোপবালক সকল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিতব অর্থাৎ শঠ বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধারোহণেও ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শান্তভক্তিরসের গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। এই রসের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি নরাকার পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ নারায়ণ, পরমাত্মা ও শান্ত দান্ত শুচি বশী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতারহিত, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, ভক্তিমার্গপ্রদর্শক সনকাদি আধিকারিক ভক্ত সকল আশ্রয়ালম্বন। জ্ঞানিগণও মোক্ষবাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তের কৃপায় যদি ভক্তিবাসনাযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহারাও আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন। পর্ব্বতকাননাদিবাসী সাধুজনের সঙ্গ ও সিদ্ধক্ষেত্রাদি উদ্দীপন-বিভাব। নাসাগ্রদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, নির্ম্মমতা, ভগবদ্দ্বেষিজনে বিদ্বেষ-রাহিত্য, ভগবদ্ভক্তজনেও ভক্ত্যাতিশয্যের অভাব, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি অনুভাব। প্রলয়বর্জ্জিত অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ মতি ও ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

দাস্যভক্তিরসের গুণ সেবা। এই রসের ঈশ্বর প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ও ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, গৌরবভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, দাস্যসেবাপরায়ণ, অধিকৃতভক্ত আশ্রিত-ভক্ত পারিষদ ও অনুগামী এই চারিপ্রকার ভক্ত আশ্রয়ালম্বন। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-শঙ্করাদি আধিকারিক দেবতারা অধিকৃতভক্ত। আশ্রিতভক্ত শরণ্য জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে কালিয়নাগ, মগধরাজ-জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া পরে মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা দাস্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই জ্ঞানিচর। সনকাদি মুনিগণ এই বিভা-গের অন্তর্গত। আর যাঁহারা প্রথম হইতেই সেবানিষ্ঠ হয়েন, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলা যায়। চন্দ্রধ্বজ হরিহয় ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়েন। উদ্ধব দারুক ও শ্রুতদেবাদি ক্ষত্রিয়গণ এবং উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ পারিষদ। পুরে সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি এবং ব্রজে রক্তক পত্রক ও মধুকণ্ঠাদি অনুগামী। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সপরিবার শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম ধূর্য্যভক্ত; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গে অধিক আদরযুক্ত, তাঁহাদিগের নাম ধীরভক্ত; আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গর্ব্বিত থাকিয়া কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহারাই বীরভক্ত। এই সকল সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্ত ভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে গুরুত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট প্রদ্যুম্ন ও শাম্বাদি শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। উক্ত ভক্ত সকল আবার নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ ও সাধকভেদে ত্রিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ চরণধূলি ও মহাপ্রসাদ প্রভৃতি উদ্দীপনবিভাব। আজ্ঞা-পালনাদি অনুভাব। এই রসের তিনটি অবস্থা;—প্রেম, স্নেহ ও রাগ।

তন্মধ্যে অধিকৃত ভক্তে ও আশ্রিত ভক্তে প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী; পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী; পরীক্ষিৎ দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; ব্রজানুগ রক্ত-কাদিতে এবং পুরে প্রদ্যুম্নাদিতে সকলগুলিই দৃষ্ট হয়। এই রসে অযোগ যোগ ও বিয়োগ এই তিনটি অবস্থা হয়। প্রথম দর্শনের পূর্ব্বের অবস্থার নাম অযোগাবস্থা। দর্শনের পর যে বিচ্ছেদ, তাহার নাম বিয়োগাবস্থা। আর মধ্যাবস্থার সঙ্গের নাম যোগাবস্থা। বিয়োগে অঙ্গে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা বা অনবস্থা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা এই দশ দশা। অযোগে ঔৎসুক্যাদি এবং যোগে সিদ্ধি ও তুষ্টি প্রভৃতি দশা।

সখ্যভক্তিরসের গুণ সম্ভ্রমরাহিত্য। এই রসে বিদগ্ধ বুদ্ধিমান্ সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, বিশ্বাসভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, সখ্যসেবাপরায়ণ, তদীয় সখা সকল আশ্রয়ালম্বন। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা ভেদে ঐ আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্য-যুক্ত, তাঁহারাই সুহৃৎ। ব্রজে বলভদ্র সুভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র প্রভৃতি সুহৃৎ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র তাঁহারাই সখা। ব্রজে বিশাল বৃষভ ও দেবপ্রস্থ প্রভৃতি সখা। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাঁহারাই প্রিয়সখা। ব্রজে শ্রীদাম সুদাম ও বসুদাম প্রভৃতি প্রিয়সখা। আর যাঁহারা প্রেয়সীরহস্যের সহায় ও শৃঙ্গারভাবশালী, তাঁহারাই প্রিয়নর্ম্মসখা। সখ্যে বাহুযুদ্ধ ক্রীড়া ও একশয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুভাব। অশ্রুপুলকাদি সমস্তই সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষগর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব। সখ্য রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ও রাগ এই চারিটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জ্জুন ভীমসেন ও শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি সখা। এই সখ্যরসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা।

বাৎসল্যভক্তিরসের গুণ স্নেহ। এই রসে কোমলাঙ্গ বিনয়ী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, অনুগ্রাহ্যভাববন্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের অনুগ্রহপাত্র এইপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, বাৎসল্যসেবাপরায়ণ পিত্রাদি গুরুজন সকল আশ্রয়ালম্বন। ঐ আশ্রয়ালম্বন ব্রজে ব্রজেশ্বরী ব্রজরাজ রোহিণী উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং পুরে দেবকী কুন্তী ও বসুদেবাদি। হাস্য মৃদুমধুর বাক্য ও বাল্যচেষ্টাদি উদ্দীপন-

বিভাব। মস্তকাঘ্রাণ আশীর্ব্বাদ ও লালনপালনাদি অনুভাব। স্তম্ভস্বেদাদি সমস্ত ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই নয়টি সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। এই রতির প্রেম স্নেহ ও রাগ এই তিনটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটি দশা হয়।

মধুর ভক্তিরসের গুণ অঙ্গসঙ্গসুখদান। 'এই রসে রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্যের আধারভূত নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মমতাযুক্ত, সম্ভোগভাবময়, শ্রীভগবন্নিষ্ঠ, নিজ আচরণ দ্বারা অন্যের উপকারক, কান্তসেবাপরায়ণ প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব বসন্ত কোকিলধ্বনি নবমেঘ ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি দর্শনাদি উদ্দীপনবিভাব। কটাক্ষ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত। আলস্য ও উগ্রতা বর্জ্জিত নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী ভাব। ইহাতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই সকল অবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়।

মধুর রসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্তাদি ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক-গুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধিকাতে তিনশত ষাইট প্রকার নায়িকাগুণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে নায়িকা তিন প্রকার। শ্রীরাধাদি গোপীগণই সমর্থা নায়িকা।

মধুর রস রসের পরাকাষ্ঠা। এই রসে সকল রসের সমাহার হওয়ায় সকল রসেরই গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন ও কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন এই পঞ্চ-গুণই দৃষ্ট হয়। যেমন আকাশের গুণ বায়ুতে, বায়ুর গুণ তেজে, আকাশ বায়ু ও তেজের গুণ জলে এবং আকাশ বায়ু তেজ ও জলের গুণ পৃথিবীতে দেখা যায়, তেমনি শান্তের গুণ দাস্যে, শান্ত ও দাস্যের গুণ সখ্যে, শান্ত দাস্য ও সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুর রসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুর রস স্বাদাধিক্যে সকল রস হইতে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে। এই মধুর রসের স্বকীয় ও পরকীয় ভেদে দ্বিবিধ সংস্থান। এই ভক্তিরসের সূত্রমাত্র প্রদর্শিত হইল। অতঃপর তুমি স্বয়ং এই বিষয় চিন্তা কর। চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র রসতত্ত্ব তোমার অন্তরে স্ফুরিত হইবে। রসসাগর অনন্ত ও অগাধ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞ জীব ঐ রসসিন্ধুর পার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

প্রভুর বারাণসীধামে প্রত্যাগমন।

রূপগোস্বামীকে শিক্ষাদান ও শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বারাণসী যাত্রা করিলেন। রূপগোস্বামী প্রভুর বিরহভাবনায় কাতর হইয়া তাঁহার অনুগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনের এত নিকটে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন না করা ভাল হয় না, অতএব তোমরা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনেই যাও। আমি বারাণসী হইয়া নীলাচলে যাইব। তুমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের পর নীলাচলে যাইও। নীলাচলেই আমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন। রূপগোস্বামীও কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

প্রভু প্রয়াগ হইতে নৌকাযোগে বারাণসীধামে উপনীত হইলেন। চন্দ্রশেখর পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্নযোগে প্রভু আসিয়াছেন দেখিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে প্রভু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। অনন্তর প্রভুকে লইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। তপনমিশ্র প্রভুর আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রশেখরের আলয়ে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া প্রভুর চরণগ্রহণ করিলেন। এই দিন চন্দ্রশেখরের গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা হইল। পরদিন তপনমিশ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বাসা কিন্তু চন্দ্রশেখরের গৃহেই নির্দ্দিষ্ট রহিল।

সনাতনগোস্বামীর বারাণসীযাত্রা।

এদিকে সনাতন গোস্বামী কারামুক্ত হইয়া ভৃত্য ঈশানের সহিত প্রভুর চরণদর্শনাভিলাষে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রকাশ্য রাজপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্যপথে ফলমূলাদি দ্বারা কোনরূপে জীবনধারণ করিয়া পাতড়াপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতে একজন ভূঞা উপাধিধারী দস্যু বাস করিত। অসহায় পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই তাহার ব্যবসায়। সনাতন গোস্বামী ঐ ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ভূঞার অধীনে একজন

গণক ছিল। সে গণনা করিয়া কাহার নিকট কি আছে বলিয়া দিতে পারিত। গণক গণনা করিয়া ভূঞাকে জানাইল, এই ভৃত্যটির নিকট আটটি সুবর্ণমুদ্রা আছে। ভূঞা আনন্দিত হইয়া সনাতন গোস্বামীকে বলিল, "আমি রাত্রিতে আমার লোক দিয়া তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। এখন তোমরা স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর।" এই কথা বলিয়া ভূঞা পরম সমাদর সহকারে রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী নদীতে স্নান করিয়া দুই উপবাসের পর রন্ধন ও ভোজন করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী সনাতন ভূঞার অতিরিক্ত আদর দেখিয়া সংশয়িতচিত্তে ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কি কিছু অর্থ আছে?" ঈশান আটটি মোহরের একটি গোপন করিয়া বলিল, "হাঁ, আমার নিকট সাতটি মোহর আছে।" সনাতন গোস্বামী কিছু বিরক্তির সহিত ঈশানকে বলিলেন, "মোহরগুলি আমাকে দাও।" পরে ঈশানের নিকট হইতে সাতটি মোহর লইয়া ভূঞাকে দিয়া মধুরবচনে বলিলেন, "আমার নিকট কয়েকটি মোহর আছে, এইগুলি লইয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে পার করিয়া দাও। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যাইতে পারিব না। আমাকে এই পর্ব্বত পার করিয়া দিলে, তোমার বিশেষ পুণ্য হইবে।" ভূঞা হাসিয়া বলিল, "তোমার ভৃত্যের নিকট আটটি মোহর ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছি। আমি আজ রাত্রে তোমাদের মারিয়া ঐ মোহরগুলি লইতাম। ভাল হইল, আমি হত্যাপাপ হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তুমি অতি সুবোধ, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছি, মোহর লইব না, তোমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "তুমি যদি এই মোহরগুলি না লও, পথে অন্য কেহ আমাদিগকে মারিয়া কাড়িয়া লইবে, অতএব তুমিই গ্রহণ কর, আমরাও নিরাপদে গমন করি।" ভূঞা সন্তুষ্ট হইয়া মোহরগুলি লইয়া চারিজন লোক সঙ্গে দিয়া সনাতন গোস্বামীকে রাতারাতি পর্ব্বত পার করিয়া দিল। সনাতন গোস্বামী বনপথে নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বত পার হইয়া ভূঞার লোকদিগকে বিদায় দিলেন। পরে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট আরও একটি মোহর আছে কি?" ঈশান উত্তর করিল, "আছে, পথখরচের জন্য একটি মোহর সম্বল রাখিয়াছি।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "ভালই করিয়াছ, তুমি এই মোহরটি লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, আর আমার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।" ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। সনাতন গোস্বামীও ছিন্ন কন্থা ও করোয়া লইয়া নির্ভয়ে

গমন করিতে লাগিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া সন্ধ্যার সময় হাজিপুরে আসিয়া একটি উদ্যানের ভিতর রাত্রিযাপনের মানস করিলেন। সনাতন গোস্বামীর গ্রামসম্বন্ধে ভগিনীপতি শ্রীকান্ত সেন গৌড়েশ্বরের আদেশে বার্ষিক দেয় ঘোটকের মূল্যস্বরূপ তিনলক্ষ টাকা লইয়া দিল্লীর পাতসাহকে দিতে যাইতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি এই হাজিপুরের রাজপ্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে উদ্যানমধ্যে সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। দুইজনে নিভৃতে অনেক কথাবার্তা হইল। সনাতন গোস্বামী শ্রীকান্তকে নিজের কারামোচনবৃত্তান্ত সবিশেষ বলিলেন। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। সনাতন গোস্বামী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তখন শ্রীকান্ত তাঁহাকে অন্ততঃ দুই একদিনও হাজিপুরে থাকিতে বলিলেন। সনাতন গোস্বামী তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীর প্রবল বৈরাগ্যের বেগ অপ্রতিরোধ্য বুঝিয়া আর অধিক কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তখন সনাতন গোস্বামী শ্রীকান্তকে বলিলেন, "তুমি আমাকে কোন সুযোগে সত্বর গঙ্গা পার করিয়া দাও, আমি আজই এখান হইতে চলিয়া যাইব।" শ্রীকান্ত অগত্যা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একখানি কম্বল দিয়া তাঁহাকে তখনই নৌকাযোগে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামী কয়েকদিন অবিশ্রান্ত চলিয়া বারাণসীধামে উপনীত হইলেন।

সনাতনগোস্বামীর প্রভুর সহিত মিলন।

সনাতন গোস্বামী বারাণসীতে উপনীত হইয়া শুনিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শুনিয়াই তিনি চন্দ্রশেখরের ভবনে গমন করিলেন। তিনি দ্বারদেশে কাহাকেও না দেখিয়া দ্বারেই বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর দ্বারদেশে আসিয়া সনাতন গোস্বামীকে দেখিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বোধ হইল না, সুতরাং ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে বলিলেন, "কৈ, বৈষ্ণবত দেখিলাম না।" প্রভু বলিলেন, "দ্বারদেশে কেহই নাই?" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "একজন

দরবেশ বসিয়া আছে।” প্রভু বলিলেন, “তাঁহাকেই লইয়া আইস।” চন্দ্রশেখর পুনর্ব্বার যাইয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। সনাতন গোস্বামীকে চন্দ্রশেখরের সহিত আসিতে দেখিবামাত্র প্রভু স্বয়ং উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সনাতন গোস্বামী “প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে স্পর্শ করিও না” বলিতে লাগিলেন। প্রভু শুনিলেন না। দুইজনে গলাগলি করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্রশেখরের চমৎকার বোধ হইল। প্রভু সনাতন গোস্বামীকে লইয়া বারাণ্ডার উপর নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। পরে তাঁহার কারামুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। অনন্তর প্রভু বলিলেন, “প্রয়াগে তোমার দুই ভাইর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন, আমিও বারাণসীতে চলিয়া আসিলাম।” এই কথার পর প্রভু চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রকে সনাতনের পরিচয় দিলেন। তপনমিশ্র শুনিয়া সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “সনাতনকে ক্ষৌর করাইয়া বৈষ্ণবের বেশ করিয়া দাও।” চন্দ্রশেখর প্রভুর আদেশ অনুসারে সনাতন গোস্বামীকে ক্ষৌর ও গঙ্গাস্নান করাইয়া একখানি নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। প্রভু শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। চন্দ্রশেখর সনাতন গোস্বামীকে তাঁহার ইচ্ছামত একখানি পুরাতন বস্ত্রই প্রদান করিলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ বস্ত্রখানি দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড কৌপীন ও অপরখণ্ড বহির্বাস করিলেন। ঐ দিবস সনাতন গোস্বামী তপনমিশ্রের গৃহেই প্রভুর শেষান্ন প্রাপ্ত হইলেন।

পরদিন প্রভু সনাতন গোস্বামীকে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে লইয়া ভিক্ষা করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, “সনাতন, তুমি যতদিন এই কাশীধামে থাকিবে, ততদিনই আমার গৃহে ভিক্ষা হইবে।” সনাতন গোস্বামী বলিলেন, “আমি মাধুকরী করিব, স্থূল ভিক্ষা লইব না।” সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর গায়ের কম্বলখানি প্রভুর ভাল লাগিল না; বার বার কম্বলখানির দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মুখে কোন কথাই বলিলেন না। সনাতন গোস্বামী তাহা বুঝিতে

পারিয়া কম্বলখানি ত্যাগ করাই মনস্থ করিলেন। তিনি মধ্যাহ্নসময়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিলেন, এক বৈষ্ণব একখানি কাঁথা শুকাইতেছেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনি আমার এই কম্বলখানি লইয়া আপনার ঐ কাঁথাখানি আমাকে প্রদান করুন।" বৈষ্ণব ভাবিলেন, সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে পরিহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন, "আপনি প্রবীণ লোক হইয়া আমাকে পরিহাস করিতেছেন কেন?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, আপনাকে পরিহাস করি নাই।" তখন সেই বৈষ্ণব নিজের কাঁথাখানি দিয়া সনাতন গোস্বামীর কম্বলখানি লইলেন। সনাতন গোস্বামীও ঐ কাঁথাখানি গায়ে দিয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভু দেখিয়া বলিলেন, "সনাতন, তোমার কম্বল কোথা গেল?" সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ তোমার বিষয়রোগ খণ্ডাইয়া উহার শেষ রাখিবেন কেন? তিন মুদ্রার কম্বল গায়ে দিয়া মাধুকরী করিতে দেখিলে, লোকে তোমাকে উপহাস করিত, অতএব প্রভু তোমার কম্বল রাখিলেন না।" এই কথা বলিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া সনাতন গোস্বামীর প্রতি কৃপা ও শক্তিসঞ্চার করিলেন।

সনাতনগোস্বামীর শিক্ষা।

সনাতন গোস্বামীর অসাধারণ বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপাও করিলেন। তাঁহার কৃপায় সনাতন গোস্বামীর তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মিল। পূর্ব্বে যেরূপ রায় রামানন্দ তাঁহার কৃপায় তাঁহার প্রশ্ন সকলের উত্তরদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সনাতন গোস্বামীও তদ্রূপ তাঁহার কৃপায় তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ের প্রশ্নকরণে সমর্থ হইলেন। সনাতন গোস্বামী দৈন্য ও বিনয় সহকারে দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—

"নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥

কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে যে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥"

সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—"প্রভো, আমি বিষম বিষয়ান্ধকূপে পতিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম, সাধ্যতত্ত্ব বা সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসাতেও আমার অধিকার নাই। যদি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, তবে বলুন, আমি কে? আমি যে প্রতিনিয়ত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছি, ইহারই বা কারণ কি? আমার, কর্ত্তব্য কি? কি করিলে, আমার হিত হয়?—এই সকল বিষয়, এবং এতদ্ভিন্ন আরও যদি কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে, তাহাও, আমাকে উপদেশ করুন।"

"প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥

সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে পূর্ণ কৃপা করিয়াছেন। তুমি সকল তত্ত্বই বিদিত আছে। তোমার ত্রিতাপও নাই। তুমি যে তত্ত্বজ্ঞ এবং তাপরহিত হইয়াও ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ, তাহা কেবল তোমার বিদিত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত। সাধুদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তুমি ভক্তিমার্গপ্রবর্ত্তনের যোগ্যপাত্র। আমি তোমাকে ক্রমান্বয়ে সকল তত্ত্বই বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥”

যেমন সূর্য্যের আলোক, যেমন অগ্নির উষ্ণতা, তেমনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। মণি ও মন্ত্রাদির শক্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ঐ স্বাভাবিকী শক্তিও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি হইতে ধামপরিকরাদির, জীবশক্তি হইতে জীবসমূহের এবং মায়াশক্তি হইতে জগতের প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি চিচ্ছক্তিরই নামান্তর। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নামান্তর। তটস্থাশক্তি জীবশক্তির নামান্তর। জীবশক্তি নিজের স্বসংবেদ্যত্ব অর্থাৎ স্বপ্রকাশভাব হইতে বিচ্যুত ও অসম্যক্‌প্রকাশ-স্বভাব হওয়াতেই তাঁহাকে স্বপ্রকাশস্বভাবা অন্তরঙ্গা শক্তি ও অপ্রকাশস্বভাবা বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থাশক্তি বলা হয়। ঐ তিন শক্তিই শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া ভক্তপর্য্যায়। অতএব জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির ন্যায় তাঁহারই প্রকাশসামর্থ্য, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়াও, নিজের মায়াধীনত্ব ও অণুত্বাদি হেতু, মায়াধীশত্ব ও বিভুত্বাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদা-ভেদই জানিতে হইবে।

জগৎ জীবজড়াত্মক। এই জীবজড়াত্মক জগতে পরস্পর-বিভিন্ন-স্বভাব-সমন্বিত দুইটি সামর্থ্য বা শক্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি জীবসামর্থ্য, অপরটি জড়সামর্থ্য; একটি দেহী, অপরটি দেহ; একটি চিৎ, অপরটি অচিৎ। জগতে সামর্থ্য দুইটি না হইয়া একটি হইলে, কেবল দেহী বা কেবল দেহ হইলে, আমি কে, এইরূপ প্রশ্ন উত্থিতই হইতে পারিত না। সামর্থ্য দুইটি হওয়াতেই, আমি কে, আমি দেহ না দেহী, এই প্রশ্নটি অনেকেরই মনে উত্থিত হইতে দেখা যায়। আবার শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ হইতেও, আমি কে, আমি শক্তি না শক্তিমান্, এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, অর্থাৎ আমি দেহ না দেহী এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত, দেহ ও দেহীর স্বরূপনির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। দেহ গুণক্রিয়াত্মক এবং দেহী জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক। দেহের স্বরূপভূত বা মূলভূত গুণ ও ক্রিয়া আবার পরস্পরসাপেক্ষ। গুণ ব্যতিরেকে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে গুণ প্রকাশ পায় না। পরস্পরসাপেক্ষ গুণ ও ক্রিয়া সকল

লইয়াই দেহ। তন্মধ্যে গুণ সকল দেহের উপাদান এবং ক্রিয়া সকল উহার নিমিত্ত; কারণ, গুণসকলের সংযোগবিয়োগেই দেহের উৎপত্তিবিনাশ দৃষ্ট হয়। এক মহীয়সী মায়াকেই আবার ঐ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেহ কেহ এক মহীয়সী মায়াকে ঐ সকল গুণক্রিয়ার মূল না বলিয়া পরমাণুসমূহকেই ঐ সকল গুণক্রিয়ার মূল বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, গুণক্রিয়ার মূল অণু না হইয়া বিভু হওয়াই সঙ্গত। গুণের জ্ঞানে দেশ কারণ। বাহ্য জগতের গুণ বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল গুণ দেশবৃত্তিত্ব অপেক্ষা করে। দেশবৃত্তিত্ব ভিন্ন গুণের ধারণাই হয় না। আমরা গুণের পরিবর্ত্তনের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশসম্বন্ধরহিত গুণ বুঝিতে পারি না। আমরা গুণাভাবের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু দেশাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। দেশাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, দেশের বিভুত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া উঠিল; কারণ, দেশকে বিভু না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে, তদন্তে দেশের অভাবও বুঝিতে হয়। ক্রিয়ার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ক্রিয়ার মূলও অণু না হইয়া বিভু হওয়াই উচিত। ক্রিয়ার জ্ঞানে কাল কারণ। ক্রিয়া বহুপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই ঐ সকল ক্রিয়া কালবৃত্তিত্ব অপেক্ষা করে। কালবৃত্তিত্ব ভিন্ন ক্রিয়ার ধারণাই হয় না। আমরা ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালসম্বন্ধরহিত ক্রিয়া বুঝিতে পারি না। আমরা ক্রিয়াভাবের ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কালাভাব আমাদিগের বুদ্ধির অতীত। কালাভাব বুদ্ধির অতীত হইলে, কালের বিভুত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া উঠিল; কারণ, কালকে বিভু না বুঝিয়া অণু বুঝিতে হইলে, তদন্তে কালের অভাবও বুঝিতে হয়। বিভুত্বের ন্যায় নৈয়ত্য বা নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বও দেশ ও কালের অপর একটি লক্ষণ। দেশ গুণের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী এবং কাল ক্রিয়ার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। দেশ গুণের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া গুণসকলের যৌগপদ্যরূপ দৈশিকসম্বন্ধের ঘটক হয়; আর কাল ক্রিয়ার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ক্রিয়াসকলের পারম্পর্য্যরূপ কালিকসম্বন্ধের ঘটক হয়। গুণ ও ক্রিয়া যেরূপ পরস্পরসাপেক্ষ, দেশ ও কালও তদ্রূপ পরস্পরসাপেক্ষ। কাল ব্যতিরেকে দেশের এবং দেশ ব্যতিরেকে কালের ধারণা করা যায় না। গুণক্ষোভের নিমিত্তস্বরূপ কাল ব্যতিরেকে গুণের অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় দেশ জ্ঞানের বিষয় হয় না এবং গতির বা অবস্থার উপাদানস্বরূপ দেশ ব্যতিরেকে

ক্রিয়ার অপ্রকাশ হেতু তদাশ্রয় কাল জ্ঞানের বিষয় হয় না। দেশ ও কাল পরস্পরবিভিন্ন গুণাংশের ও ক্রিয়াংশের সম্বন্ধঘটকরূপে পরস্পর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞেয়বস্তু সকলের সহিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জাতি যেরূপ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না, দেশও তদ্রূপ গুণক্রিয়ায় সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানের বিষয় হয় না।' এইরূপ হইলেও, জাতিজ্ঞান যেরূপ ব্যক্তি-জ্ঞানের নিয়তপরবর্ত্তী ফল, দেশকালজ্ঞান তদ্রূপ গুণক্রিয়ায় জ্ঞানের নিয়ত-পরবর্ত্তী ফল নহে, পরন্তু নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী মূল। ঐ দেশ ও কাল মহীয়সী মায়াশক্তির দুইটি প্রান্ত। গুণাত্মক দেশ মায়াশক্তির অন্ত্যপ্রান্ত এবং ক্রিয়াত্মক কাল উহার আদ্যপ্রান্ত। মায়াশক্তির স্পন্দনজনিত গুণক্ষোভ হইতেই কারণ-বারির উৎপত্তি। ঐ কারণবারি ক্রমশঃ পরস্পন্দিত হইয়া স্পন্দনতারতম্যে অংশতঃ মহদাদি তত্ত্বসমূহের আকারে পরিণত হয়। পরে উক্ত মহদাদি তত্ত্ব সকল স্বান্তর্নিহিত স্পন্দনাত্মক কালের প্রেরণায় চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত পরমাণু, অণু বা দ্ব্যণুক ও ত্র্যসরেণু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ধারণ পূর্ব্বক এই বিচিত্র-গুণময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে। তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ ও বিভিন্ন-গুণ-নাম-সমন্বিত আকর্ষণ সকল জড়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত একই স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াসামর্থ্যের প্রকাশভেদমাত্র। যে জড়শক্তির স্পন্দন হইতে এই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি, ঐ স্পন্দন ও জড়শক্তি একই তত্ত্ব কি না, ইহাই অতঃপর বিবেচ্য। জড়বিজ্ঞান তন্নির্ণয়ে অসমর্থ। তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম বা জড়াতীত কোন বস্তুর সামর্থ্যবিশেষের প্রেরণা-জনিত আগন্তুক ধর্ম্ম, তাহা জড়বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে অক্ষম। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলেন,—তাপাদি বিভিন্ন প্রকাশ সকল জড়ের সহজ ধর্ম্ম নহে, পরন্তু জড়াতীত কোন বস্তুর সামর্থ্যবিশেষের প্রেরণাজনিত আগন্তুক ধর্ম্ম। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের এইরূপ বলিবার হেতু আছে। পরমাণুতে যে ক্রিয়াশক্তি অনুমিত হয়, তাহা পরমাণুতে থাকে না, পরমাণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অবকাশাত্মক দেশেই থাকে। উহা জড় পরমাণুর ধর্ম্ম নহে, কিন্তু জড়সত্তাপ্রকাশিকা চিদ্বৃত্তি। জড়ে ক্রিয়া করা ভিন্ন জড়ের সহিত উহার অপর কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। ক্রিয়া যে জড়ের সহজ ধর্ম্ম নহে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। ক্রিয়ার কারণ ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাও আবার স্বয়ংসিদ্ধা নহে; কারণ, ইচ্ছার মূলে জ্ঞান অপরিহার্য্য। অতএব জগতে জড়সামর্থ্যের ন্যায় জড়াতীত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মক জীবসামর্থ্যও সিদ্ধ হইতেছেন।

প্রথম প্রশ্নটি মীমাংসিত হইল। অনন্তর দ্বিতীয় প্রশ্নটির মীমাংসার অবসর। দেহী জীব শক্তি না শক্তিমান্? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই প্রশ্নটির মীমাংসার নিমিত্ত প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যে দেহের সৃষ্টিস্থিতিনিয়মনাদির উপপাদনার্থ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমন্বিত যে দেহী জীব স্বীকৃত হইলেন, তিনি সেই দেহের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে সমর্থ কি না? তিনি সমর্থ হইলে, আর তাঁহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমন্বিত চিদ্বস্তুর স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আর তিনি যদি সমর্থ না হন, তবে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমন্বিত চিদ্বস্তু বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়। অস্মদাদি অণু-জীবের যে সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই নিমিত্তই বেদান্তসূত্রে অণুজীবের জগদ্-ব্যাপার বা জগৎকর্ত্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। মায়াধীন অণুজীবের সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব বিধায় প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মায়াধীশ বিভুচৈতন্যের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ, জীবজড়াত্মক জগৎ তাঁহারই শক্তিবৈচিত্র্য। জীবাদিসর্ব্বশক্তিসমন্বিত সেই পুরুষই এই জীবজড়াত্মক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই সৃষ্টজগতে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ঐ পুরুষ। তিনিই শক্তিবর্গের মূলাশ্রয়। তিনিই শক্তিমান্; শক্তিসকল তাঁহার বিশেষণ। তিনিই পরব্রহ্ম—পরমাত্মা। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁহারই আবির্ভাবভেদে নামভেদমাত্র। তিনি সূর্য্যস্থানীয়। জীব সকল তাঁহার মণ্ডলবহিশ্চরকিরণপরমাণুস্থানীয়। মণ্ডলবহিশ্চরকিরণপরমাণু সকল যেমন স্বরূপতঃ সূর্য্যেরই অংশ বলিয়া সূর্য্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারেন, তদ্রূপ অণু জীবাত্মা সকলও বিভু পরমাত্মারই শক্ত্যংশ বলিয়া নিজাংশী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন, "সোঽহম্"—আমি সেই বস্তু। কিরণপরমাণু সকল যেমন সূর্য্যাংশ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, অণু জীবাত্মা সকলও তদ্রূপ পরমাত্মার শক্ত্যংশ বলিয়া পরমাত্মার ন্যায় জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াবিশিষ্ট। জীব যখন বহির্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের গ্রহণে উন্মুখ হয়েন, তখন তাঁহার ক্রিয়াবৃত্তির প্রকাশ হয়। তিনি যখন অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ বহির্ম্মুখতার পরিবর্ত্তনে উন্মুখ হয়েন, তখন তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তির প্রকাশ হয়। আর তিনি যখন শান্ত বা কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়েন, তখন তাঁহার জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ হয়। ঐ তিনটি বৃত্তি তাঁহার স্বাভাবিকী। তাঁহার অস্তিত্বের সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। জীবের সত্তার সহিত উক্ত বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও অবশ্য

স্বীকার্য্য। জীবের সত্তা কেহই অস্বীকার করেন না। 'আমি আছি' ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। 'আমি নাই' ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। কারণ, আত্মার সত্তা সকল তর্কের অতীত। উহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধা। উহা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।' সকল প্রমাণই আত্মসত্তাসাপেক্ষ। আত্ম-সত্তা স্থির হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গেই উহার বৃত্তিত্রয়ের সত্তাও স্থির হইতেছে। কারণ, 'আমি আছি' এই জ্ঞান আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রমাণ। ইচ্ছা ও ক্রিয়া জ্ঞানেরই প্রকাশ বিশেষমাত্র। অতএব আত্মাস্তিত্বের সহিত আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাদিসমন্বিত হইলেও, নিজের অণুত্ব ও বহিশ্চরত্ব হেতু বিভু আশ্রয়তত্ত্বের জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত অনাদি কাল হইতে বহির্ম্মুখ অর্থাৎ পরতত্ত্ব-বিমুখ। এই পরতত্ত্ববৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র। এই ছিদ্র দ্বারাই মায়া তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। মায়ার প্রবেশে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়। স্বরূপজ্ঞানের আবরণে তাঁহার কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটিলেই মায়া জীবকে প্রকৃতিগুণ দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ডার্হ ব্যক্তির ন্যায় বিবিধ সংসারদুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের তাপত্রয়ের কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

সংসারচক্রে ভ্রমণকারী জীবের ঈশ্বরবৈমুখ্য স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ঈশ্বরবৈমুখ্যই আবার তাহার মায়াধীনতার হেতু, অর্থাৎ জীব স্বভাবতঃ ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াই মায়ার অধীন হইয়াছে। ঈশ্বরবিমুখ জীবকে মায়া আবরণ করিয়া থাকেন। মায়ার আবরণে জীবের ঈশ্বরবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ঈশ্বর স্মৃতিবহির্ভূত হইলেই জীবের স্বরূপের জ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়। আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান অন্তর্হিত হইলে, বিপর্য্যয় ঘটে। বিপর্য্যয় বলিতে স্থূল সূক্ষ্ম ও

কারণ এই ত্রিবিধ দেহে পর পর আত্মাভিমান ও তদনন্তর তাহাতে অভিনিবেশ। সত্ত্বগুণপ্রধান কারণশরীরে আত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের কারণশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। রজোগুণপ্রধান সূক্ষ্মশরীরে আত্মার ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের সূক্ষ্মশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। আর তমোগুণপ্রধান স্থূলশরীরে আত্মার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ দর্শনে উহাতে অভিনিবেশ জন্মিলেই জীবের স্থূলশরীর দ্বারা বন্ধন হয়। উক্ত বন্ধনই জীবের তাপত্রয়ের মূল। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি দেহবন্ধনের ভয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন।

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

পরমেশ্বর জীব সকলের পরমাশ্রয় হইলেও জীবগণ পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরকেও ভুলিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানও হারাইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন যে আত্মবিষয়ক অজ্ঞান তন্নিমিত্ত জীবসমাজে 'আত্মা আছেন ও আত্মা নাই' এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। উক্ত বিভিন্ন মতবাদের খণ্ডনার্থ জীবগণ পরস্পর ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকে। ঐ বিবাদ নিষ্ফল হইলেও, উহা সহসা নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ বিবাদের সহসা নিবৃত্তি হয় না বলিয়াই, তন্নিমিত্ত পরমকারুণিক সাধু ও শাস্ত্র সকল তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল উপদেশ হইতে জীবগণ প্রথমতঃ ইহাই বিদিত হয়েন যে, তাঁহারা জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশালী চিন্ময় পুরুষ এবং পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারহিত জড়বস্তু; কারণ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া তাঁহাদেরই, জড়জগতের নহে। পরিশেষে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারেন যে, কি পিণ্ডাণ্ড কি ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে অবস্থিত হইয়া বা যাহার সাহায্যে তাঁহারা জানিতেছেন বা ইচ্ছা করিতেছেন অথবা ক্রিয়া করিতেছেন, উহা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে, পরন্তু কোন এক অচিন্ত্যশক্তি পুরুষের শক্তি দ্বারা নিয়মিত। এইরূপে যখন 'আত্মার অবধিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, জাগ্রদাদ্যবস্থার সাক্ষিত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব এবং জগতের আগমাপায়িত্ব, দৃশ্যত্ব, সাক্ষ্যত্ব অর্থাৎ জাগ্রদাদ্যবস্থাবিশিষ্টত্ব ও দুঃখাস্পদত্বের সহিত আত্মার আত্মা পরমাত্মার পরমাশ্রয়ত্ব অবধারিত হয়, তখনই তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন। যে জীব সৌভাগ্যক্রমে একবার কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন, তিনি নিস্তার পাইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

পরমেশ্বরের এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া। যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারাই ইহাকে অতিক্রম করিয়া থাকে।

মায়ামুগ্ধ জীবের আপনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি করুণা করিয়া বেদ ও তদর্থনির্ণায়ক পুরাণশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্ররূপে আচার্য্যরূপে ও অন্তর্যামিরূপে আপনাকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্র ও গুরু হইতেই জীবের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীব শাস্ত্র ও গুরু হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিদিত হয়েন।

বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয় উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্য বস্তু এবং তদ্বিষয়ক ভজনই তাঁহার প্রাপক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তির প্রাপ্যপ্রাপকতালক্ষণ সম্বন্ধ। ঐ ভক্তি আবার সাধ্য ও সাধন ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন হয়েন না, কিন্তু সাধ্যভক্তিরূপ প্রেম দ্বারা পরম্পরায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন হয়েন। এই নিমিত্তই শ্রবণাদি সাধনভক্তিকে অভিধেয় এবং প্রেমরূপ সাধ্যভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেম মহাধন, পুরুষার্থের শিরোমণি। প্রেম ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসেবাসমুখ আনন্দের লাভ হইয়া থাকে। প্রেমের দুইটি কার্য্য। মধুর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করানই প্রেমের প্রথম কার্য্য, এবং সেবা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করানই প্রেমের দ্বিতীয় কার্য্য। প্রেমের উক্ত কার্য্যদ্বয় আবার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনুভবের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণরসাস্বাদন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ লাভের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

মায়ামুগ্ধ জীবের যেরূপে দুঃখের বিমোচন হয়, তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা এক দরিদ্রের গৃহে একজন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার ঈদৃশ দুঃখভোগ করা উচিত হয় না। তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রচুর ধন রাখিয়াই জীবন ত্যাগ করিয়াছেন।

ঐ ধন তোমার গৃহমধ্যেই প্রোথিত আছে। দক্ষিণদিক্ খনন করিলে, ধন পাইবে না, অনেক ভীমরুল ও বোল্‌তা উঠিবে। পশ্চিমদিক্ খনন করিলে, ধন পাইবে না; কারণ, ঐ দিকে এক যক্ষ আছে, সে ধনপ্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। উত্তরদিক্ খনন করিলেও, ধন পাইবে না; কারণ, ঐ দিকে এক অজগর সর্প আছে, সে তোমাকে গ্রাস করিবে। কিন্তু ঐ তিন দিক্ খনন না করিয়া যদি কেবল পূর্ব্বদিক্ অল্পমাত্র খনন কর, তাহা হইলেই ধন প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যানুসারে দরিদ্র ব্যক্তি যেমন পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রসকল মায়ামুগ্ধ জীবকে যাহা উপদেশ করেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কর্ম্মমার্গই সংসারের দক্ষিণদিক্। কর্ম্মমার্গকে আপাততঃ সংসারদুঃখ-নিবারণের উপায় বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম দ্বারা সংসার দুঃখ নিবারিত হইতে পারে না। কর্ম্ম সকাম। সকাম কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল নরকাদিদুঃখ। বিহিত কর্ম্মের ফল স্বর্গাদিসুখ। বিহিত কর্ম্মের ফল স্বর্গাদিসুখ হইলেও, ঐ সুখ চিরস্থায়ী নহে, উহারও নাশ আছে। অতএব বিহিত কর্ম্ম দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি অসম্ভব। নিত্যকর্ম্মও ফলরহিত নহে। নিত্যকর্ম্মও চিত্তশুদ্ধি ও প্রত্যবায়পরিহারের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং উহার অনুষ্ঠানেও শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা আছে। অতএব নিত্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালেই দুঃখ অপরিহার্য্য। কর্ম্মের ফল সকল ভীমরুল ও বোল্‌তার ন্যায় উত্থিত হইয়া কর্ম্মীকে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে। জ্ঞানমার্গই সংসারের উত্তরদিক্। ঐ জ্ঞানমার্গ ফলকামনারহিত হইলেও, ঐ মার্গে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণরূপ অজগরের বাস। জ্ঞানী সিদ্ধ হইলেই, সাযুজ্যরূপ অজগর উত্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। সাযুজ্যরূপ অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্ত জীব নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। অতএব সাধনকালে তিনি সমাধিতে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহাও তাঁহার সিদ্ধিকালে থাকে না। অষ্টাঙ্গযোগই পশ্চিমমার্গ। ঐ মার্গে সিদ্ধিরূপ এক যক্ষ বাস করে। সে ধার-ণার সময়েই উত্থিত হইয়া সাধককে অভিভূত করিয়া ফেলে, আর অগ্রসর হইতে দেয় না। অতএব ঐ সিদ্ধিরূপ যক্ষের উপদ্রবে যোগসাধক ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমার্গ-

রূপ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামনাবর্জ্জিত। ভক্ত কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি ও যোগের ফল সিদ্ধি প্রভৃতি কোন কামনাই করেন না। ভক্ত নিষ্কাম—ভক্তিমাত্রকাম। ভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥"

হে উদ্ধব, উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, কনিষ্ঠ ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিয়া বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয়েন, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে সেই বিষয়ভোগ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ ভক্তি প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মকেই নাশ করিয়া থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ আমাকে বলবতী ভক্তির ন্যায় বশীভূত করিতে পারে না। আমি একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তির গ্রাহ্য। আমি ভক্তের প্রিয় আত্মা। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। সত্যদয়াদিযুক্ত ধর্ম্ম ও তপস্যান্বিত জ্ঞান ভক্তিহীন পুরুষকে সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না।

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥"

আমি ভক্তাধীন; ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা থাকে না। আমি ভক্তজনপ্রিয়; ভক্ত সকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকেন। সাধ্বী

স্ত্রী যেমন সাধু পতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমাতে বদ্ধহৃদয় সমদর্শী ভক্ত-সকল আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ধামে লইয়া যান, ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করান। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠা।

বিজ্ঞানরূপা ও আনন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি একমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই দর্শনীয়া।

ভক্তিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বেদে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন ধনের লাভে সুখভোগরূপ ফলের লাভ ও তাহার সঙ্গেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভক্তির লাভে প্রেমরূপ ফলের লাভ ও তল্লাভে কৃষ্ণরসাস্বাদের সহিত সংসারদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। প্রেমসুখই ভক্তির মুখ্যফল এবং দুঃখনিবৃত্তি উহার আনু-ষঙ্গিক ফল। অতএব দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন নহে, প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ।

সম্বন্ধতত্ত্ব।

প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণই বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়; কর্ত্তব্য শ্রবণাদি সাধনভক্তি অভিধেয় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়; আর ভক্তিফলরূপ প্রেমই প্রয়োজন অর্থাৎ পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রাপ্তির গৌণ সাধন শ্রবণাদিভক্তি ও মুখ্য সাধন প্রেমই বেদাদি শাস্ত্রের প্রধান সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন। ঐ তিনের জ্ঞান হইলে, মায়াবন্ধন আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বেদের মুখ্য সম্বন্ধ পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে;—

"ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দৈবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥"

• চরাচর জগতের মোহনার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগম বিরচিত হইয়াছে, তত্ত-ন্নিরূপিত দেবতা সকলও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন; কল্পকাল পর্য্যন্ত

এইরূপই হউক, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ, নিখিল শাস্ত্রের বিচারপ্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

বেদশব্দ সকল গৌণবৃত্তি ও মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এবং বেদবাক্য সকল অন্বয়সম্বন্ধ ও ব্যতিরেকসম্বন্ধ দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বেদের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই শ্রীকৃষ্ণপর্য্যবসায়িনী। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥"

শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহার অভিধান করেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্প অর্থাৎ তর্ক করেন, এই সকল অভিপ্রায় আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই দেবতারূপে অভিধান করেন, এবং আমাকেই তর্ক করিয়া নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ আমাকেই আশ্রয় করিয়া, প্রথমতঃ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক, মধ্যে আমার অবতারাদিরূপ ভেদের অনুবাদ করণানন্তর, অন্তে, অঙ্কুরগত রস যেমন কাণ্ডশাখাদিতে প্রসৃত হয়, তেমনি, প্রণবার্থভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কাণ্ডশাখাদিতে অনুস্যূত বলিয়া, নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ কালিকপরিচ্ছেদরহিত বা বিভু, দৈশিকপরিচ্ছেদরহিত বা নিত্য এবং বস্তুপরিচ্ছেদরহিত বা পূর্ণ। তাঁহার বৈভবও অনন্ত। সৎ চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিকার্য্য সকলই তাঁহার বৈভব। তাঁহার শক্তি সকল প্রধানতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত ভাগত্রয় যথা,—চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপেরই অন্তর্গত অর্থাৎ বাচক বলিয়া চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তিও বলা যায়। মায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপে না থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের বাহিরে অর্থাৎ স্বরূপবহিশ্চর জীবশক্তিতেই থাকিয়া তাঁহার স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গাশক্তিও বলা যায়। আর জীবশক্তি তাঁহার স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপশক্তির এবং মায়া-

শক্তির সঙ্গে থাকিয়া স্বরূপের লক্ষক হয়েন বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তিও বলা যায়। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার শক্তিকার্য্য। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বরূপশক্তির কার্য্য এবং ব্রহ্মাণ্ড সকল তাঁহার জীবশক্তি ও মায়াশক্তির কার্য্য। স্বরূপ, শক্তি ও শক্তিকার্য্য এই তিনের তিনিই একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
ক্রীড়দযদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে॥"

দশমস্কন্ধে শক্তিরূপ ভক্তগণের আশ্রয়-স্বরূপ-বিগ্রহধারী পরমানন্দময় যদু-কুলসাগরে ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপ দশম লক্ষ্যবস্তু বর্ণিত হইতেছেন।

অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি সকলের আদি, সকলের অংশী। তিনি কিশোরশেখর। তিনি চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ, সুন্দর-স্বপ্রকাশ-সুখমূর্ত্তি, গোপালনলীল, যাদবদিগের অগ্রাহ্য অর্থাৎ দেবতা, ব্রজবাসীদিগের গ্রাহ্য অর্থাৎ নিজজন এবং কারণসকলেরও কারণ।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

ইতিপূর্ব্বে যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইল, এবং পরেও যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাঁহাদিগের কেহ বা পুরুষের অংশ, কেহ বা পুরুষের কলা; কিন্তু বিংশতিতম অবতারে যাঁহার নামোল্লেখ হইল, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, অংশী। নারায়ণও ভগবান্, অতএব পুরুষের অংশী, ইহা সত্য, কিন্তু নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ নারায়ণের ভগবত্তা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা হইতে সিদ্ধ বলিয়া গৌণ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মুখ্য জানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল যুগে যুগে অসুরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত লোক সকলকে সুখী করিয়া থাকেন।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানীর সম্বন্ধে জীবাতিরিক্ত-বিশেষণ-প্রকাশ-রহিত শুদ্ধ বিশেষ্যরূপ ব্রহ্মস্বরূপে, যোগীর

সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি-মায়িক-বিশেষণ-প্রকাশ-যুক্ত পরমাত্মস্বরূপে ও ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। ঐ অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্ব নির্বিশেষ-রূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন; আর সর্ব্বশক্তিসমন্বিতরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন।

নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ-রূপ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। সূর্য্য যেমন লোক-দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়রূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ জ্ঞানীর জ্ঞানে জ্যোতীরূপেই দৃষ্ট হয়েন, মূর্ত্তরূপে দৃষ্ট হয়েন না।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গকান্তি, আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারও আত্মা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥"

এই কৃষ্ণকে তুমি আত্মার আত্মা বলিয়া বিদিত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও, জগতের হিতার্থ যোগমায়া দ্বারা দেহধারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

অথবা, হে অর্জ্জুন, তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা অর্থাৎ আমার একাংশরূপ পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

জ্ঞানযোগাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমন্বিত আবির্ভাবের

অনুভব হয়, কিন্তু ভক্তি দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। তাঁহার একই বিগ্রহে অনন্ত রূপের প্রকাশ হয়। ঐ অনন্ত রূপ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত তিন ভাগ যথা,—স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ। স্বয়ংরূপের আবার স্বয়ং ও প্রকাশ এই দুইরূপে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা,—

"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

যে রূপ অনন্যাপেক্ষ, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই স্বয়ংরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। ঐ স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেকত্র প্রকট হইয়াও, বহুত্ব-প্রতীতি উৎপাদন না করিয়া একত্বপ্রতীতিই উৎপাদন করেন, তবে তাঁহাকে প্রকাশ বলা হয়। প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নহেন, স্বয়ংরূপই।

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥"

এক রূপের যুগপৎ অনেকস্থানে সকলপ্রকারে তৎস্বরূপে প্রাকট্য হইলে, ঐ রূপের ঐ প্রাকট্যকেই প্রকাশ বলা যায়। ঐ প্রকাশ কোনরূপ ভেদের মধ্যে গণ্য হয়েন না; কারণ, উহা কোন অংশেই স্বয়ংরূপ হইতে পৃথক্ নহেন। ঐ প্রকাশ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। তন্মধ্যে মুখ্য প্রকাশকেই প্রকাশ বলা যায় এবং গৌণ প্রকাশকে বিলাস বলা যায়। রাসে ও মহিষী-বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাঁহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। আর দেবকী-নন্দনে, বলদেবে, ও নারায়ণে তাঁহার যে প্রকাশ, তাঁহাকেই গৌণ প্রকাশ বলা যায়। যে প্রকাশে আকৃত্যাদির অভেদ হেতু স্বয়ংরূপের সহিত ঐক্য-প্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাঁহাকেই মুখ্য প্রকাশ বলা যায়। এই নিমিত্ত দ্বিভুজ দেবকীনন্দনকে মুখ্য প্রকাশই বলা উচিত। আর যে প্রকাশে আকৃত্যাদির ভেদ হেতু স্বয়ংরূপ হইতে পার্থক্যপ্রতীতি উৎপাদিত হয়, তাঁহাকেই গৌণ-প্রকাশ বলা যায়। এই নিমিত্ত দেবকীনন্দন চতুর্ভুজ হইলে, তাঁহাকে গৌণ-প্রকাশই বলা উচিত। এই গৌণপ্রকাশ বা বিলাস আবার বৈভব ও প্রাভব ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। যে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি প্রকটিত হয়, তাঁহাকে বৈভবপ্রকাশ এবং যে গৌণপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি প্রকটিত হয়, তাঁহাকে প্রাভবপ্রকাশ বলা যায়। দেবকীনন্দন ও বলদেব প্রভৃতি দ্বিভুজ মূর্ত্তিসকল বৈভবপ্রকাশ এবং শ্রীনারায়ণাদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিসকল প্রাভবপ্রকাশ। উক্ত বৈভব ও প্রাভব সংজ্ঞক দ্বিবিধ গৌণ প্রকাশই তদেকাত্মরূপের অন্তর্গত।

"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥"

যে রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত হইয়াও আকৃত্যাদি দ্বারা অন্যাদৃশ অর্থাৎ অন্যের ন্যায় প্রকাশ পান, তাঁহাকেই তদেকাত্মরূপ বলা যায়। এই তদেকাত্মরূপকে কায়ব্যূহ বলিলেও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশকে কিন্তু কায়াব্যূহ বলা যায় না; কারণ, তাঁহার মুখ্যপ্রকাশ কোনপ্রকারেই ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করেন না। তদেকাত্মরূপ কায়ব্যূহের ন্যায় কোন না কোন অংশে ভেদপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ কায়ব্যূহ হইলে, তদ্দর্শনে কায়ব্যূহনির্ম্মাণকুশল নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময় উৎপন্ন হইত না। শ্রীকৃষ্ণের গৌণপ্রকাশ বা বিলাসমূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময় জন্মিতে দেখা যায় না।

তদেকাত্মরূপ আবার বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। বিলাসের লক্ষণ যথা;—

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে।"

যে রূপ লীলাবিশেষ সম্পাদনার্থ ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইয়াও শক্তিতে প্রায়ই মূলরূপের তুল্য, তাঁহাকেই বিলাস বলা যায়।

"একই বিগ্রহ কিন্তু আকার হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥
যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥"

শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপে প্রকাশ হইলেও, তাঁহার মূর্ত্তিভেদ স্বীকৃত হয় না। তাঁহার একই মূর্ত্তিতে অনন্ত মূর্ত্তির প্রকাশই স্বীকৃত হইয়া থাকে। তিনি অনন্ত প্রকাশে অনন্তমূর্ত্তি হয়েন না, তাঁহার এক মূর্ত্তিই অনন্তমূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার একই মূর্ত্তিতে বিবিধ আকার, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ অস্ত্র, বিবিধ বেশ ও বিবিধ ভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং বিবিধ নাম শ্রুত হয়। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে গোপবেশ ও গোপাভি-মান এবং বিলাসাদিতে ক্ষত্রিয়াদিবেশ ও ক্ষত্রিয়াদি অভিমান হইয়া থাকে। স্বয়ংরূপে যাদৃশ সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য অভিব্যক্ত হয়, বিলাসাদিতে তাদৃশ সৌন্দর্য্যাদি অভিব্যক্ত হয় না। স্বয়ংরূপের সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে বিলাসাদিরও ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাস গোলোকে বলদেব, মথুরায় বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, দ্বারকায়

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের বিলাস বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। গোলোকে একমাত্র বলদেবরূপ ব্যূহের প্রকাশ। মথুরায় দুই ব্যূহের ও দ্বারকায় চারি ব্যূহের প্রথম এবং বৈকুণ্ঠে চারিব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়া থাকে। উক্ত চারি ব্যূহ হইতে আবার অনেক ব্যূহের প্রকাশ শ্রবণ করা যায়। এই বিলাস উক্ত হইল। অতঃপর স্বাংশ বলা হইতেছে। স্বাংশের লক্ষণ যথা,—

"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।"

যিনি বিলাসসদৃশ হইয়াও বিলাসাপেক্ষা ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই স্বাংশ বলা হয়। সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার সকল এবং মৎস্যাদি লীলাবতার সকল স্বাংশের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন।

অনন্তর আবেশ বলা হইতেছে। আবেশের লক্ষণ যথা,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥"

শ্রীভগবান্ জ্ঞানশক্ত্যাদির অংশ দ্বারা যে সকল মহত্তম জীবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকেই আবেশ বলা যায়। পৃথু, ব্যাস ও সনকাদি আবেশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

অনন্তর শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতার সকল উক্ত হইতেছেন। শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতার আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও উহা অসম্ভব নহে; কারণ, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই শ্রীভগবানের অবতার সকল সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বজনসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এই নিমিত্তই দর্শন ও বিজ্ঞান ঐ বদ্ধমূল অবতারের পোষকতা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব অবতার যে কল্পনার সামগ্রী নহেন, উপেক্ষার বস্তু নহেন, উপহাসের বিষয় নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ বিশ্বের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ মঙ্গলই শ্রীভগবানের অবতারেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

অতঃপর দেখা যাউক, শাস্ত্র সকল সেই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মূলীভূত অবতার কাহাকে বলেন?—"বিশ্বকার্য্যার্থ শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। ঐ অবতার কখন অলৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি-নিরপেক্ষ-ভাবে এবং কখন বা লৌকিকরূপে অর্থাৎ পিত্রাদি হইতেই হইয়া থাকে।" অংশাবতার, গুণাবতার ও আবেশাবতার ভেদে উক্ত অবতার ত্রিবিধ। অংশাবতার

পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতার ভেদে চতুর্ব্বিধ। গুণাবতার সত্ত্বাদিগুণভেদে ত্রিবিধ। আবেশাবতার শ্রীভগবদাবেশ ও তচ্ছক্ত্যাবেশ ভেদে দ্বিবিধ। উক্ত অংশাবতারাদি ত্রিবিধ অবতারের অধিকাংশই স্বাংশ বা আবেশ। যিনি স্বয়ংরূপ, তিনিও কখন কখন ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ স্বতন্ত্র স্বয়ংরূপের বিষয় পরে বলা হইবে। আপাততঃ দ্বারান্তর দ্বারা অবতরণই উক্ত হইতেছে। বিশ্বকার্য্যার্থ ভগবান্ শেষশায়ী প্রভৃতি তদেকাত্মরূপ দ্বারা বা বসুদেবাদি ভক্ত দ্বারা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। যে কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, ঐ কার্য্য কি? শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়া থাকি।

আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

ধর্ম্মসংস্থাপনই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চাবতারের মুখ্য কারণ এবং সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুরাচারগণের বিনাশ উহার আনুষঙ্গিকবিধায় গৌণ কারণ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা তাহার ধর্ম্ম। স্বভাব প্রধানতঃ দ্বিবিধ; ঔপাধিক ও অনৌপাধিক। ঔপাধিক স্বভাব আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দ্বিবিধ; আর অনৌপাধিক স্বভাব আধ্যাত্মিক; অতএব ধর্ম্ম আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ত্রিবিধ। আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থই শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতার হইয়া থাকে। ভুতসকল নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, উহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; দেবতারা অভিমান বশতঃ নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, উহাদিগকে পুনর্ব্বার নিজ নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; জীবাত্মা নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিজ ধর্ম্মে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ

করেন। ভূতসকলের ধর্ম্ম, জীবাত্মার ভোগ দ্বারা মোক্ষবিধানার্থ উপাধিনির্ম্মাণ; দেবতাদিগের ধর্ম্ম, নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া উক্ত উপাধিনির্ম্মাণের সাহায্য-করণ; আত্মার ধর্ম্ম, গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ-জীবত্ব। প্রকৃতিগুণোৎপন্ন ভূত সকল কালবশে জীর্ণ হইয়া জীবের ভোগসমাধানে ও যথাযোগ্য উপাধিনির্ম্মাণে অসমর্থ হইলে, দেবতারা অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত এবং অধিকারভ্রষ্ট হইলে, জীবসকল বিপথগামী হইয়া স্বাভাবিক শুদ্ধত্বলাভে বঞ্চিত হইলে, শ্রীভগবান ভূতসকলকে, দেবতাসকলকে ও জীবসকলকে স্বস্বধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অবতরণে প্রপঞ্চে প্রয়োজনানুরূপ শক্তিসকলের সঞ্চার হইয়া থাকে। শক্তি সঞ্চারের ইহাই নিয়ম। আত্মার ভোগমোক্ষবিধানার্থ করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এইরূপই নিয়ম করিয়াছেন। জীবের ভোগমোক্ষ এই নিয়মেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; উহার প্রকারান্তর দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত ভূতসকল প্রকৃতি হইতে শনৈঃ শনৈঃ উৎপন্ন ও উপাধিরূপে পরিণত হইয়া জীবের ভোগ-মোক্ষের সাধন হয়; আধিকারিক দেবতাসকল শনৈঃ শনৈঃ আপনাপন অধিকার লাভ করিয়া জীবের ভোগমোক্ষের সহায়তা করেন; জীবসকল শনৈঃ শনৈঃ ভোগ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া মোক্ষ অর্থাৎ গুণাষ্টকবিশিষ্ট শুদ্ধ স্বস্বভাব প্রাপ্ত হয়েন। উপাধিভাব ভূতসমূহের উৎকর্ষ; অধিকারভাব দেবতাদিগের উৎকর্ষ; গুণাষ্টকবিশিষ্ট-শুদ্ধভাব-লাভ জীবাত্মার উৎকর্ষ। উক্ত উৎকর্ষের পথে প্রভূত বিঘ্নবাধা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বিঘ্নবাধা অতিক্রম না করিয়া কেহ কখন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। বিঘ্নবাধাই উন্নতির সোপান। বিঘ্নবাধাই উন্নতির আনুকূল্য করিয়া থাকে। বীজ হইতে পুষ্পফল-প্রসবকারী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কোন বীজকেই প্রাকৃতিক বিঘ্নবাধা অতিক্রম না করিয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া পুষ্পফল প্রসব করিতে দেখা যায় না। বীজবপনার্থ ক্ষেত্রের প্রয়োজন। ক্ষেত্রমধ্যে বপন ব্যতিরেকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ক্ষেত্রমধ্যে উপ্ত বীজ সর্ব্বদিগ্বর্ত্তিনী মৃত্তিকা দ্বারা বাধিত হইয়াই উষ্মাসংযোগে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দ্বারা অধোভাগে মূল ও উর্দ্ধভাগে কাণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। এইরূপে বীজসঞ্জাত অঙ্কুর উৎপন্ন ও বাহ্য প্রকৃতি দ্বারা ব্যাহত হইয়াই ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হয়। শাখাপল্লবাদিসমন্বিত বদ্ধমূল বৃক্ষও রবিকিরণ-সংযোগ ও মেঘাম্বুসেক ব্যতিরেকে যথেষ্ট পুষ্পফল প্রসবে সমর্থ হয় না। তদ্রূপ প্রকৃতির গুণত্রয় পরস্পরাভিভাবকতা ব্যতিরেকে স্বস্বোৎকর্ষ লাভ করিতে

পারে না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন—অনুগ্রহ ভিন্ন প্রাকৃতিক বিঘ্নবাধা সকল অতিক্রম পূর্ব্বক জীবোপাধিসংগঠনে সমর্থ হয় না; দেবতা সকল অসুরগণ কর্তৃক পরিভূত না হইয়া নিজ নিজ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন—অনুগ্রহ ভিন্ন আসুরিক বিঘ্নবাধা সকল অতিক্রম পূর্ব্বক শান্তিময় অধিকারে অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; জীবাত্মা সকলও মায়াভিভব ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না, এবং কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াও পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতা ভিন্ন—অনুগ্রহ ভিন্ন পরমপুরুষার্থলাভে সমর্থ হয়েন না। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত দুঃখ নৈরাশ্য, নৈরপেক্ষ্য, আগ্রহ ও শ্রীভগবৎকৃপাই সংসার কূপ-পতিত জীবের উত্তরণাবলম্বন। ভোগাভিনিবেশ ও তজ্জনিত দুঃখাদি ব্যতিরেকে জীবের আত্মোন্নতির উপায়ান্তর দেখা যায় না। আবার কথঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিয়াও শ্রীভগবানের করুণা ভিন্ন কোন জীবই শ্রীভগবদ্দাস্যরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন না। অতএব জীবের প্রতি কৃপাবিস্তারার্থই শ্রীভগবান প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ দ্বারা যে কৃপা বিতরিত হয়, তদ্দ্বারাই জীবসকলের চরমোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের নিবাসভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্যমান সৌরজগতের অংশ। সৌরজগৎ নাক্ষত্রিক জগতের অংশ। নাক্ষত্রিক জগৎ চতুর্দ্দশ ভুবনের অংশ। চতুর্দ্দশ ভুবন বা সমুণাল লোকপদ্ম ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অংশ। শাস্ত্র সকল চতুর্দ্দশ ভুবনকে সমৃণাল লোকপদ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন এবং সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণও ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনকে ধ্যাননেত্র দ্বারা তদাকারেই দর্শন করিয়া থাকেন। ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অংশ। সমষ্টিব্রহ্মাণ্ড কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মধামের পরিধিস্থানীয়। অতএব ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডপরিধির একটি বিন্দু বলিলেও বলা যায়। বিন্দু যেমন রেখার অবয়ব ও রেখা হইতে অনতিরিক্ত, তদ্রূপ ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডও সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব এবং উহা হইতে অতিরিক্ত নহে। কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মধাম ওতপ্রোতভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অস্ত্যা আধারস্বরূপে গূঢ়রূপে অবস্থিত হইয়াও লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অংশেয়বৎ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মধাম শ্রীভগবানের বৈভববিশেষ—প্রকাশবিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডও শ্রীভগবানের বৈভববিশেষ। ব্রহ্মধাম তাঁহার ত্রিপাদবৈভব বা স্বরূপবৈভব এবং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পাদবৈভব বা মায়াবৈভব। উক্ত

উভয় বৈভবই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। তন্মধ্যে স্বরূপবৈভবে কেবল সিদ্ধগণের সহিত লীলা হইয়া থাকে। মায়াবৈভব সিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলনস্থান। ঐ স্থানে শ্রীভগবান সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের সহিত যুগপৎ লীলা করিয়া থাকেন। উভয় লীলাই নিত্য। স্বরূপবৈভবের লীলা অবিচ্ছেদে এবং মায়াবৈভবের লীলা ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রবাহরূপে সাধিত হইয়া থাকে। জ্যোতি-শ্চক্রস্থ একই সূর্য্য যেমন একটি বর্ষে পূর্ব্বাহ্নাদি সমাপন করিয়া বর্ষান্তরে আবার ঐ পূর্ব্বাহ্নাদি প্রকাশ করে, শ্রীভগবান তদ্রূপ অপ্রকট প্রকাশে নিজ ধামে থাকিয়াই প্রকট প্রকাশে এক ব্রহ্মাণ্ডে বাল্যাদিলীলা সমাপন করিয়া অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবার ঐ সকল লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলা অলাত-চক্রের ন্যায় বা প্রবাহের ন্যায় গমনাগমন করিতেছেন। জন্মাদি মৌষলান্ত লীলা সকল ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রকাশিত হইয়া আপনাদের নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। মায়াবৈভব স্বরূপবৈভবের ছায়ামাত্র। স্বরূপবৈভব বিম্বস্থানীয়, মায়াবৈভব উহার প্রতিবিম্ব। অতএব স্বরূপবৈভবের সহিত মায়াবৈভবের আশ্রয়াশ্রয়িভাব ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ আশ্রয়া-শ্রয়ভাবও আবার পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। শ্রীভগবান যে কি কৌশলে সম্বন্ধমাত্র চিদ্ভূতের সহিত জড়ভূতের তাদৃশ ঐশ্বরিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল তিনিই জানেন। চিজ্জড়ের একত্র সমাবেশ মানববুদ্ধির অগোচর। বুদ্ধির বিষয় না হইলেও সত্যের অপলাপ করা যায় না। জড়াজড়ের উপাদ্যুপাদিতভাব অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। মায়াবীর মায়ারহস্য বোধগম্য না হইলেও দর্শকে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারা যায় না। যোগেশ্বরেশ্বর মহামায়াবী মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব। তিনি বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার স্বরূপবৈভবকে যথেচ্ছ মায়াবৈভবে প্রকট করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপবৈভবীয় লীলা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন মায়াবৈভবীয় লীলাকে স্বরূপবৈভবীয় লীলারই প্রকাশবিশেষ বলা যায়। এইরূপে লীলাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও উভয়ের রূপভেদ অনিবার্য্য। অধিষ্ঠানভেদে প্রকাশের ভেদই বিধিসম্মত। এই নিমিত্তই অপ্রকটলীলা ও প্রকটলীলা স্বরূপতঃ এক হইয়াও বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তদ্দ্বারা অপর একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অনন্ত অপ্রকটলীলার সীমাবদ্ধ-প্রকট-প্রকাশে মুক্তজীবের প্রশান্তগম্ভীর সুখসাগর তরঙ্গায়িত এবং বদ্ধজীবের মুক্তিসুখসাগরে যথেষ্ট অবগাহন সাধিত হইতে থাকে।

শ্রীভগবানের সৃষ্টিব্যাপারেই মায়াবৈভবে স্বরূপবৈভবের প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষাবতার। যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, যিনি অংশতঃ বহুরূপ হইয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী হয়েন, যিনি আদি অবতার ও সকল অবতারের বীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার অংশ পরমাত্মস্বরূপে ভূতে ভূতে বিরাজ করেন, তাঁহারই নাম পুরুষাবতার। এই পুরুষাবতার সম্বন্ধে সাত্বততন্ত্রের উক্তি যথা—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

বিষ্ণুর অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম প্রথম পুরুষ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী, তাঁহার নাম দ্বিতীয় পুরুষ। আর যিনি সর্ব্বভূতের বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী, তাঁহার নাম তৃতীয় পুরুষ।

প্রথম পুরুষ। প্রলয়লীন, বাসনাবদ্ধ, পরমেশ্বরবিমুখ জীবসকলের প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। বাসনাবদ্ধ জীব সৃষ্ট সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া মৎসাম্মুখ্য লাভ করুক এইরূপ ইচ্ছা হইতেই শ্রীভগবানের সৃষ্টীচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সিসৃক্ষু পরমেশ্বর পুরুষরূপ স্বীকার পূর্ব্বক প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। ঐ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অপগমে স্পন্দ বা ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হয়। গুণক্ষোভে অব্যক্তা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিলীন বৃত্তিসমূহের স্পন্দন বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরের অভিভব, উপকার, পরিণাম ও সংযোগ দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহদাদি ক্ষিত্যন্ত তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম পুরুষই তত্ত্বসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি মহাবিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর রূপ বিরাট।

দ্বিতীয় পুরুষ। মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত কারণ-তত্ত্ব-সকলকে ত্রিবৃৎকৃত বা পরস্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ।

ইঁহার প্রবেশের পূর্ব্বে তত্ত্ব সকল অন্তর্নিহিত-ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে পরস্পর অসংহত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীহারবৎ সঞ্চরণ করিতে থাকে। সরল গতির দিক্‌পরিবর্ত্তন বা বক্রভাব বিরুদ্ধশক্তির প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতিরেকে অবয়ব-সন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রবল আকর্ষণ দ্বারা তত্ত্বসকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়া থাকেন। এইরূপে তত্ত্বসকল বক্রগতিবিশিষ্ট, ত্রিবৃৎকৃত, পঞ্চীকৃত, চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও আকুঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অভিভব পূর্ব্বক কেন্দ্রাবিচ্ছিন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে। কেন্দ্রাবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সকল দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয় না; কারণ সমষ্টির অবয়ব ব্যষ্টি বস্তু সকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া উহার সমান্তর অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি গর্ভোদশায়ী ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনিও বিরাটরূপী।

তৃতীয় পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্ম। স্থূল সৃষ্টির নিমিত্ত দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতারসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, তাঁহাকেই তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। ইনি ক্ষীরোদশায়ী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ। ইঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মাও বলা যায়।

গুণাবতার। স্থূলসৃষ্টি বা চরাচরসৃষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৃষ্টির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণের অবতার, সংহারের নিমিত্ত সংহারকর্ত্তা তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্ত্তা সত্ত্বগুণের অবতার। এই পালনকর্ত্তা সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণু ও পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুরুষ একই। রজোগুণাবতারের নাম ব্রহ্মা এবং তমোগুণাবতারের নাম শিব। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত পুরুষ নিয়ামক, অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিচালনকর্ত্তা। তাঁহারা যেভাবে পরিচালন করেন, গুণসকল সেইভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এইরূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতারূপ সম্বন্ধকে যোগ বলা হয়। অতএব গুণাবতার সকল কখনই ঈদৃশ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগ প্রাপ্ত অর্থাৎ গুণবদ্ধ হয়েন না। তন্মধ্যে

ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্যমাত্র রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষ্ণু সঙ্কল্পমাত্র সত্ত্বগুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষ্ণু কোনপ্রকারেই সত্ত্বগুণের সহিত যুক্ত হয়েন না।

ব্রহ্মা। সমষ্টিবিরাড়্‌রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি কেবল ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সমষ্টিজীবাত্মক সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়; আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই লোকাত্মক স্থূলরূপের নাম বৈরাজ। সূক্ষ্মরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক ও দেবাদির অগোচর; স্থূলরূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক ও দেবাদির গোচর। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থূলোপাধির নাম বিরাট্। সূক্ষ্মোপাধির নাম হিরণ্যগর্ভ। আর কারণোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টিবিরাট্। তদুপহিত চৈতন্যই ব্রহ্মা এবং তদন্তর্যামী চৈতন্যই দ্বিতীয় পুরুষ। বৈরাজসংজ্ঞক ব্রহ্মা, সৃষ্টি ও বেদপ্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাপ্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। আর কোন কোন মহাকল্পে তাদৃশ জীবের অভাব হইলে, দ্বিতীয় পুরুষই অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার জীবকোটিত্ব ও ঈশ্বরকোটিত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরাবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মা অবতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ কেহ সমষ্টিরূপ শ্রীভগবানের সন্নিকৃষ্টতা হেতু, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়া শ্রীভগবান ক্ষীরনীরবৎ তাঁহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে আবেশাবতারই বলিয়া থাকেন।

শিব। শ্রীশিব একাদশব্যূহাত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। ঐ একাদশ ব্যূহ যথা,—অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান এই তাঁহার অষ্ট মূর্ত্তি। তাঁহার দশ বাহু, পঞ্চ বদন এবং প্রত্যেক মুখে তিনটি তিনটি করিয়া নয়ন উক্ত হইয়া থাকে। প্রায়ই ব্রহ্মা শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্ত্তা হয়েন। উক্ত ত্রিবিধ সংহারকর্ত্তাকেই গুণাবতার বলা হয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন; তিনি নির্গুণ এবং শ্রীনারা-

য়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ, অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাবতার বিষ্ণু।

লীলাবতার। শ্রীভগবানের যে সকল অবতারে আয়াসরহিত, বিবিধ-বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিত্যনূতন উল্লাসতরঙ্গ দ্বারা তরঙ্গায়িত, স্বেচ্ছাধীন কার্য্যসকল দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলা হইয়া থাকে। লীলাবতার সকল পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। ঐ সকল লীলাবতারের মধ্যে অধিকাংশই অংশাবতার ও আবেশাবতার। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। পূর্ব্বে যে স্বয়ংরূপের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ংরূপ। কল্পাবতার ও যুগাবতার সকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত, এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ, কেহ অংশ ও কেহ আবেশ। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লীলাবতার যথা,—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ইহাঁরা প্রতিকল্পেই লীলার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরাবতার। মন্বন্তরাবতারসকলও লীলাবতার হইলেও, ইহাঁরা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন, সেই সেই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পালন করাতেই, ইহাঁদিগকে মন্বন্তরাবতারই বলা হইয়া থাকে। যে মন্বন্তরে যিনি মন্বন্তরাবতার হয়েন, তিনিই সেই মন্বন্তরের সর্ব্বশেষে উপাসনাবিশেষের প্রচারার্থ যুগাবতার হইয়া থাকেন। চারিটি যুগের যুগাবতার চারিটি। সত্যযুগের যুগাবতার শুক্ল, ত্রেতাযুগের যুগাবতার রক্ত, দ্বাপরযুগের যুগাবতার শ্যাম, আর কলিযুগের যুগাবতার সচরাচর কৃষ্ণ। কলিতে কচিৎ পীতবর্ণ যুগাবতারও দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

চতুঃসন। যে চারিজনের নামের আদিতে 'সন' শব্দ বিদ্যমান, তাঁহারাই চতুঃসন বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাদের নাম সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহাদের আকার পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বর্ণ গৌর। তাঁহারা জ্ঞানপ্রচারার্থ আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতেই ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত

অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান ত্রিপাদবৈভবে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক ও পাদ-বৈভবে প্রধানতঃ তপোলোক, এবং কর্ম্ম জ্ঞানপ্রচার। সৃষ্টির অধোমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিশেষ কোন কর্ম্ম থাকে না। মানবজাতির উৎপত্তির পর তাঁহারা জ্ঞানপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পীয় মহত্তম জীব। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞানিচর ভক্ত অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বভূতের সেবা-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক, পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া স্বসঙ্কল্পিত মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

নারদ। ইনিও পূর্ব্বকল্পীয় মহত্তম জীব এবং আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত এবং সৃষ্টির ঊর্দ্ধমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তির পর জগতে শুদ্ধাভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাঁর বর্ণ শুভ্র এবং সর্ব্বভূতের সেবাই ব্রত। ইনি পঞ্চরাত্র নামক আগমশাস্ত্রের প্রণয়নকর্ত্তা। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী হইয়াও বীণাযন্ত্রসহযোগে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন।

বরাহ। ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ চতুষ্পাদ বরাহ এবং দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার ও প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুক্লবর্ণ নৃবরাহ আবির্ভূত হয়েন। ইহাঁর বাসস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ ও মহর্লোক। বরাহাদি তির্য্যগ্‌-রূপী বা নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবতার সকলও কাল্পনিক নহেন; কারণ, ইহাঁ-দিগের মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়া থাকে এবং শতপথাদি ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে ও আরণ্যকে ও ইহাঁদের উল্লেখ দেখা যায়।

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা উক্ত হইয়াছে। কোন্ কল্পে কোন্ বিষয় কিরূপ ছিল, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বিশেষতঃ পুরাণে অনেকানেক উচ্চতর লোকের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লোকের ঘটনা এই ভূর্লোকের পক্ষে অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অতীত ঘটনাসকল এবং স্বর্গাদি উচ্চতর লোকের ঘটনাসকল কি ইদানীন্তন ঐতিহাসিক অল্পীয় ঘটনাসকলের সহিত এবং ভূর্লোকীয় ঘটনাবলীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত? মানবের দর্শনবিজ্ঞান যাহা

স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিপুল বিশ্ব-রাজ্যে থাকিতে পারে না ? উহা থাকিতে পারে না, বলা বা মনে করাও ধৃষ্টতার কার্য্য — দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র ! সীমাবদ্ধ স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব বোধ হয়, উত্তরোত্তর মুক্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আবার দম্ভাহঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া ঐ সকল পৌরাণিক ঘটনার প্রকারান্তরে অর্থকল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়া উক্ত হয়। বিশেষতঃ ঐরূপ কল্পনায় আংশিক অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক অংশের রূপক যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটি রূপক সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনামাত্র।

মৎস্য। বরাহাবতারের ন্যায় মৎস্যাবতারেরও ব্রাহ্মকল্পে বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া অপহৃত বেদের আহরণার্থ একবার এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিবার নিমিত্ত আর একবার মৎস্যদেবের অবতার উক্ত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে প্রতি মন্বন্তরেই একবার করিয়া মৎস্যাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অবতারে এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যায়। সংহিতাদিতেও এই অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

যজ্ঞ। শ্রীভগবান্ রুচি হইতে আকূতিতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম হরি।

নরনারায়ণ। শ্রীভগবান্ জ্ঞানপ্রচারার্থ ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর দুই সহোদরের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব চতুঃসনের ন্যায় ইহাঁদিগেরও চারিটিতে একটি অবতার গণনা করা হয়।

কপিল। কপিলদেব জ্ঞানপ্রচারার্থ কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বর্ণ কপিল। ইনি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন।

দত্ত। দত্ত বা দত্তাত্রেয় জ্ঞানপ্রচারার্থ অত্রিমুনি হইতে অনসূয়াতে আবির্ভূত হইয়া, অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

হয়শীর্ষা। হয়গ্রীব অবতারে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার যজ্ঞে সুবর্ণবর্ণে আবির্ভূত হইয়া বেদাপহারী মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশসাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেদের প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন।

হংস। হংস নামক অবতারে শ্রীভগবান্ ভক্তিপ্রচারার্থ জল হইতে হংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেবর্ষি নারদকে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন।

ধ্রুবপ্রিয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধ্রুবকে ধ্রুবগতি প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ধ্রুবপ্রিয় নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম পৃশ্নিগর্ভ।

ঋষভ। এই অবতারে শ্রীভগবান্ আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীতে অবতীর্ণ হইয়া পারমহংস্য ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন।

নৃসিংহ। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপে অবতরণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ও প্রহ্লাদের পরিত্রাণ সাধন করিয়াছিলেন। বেদে নৃসিংহদেবের উল্লেখ দেখা যায়।

কূর্ম্ম। কল্পের আদিতে পৃথ্বীধারণার্থ যে কূর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, তিনিই পুনর্ব্বার চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রমন্থন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। বেদে এই অবতারেরও বহুল প্রচার দেখা যায়।

ধন্বন্তরি। সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান্ ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মোহিনী। সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীভগবান মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া দৈত্যগণের ও মহাদেবের মোহন করিয়াছিলেন।

বামন। শ্রীভগবান ব্রাহ্মকল্পে ক্রমান্বয়ে তিনবার বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাস্কলি নামক দৈত্যের যজ্ঞে, দ্বিতীয়তঃ বৈবস্বত মন্বন্তরে ধুন্ধু নামক অসুরের যজ্ঞে এবং তৃতীয়তঃ ঐ মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে কশ্যপ হইতে অদিতিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিরাজার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি বাচ্ঞা করিয়াছিলেন। সংহিতাতে ও আরণ্যকে এই অবতারের উল্লেখ আছে।

পরশুরাম। বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে শ্রীভগবান গৌরবর্ণ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

শ্রীরাঘবেন্দ্র। বৈবস্বতমন্বন্তরীয় চতুর্ব্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় শ্রীভগবান

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত নবদুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল সংহার করিয়াছিলেন।

ব্যাস। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় দ্বাপরে শ্রীভগবান পরাশর হইতে সত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতরণপূর্ব্বক বেদরূপ কল্পতরুর শাখাবিভাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরে অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরে শ্রীভগবান রাম ও কৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তিতে যদুবংশে অবতরণ পূর্ব্বক পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন। অথর্ব্বসংহিতার দ্বিতীয় প্রপাঠকে পঞ্চমানুবাকে এই দুই অবতারের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। যথা—"নক্তং জাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।" ইতি। হে ঔষধে বৈষ্ণবদাহশমনি যোগমায়ে, ত্বং রামে বলরামে কৃষ্ণে চ জাতে প্রাদুর্ভূতে সতি জাতা অসি ভবসি অসিক্নি অসিক্নী অবৃদ্ধা তরুণীতি তদর্থঃ। হে বৈষ্ণবদাহ-শমনি যোগমায়ে, তুমি শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের পর তাঁহাদিগের তরুণী অনুজা হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলে।

বুদ্ধ। বর্ত্তমান কলিযুগের দুইসহস্র বৎসর গত হইলে, শ্রীভগবান্ অসুরমোহনার্থ গয়াপ্রদেশে বুদ্ধ নামে অবতরণ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

কল্কি। কলিযুগের অবসানে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে কল্কিরূপে অবতরণ করিয়া দস্যুপ্রকৃতি নরগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক কলাপ-গ্রামস্থ যোগযুক্ত চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরু দ্বারা পুনর্ব্বার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার করিবেন।

মন্বন্তরাবতার। যজ্ঞ প্রথম মন্বন্তরাবতার। ইনি লীলাবতারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় মন্বন্তরাবতার বিভু। ইনি বেদশিরা নামক পিতা হইতে তুষিতা নাম্নী জননীতে আবির্ভূত ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ করিয়াছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরাবতার সত্যসেন। ইনি ধর্ম্ম হইতে সুনৃতাতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ইন্দ্রের শত্রু সকল বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ মন্বন্তরাবতার হরি। ইনি হরিমেধা হইতে হরিণীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্র-শত্রু সকলের বিনাশসাধন ও কুম্ভীরের মুখ হইতে গজেন্দ্রের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্চম মন্বন্তরাবতার বৈকুণ্ঠ। ইনি শুভ্র হইতে বিকুণ্ঠাতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন ও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বৈকুণ্ঠলোক রচনা করিয়া-

ছিলেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরাবতার অজিত। ইনি বৈরাজ হইতে সম্ভূতিতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনিই উক্ত মন্বন্তরে কূর্ম্মাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বামনদেবই সপ্তম মন্বন্তরাবতার হইয়াছিলেন। অষ্টম মন্বন্তরাবতার সার্ব্বভৌম। ইনি উক্ত মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরন্দর নামক ইন্দ্র হইতে স্বর্গরাজ্য হরণ পূর্ব্বক বলিরাজাকে অর্পণ করিবেন। নবম মন্বন্তরাবতার ঋষভ। ইনি আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধরাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক শম্ভুনামক ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য অর্পণ করিবেন। একাদশ মন্বন্তরাবতার ধর্ম্মসেতু। ইনি আর্য্যক হইতে বৈধৃতাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিবেন। দ্বাদশ মন্বন্তরাবতার সুধামা। ইনি সত্যবহা হইতে সুনৃতাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিবেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরাবতার যোগেশ্বর। ইনি দেবহোত্র হইতে বৃহতীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিবেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার বৃহদ্ভানু। ইনি সত্রায়ণ হইতে বিনতাতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ মন্বন্তর পালন করিবেন। এককল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরাবতার হয়েন। অতএব ব্রহ্মার একমাসে ৪২০টি, একবৎসরে ৫০৪০টি ও শতবৎসরে ৫০৪০০০টি মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকেন।

যুগাবতার। যুগাবতার চারিটি। মন্বন্তরাবতার সকলই নিজ নিজ মন্বন্তরে যুগাবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সত্যযুগে শুক্লনামক যুগাবতার, ত্রেতাযুগে রক্তনামক যুগাবতার, দ্বাপরযুগে শ্যামনামক যুগাবতার, এবং কলিযুগে কৃষ্ণনামক যুগাবতারের কথা শ্রবণ করা যায়। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, জটিল, বল্কলাম্বর, কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী, যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট, অক্ষমালাবিভূষিত, দণ্ডকমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারীর বেশে অবতরণ করিয়া ধ্যান-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্বাহু, ত্রিমেখল, হিরণ্যকেশ, ত্রয্যাত্মা, এবং স্রুকস্রুবাদি দ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তিতে অবতরণ করিয়া যজ্ঞ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। দ্বাপরযুগে কখন শ্যামবর্ণ, কখন শুকপত্রবর্ণ, কখন হরিদ্বর্ণ ও কখন পীতবর্ণ হইয়া অবতরণ করিয়া থাকেন। অতীত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্ম অসতীকুসুমের ন্যায় বা নবীননীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন, বক্ষঃস্থলের বামভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিরূপ শ্রীবৎসচিহ্ন ও করচরণাদিতে পদ্মাদিরূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত এবং কৌস্তুভাদিলক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অর্চ্চনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কলিযুগে শ্রীভগবান্ কান্তিতে

অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বলকৃষ্ণবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ আবেশরূপে অবতরণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষ বিশেষ দ্বাপরে ও বিশেষ বিশেষ কলিতে স্বয়ং ভগবানই অবতরণ করিয়া থাকেন। যে দ্বাপরে ও যে কলিতে স্বয়ং ভগবানের অবতার হয়, সেই দ্বাপরে ও সেই কলিতে আর পৃথক্ যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। তৎকালে যুগাবতার শ্রীভগবানেই প্রবিষ্ট হইয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

স্বয়ংরূপাবতার। ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম শ্বেতবারাহ কল্পের বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগস্থ বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরযুগের সন্ধ্যাংশ সময়ে, অর্থাৎ ৮৬৩৮৮০ অব্দ গতে দক্ষিণায়নে, বর্ষাকালে, ভাদ্রমাসের অষ্টম দিবসে, কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, রোহিণী নক্ষত্রে, আয়ুষ্মান্ যোগে, কৌলব করণে, ষট্‌চত্বারিংশদ্দণ্ডে, রাত্রির চতুর্দ্দশ দণ্ড গতে, বৃষলগ্নে, শুক্রের ক্ষেত্রে, সূর্য্যের হোরায়, বুধের দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে, মঙ্গলের দ্বাদশাংশে, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে, বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে, মকররাশিস্থ মঙ্গলে, কন্যারাশিস্থ বুধে, তুলারাশিস্থ শুক্রে ও শনিতে, মীনরাশিস্থ বৃহস্পতিতে, সিংহরাশিস্থ রবিতে ও বৃশ্চিকরাশিস্থ রাহুতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে অবতরণ করিয়াছিলেন। বেদে, রামায়ণে, পুরাণে ও ভারতে, সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবতার গীত হইয়া থাকে। সকল বেদেই শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। নিদর্শনস্বরূপে ঋগ্‌বেদের তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

ঐ স্থানে উক্ত হইয়াছে,—"ওঁ কৃষ্ণং ত এম রুশতঃ পুরোভাশ্চরিষ্ণর্চ্চির্বপুষামিদেকং যদপ্রবীতা দধতে হ গর্ব্ভং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীদু দূতঃ" ইতি।

কৃষ্ণম্ এম প্রপদ্যাম, যস্য তে তব রুশতঃ রোচমানস্য পুরোভাঃ পুরস্তাদ্দীপ্তিঃ ভবিতা। চরিষ্ণু সঞ্চরণশীলম্ অর্চ্চিঃ বপুষাং বপুষ্মতাম্ একম্ ইৎ এব যৎ যং ত্বাম্ অপ্রবীতা, নাস্তি প্রকর্ষেণ বীতং গমনং যস্যাঃ সা নিগড়িতা দেবকী কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েতি ছান্দোগ্যে পঞ্চমপ্রপাঠকে দেবক্যা এব কৃষ্ণমাতৃত্বদর্শনাৎ, গর্ব্ভং হ দধতে ধারয়তি। সদ্যশ্চিৎ সদ্যঃ এব ইহ জাতঃ আবির্ভূতঃ সন্ দূতঃ মাতুর্বিয়োগদুঃখপ্রদঃ ভবসি ইতি তস্যার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি। তিনি পুরোভাগে দীপ্তিমণ্ডলমণ্ডিত। তিনি সঞ্চরণশীল তেজের ন্যায় অদ্ভুত শরীর ধারণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় শরীরী হয়েন। নিগড়িতা দেবকী তাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ করেন। তিনি দেবকীর গর্ব্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া ব্রজে গমন পূর্ব্বক জননীর সম্বন্ধে বিয়োগদুঃখপ্রদ হয়েন।

পুনশ্চ—ঋগ্বেদে ১০ম মণ্ডলে খিলসূক্তে এই মন্ত্রটি পঠিত হয়।

"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে।"

এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট।

সমস্ত বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে, ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও পুরাণেতিহাসে, এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আবার শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবরূপ পরম উৎকর্ষও বেদে উক্ত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের পরিশিষ্টখণ্ডে শ্রীরাধামাধবের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; যথা—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইত্যাদি। এই শ্রুতির অর্থ অতিশয় স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, পরন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান্, এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-নামের সর্ব্বাপেক্ষা মহিমাতিশয্যকথন দ্বারা এবং তদীয়চরণরেণুর লক্ষ্মীদেবীরও প্রার্থনীয়ত্বকথন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

মহাভারতোক্ত পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাঘটিত শতনামের মধ্যে যে কোন একটি নাম একবার কীর্ত্তিত হইয়া সেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন, "যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি সমস্ত বেদবল্লীর উপাদেয় ফল এবং চিদেকস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রদ্ধাসহকারে অথবা অবহেলা পূর্ব্বক একবারমাত্রও পরিকীর্ত্তিত হইলে, তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

"লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল স্পৃহা করিয়া থাকেন" এইপ্রকার শাস্ত্রোক্তিও দেখা যায়। লক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে—"কোন সময়ে লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকনে তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তপস্যার কারণ কি? লক্ষ্মী বলিলেন, আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে অভিলাষ করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তাহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ।" ইত্যাদি।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥"

অতএব মহাবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিলাস নহেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

এই নিমিত্তই ব্রহ্মসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে ;—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার শরীর। তিনি অনাদি ও সকলের আদি। গোপালন তাঁহার লীলা বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'গোবিন্দ'। তিনি নিখিল কারণের কারণ।

যে পরমপুরুষ রামাদিমূর্ত্তিসমূহে নিয়মিত শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া প্রপঞ্চে বিবিধ অবতার করিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি।

এই নিমিত্তই শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্যবেত্তা দেবর্ষি নারদ, অন্য কাহাকেও প্রণাম না করিয়া, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব তাঁহার লীলাতেই পরিব্যক্ত আছে। তাঁহার লীলার আলোচনাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী, এই ত্রিবিধ লোকই তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যলাভে সমর্থ হয়েন। বিষয়ী সকল শ্রবণ-মনোহর জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্যধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন মুমুক্ষু সকল ভবৌষধ জ্ঞানে তদীয় লীলার

আলোচনায় ক্রমশঃ তৎপরায়ণ হইয়া তদীয় দাস্য লাভ করিয়া থাকেন। আর মুক্তপুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী সকল আনন্দদায়কজ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় ক্রমশঃ মমতালাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, এবং ভক্ত সকল দুস্ত্যজ জ্ঞানে তদীয় লীলার আলোচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর আনন্দলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ কেবল মুক্ত ও মুমুক্ষুর আরাধ্য নহেন, পরন্তু তিনি বিষয়ীরও আরাধ্য দেবতা। তিনি কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি বনবাসী ও কি ভিক্ষু, সকলেরই আরাধ্য। তাঁহার অবতার নিখিল বিশ্বের আকর্ষক। বিশেষতঃ তাঁহার নরলীলা মধুর হইতেও সুমধুর। তিনি বাল্যলীলায় বালক্রীড়া দ্বারা সর্ব্বসত্ত্বমনোহর প্রকৃত বালক। তাঁহার পৌগণ্ডলীলা এবং কৈশোরলীলাও তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার সকল লীলাই মধুর, সকল লীলাই আনন্দময়। তাঁহাতে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মাধুর্য্যই বিরাজ করে। তাঁহাতে নবজলধরের সৌন্দর্য্য, বসন্তের সৌরভ্য, বিহগকুলের সৌস্বর্য্য ও কুসুমসমূহের সৌকোমল্য যুগপৎ বিরাজিত। তারকারাজিত সুনীল নভোমণ্ডল, প্রশান্তগম্ভীর অপার অম্বুরাশি, চপলারাজিত অম্বুদপটল, শান্ত নিঃশব্দ নিবিড় অরণ্যানী ও হিমানীমণ্ডিত শৈলশিখর তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য স্মরণ করাইয়া থাকে। তিনি স্বীয় শৈশবসৌকুমার্য্য, বালচাপল্য, পৌগণ্ডক্রীড়া ও কৈশোরবিহার দ্বারা নিখিল স্থাবরজঙ্গমের আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ঐতিহাসিক রহস্য, উপন্যাস নহে। তাঁহার অবতার বিশ্বরঙ্গে মানবনাট্য। তিনি মনুষ্যনাট্যে বিশ্বরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অবতারের লীলা সকলও ঐতিহাসিক ঘটনা, রূপককল্পিত নহে। রূপককল্পনা না হইলেও, ঐসকল ঐতিহাসিক ঘটনার অভ্যন্তরে যে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐসকল নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্য উদ্ভিন্ন হইলে, উহা মানবের হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যনাট্যে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তদীয় পার্ষদবৃন্দেরও অবতার হইয়া থাকে। তাঁহার পার্ষদবর্গও তাঁহার ন্যায় মনুষ্যনাট্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে ও পরে এই ধরাধামে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্ষদবর্গের অবতারে একটি ঘোরতর সুরাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হয়; কারণ, তদ্দ্বেষী অসুরবর্গেরও তদীয় পার্ষদবর্গের ন্যায় ধরাধামে আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। পার্ষদবর্গ জ্ঞানভক্তির

প্রচার দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনের সাক্ষাৎ সহায়, অতএব তাঁহার মিত্রপক্ষ, এবং অসুরবর্গ উক্ত কার্য্যের বাধা উৎপাদন দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনের পরম্পরায় সহায়, অতএব তাঁহার অরিপক্ষ। উভয়পক্ষের যুগপৎ আবির্ভাবে সুরাসুর-সংগ্রাম অনিবার্য্য; অতএব উভয় পক্ষের সংগ্রামেই মানবলীলার উপসংহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবলীলার উপসংহার হইলেও, লীলার পরিসমাপ্তি হয় না, অপ্রকটে অনন্তপ্রকাশে দেবলীলা হইতে থাকে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, "যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ"; "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।"

নিত্যধামের অনন্ত লীলাকেই দেবলীলা বা অপ্রকটলীলা বলা হয়। ঐ নিত্যধাম গোলোক ও পরব্যোম ভেদে দ্বিবিধ। গোলোকের নামান্তর কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোক নিত্যধামরূপ পদ্মের কর্ণিকারস্থানীয় এবং পরব্যোম উহার দলস্থানীয়।

"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥"

আথর্ব্বণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপিচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি। অগ্রে চ তস্যাদ্যা প্রকৃতী রাধিকা নিত্যনির্গুণসর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরীতি।"

ছান্দোগ্যে—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নীতি।"

মুণ্ডকে—"দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইতি।"

ঋগ্বেদে—"তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরীতি।"

গোপালোপনিষদে—"তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপালপুরী হি।"

শাস্ত্রে কৃষ্ণলোককে পদ্মের কর্ণিকারসদৃশ এবং পরব্যোমকে পদ্মের দলসদৃশ বলিয়াই বর্ণন করেন। ভক্তগণ ভক্তিভাবিত অন্তরে দর্শনও তদ্রূপেই করিয়া থাকেন। উহা ভক্তগণ কর্ত্তৃক দৃশ্য হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহে।

"প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদিগুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম॥"

প্রকৃতির পারে সর্ব্বগামী, অপরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক পরব্যোম। পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোকের দ্বারকা মথুরা ও গোকুল এই তিনরূপে অবস্থিতি। সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল, অর্থাৎ শ্রীগোকুলই কেন্দ্রস্থানীয়। গোলোক বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ ঐ শ্রীগোকুলেরই নামান্তর। শ্রীগোকুল শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই প্রকটকালে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আবার যখন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অপ্রকাশ হয়, তখন তিনি অপ্রকটপ্রকাশেই অবস্থান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, লীলা, ধাম ও গুণ প্রভৃতি সকলই অনন্ত। কেহই তাঁহার গুণাদির অন্ত পান না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিজগুণের অন্ত পান না।

শ্রুতি বলিতেছেন,—

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া।
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্থ সাবরণাঃ॥
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

হে ভগবন্, আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারা আপনার অন্ত পান না। দেবতাদিগের কথা দূরে থাকুক, আপনিও আপনার অন্ত পান না। সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজঃকণার ন্যায় কালচক্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপনার দেহমধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ভবৎপর্য্যবসিতা শ্রুতি সকল অতন্নিরসন-মুখে অর্থাৎ 'তন্ন তন্ন' বিচার করিয়া আপনাতেই ফলিত হইয়া থাকে।

ঐ কথাও ত্যাগ কর। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতরণ করিলে, যদি তাঁহার সেই অবতারলীলা বিচার করিতে অভিলাষ করা যায়, তবে মন ঐ লীলারও অন্ত পায় না। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তেই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইপ্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এক মুহূর্ত্তেই বৈকুণ্ঠনাথের সহিত অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। এরূপ আর কোথাও শ্রবণ করা যায় নাই। ইহা শ্রবণ করিলে, চিত্ত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার মোহনার্থ অসংখ্য গোধন ও গোপবালক এবং তাঁহাদিগের বসনভূষণাদি সমস্তই স্বয়ং রচনা করিয়া ব্রহ্মাকে ঐ সকল আবার চতুর্ভুজ নারায়ণের আকারে দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা মোহিত হইয়া অনেক স্তবস্তুতির পর বলিয়াছিলেন,—

"জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥"

হে প্রভো, বহু উক্তির প্রয়োজন নাই; যাহারা তোমার বৈভব জানি বলিয়া অভিমান করে, তাহারা জানুক; তোমার বৈভব আমার কিন্তু শরীর বাক্য ও মনের অগোচর।

শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথাও পরিত্যাগ কর। শ্রীবৃন্দাবনভূমির আশ্চর্য্য বিভুত্ব দেখ। শাস্ত্র বলেন, শ্রীবৃন্দাবন ষোল ক্রোশ ভূমি। সেই ষোলক্রোশ শ্রীবৃন্দাবনের একদেশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছিল। বলিতে বলিতে প্রভুর ঐশ্বর্য্যসাগর স্ফুরিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে লাগিলেন।

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥"

যাঁহার সমান নাই এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই, যিনি ত্র্যধীশ্বর ও পরমানন্দস্বরূপসম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপাল সকল উপহার লইয়া কিরীটকোটি দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের উগ্রসেনানুবৃত্তি আমাদিগের বিশেষ ব্যথা উৎপাদন করে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের ঈশ্বর হইয়াও যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। স্থূল সূক্ষ্ম ও সমষ্টির অন্তর্যামী তিন পুরুষ জগতের ঈশ্বর হইয়াও যাঁহার অংশ, সেই শ্রীকৃষ্ণই ত্র্যধীশ্বর।

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

লোমকূপে আবির্ভূত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব যাঁহার একটি নিশ্বাসপরিমিত কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।

'গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর। সেই অন্তঃপুরে পিতা মাতা ও বন্ধুগণ, যোগমায়ারূপা দাসী এবং মধুর রাসাদিলীলা সকল বিরাজ

করেন। সেই অন্তঃপুর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। সেই অন্তঃপুরের তলে পরব্যোম নামক মধ্যম আবাস অর্থাৎ বৈঠকখানা বাড়ী। সেই মধ্যম আবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং সেই মধ্যম আবাসেই অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ বিরাজ করেন।

"গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

গোলোক শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম এবং সর্ব্বোর্দ্ধবর্ত্তী অর্থাৎ কেন্দ্রস্থানীয়। উহার তলে হরিধাম অর্থাৎ পরব্যোম, মহেশধাম অর্থাৎ মুক্তিধাম এবং দেবীধাম অর্থাৎ মায়াধাম এই তিনটি লোক পর পর গোলোকের আবরণরূপে বিরাজিত। ঐ সকল ধামে যিনি যথাযোগ্য ঐশ্বর্য্য সকল বিধান করিয়াছেন, সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।

শ্রীকৃষ্ণের পরব্যোম নামক মধ্যম আবাসের পর শ্রীভগবানের স্বেদজলবাহিনী বিরজা নাম্নী নদী। ঐ বিরজাই কারণার্ণব। কারণার্ণবের একপারে পরব্যোম অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য ও অনন্ত ত্রিপাদবিভূতি এবং অপরপারে মায়াধাম অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বা পাদবিভূতি। এই ব্রহ্মাণ্ডই শ্রীভগবানের বহির্বাটী। এই বহির্বাটীর অধীশ্বরী প্রাকৃতসম্পদ্রূপা জগল্লক্ষ্মী। মায়া তাঁহার দাসী। এই স্থানেই জীবগণ বাস করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ হরিধাম, মহেশধাম ও দেবীধাম এই তিন ধামেরই অধীশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদবিভূতি বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতির কথা দূরে থাকুক, পাদবিভূতিরই অন্ত পাওয়া যায় না। পরিদৃশ্যমান্ এক একটি সৌরজগৎ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এমন ব্রহ্মাণ্ড অগণ্যই আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই একজন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা একজন করিয়া পালনকর্ত্তা ও একজন করিয়া সংহারকর্ত্তা আছেন। উহাঁদিগের সাধারণ নাম চিরলোক-পাল।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার সময় একদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার দর্শনার্থ দ্বারকায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দ্বারপাল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আগমনসংবাদ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "কোন্ ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, শুনিয়া

আইস।" দ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইল। ব্রহ্মা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি সনকপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।" দ্বারপাল যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মার উত্তর নিবেদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া ব্রহ্মাকে লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। দ্বারপাল তদনুসারে ব্রহ্মাকে লইয়া আসিল। ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার আগমনের কারণ পরে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ আমার একটি সংশয় অপনোদন করিতে হইবে। আপনি দ্বারপাল দ্বারা 'কোন্ ব্রহ্মা' এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহার কারণ কি? ব্রহ্মাণ্ডে মদতিরিক্ত আরও কি কোন ব্রহ্মা আছেন?" ব্রহ্মার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যই জনোন্মাদকরী মায়া। তিনি হাস্য করিবামাত্র সভামধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ঐ সকল ব্রহ্মার কেহ দশবদন, কেহ বিংশতিবদন, কেহ শতবদন, কেহ সহস্রবদন, কেহ লক্ষবদন, কেহ বা কোটিবদন। ব্রহ্মা সকলের সহিত লক্ষকোটিনয়নসমন্বিত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ন্যায় কত শত ব্রহ্মা ও কত শত অপর দেবতা আসিয়া মুকুটকোটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্পর্শ করিতেছেন। ঐ সকল মুকুট ও পাদপীঠের সংঘর্ষে ঘোরতর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রণামের পর ঐ সকল ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবের পর তাঁহারা যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "প্রভো, এই দাসগণকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, বলিতে আজ্ঞা হউক; আপনার আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, তোমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়াতেই আহ্বান করিয়াছিলাম। তোমাদিগের আর কোন দৈত্যভয় নাই ত?" তাঁহারা বলিলেন, "আপনার প্রসাদে দৈত্যভয়ের সম্ভাবনা কোথায়! আপনার অবতারে এই পৃথিবীর দৈত্যভয়ও অন্তর্হিত হইয়াছে।" প্রত্যেক ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাই এইপ্রকার উত্তর করিলেন। কিন্তু একজন অপরজনকে লক্ষ্য করিলেন না। অধিকন্তু সকলেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। ইহা আশ্চর্য্যও নহে। দ্বারকাপুরীর বৈভবই এইরূপ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ একে একে আহূত ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণের সকলকেই বিদায় করিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা

সকলই দেখিলেন। দেখিয়া সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভো, আমার সংশয় নিবৃত্ত হইয়াছে, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া স্বধামে গমন করিলেন।

গোলোকাভিধেয় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থান। এই তিন ধাম তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণ। তিনি এই তিন ধামের অধীশ্বর বলিয়াই তাঁহাকে ত্র্যধীশ্বর বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তি হইল। অমনি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥"

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্য ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।

তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছতিতি,
পীতাম্বর বিজুলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী ॥"

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥"

"তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম॥
সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥ ধ্রু॥

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোম-স্বরূপের গণে।
যিঁহো সব অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা॥
সেইতো মাধুর্য্য সার, অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি॥
গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ॥
সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।

আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী, সর্ব্বাশ্রয়॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত॥
কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখ মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥"

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥"

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥"

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়,
ত্রিজগত করিল কামময়॥
সখি হে! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে,
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ॥ ধ্রু॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥

কর নথ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসিকাবাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোকে করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পীতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন॥
না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলে আঁখি দুটি,
তাহে দিলে নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য-সৃজনে॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু, মুখ সুমধুর-ইন্দু,
অতিমধুস্মিত সুকিরণ।

এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন॥"

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

"সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ ধ্রু॥
কৃষ্ণাঙ্গলাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক ব্যাপে যার পুর॥
স্মিতকিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুপুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে?

নীবী খসায় পতি-আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে॥"

অভিধেয়তত্ত্ব।

সম্বন্ধতত্ত্ব বলা হইল। অতঃপর অভিধেয়তত্ত্ব বলিব। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় বলিয়া নিশ্চিত হয়েন।

"শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥"

শ্রুতিই মানবের মাতা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তোমার আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি ভ্রাতৃগণও জননী ও ভগিনীরই অনুগত। অতএব হে মুরহর, তুমিই একমাত্র আশ্রয়, ইহা সত্য বুঝিয়াছি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে, স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপে ও স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; স্বরূপবিলাস শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ; স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা; স্বরূপশক্তিবিলাস শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীলক্ষ্মী; স্বরূপশক্তিবৃত্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব; স্বরূপ-

শক্তিবৃত্তিবিলাস বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। অবতার সকল স্বরূপবিলাসের অংশ; পরিকর সকল স্বরূপশক্তির বা স্বরূপশক্তিবিলাসের অংশ। স্বরূপবিলাসের অংশ-ভূত অবতার সকল শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়াই গণ্য হয়েন। তটস্থাশক্তিরূপ জীব সকল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। এই সকল স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠে ও ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করিয়া থাকেন। বিভিন্নাংশ জীব আবার নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার ভেদে দুইপ্রকার। যাঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যমুক্ত। তাঁহারা পার্ষদমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিত্য বহির্ম্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসংসার। তাঁহারা অনাদিবহির্ম্মুখতা বশতঃ সংসারবদ্ধ হইয়া সংসারদুঃখ ভোগ করেন। তাঁহাদিগের বহির্ম্মুখতা নিবন্ধনই মায়া তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া সংসারদুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সংসার-দুঃখ আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। এই নিমিত্তই সংসারদুঃখকে ত্রিতাপ বলা হয়। জীব কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ত্রিতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যে জীব সাধুরূপ বৈদ্য লাভ করেন, তিনিই তদুপদেশে সংসাররোগ হইতে মুক্ত হয়েন। সাধুবৈদ্যের উপদেশরূপ মন্ত্রের বলেই জীবের মায়াপিশাচীর আবেশ ত্যাগ হইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিতাপেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখনই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পুনশ্চ কৃষ্ণের নিকট গমন করেন।

> "কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
> স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
> উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
> স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কতপ্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তাহারা আমাকে দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা নিবৃত্ত হইল না। হে যদুপতে, এখন আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিয়োগ কর।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বপ্রধান অভিধেয়। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, এই তিনটিই ভক্তিমুখাপেক্ষী। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতিতুচ্ছ। কর্ম্মাদি ঐ অতিতুচ্ছ নিজফলও আবার ভক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না;

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

শুভাশুভ-কর্ম্ম-লেপ-রহিত ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানের একটি নাম নৈষ্কর্ম্ম্য। নৈষ্কর্ম্ম্যাভিধেয় জ্ঞান আবার অবিদ্যাখ্য অঞ্জনের অর্থাৎ উপাধির নিবর্ত্তক হয়। তাদৃশ জ্ঞানও যদি ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হয়, তবে তাহা কোনরূপেই শোভা পায় না, অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালেও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে কাম্য-কর্ম্ম ও অকাম্যকর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, ভক্তির আকারে আকারিত না হইলে, কি কখন শোভা পাইতে পারে? যোগীর যোগ, কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান বা মন্ত্রীর মন্ত্র কৃষ্ণার্পণ ব্যতিরেকে কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না।

ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও যোগ কিছু কিছু সিদ্ধি উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল সিদ্ধিও আবার চিরস্থায়িনী হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানও তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর। যে স্বসত্তার জ্ঞান নাস্তিকেরও আছে, নাস্তিকেরাও যাহার অপলাপ করিতে সাহসী হয় না, জ্ঞানীর জ্ঞানও সেই স্বসত্তাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন ফলই উৎপাদন করিতে পারে না। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

যাঁহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গলই লাভ করা যায়, হে বিভো, তোমার সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান-লাভার্থে ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্মজ্ঞানলাভার্থে চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।

জ্ঞানী যে মুক্তির নিমিত্ত প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করেন, কৃষ্ণোন্মুখ জীব তাহা অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস হইয়াও, তাহা ভুলিয়াছেন। ভুলিয়াছেন বলিয়াই মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। বদ্ধ হইয়াও যে জীব তদবস্থাতেই গুরুসেবা দ্বারা কৃষ্ণভজনে রত হয়েন, তিনিই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া জীব বর্ণাশ্রমাচাররূপ স্বধর্ম্মের আচরণ করিলেও, ঐ স্বধর্ম্ম তাঁহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন দূরে থাকুক নরকযাতনা হইতেও মোচন করিতে পারে না।

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

বিরাট্ পুরুষের মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণতারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি উক্ত বর্ণাশ্রম সকলের সাক্ষাৎ জনকস্বরূপ সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না, সুতরাং যিনি সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তিনি কর্ম্মলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হয়েন।

কর্ম্মীর ন্যায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উদয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন; কিন্তু কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত তাঁহার সেই জ্ঞান যে চিত্তশুদ্ধিও উৎপাদন করিতে পারে নাই, তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব তাঁহারও অধঃপতনই হইয়া থাকে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

হে অরবিন্দলোচন, যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব হেতু মলিনচিত্ত হয়, এবং সংসারমধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিমুক্ত

বোধ করিয়া তোমার পাদপদ্মের সমাদর করে না। যাহারা তোমার পাদপদ্মকে সমাদর করে না, তাহাদের গতিও সেইরূপই হয়। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করিয়াও অহঙ্কার বশতঃ উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যতুল্য; মায়া অন্ধকারসদৃশী। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই।

"শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥"

মুনিগণ সকল হইতে বৃহত্তমত্ব হেতু যে তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তত্ত্বই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদ, অর্থাৎ, শ্রীভগবানের নির্বিকল্পসত্তারূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্ররূপাদি-বিকল্প-বিশেষ-বিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের সোপানস্বরূপ। ঐ নির্বিকল্প ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জড়ের প্রতিযোগিস্বরূপ, অজস্রসুখস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য দুঃখের প্রতিযোগিস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল; কারণ, আত্মাই স্বপ্রকাশত্ব হেতু ও নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্ব হেতু তত্তদ্রূপে প্রতীত হয়েন; তিনি নিত্যপ্রশান্ত অর্থাৎ নিত্যক্ষোভরহিত, অভয়, বিশোক; তিনি বহুকারকসাধ্য-ক্রিয়াফলপ্রকাশক-শব্দ-বর্জ্জিত অর্থাৎ উৎপত্তি বিকার প্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুর্বিধ কর্ম্মফলের প্রকাশক কর্ম্মকাণ্ড-রূপ শব্দ তাঁহার বোধক হয় না; তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্যত্বাদি-দোষ-রহিত, সম অর্থাৎ উচ্চনীচভাবশূন্য, সদসতের পর অর্থাৎ কার্য্যসকল ও কারণসকলের উপরিস্থিত; অধিক কি, স্বয়ং মায়াও তদভিমুখস্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষসকলে অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করেন।

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।

ঐ সকল জীব যদি একবার বলে 'কৃষ্ণ, আমি তোমার', তাহা হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করিয়া থাকেন।

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥"

যে একবার আমার শরণাগত হইয়া বলে, 'কৃষ্ণ, আমি তোমার', আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত।

ভুক্তিকামী কর্ম্মী মুক্তিকামী জ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগী যদি সুবুদ্ধি হয়েন, তবে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভের নিমিত্ত দৃঢ়ভক্তিযোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥"

অকাম একান্তভক্ত, উক্তামুক্ত-সর্ব্বকাম কর্ম্মী ও যোগী এবং মোক্ষকাম জ্ঞানী যদি উদারবুদ্ধি হয়েন, তার তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রার্থনা না করিয়াও যদি কোন অন্যকামী অন্যকামনায় শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার কাম্য বস্তু সকল না দিয়া নিজচরণই প্রদান করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেন, অজ্ঞ জীব অমৃতস্বরূপ আমার চরণ ত্যাগ করিয়া বিষতুল্য বিষয় প্রার্থনা করিলেও, আমি বিজ্ঞ হইয়া কেন তাহাকে বিষয় প্রদান করিব? এইপ্রকার বিবেচনা করিয়াই তিনি সেই অজ্ঞ জীবকে স্বচরণামৃত প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা বিষয় ভুলাইয়া থাকেন।

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥"

শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যাদিকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলেও সহসা পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ, তাহাদিগের প্রার্থিত লাভের পরও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

যিনি কামনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তিনি কৃষ্ণরস পাইয়া কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দাস্য অভিলাষ করিয়া থাকেন।

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥"

মহাত্মা ধ্রুব বলিয়াছিলেন,—হে প্রভো, লোকে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্র সকলের পক্ষে দুর্লভ তদীয় চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি ; অতএব আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর কোন বর প্রার্থনা করি না।

যেমন নদীপ্রবাহে নীয়মান তৃণকাষ্ঠাদির মধ্যে কখন কোনটি তীর প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কেহ কোন ভাগ্যে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

"মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিৎ তরতি কশ্চন ॥"

মহাভাগ অক্রূর বলিয়াছিলেন,—আমি অধম কংসের দূত হইলেও বঞ্চিত হইব মনে করি না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিব। কালপ্রবাহে নীয়মান হইয়াও কেহ কখন তীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যের উদয়ে যখন কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁহারই কৃপায় শ্রীকৃষ্ণে রতি হইয়া থাকে।

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥"

হে অচ্যুত, এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হয়। জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হইলে, তাঁহার কৃপায় কার্য্যকারণনিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি অবশ্য ভাগ্যবান্। সেই ভাগ্যবান্ পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয় স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ন-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

হে প্রভো, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ভবৎকৃত উপকার স্মরণে বর্দ্ধিতপরমানন্দ হইয়া কিছুতেই আপনাকে ঋণমুক্ত বোধ করিতে পারেন না; কারণ, আপনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা জীবের বিষয়বাসনা নিরসন পূর্ব্বক নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যদি কাহারও সাধুসঙ্গের গুণে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি ভক্তির ফল প্রেম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার সংসারক্ষয় আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার প্রেমের সিদ্ধিতেই সংসারক্ষয়েরও সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

যিনি বিষয়ে অত্যাসক্ত বা অতিবিরক্ত নহেন, তাদৃশ ব্যক্তিরই কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, ভক্তিযোগ লাভ হয়, এবং তাঁহার ঐ ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হইয়া থাকে।

মহৎকৃপা ব্যতিরেকে কোনরূপেই ভক্তি লাভ হয় না। যাঁহার ভক্তি লাভ না হয়, তাঁহার, কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরের কথা, সংসারেরও ক্ষয় হয় না।

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্‌গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

জড়ভরত বলিয়াছিলেন,—হে রহূগণ, সাধুর চরণরেণু দ্বারা অভিষেক ভিন্ন, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস দ্বারা, তত্তৎকর্ম্মের তত্তদ্দেবতার উপাসনা দ্বারা, অথবা জল অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

মহাত্মা প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—যাবৎ বিষয়াভিমানরহিত সাধুগণের

চরণধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, তাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়।

সকল শাস্ত্রই একবাক্যে সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গের অতুল প্রভাব। অত্যল্পকাল সাধুসঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

সূতগোস্বামী বলিয়াছিলেন,—বিষ্ণুভক্তগণের অত্যল্প সঙ্গও যে ফল প্রদান করে, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না। মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদিসুখের সহিত উহার তুলনা করিব কিরূপে?

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চনপরায়ণ হও; আমাকে নমস্কার কর; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে আজ্ঞাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছ, সেই সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার এই শেষ আজ্ঞাকেই বলবতী বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমাকে ঐ সকল ধর্ম্মের ত্যাগজন্য সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আজ্ঞা কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান এই তিনটি বেদোক্ত ধর্ম্ম। শেষোক্ত ভক্তিযোগরূপ আদেশই বলবান্। এই শেষোক্ত বলবান্ আদেশের বলে যদি কাহারও ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

বিষয়ে নির্বেদবিশিষ্ট ত্যাগী পুরুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর সকাম পুরুষ সকলই কর্ম্মাধিকারী। কর্ম্মাধিকারী কর্ম্ম করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় বা আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবেন। বিষয়ে নির্ব্বেদ জন্মিলে, তিনি জ্ঞানযোগীর সঙ্গে জ্ঞানী হইয়া আমার ভজন করিবেন; আর বিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মিয়া যদি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তবে ভক্তিযোগীর সঙ্গে ভক্ত হইয়া আমার ভজন করিবেন। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা সুদৃঢ়নিশ্চয়। যাঁহার বিশ্বাস হয়, তিনি আর কর্ম্ম করেন না, কৃষ্ণে ভক্তিই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, কর্ম্মত্যাগজন্য প্রত্যবায় হয় না; কারণ, কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। সকাম কর্ম্ম সকল বন্ধজনক বলিয়া হেয়। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তি-মুক্তির সহায় হয় বলিয়া উপাদেয়। স্ত্রীপুত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবগণের সেবা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সেবনই নিষ্কাম কর্ম্ম। সর্ব্বভূতের সেবাও শ্রীভগবানেরই সেবা হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায়। পরম্পরায় সেবা হইতে সাক্ষাৎ সেবাই গরীয়সী। গরীয়সী ভগবৎসেবা দ্বারা সকল সেবাই সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া যায়।

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥"

যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে, তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত অর্থাৎ পুষ্ট হয়, যেমন প্রাণের তর্পণ করিলে, ইন্দ্রিয়বর্গের তর্পণ সিদ্ধ হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই, সকল দেবতার সকল ভূতের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাভেদে ভক্তির অধিকারী তিনপ্রকার হয়েন। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধ, যাঁহার শ্রদ্ধা কোন রূপেই বিচলিত হইবার নয়, তিনি উত্তম অধিকারী। শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ না হইয়াও যিনি দৃঢ়শ্রদ্ধ হয়েন, তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে নিপুণ নহেন এবং শ্রদ্ধাও যাঁহার কোমল, তিনিই কনিষ্ঠ অধিকারী।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব এবং সেই আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। উত্তম ভক্ত অভেদদর্শী। অভেদদর্শী হইলেও, সময়ে সময়ে পূর্ব্বানুভূত ভেদের স্মরণ হওয়ায়, তাঁহারও জীবে দয়া সম্ভব হইয়া থাকে।

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।

আর অজাতরতি ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত। এই কনিষ্ঠ ভক্ত আবার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাজাতভক্তিবিশিষ্ট ও লোকপরম্পরাপ্রাপ্তশ্রদ্ধাজাতভক্তিবিশিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। প্রথমোক্ত ভক্তই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত এবং শেষোক্ত ভক্ত গৌণ কনিষ্ঠ ভক্ত। গৌণ কনিষ্ঠ ভক্তের সর্ব্বাদরলক্ষণ ভক্তগুণের অনুদয় হেতু, তিনি কেবল প্রতিমাতেই হরিবুদ্ধিতে পূজা করিয়া থাকেন, হরিভক্তজনের বা অন্যের পূজা করেন না। অতএব ইনি সম্প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণভক্তের সকল মহাগুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকল শ্রীকৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণভক্তের অসংখ্য গুণ, বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণভক্ত কৃপালু, পরদ্রোহরহিত, সত্যসার, সমদুঃখসুখ, অসূয়াদিদোষরহিত, বদান্য, কোমলচিত্ত, সদাচার, অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরিগ্রহ, সর্ব্বোপকারক, শান্ত অর্থাৎ সংযমিতান্তঃকরণ, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ অর্থাৎ ব্যবহারিকক্রিয়ারহিত, স্থির অর্থাৎ অব্যগ্র, ক্ষুৎপিপাসাদিজয়ী, মিতভোজী, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর অর্থাৎ নির্বিকার, করুণ অর্থাৎ করুণাবশে কর্ম্মকারী, মৈত্র অর্থাৎ অবঞ্চক, কবি অর্থাৎ বন্ধমোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ অর্থাৎ পরের বোধনে নিপুণ ও মৌনী অর্থাৎ বাচালতারহিত।

কৃষ্ণভক্তের সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে। মূলীভূত সাধুসঙ্গের পর সাধনাঙ্গ দ্বারা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গই মুখ্য। সাধুসঙ্গ যেমন কৃষ্ণপ্রেমলাভে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনি অসৎসঙ্গ

ত্যাগও অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরস্ত্রীসঙ্গকারী ও কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকলই অসাধু। ঈদৃশ অসাধুকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম এবং ঐশ্বর্য্য—সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। পরস্ত্রীকামুক ব্যক্তির ন্যায় চঞ্চলমতি ও দেহাত্মবুদ্ধি ব্যক্তিরও সঙ্গ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। অসৎসঙ্গ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ' ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, বদান্য ও সর্ব্বসমর্থ, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কথনই শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবেন না। যিনি সংসারভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই শরণাগত বলা যায়। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই অকিঞ্চন বলা যায়। অতএব শরণাগত ও অকিঞ্চন একই হইতেছেন। আত্মসমর্পণ উহাদেরই অন্তর্গত। কারণ, দেহদৈহিক বিষয়ের ত্যাগরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াই শরণাগত বা অকিঞ্চন হওয়া যায়। শরণাপত্তির ছয়টি আকার,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥"

আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ যাহা অনুকূল তাহার কর্ত্তব্যতাবোধে নিয়মকরণ, প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাসকরণ, রক্ষাকর্ত্তার স্বরূপে অঙ্গীকরণ, আত্মনিবেদন ও কাতরতাপ্রকাশ, এই ছয়টির নাম শরণাপত্তি। তন্মধ্যে রক্ষাকর্ত্তার স্বরূপে অঙ্গীকরণই মূল শরণাপত্তি; কারণ, শরণাপত্তি শব্দে আশ্রয়রূপে বা রক্ষকরূপে স্বীকারই বোধিত হয়। অপর পাঁচটি উহার অঙ্গ।

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে নিজের আশ্রিত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

মনুষ্য যখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক সেবাভিলাষে পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করেন, তথনই জীবন্মুক্ত হইয়া মৎসদৃশৈশ্বর্য্যভোগের যোগ্য হয়েন।

অতঃপর সাধনভক্তির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহা হইতে সাধ্য-ভক্তিরূপ প্রেম লাভ হয়, তাহাই সাধনভক্তি। শ্রবণাদি ক্রিয়া সকলই সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ; কারণ. উহারা সাধনভক্তি হইতে অভিন্ন ও সাধনভক্তির পরিচায়ক। প্রেমভক্তির জনকতা উহার তটস্থলক্ষণ; প্রেম-ভক্তির উৎপাদনকার্য্য সাধনভক্তি না হইয়াও সাধনভক্তির বোধক হয়। যদি বল,—নিত্যসিদ্ধ প্রেমের আবার উৎপত্তি কি? তাহার উত্তর এই,—নিত্যসিদ্ধ প্রেমের হৃদয়ে প্রকাশই তাহার উৎপত্তি। শ্রবণাদিক্রিয়ারূপ সাধন-ভক্তি নিত্যসিদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ে প্রকট করিয়াই তাহার উৎপাদিকা হয়েন।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উৎপাদ্য নহে। প্রেম উৎপাদ্য না হইলেও, শ্রবণাদি সাধনভক্তি দ্বারা নির্ম্মল চিত্তেই প্রেমের উদয় হয় বলিয়াই প্রেমকে সাধ্য এবং শ্রবণাদিকে উহার সাধন বলা যায়।

এই সাধনভক্তি আবার বৈরী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। রাগহীন ব্যক্তি শাস্ত্রশাসন অনুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির তাদৃশী ভক্তিকে বৈধী সাধনভক্তি বলা হয়। শাস্ত্রের শাসন দুইপ্রকার। একপ্রকার শাসন বিধিমুখ এবং অপরপ্রকার শাসন নিষেধমুখ। এই উভয়মুখ শাসন হইতেই রাগহীন ব্যক্তির ভজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিধিমুখ শাসন সকলের অকরণে প্রত্যবায়ের ভয়ে এবং নিষেধমুখ শাসন সকলের লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের ভয়েই প্রবৃত্তি জানিতে হইবে।

সাধনভক্তির অঙ্গ বহুবিধ। ঐ সাধনাঙ্গ সঙ্ক্ষেপতঃ চতুঃষষ্টিপ্রকার উক্ত হয়েন। উক্ত চতুঃষষ্টি অঙ্গ যথা,—

১। গুরুপাদাশ্রয়—সংসার অনর্থকর ও দেহ ক্ষণভঙ্গুর বুঝিয়া সত্বর প্রেম-সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত গুরুদেবের চরণাশ্রয়।

২। শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ। আদিপদে ভজনরীতির শিক্ষণ বোধিত হয়।

৩। অকপটহৃদয়ে শ্রীভগবদ্বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের সেবন।

৪। শ্রীগুরুদেবের নিকট সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ও শিক্ষা।

৫। সজাতীয় সাধুগণের আচরিত শাস্ত্রবিধির অনুসরণ।

৬। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ সর্ব্ববিধ ভোগের ত্যাগ।

৭। শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস। ঐ বাস সামর্থ্যসত্ত্বে কায় দ্বারা এবং অসামর্থ্যে মানসে।

৮। যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ না করা।

৯। একাদশী প্রভৃতি বিধিবোধিত দিনে উপবাস।

১০। আমলকী ও অশ্বত্থ বৃক্ষের এবং গো ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পূজা।

১১। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জন। তন্মধ্যে সেবাপরাধ ৩২টি। তদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে ৪২টি সেবাপরাধ উক্ত হয়। অতএব সেবাপরাধ সর্ব্বসমেত ৭৪টি। ১ যানারোহণে বা পাদুকা লইয়া ভগবদ্‌গৃহে গমন। ২ ভগবদ্‌যাত্রাদির অসেবন। ৩ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা। ৪ অশুচি হইয়া ভগবৎপ্রণামাদি। ৫ এক হস্ত দ্বারা প্রণাম। ৬ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দেবতান্তরের প্রণামাদি। ৭ তদগ্রে পাদপ্রসারণ। ৮ তদগ্রে বাহুদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশনরূপ পর্য্যঙ্কবন্ধন। ৯ তদগ্রে শয়ন। ১০ তদগ্রে ভোজন। ১১ তদগ্রে মিথ্যাভাষণ। ১২ তদগ্রে উচ্চভাষণ। ১৩ তদগ্রে অন্যের সহিত কথোপকথন। ১৪ তদগ্রে রোদন। ১৫ তদগ্রে কলহ। ১৬ তদগ্রে কাহারও নিগ্রহকরণ। ১৭ তদগ্রে কাহাকেও অনুগ্রহকরণ। ১৮ তদগ্রে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ। ১৯ ভগবৎসেবার সময় কম্বলাবরণ। ২০ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে পরনিন্দা। ২১ তদগ্রে পরপ্রশংসা। ২২ তদগ্রে অশ্লীলভাষণ। ২৩ তদগ্রে অধোবায়ুত্যাগ। ২৪ সামর্থ্য-সত্ত্বে বিত্তশাঠ্য বশতঃ গৌণ উপচার দ্বারা ভগবদুৎসবাদি নির্ব্বাহ করা। ২৫ অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ। ২৬ শ্রীকৃষ্ণকে কালোৎপন্ন ফলাদি অনর্পণ। ২৭ কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা। ২৮ শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৯ শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া অন্যকে প্রণাম করা। ৩০ শ্রীগুরুর নিকট তাঁহার স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান। ৩১ শ্রীগুরুর নিকট নিজের প্রশংসা করা। ৩২ দেবতার নিন্দা। ৩৩ রাজান্নভক্ষণ। ৩৪ অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ। ৩৫ বিধিরহিত উপাসনা। ৩৬ বাদ্য ব্যতিরেকে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন। ৩৭ কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষ্যের সংগ্রহ। ৩৮ পূজাকালে মৌনভঙ্গ। ৩৯ পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন। ৪০ গন্ধমাল্যাদি না দিয়া ধূপদান। ৪১ অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজা। ৪২—৫৫ দন্ত-ধাবন না করিয়া, স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া, রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া, দীপ স্পর্শ করিয়া, শব স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ নীলবর্ণ অধৌত পরকীয় ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃত দর্শন করিয়া, ক্রোধ করিয়া, শ্মশানে গমন করিয়া, কুষ্মাণ্ড ও পিণ্যাক

ভক্ষণ করিয়া, তৈল মাখিয়া এবং ভুক্তবস্তুর অপরিপাকাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ করা ও কর্ম্ম করা। ৫৬ বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। ৫৭ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে তাম্বূল চর্ব্বণ। ৫৮ এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন। ৫৯ আসুরকালে শ্রীকৃষ্ণের পূজা। ৬০ কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা। ৬১ স্নানের সময়ে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ। ৬২ পর্য্যুষিত ও যাচিত পুষ্প দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা। ৬৩ পূজার সময় থুৎকার করা। ৬৪ পূজা-বিষয়ে গর্ব্ব করা। ৬৫ তির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ করা। ৬৬ অধৌতপদে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করা। ৬৭ অবৈষ্ণবপক্কান্ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা। ৬৮ অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা। ৬৯-৭০ গণেশের পূজা না করিয়া ও কাপালিককে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা। ৭১ নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে স্নান করান। ৭২ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা। ৭৩ নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করা। ৭৪ শ্রীকৃষ্ণের শপথাদি করা।

যদি কখন কোন অপরিহার্য্য কারণে উক্ত অপরাধ সকলের মধ্যে কোন না কোন অপরাধ ঘটে, তবে নিয়ত সেবা বা শরণাপত্তি অথবা নামাশ্রয় দ্বারাই উক্ত অপরাধ হইতে আপনাকে মোচন করিতে হইবে। ইচ্ছা পূর্ব্বক সেবাপরাধ নামাপরাধের মধ্যেই গণ্য হইবে।

নামাপরাধ দশবিধ।—১ বৈষ্ণবনিন্দাদি। ২ শিবকে বিষ্ণু হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান। ৩ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি অবজ্ঞা। ৪ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা। ৫ নামে অর্থবাদ। ৬ নামে কুব্যাখ্যা বা কষ্টকল্পনা। ৭ নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮ অন্য শুভকার্য্যের সহিত নামকে সমান মনে করা। ৯ শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা। ১০ নামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি।

এই দশটি নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যদি দৈবাৎ অনবধানতাদি বশতঃ কখন কোন নামাপরাধ ঘটে, তবে তখনই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়াও যদি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে না পারা যায়, তবে নামেরই শরণাপন্ন হইয়া অবিচ্ছেদে নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারিবে।

১২। অবৈষ্ণব জনের সঙ্গত্যাগ। অবৈষ্ণব শব্দে বিষ্ণুদীক্ষারহিত ব্যক্তি এবং বিষ্ণুদীক্ষা সত্ত্বেও বৈষ্ণবাচাররহিত ব্যক্তি বুঝায়।

১৩। অনধিকারি-বহুশিষ্য-করণ ত্যাগ।

১৪। ভক্তিবিরোধী বহু গ্রন্থের অনুশীলন ত্যাগ।

১৫। লাভালাভে হর্ষবিষাদ ত্যাগ।

১৬। শোকমোহাদি ত্যাগ।

১৭। অন্য দেব ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা ত্যাগ।

১৮। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা ত্যাগ।

১৯। গ্রাম্যবার্ত্তা ত্যাগ।

২০। প্রাণিগণের উদ্বেগদানাদি ত্যাগ।

২১। নামগুণাদির শ্রবণ।

২২। নামগুণাদির কীর্ত্তন।

২৩। নামগুণাদির স্মরণ। স্মরণ উত্তরোত্তর গাঢ়তা অনুসারে পাঁচপ্রকার; স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। মনের সহিত যথাকথঞ্চিৎ নামগুণাদির সম্বন্ধের নাম স্মরণ; সকল স্থান হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া সামান্যাকারে রূপাদিতে মনের স্থাপনের নাম ধারণা; বিশেষতঃ রূপাদিচিন্তনের নাম ধ্যান; অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি; ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণের নাম সমাধি।

২৪। ভূতশুদ্ধ্যাদি পূর্ব্বক উপচারসমূহের সমন্ত্রক অর্পণরূপ পূজা।

২৫। বন্দন অর্থাৎ প্রণাম।

২৬। পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবন।

২৭। দাস্য।

২৮। সখ্য।

২৯। দেহদৈহিক বিষয়সমূহের অর্পণরূপ আত্মনিবেদন।

৩০। শ্রীভগবানের সম্মুখে নৃত্য।

৩১। বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপন করা। উহা প্রার্থনাময়ী, [illegible] ও লালসাময়ী ভেদে ত্রিবিধা।

৩২। দণ্ডবৎ প্রণাম।

৩৩। ভগবদ্দর্শনে অভ্যুত্থান।

৩৪। যাত্রাদিকালে অনুব্রজ্যা অর্থাৎ পশ্চাদ্গমন।

৩৫। তীর্থযাত্রা।

৩৬। পরিক্রমা।

৩৭। স্তবপাঠ।

৩৮। উপাংশু, বাচিক ও মানসিক ভেদে তিনপ্রকার জপ।

৩৯—৪০। গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

৪১। ধূপনির্ম্মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ।

৪২। মহাপ্রসাদ ভোজন।

৪৩—৪৫। আরাত্রিক, মহোৎসব ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

৪৬। নিজ প্রিয়বস্তু দান।

৪৭—৫০। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবতের সেবা।

৫১। কৃষ্ণার্থে সমস্ত চেষ্টা।

৫২। তাঁহার কৃপাবলোকন।

৫৩। ভক্তগণ সমভিব্যাহারে জন্মদিনাদিতে মহোৎসব করণ।

৫৪। সর্ব্বদা শরণাপত্তি।

৫৫। কার্ত্তিকাদি ব্রত ধারণ।

৫৬। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ।

৫৭। হরিনামাক্ষর ধারণ।

৫৮। নির্ম্মাল্যধারণ ও চরণামৃতধারণ।

৫৯। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।

৬০। সাধুসঙ্গ।

৬১। নামসঙ্কীর্ত্তন।

৬২। শ্রীভাগবতার্থাস্বাদন।

৬৩। মথুরামণ্ডলে বাস।

৬৪। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা।

উক্ত চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটি সাধনভক্তির উপক্রমস্বরূপ ও গ্রহণীয়। তৎপরবর্ত্তী দশটি ত্যাজ্য। অবশিষ্টগুলি অনুষ্ঠেয়। সর্ব্বশেষ পাঁচটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ প্রভাবশালী। উক্ত চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের একটি বা অনেকটিতে নিষ্ঠা জন্মিলেই প্রেমলাভ হইতে পারে।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রবণে, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদসেবনে,

পৃথুরাজা পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলিরাজা আত্মনিবেদনে নিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষাদির বহু অঙ্গের সাধনও শ্রবণ করা যায়।

শাস্ত্রশাসন হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহার আর দেবাদির ঋণ থাকে না।

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

যিনি কর্ত্তব্য বা ভেদ জ্ঞান ত্যাগ পূর্ব্বক সর্বতোভাবে শরণাগতপালক মুকুন্দের শরণাগত হয়েন, তিনি আর দেবতা ঋষি ভূত পিতৃ বা কুটুম্বাদির নিকট ঋণী থাকেন না।

এইরূপ যিনি বিধিধর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম সকল ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভজন করেন, তিনি আর নিষিদ্ধ পাপাচারে রত হয়েন না। যদি কথন অজ্ঞানতা বশতঃ কোন পাপ উপস্থিত হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে শোধন করিয়া লয়েন। তজ্জন্য তাঁহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। তত্ত্ববিচারাত্মক জ্ঞান ও দুঃখসহনাত্মক বৈরাগ্য অতিশয় কঠোরস্বভাব। ভগবন্মাধুর্য্যানুভবাত্মিকা ভক্তি অতিশয় কোমলস্বভাব। অতএব কঠোরস্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগ্য কোমলস্বভাবা ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না।

"কর্ম্ম বিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।
জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥"

শুদ্ধাশুদ্ধ্যাদিবিচারসাপেক্ষ কর্ম্ম চিত্তের বিক্ষেপক, কঠোর বৈরাগ্য সরস হৃদয়কে নীরস করে, 'সোঽহং' জ্ঞান উপাস্য-উপাসক-ভাবের হানিকর, অতএব উহাদের কোনটিই ভক্তির অনুগত নহে। তবে যদি উহারা শোধিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম যদি ভগবৎপরিচর্য্যাত্মক হয়, বৈরাগ্য যদি কৃষ্ণার্থ ভোগত্যাগময় হয়, এবং জ্ঞান যদি ভজনীয় ভগবানের অনুসন্ধানাত্মক অতএব উপাস্যোপাসকভাবময় হয়, তবে উহারা ভক্তির অঙ্গীভূত হইয়া থাকে।

যমনিয়মাদি জ্ঞান ও যোগের অঙ্গ সকলও কৃষ্ণভক্তকে পৃথক্ সাধন করিতে হয় না। উহারা আপনাআপনি কৃষ্ণভক্তের অনুগত হইয়া থাকে।

এই বিধিভক্তি বলা হইল। অতঃপর রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ বলা হইতেছে।

রাগাত্মিকা নাম্নী মুখ্যা ভক্তি ব্রজবাসিগণের নিজসম্পত্তি; অর্থাৎ উহা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিরূপ ব্রজপরিকরগণের স্বাভাবিকী বৃত্তি। সাধক জীব সকল তাঁহাদিগের অনুগত হইয়া ভজন করিলে, ঐ বৃত্তি সুরসরিৎপ্রবাহের পৃথিবী-সঞ্চারের ন্যায়, ঐ সকল সাধক জীবেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে, এবং তখন ঐ সকল সাধকের ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

অভীষ্ট বস্তুতে স্বারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিকী যে একটি প্রেমময়ী তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইতে একটি পরমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নামই রাগ। রাগ-ময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। অতএব ইষ্টবস্তুবিষয়িণী প্রেমময়ী তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ এবং তজ্জন্য ইষ্টে আবিষ্টতাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। ঐ রাগময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ভাগ্য-বান্ জীবের তদ্বিষয়ে লোভ হয়, তবেই তিনি ব্রজবাসিজনের ভাবের অনুগত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার সেই লোভোৎপত্তির পক্ষে শাস্ত্রযুক্ত্যাদির কোনরূপ অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না।

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥"

ব্রজবাসিজনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তি-কেই রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। নিজাভিমত ব্রজরাজনন্দনের সেবাপ্রাপ্তির লোভে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুষ্ঠানকেই রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ব্রজলীলার পরিকরবর্গের ভাবের মাধুর্য্য শ্রবণে যাঁহার বুদ্ধি লুব্ধ অর্থাৎ তল্লাভার্থ উৎসুক হয়, তিনিই ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইয়া তাদৃশ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। লোভোৎপত্তির পক্ষে শাস্ত্রের বা যুক্তির অপেক্ষা দেখা যায় না। শাস্ত্রযুক্তি

ব্যতিরেকেই, যাঁহার লোভ জন্মিবার হয়, তাঁহার লোভ জন্মিয়া থাকে। লোভ জন্মিবার পর রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি শাস্ত্রাদির সাহায্যে রাগানুগার সাধন অর্থাৎ ভজনরীতি শিক্ষা করিয়া থাকেন। রাগানুগার সাধন বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণাদি সাধন এবং অন্তরে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা করিয়া দিবানিশি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবন করিতে হয়। এই অভিধেয় তত্ত্ব বলা হইল।

প্রয়োজনতত্ত্ব।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সাধুসঙ্গের পর ভজন করিতে করিতে উত্তরোত্তর সাধনের পরিপাকে শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়া থাকেন।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে শ্রবণাদি সাধন। সাধন দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি। অনর্থের নিবৃত্তিতে শ্রবণাদি সাধনে রুচি। রুচির পর আসক্তি। আসক্তির পর শ্রীকৃষ্ণে রতি। রতি প্রেমের অঙ্কুরস্বরূপ। উহার নামান্তর ভাব। এই ভাব আবার বৈধভক্ত্যুত্থ ও রাগভক্ত্যুত্থ ভেদে দ্বিবিধ। বৈধভক্ত্যুত্থ ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র এবং রাগভক্ত্যুত্থ ভাব শুদ্ধ। এই নিমিত্ত রতির মিশ্রা ও কেবলা দুইটি নাম হইয়াছে। কেবলা রতি কেবল মাধুর্য্য-জ্ঞানময়ী। এই রতির স্থান গোকুল। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা মিশ্রা রতি পুরদ্বয়ে ও বৈকুণ্ঠাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মিশ্রা রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা কোথাও প্রেমের উদ্দীপন এবং কোথাও বা উহার সঙ্কোচন হইয়া থাকে। কেবলা

রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হয়ই না। ক্বচিৎ হইলেও তাদৃশ ভক্ত যেখানে ঐশ্বর্য্য দেখেন, সেখানে নিজসম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

ঐ রতি বা ভাব শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ অর্থাৎ হ্লাদিন্যাদি স্বরূপশক্তির বৃত্তির সারাংশ। বৃত্তির সারাংশ বলিতে শ্রীভগবানের নিত্য প্রিয়জনের আশ্রিতা তদীয়া আনুকূল্যাভিলাষময়ী পরমা বৃত্তি। ঐ বৃত্তি শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় প্রপঞ্চগত ভক্তসকলের চিত্তবৃত্তিতেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। উহার সঞ্চারে তাদৃশ ভক্তের ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে প্রীতি এই নয়টি প্রীত্যঙ্কুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তদ্দর্শনে তাদৃশ ভক্তকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত বলা যায়।

ভাবের পরিপাকাবস্থাই প্রেম। প্রেমে চিত্ত সম্যক্ মসৃণ ও অতিশয় মমতা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ গাঢ় ভাবই প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেমের উত্তরোত্তর গাঢ়তায় স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব, এই কয়টি আখ্যা হইয়া থাকে। প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলেই স্নেহ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। স্নেহাবস্থায় প্রিয় বস্তুর ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। স্নেহ পরিপক্ব হইয়া নূতন মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত কৌটিল্য ধারণ করিলেই উহাকে মান বলা যায়। মান যখন বিশ্রম্ভ ধারণ করিয়া অর্থাৎ গৌরবরহিত হইয়া বিষয়াশ্রয়ের সর্ব্বথা একত্ব সংস্থাপন করে, তখন উহাকে প্রণয় বলা যায়। প্রণয়ের উৎকর্ষে যখন চিত্তে অতিশয় দুঃখকেও সুখ বলিয়া বোধ হয়, তখন উহাকে রাগ বলা যায়। রাগের পরিপাকই অনুরাগ। অনুরাগে সদানুভূত প্রিয় বস্তুও নিত্য নবীভূতের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ অনুরাগ আবার যখন যাবদা-শ্রয়বৃত্তি হইয়া অর্থাৎ সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বসংবেদ্যদশা লাভ করে, অর্থাৎ নিজের বৃত্তিভূত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকাদি ভাব সকল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, তখন উহাকে ভাব বলা যায়। এই ভাব ব্রজদেবীগণে আরম্ভ হইতেই দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে মহাভাবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ব্রজদেবীগণের ভাবই মহাভাব নামে উক্ত হয়।

মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দুইপ্রকার। অধিরূঢ় মহাভাব আবার মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ। মোদনাখ্য মহাভাবই বিরহে মোহন নামে উক্ত হইয়া থাকে। মাদনের বিরহ হয় না। ঐ মোহনে দিব্যোন্মাদ জন্মে

এবং ঐ দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। যে অবস্থায় নিমেষমাত্র কালও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন সহ্য হয় না, তাহারই নাম রূঢ় মহাভাব। আর যে অবস্থায় ঐ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন অতিশয় পীড়াদায়ক হয়, তাহারই নাম অধিরূঢ় মহাভাব। মোদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরও ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাদনে সর্ব্বভাবের উদ্‌গম হয় এবং উহা কেবল শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাব বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ আবার পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্বিধ। অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তিনী উৎকণ্ঠাময়ী রতির নাম পূর্ব্বরাগ। নায়কনায়িকার অভিমত আলিঙ্গনাদির নিরোধজনক ভাবের নাম মান। প্রিয়ের সমীপে থাকিয়াও অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ তদ্‌বিরহবোধের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রিয়ের দূরগমনের নাম প্রবাস।

প্রেমের আলম্বন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি। শ্রীরাধিকা নায়িকার শিরোমণি। অনন্তগুণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ সকল প্রধানতঃ চতুঃষষ্টিসংখ্যক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

উক্ত চতুঃষষ্টি গুণ যথা—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচির স্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চ গুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ॥
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥"

সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, রুচির, তেজস্বী, বলীয়ান্ বয়োযুক্ত, বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ, সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষুঃ, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান্, শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেম-বশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণমনো-হারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বরীয়ান্ ও ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্বিগাহ। এই সমস্ত গুণ জীবগণেও দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হয় না, অংশতঃ দৃষ্ট হয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণেই এইগুলি পরিপূর্ণ-ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ ও সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে গিরিশাদি দেবতাতেও দেখা গিয়া থাকে।

অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, অবতারাবলীবীজ, হতারিগতিদায়ক ও আত্মারামগণাকর্ষী। শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি অদ্ভুত গুণ শ্রীনারায়ণাদিতেও দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি, অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিত ও অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর। লীলাদি এই চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ। এইগুলি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

১। সুরম্যাঙ্গ—শ্লাঘ্য অঙ্গসন্নিবেশের নাম সুরম্যাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটি আবির্ভাবের সময় হইতেই ব্যক্ত।

২। সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত—শ্রীকৃষ্ণের সল্লক্ষণ গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ ভেদে দ্বিবিধ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণজনিত লক্ষণের নাম গুণোত্থ লক্ষণ। সপ্ত স্থানে রক্ততা, ছয় স্থানে তুঙ্গতা, তিন স্থানে বিস্তার, তিন স্থানে খর্ব্বতা, তিন স্থানে গম্ভীরতা, পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা ও পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণোত্থ সল্লক্ষণ সর্ব্বসমেত বত্রিশটি। করাদিতে রেখাময় লক্ষণ সকলের নাম অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের এই অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ যোলটি। তাঁহার নামকরণকালে গর্গমুনি এই সল্লক্ষণ সকল বলিয়াছিলেন।

৩। রুচির—সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের আনন্দকারী। শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটি তাঁহার বাল্যাদিলীলাত্রয়ে বিশেষরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৪। তেজস্বী—ধাম ও প্রভাব সমন্বিত। তন্মধ্যে তেজোরাশির নাম ধাম এবং দুর্দ্ধর্ষতা ও সর্ব্বপরাজয়কারী তেজের নাম প্রভাব। মল্লরঙ্গে এই তেজ নামক গুণ দৃষ্ট হয়।

৫। বলীয়ান্—বলবান্। এই গুণটিও মল্লরঙ্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৬। বয়োযুক্ত—বয়সের বাল্যাদি বিবিধ ভেদ সত্ত্বেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়, সর্ব্বগুণযুক্ত ও নিত্যনূতনবিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়োগুণ। সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই এই গুণটি প্রধানতঃ ব্যক্ত হইয়া থাকে।

৭। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ—যিনি সংস্কৃতপ্রাকৃতাদি অশেষ ভাষায় সুপণ্ডিত,

তাঁহাকেই উক্তগুণযুক্ত বলা যায়। গোচারণলীলায় এই গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়।

৮। সত্যবাক্য—যাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না। এই গুণটি জরাসন্ধ-বধাদি স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৯। প্রিয়ম্বদ—অপরাধী জনেও সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগকারী। কালিয় নাগের দমনকালে এই গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়।

১০। বাবদূক—শ্রবণপ্রিয় ও অখিলগুণান্বিত বাক্য প্রয়োগকুশল। ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গের সময় এই গুণটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১১। সুপাণ্ডিত্য-বিদ্বান্ ও নীতিজ্ঞ। অখিলবিদ্যাবিৎকে বিদ্বান্ এবং যথোচিতকর্ম্মকারীকে নীতিজ্ঞ বলা যায়। এই গুণটি গুরুগৃহে ও অপর দ্বারকা-লীলায় ব্যক্ত আছে।

১২। বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি। এই গুণটিও গুরুগৃহে ও কালযবন-বধের সময় বিশেষরূপেই প্রকাশ পায়।

১৩। প্রতিভান্বিত—নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি বিশিষ্ট। এই গুণটি মান-ভঞ্জনলীলাতেই সম্যক্ স্ফুরিত হইয়া থাকে।

১৪। বিদগ্ধ—কলাবিলাসকুশল। শ্রীবৃন্দাবনে পাশক্রীড়াদির সময় এই গুণটি বিশেষরূপেই ব্যক্ত হয়।

১৫। চতুর—যুগপৎ অনেক-কার্য্য-সমাধানকারী। অরিষ্টবধকালে এই গুণটি প্রথম প্রকাশ পায়।

১৬। দক্ষ—দুঃসাধ্য কার্য্য সত্বর সম্পাদনকারী। নরকাসুরবধকালে এই গুণটি পরিস্ফুট আছে।

১৭। কৃতজ্ঞ—কৃত সেবাদিকর্ম্মের অভিজ্ঞ। কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট গমনকালে এই গুণটি পরিস্ফুট দেখা যায়।

১৮। সুদৃঢ়ব্রত—সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিয়ম। পারিজাতহরণে এই গুণটি ব্যক্ত হয়।

১৯। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ—দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকারী। উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণকালে এই গুণটি বিশেষতঃ ব্যক্ত হয়।

২০। শাস্ত্রচক্ষু—শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী। দ্বারকালীলায় এই গুণটি দৃষ্ট হয়।

২১। শুচি—স্বয়ং বিশুদ্ধ ও অন্যের পাবন। স্যমন্তক-মণি-হরণ-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২২। বশী—ইন্দ্রিয়জয়কারী। বংশবিস্তারপ্রসঙ্গে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়।

২৩। স্থির—আফলোদয়কর্ম্মকারী। জাম্ববতীপরিণয়স্থলে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়।

২৪। দান্ত—ক্লেশসহিষ্ণু। গুরুগৃহে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২৫। ক্ষমাশীল—অপরাধসহিষ্ণু। শিশুপালবধে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২৬। গম্ভীর—দুর্বিগাহ্যাশয়। ব্রহ্মমোহনলীলায় এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২৭। ধৃতিমান্—পূর্ণকাম এবং ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষোভরহিত। রাজসূয়যজ্ঞ-প্রসঙ্গে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২৮। সম—রাগদ্বেষবিমুক্ত। কালিয়দমনকালে এই গুণটির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

২৯। বদান্য—দাতা। দ্বারকালীলায় নারদমোহে এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। ধার্ম্মিক—ধর্ম্মকারক ও ধর্ম্মরক্ষক। দ্বারকালীলায় এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩১। শূর—যুদ্ধবিষয়ে উৎসাহান্বিত ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ। জরাসন্ধের সহিত সংগ্রামে এই গুণটির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

৩২। করুণ—পরদুঃখাসহিষ্ণু। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ রাজগণের মোচনে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৩। মান্যমানকৃৎ—গুরু-বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণসকল-পূজাকারী। দ্বারকালীলায় এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৪। বিনয়ী—অনুদ্ধত। রাজসূয়যজ্ঞে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৫। দক্ষিণ—কোমলচরিত্র। সত্যভামাপরিণয়ে এই গুণটির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৬। হ্রীমান্—লজ্জাশীল। গোবর্দ্ধনধারণকালে এই গুণটি প্রথম ব্যক্ত হইয়াছিল।

৩৭। শরণাগতপালক—শরণাগত ব্যক্তির পালনকারী। বাণযুদ্ধে এই গুণটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। সুখী—ভোগী ও দুঃখস্পর্শপরিশূন্য। অন্নভিক্ষায় এই গুণটি সুব্যক্ত আছে।

৩৯। ভক্তসুহৃৎ—সুসেব্য ও দাসবন্ধু। ভীষ্মনির্য্যাণে এই গুণটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

৪০। প্রেমবশ্য—সেবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রেমের বশীভূত। পৃথুকোপাখ্যানে এই গুণটি দৃষ্ট হয়।

৪১। সর্ব্বশুভঙ্কর—সর্ব্বজনহিতকারী। উদ্ধবশিক্ষায় এই গুণটি ব্যক্ত হইয়াছে।

৪২। প্রতাপী—প্রতাপশালী।

৪৩। কীর্ত্তিমান্—কীর্ত্তিশালী।

এই দুইটি গুণ দ্বারকালীলার অনেক স্থলেই সুব্যক্ত আছে।

৪৪। রক্তলোক—লোকের অনুরাগভাজন। রাজসূয়যজ্ঞে এই গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৪৫। সাধুসমাশ্রয়—সাধুজনপক্ষপাতী।

৪৬। নারীগণমনোহারী—সুন্দরীবৃন্দের চিত্তাকর্ষক।

৪৭। সর্ব্বারাধ্য—সকলের পূজ্য।

৪৮। সমৃদ্ধিমান্—মহাসম্পত্তিশালী।

৪৯। বরীয়ান্—শ্রেষ্ঠ।

৫০। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও অলঙ্ঘ্যশাসন।

৫১। সদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত—মায়িক কার্য্যে অবশীকৃত।

৫২। সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন।

৫৩। নিত্যনূতন—সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও নূতনের ন্যায় প্রকাশমান।

৫৪। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ—সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

৫৫। সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত—সকল সিদ্ধি যাঁহার নিজবশে।

৫৬। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি—সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন ও ভক্তের প্রারব্ধখণ্ডন প্রভৃতি অচিন্ত্যশক্তি সমন্বিত।

৫৭। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ—বিশ্বরূপ।

৫৮। অবতারাবলীবীজ—সর্ব্বাবতারের মূলাশ্রয়।

৫৯। হতারিগতিদায়ক—শত্রুগণের বিনাশসাধন পূর্ব্বক মুক্তিদাতা।

৬০। আত্মারামগণাকর্ষী—মুক্তগণেরও আকর্ষণকারী।

শ্রীকৃষ্ণের উক্ত গুণ সকল দ্বারকালীলার স্থানে স্থানে ব্যক্ত আছে।

অবশিষ্ট চারিটি গুণ মধুর হইতে মধুর। লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বংশী-মাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য সকললীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলাতেই সুব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকারও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অপ্রাকৃত অনন্ত গুণ উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ যে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক গুণ উক্ত হয়, তাহা এই—

১। মধুরা।

২। নববয়া।

৩। চলাপাঙ্গা।

৪। উজ্জ্বলস্মিতা।

৫। চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা অর্থাৎ পঞ্চাশৎসংখ্যক সৌভাগ্যসূচক রেখা বিশিষ্টা।

৬। গন্ধোন্মাদিতমাধবা অর্থাৎ গন্ধ দ্বারা মাধবকে উন্মাদিত করেন।

৭। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা।

৮। রম্যবাক্।

৯। নর্ম্মপণ্ডিতা।

১০। বিনীতা।

১১। করুণাপূর্ণা।

১২। বিদগ্ধা।

১৩। পাটবান্বিতা অর্থাৎ চাতুর্য্যশালিনী।

১৪। লজ্জাশীলা।

১৫। সুমর্য্যাদা অর্থাৎ স্বাভাবিক, শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত ও স্বকল্পিত মর্য্যাদা রক্ষণপরায়ণা।

১৬। ধৈর্য্যশালিনী।

১৭। গাম্ভীর্য্যশালিনী।

১৮। সুবিলাসা।

১৯। মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী অর্থাৎ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সকলের পূর্ণ প্রকাশভূমি।

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ সমস্ত গোকুলের প্রিয়।

২১। জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশা অর্থাৎ তাঁহার যশে সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্ত।

২২। গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী।

২৩। সখী-প্রণয়িতাবশা অর্থাৎ সখীজনের প্রণয়াধীনা।

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা।

২৫। সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ সর্ব্বদা কেশব তাঁহার আজ্ঞাধীন।

নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধিকা ভক্তিরসের বিষয় ও আশ্রয় নামক আলম্বন। দাস্যে দাসগণ, সখ্যে সখাগণ, বাৎসল্যে পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং মধুরে গোপীগণও আশ্রয়ালম্বন হয়েন। বিষয় ও আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তিরসের উদ্গম হয়, তাহা ভক্তগণই আস্বাদন করিয়া থাকেন, অভক্তগণ আস্বাদন করিতে পারে না। পূর্ব্বে প্রয়াগে অবস্থানকালে তোমার ভ্রাতা রূপকে রসতত্ত্ববিচারে এই সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছি। অতঃপর তোমরা দুইজনে ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ও মথুরার লুপ্ততীর্থের উদ্ধার কর। আর একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তন কর। এই আমি যুক্তবৈরাগ্যের মর্য্যাদা উপদেশ করিলাম। তোমরা শুষ্কবৈরাগ্যের পক্ষপাতী না হইয়া এই যুক্তবৈরাগ্যেরই পক্ষপাতী হইও। শুষ্ক জ্ঞান ও শুষ্ক বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিও।

যিনি সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা অর্থাৎ কেহ দ্বেষ করিলেও 'আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছে' এই বুদ্ধিতে তাহার প্রতি দ্বেষরহিত, 'সমস্ত জীবই পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত' এই বুদ্ধিতে জীবমাত্রের প্রতি স্নিগ্ধ, কোন কারণে কাহারও খেদ উপস্থিত হইলে 'ঐ খেদ না হউক' এই বুদ্ধিতে করুণ, দেহাদিতে মমতারহিত ও আত্মবুদ্ধিরহিত, সুখের সময় হর্ষে ও দুঃখের সময় উদ্বেগেও নিরাকুল, সহিষ্ণু, সতত সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, বিজিতেন্দ্রিয়, কেহ কুতর্ক করিলেও তদ্দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না পরন্তু 'আমি হরিদাস' এইরূপই বুদ্ধি স্থির থাকে, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন, এই প্রকার ভক্তই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি স্বয়ং লোক হইতে উদ্বেগ পান না, যিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং উপস্থিত ভোগ্য বিষয়েও স্পৃহারহিত, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথারহিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়লাভে হৃষ্ট ও অপ্রিয়লাভে দ্বেষযুক্ত হয়েন না, যিনি শোক ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভ ও অশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি শত্রুমিত্রে মানাপমানে শীতোষ্ণে ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি এবং কুসঙ্গবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতিকে সমান বোধ করেন, যিনি যথালাভতুষ্ট,

নিবাসরহিত ও স্থিরবুদ্ধি, তাদৃশ ভক্তিমানই আমার প্রিয়। যিনি এই যথোক্ত ধর্ম্মামৃতের সেবা করেন, তিনি আমার অতীব প্রিয় হয়েন। বর্ত্মপতিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড থাকিতে বস্ত্রের নিমিত্ত, পরপোষক তরুরাজি থাকিতে অন্নের নিমিত্ত, জলপূর্ণ সরিৎসরোবর থাকিতে পানীয়ের নিমিত্ত, গিরিকন্দর থাকিতে বাসস্থানের নিমিত্ত ও শরণাগতপালক শ্রীভগবান্ থাকিতে আশ্রয়ের নিমিত্ত সাধুলোক সকল কেন ধনমদান্ধ ব্যক্তি সকলের উপাসনা করিবেন।

আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা।

তদনন্তর সনাতনগোস্বামী কতকগুলি শ্রীভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু একে একে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে হরিবংশোক্ত গোলোকসংস্থান, মৌষললীলা ও অন্তর্ধানলীলার মায়িকত্ব, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারস্বরূপ বিরুদ্ধমত সকলের সঙ্গতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় সকল উপদেশ করিলেন।

সনাতনগোস্বামী প্রভুর চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন, "আমি নীচজাতি, নীচসেবী পামর। আমাকে ব্রহ্মার অগোচর সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ করিলেন। অনন্তগম্ভীর সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে আমার শক্তি নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে, পঙ্গুকেও নৃত্য করাইতে পারেন। আমার মস্তকে চরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ঐ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।" প্রভু তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার বরে উপদিষ্ট বিষয় সকল তোমাতে স্ফুরিত হউক।"

সনাতনগোস্বামী পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন, "প্রভো, শুনিয়াছি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট "আত্মারাম" শ্লোকের অষ্টাদশপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠান্বিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি বলেন, শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই।" প্রভু বলিলেন, "আমি বাতুল, কখন কি প্রলাপ বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহাই আবার সত্য মনে করিয়াছেন, আমার কিন্তু তাহার কিছুই মনে নাই। যাহাই হউক, তোমার সঙ্গের গুণে সম্প্রতি যে কিছু অর্থ স্ফুরিত হয়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

আত্মারামাঃ আত্মনি ব্রহ্মণি রমন্তে ইতি জ্ঞানিনঃ চ অপি নির্গ্রন্থাঃ অপি মুনয়ঃ মননশীলাঃ সন্তঃ উরুক্রমে হরৌ অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম জ্ঞানিগণও নির্গ্রন্থ হইয়াও তাঁহার মনন ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তির অসম্ভাবনা হেতু তন্মননপরায়ণ ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ঐ জ্ঞানী কেবলব্রহ্মোপাসক অর্থাৎ আত্মার ব্রহ্মসম্পত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মের উপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মের উপাসক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেবলব্রহ্মোপাসক আবার সাধক অর্থাৎ অপ্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্ম্য, ব্রহ্মময় অর্থাৎ প্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্ম্য এবং প্রাপ্তব্রহ্মলয় অর্থাৎ ব্রহ্মলীন ভেদে ত্রিবিধ। আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ অর্থাৎ বিদেহ ভেদে ত্রিবিধ। সাকল্যে জ্ঞানী ষড়্‌বিধ। জ্ঞানীর ষাড়্‌বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি অর্থের লাভ হইতেছে।

পূর্ব্বোক্তাঃ ষড়্‌বিধাঃ আত্মারামাঃ জ্ঞানিনঃ মুনয়ঃ চঃ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ জ্ঞানী এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অপর একটি অর্থ। অতএব সাকল্যে সপ্ত অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ আত্মনি পরমাত্মনি রমন্তে ইতি যোগিনঃ চ অপি নির্গ্রন্থাঃ অপি মুনয়ঃ মননশীলাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূত-গুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম যোগিগণও নির্গ্রন্থ হইয়াও তন্মননপরায়ণ ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ঐ যোগী সগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলম্বন-বিশিষ্ট ও নিগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি-আলম্বন-রহিত ভেদে দ্বিবিধ। উঁহাদের প্রত্যেকে আবার যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি ভেদে ত্রিবিধ। সাকল্যে যোগী ষড়্‌বিধ। যোগীর ষাড়্‌বিধ্য বশতঃ শ্লোকটিতে পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি অর্থের লাভ হইতেছে। অতএব সাকল্যে ত্রয়োদশ অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ আত্মনি মনসি রমন্তে ইতি মনোরমণশীলাঃ অপি সাধুসঙ্গ-বলাৎ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ চ সন্তঃ উরুক্রমে হরৌ অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মাতে অর্থাৎ মনোরূপ সূক্ষ্মশরীরে রমণশীল ব্যক্তিগণও সাধুসঙ্গবলে মননশীল নির্গ্রন্থ ও তদ্‌গুণাকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থটির সহিত চতুর্দ্দশ অর্থের লাভ হইল।

মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ যত্নশীলাঃ নির্গ্রন্থাঃ চ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণও আত্মারাম অর্থাৎ যত্নশীল ও নির্গ্রন্থ হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থটির সহিত পঞ্চদশ অর্থের লাভ হইল।

নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ অপি আত্মারামাঃ ধৈর্য্যশীলাঃ সন্তঃ চ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নির্গ্রন্থ মুনিগণও ধৈর্য্যশীল হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত ষোড়শ অর্থের লাভ হইল।

নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ অপি চ আত্মারামাঃ আত্মনি ধৃতৌ রমন্তঃ ভগবৎসম্বন্ধ-লাভতো দুঃখাভাবাৎ ভগবৎপ্রেমলাভতঃ উত্তমাপ্তেঃ চ পূর্ণাঃ চাঞ্চল্যরহিতাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নির্গ্রন্থ মুনিগণও ভগবৎসম্বন্ধলাভ প্রযুক্ত দুঃখের অভাব হেতু এবং ভগবৎপ্রেমলাভ প্রযুক্ত উত্তমাপ্তি হেতু পূর্ণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য-রহিত হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত সপ্তদশ অর্থের লাভ হইল।

মুনয়ঃ পণ্ডিতাঃ নির্গ্রন্থাঃ মূর্খাঃ চ অপি আত্মারামাঃ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্টাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এবং নির্গ্রন্থ অর্থাৎ মূর্খগণ উভয়েই আত্মারাম অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষবিশিষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত অষ্টাদশ অর্থের লাভ হইল।

মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ মূর্খনীচাদয়ঃ চ অপি আত্মারামাঃ আত্মনি ভগ-বদ্দাসোঽহমিত্যভিমানাত্মকে স্বভাবে রমন্তে যে তে তাদৃশাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, সনকাদি মুনিগণ এবং মূর্খনীচাদি নির্গ্রন্থ জনগণও 'আমি শ্রীভগবানের দাস' এই প্রকার অভিমানাত্মক স্বভাবে রত হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত উনবিংশ অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ আত্মনি দেহে রমন্তে যে তে অপি নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ চ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ দেহরত ব্যক্তি সকলও নির্গ্রন্থ মুনি হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ঐ দেহ-রত আত্মারাম কর্ম্মনিষ্ঠ ও তপস্বী ভেদে দুই প্রকার। উহাদের প্রত্যেকে আবার দেহোপাসক ও দেহোপাধিব্রহ্মোপাসক ভেদে দ্বিবিধ। সাকল্যে দেহ-রত আত্মারাম চারিপ্রকার। অতএব শ্লোকটিতে চারিপ্রকার অর্থের লাভ হইতেছে। এই চারিপ্রকার অর্থের সহিত ত্রয়োবিংশ অর্থের লাভ হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, দেহ-রত ব্যক্তিই দেহোপাধিব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মনিষ্ঠ, তপস্বী ও সর্ব্বকাম ভেদে চারিপ্রকার হয়েন। অতএব এই পক্ষেও চতুর্বিধ অর্থেরই লাভ হইতেছে।

মুনয়ঃ আত্মারামাঃ চ নির্গ্রন্থাঃ সন্তঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ প্রধানতঃ এবং জ্ঞানিগণ অপ্রধানতঃ নির্গ্রন্থ হইয়াই উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত চতুর্বিংশ অর্থের লাভ হইল।

মুনয়ঃ চ আত্মারামাঃ অপি নির্গ্রন্থাঃ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, মুনিগণ আত্মারাম হইয়াও নির্গ্রন্থ হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত পঞ্চবিংশ অর্থের লাভ হইল।

নির্গ্রন্থাঃ ব্যাধাদয়ঃ অপি আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, নির্গ্রন্থ ব্যাধ প্রভৃতিও আত্মারাম ও মুনি হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত ষড়্‌বিংশ অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ ভক্তাঃ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ চ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ ভক্ত মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ঐ ভক্ত বিধিমার্গ ও রাগমার্গ ভেদে দুইপ্রকার। উহাদের প্রত্যেকে আবার সাধক, সিদ্ধ ও পার্ষদ ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে সাধক আবার জাতরতি ও অজাতরতি ভেদে দুইপ্রকার, এবং পার্ষদ সাধক ও সিদ্ধের প্রত্যেকে আবার দাস্যাদিভেদে চারিপ্রকার। অতএব প্রতিমার্গে ষোড়শপ্রকার করিয়া দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অর্থের লাভ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশ এবং শেষোক্ত দ্বাত্রিংশৎ মিলিয়া অষ্টপঞ্চাশৎ অর্থের লাভ হইল।

পূর্ব্বোক্তাঃ অষ্টাধিকপঞ্চাশৎসংখ্যকাঃ আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, পূর্ব্বোক্ত অষ্টপঞ্চাশৎপ্রকার আত্মারাম ও মুনি সকল নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত উনষষ্টি অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাঃ চ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, কি আত্মারাম জ্ঞানিগণ কি মুনিগণ কি নির্গ্রন্থ ব্যক্তিগণ সকলেই সেই উরুক্রম শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

এই অর্থের সহিত ষষ্টিপ্রকার অর্থের লাভ হইল।

আত্মারামাঃ জীবাঃ অপি নির্গ্রন্থাঃ মুনয়ঃ চ সন্তঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ।

শ্রীহরির এমনি গুণ যে, আত্মারাম অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সকলও নির্গ্রন্থ ও মুনি হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সাকল্যে একষষ্টি অর্থের লাভ হইল। সনাতন, তোমার সঙ্গগুণে এই একষষ্টিপ্রকার অর্থ স্ফুরিত হইল। এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন।

সনাতনগোস্বামী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমার নিশ্বাসেই বেদের

প্রবর্ত্তন। তুমিই ভাগবতের বক্তা ও তত্ত্ববেত্তা। তোমা বিনা তত্ত্ববেত্তা আর কে আছে?" প্রভু বলিলেন,—ভাগবতের অর্থ ভাগবতের পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনা দ্বারাই স্থির করিতে হয়। ভাগবতের এক স্থানের অর্থ অন্যস্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে,—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্জ্ঞানাদির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, এই কলিযুগে ধর্ম্মজ্ঞানাদিরহিত জীবের নিমিত্ত এই পুরাণসূর্য্য উদিত হইয়াছেন।

বৈষ্ণবস্মৃতি।

অনন্তর সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে বৈষ্ণবস্মৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার উপদেশ ভিন্ন আমি কি তাহা সম্পাদন করিতে পারি? অতএব আপনি সূত্ররূপে উপদেশ করুন, আমি তদনুসারে স্মৃতিসংগ্রহের চেষ্টা করিব।"

প্রভু বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কারণ, শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, শ্রীগুরুলক্ষণ, নিষিদ্ধগুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্যপরীক্ষণ, শ্রীগুরুমাহাত্ম্য, গুরুসেবাবিধি, অধিকারিনির্ণয়, মন্ত্রসংস্কার, শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য, শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্য, দীক্ষানিত্যতা, দীক্ষাপ্রয়োগ, দীক্ষিতের পূজার নিত্যতা, সদাচার, নিত্যকৃত্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, তিলকধারণ, মালাধারণ, পুষ্প্যাদ্যাহরণ, বস্ত্রাদিসংস্কার, প্রবোধন, পঞ্চাদি উপচার দ্বারা অর্চ্চন, পূজা, আরাত্রিক, ভোজন, শয়ন, শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ, শালগ্রামলক্ষণ, হরিক্ষেত্রগমন, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, নামমহিমা, নামাপরাধবর্জ্জন, বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধখণ্ডন, শঙ্খাদিলক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎপ্রণাম, বন্দন, পুরশ্চরণ, প্রসাদভোজন, অনিবেদিতবর্জ্জন, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন, অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবতশ্রবণ, দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদিবিবরণ, মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদিবিধিবিচারণ, একাদশী প্রভৃতির বিদ্ধা ত্যাগ পূর্ব্বক অবিদ্ধাকরণ, অকরণে দোষ, করণে ভক্তিলাভ, শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাদি শাস্ত্রবচন দ্বারা নিরূপণ করিবে। আমি কেবল সূত্ররূপে বলিলাম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার

হৃদয়ে যাহা স্ফুরিত হইবে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যাহা লিখাইবেন, তুমি তাহাই লিখিবে ১।"

১। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কারণ—

শ্রীকৃষ্ণের করুণায় তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঐ ভক্তির লাভে অভিলাষ হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। বিষয়-সুখাসক্ত জনগণের ভক্তিমাহাত্ম্যজ্ঞান দুর্ঘট হইলেও কেবল দুঃখসাগরতরণের ইচ্ছাতেও ভক্তিলাভের অভিলাষ হইয়া থাকে। ভক্তিলাভের অভিলাষ হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে নিত্য দুঃখপরম্পরার অনুভব হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রেও শ্রবণ করা যায় যে, পরলোকেও দুঃসহ দুঃখশ্রেণী ভোগ করিতে হয়। অতএব সুবুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের নবমাধ্যায়ে উক্ত হই-য়াছে,—ধীর পুরুষ বহুজন্মের পর এই সুদুর্লভ অর্থপ্রদ অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন, বিষয়ভোগ পশ্বাদিযোনিতেও লাভ হইতে পারে। বিংশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—সর্ব্বফলের মূলভূত, যদৃচ্ছা-লব্ধ, সুদুর্লভ, পটুতর, গুরু-কর্ণধার-বিশিষ্ট, পরমাত্মরূপানুকূলপবন কর্ত্তৃক পরিচালিত, এই নরদেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সংসারসাগর পার হইতে যত্ন করে না, সে আত্মঘাতী।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয়—

উহারই তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, পরব্রহ্মের অনুভবসম্পন্ন ও পরমশান্ত শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। স্বয়ং শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—মদভিজ্ঞ মচ্চিত্ত ও শান্ত শ্রীগুরুর উপাসনা করিবেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মবিজ্ঞাসু ব্যক্তি হস্তে সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর সমীপে গমন করিবেন। কারণ, গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। আগমসারে গুরুশব্দের অর্থ এই প্রকার নির্দ্দেশ করেন,—গকার সিদ্ধিদ, রকার পাপদাহক এবং উকার স্বয়ং শম্ভু; অতএব গুরুশব্দ দ্বারা সিদ্ধিপ্রদ ও পাপ-নাশক শম্ভুই উক্ত হয়েন। আচার্য্য শব্দের অর্থ কুলার্ণবগ্রন্থে এইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যিনি স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিষ্যকে আচারে স্থাপন করেন এবং যিনি শাস্ত্রার্থ প্রকাশ দ্বারা অজ্ঞান নাশ করেন, তিনিই গুরুশব্দবাচ্য।

শ্রীগুরুলক্ষণ—

বিশুদ্ধবংশজাত, স্বয়ংও বিশুদ্ধ, পবিত্রাচারপরায়ণ, আশ্রমী, ক্রোধরহিত, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়ারহিত, প্রিয়বাক্য, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশ, তরুণ, সর্ব্বভূতহিতে রত, বুদ্ধিমান্, অনুদ্ধতমতি, পূর্ণ, তত্ত্ববিচারক, বাৎসল্যাদিগুণযুক্ত, অর্চ্চনপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহানুগ্রহক্ষম, হোম-মন্ত্রপরায়ণ, বিচারপ্রণালীর জ্ঞানসম্পন্ন, শুদ্ধাত্মা ও কৃপালু ব্যক্তিই গুরুগৌরবের উপযুক্ত। যিনি স্বীয় ইষ্টদেবতার উপাসনাপরায়ণ, শান্ত, দান্ত, অধ্যাত্মবেত্তা, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন, উদ্ধার ও সংহারে সমর্থ, ব্রাহ্মণোত্তম, যন্ত্র ও মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়চ্ছেত্তা, রহস্যবেত্তা, পুরশ্চরণকারী, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগ-কুশল, তপোনিরত, সত্যবাদী ও গৃহস্থ, তিনিই গুরুকরণের যোগ্য। যিনি শিষ্যের নিকট হইতে সেবা যশ ও ধনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুকরণের যোগ্য নহেন। পরন্তু যিনি কৃপাসিন্ধু, সর্ব্বগুণপূর্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা ও আলস্য-রহিত, তিনিই গুরুপদবাচ্য হয়েন। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে,—পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত পঞ্চকালের জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। তদভাবে শান্তচিত্ত, ভগবন্ময়, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সর্ব্বজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াপরায়ণ এবং মন্ত্র গুরু ও দেবতার সাধনসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও গুরুপদের যোগ্য হইবেন। ক্ষত্রিয় গুরু, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষাপ্রদানে অধিকারী। উক্তলক্ষণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, তাদৃশ বৈশ্যও বৈশ্য এবং শূদ্রের গুরু হইতে পারেন। তদভাবে শূদ্রও শূদ্রজাতির গুরু হইতে পারেন। স্বদেশেই হউক বা বিদেশেই হউক বর্ণোত্তম গুরু পাওয়া গেলে, শুভার্থী ব্যক্তি হীনবর্ণকে গুরু করিবেন না। বর্ণোত্তম গুরুর সদ্ভাবে হীনবর্ণকে গুরু করিলে, ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রোক্ত আচার সর্ব্বথা পরিপালনীয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র স্বোৎকৃষ্টবর্ণকে শিষ্য করিবেন না ইহাই শাস্ত্রীয়াচার। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। তিনি শ্রীহরির ন্যায় সকলেরই পূজ্য হয়েন। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তবে তাঁহাকে গুরু করিবে না। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব, আর তদিতর ব্যক্তিই অবৈষ্ণব।

নিষিদ্ধগুরুলক্ষণ—

বহুভোজী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিলোলুপ, হেতুবাদরত, দুষ্ট, অবাচ্যবাচক, গুণ-

নিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমসেবী, কালদন্ত, কৃষ্ণৌষ্ঠ, দুর্গন্ধিশ্বাস-যুক্ত, দুষ্টলক্ষণসম্পন্ন, বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরতুল্য হইলেও শিষ্যকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া থাকেন।

শিষ্যলক্ষণ—

শুদ্ধবংশজাত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাক্য, পবিত্রচরিত্র, বুদ্ধিমান্, দম্ভরহিত, কামক্রোধত্যাগী গুরুভক্ত, দেবতাভক্ত, নীরোগ, পাপরহিত, শ্রদ্ধা-যুক্ত, দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের পূজাপরায়ণ, যুবা, সংযতেন্দ্রিয়, দয়ালু প্রভৃতি সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়েন।

নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ—

অলস, মলিন, ক্লিষ্ট, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রুগ্ন, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, ভোগ-লালস, অসূয়াপরায়ণ, মৎসর, শঠ, পরুষবাদী, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জনকারী, পরদাররত, জ্ঞানীর শত্রু, অজ্ঞ, মণ্ডিতমানী, ভ্রষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরপীড়ক, বহ্বাশী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ব্যক্তি দীক্ষায় অনধিকারী। যাহাদিগকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না বা যাহারা গুরুর শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারাও শিষ্যত্বের অযোগ্য। যদি কেহ লোভ প্রযুক্ত তাদৃশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন দরিদ্র ও স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়া অন্তে নরকযাতনা ভোগ করিয়া তীর্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

গুরুশিষ্যপরীক্ষণ—

গুরু ও শিষ্য একবৎসর পর্য্যন্ত একত্র বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করিবেন। এইরূপ পরীক্ষার পরই দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুমাহাত্ম্য—

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, গুরুকে আমার স্বরূপই জানিবে, কদাচ অবজ্ঞা করিবে না; গুরুকে মনুষ্য ভাবিয়া তাঁহাতে দোষারোপ করিবে না, কারণ, গুরু সর্ব্বদেবময়।

গুরুর সন্নিধানে যে শিষ্য অন্যকে পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজা নিষ্ফল হয় এবং তিনি নরকে গমন করিয়া থাকেন। গুরুর সেবা করিলে, সর্ব্বপাপের ক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় ও সর্ব্বকার্য্যের সিদ্ধি হয়। যাহা কিছু নিজের প্রিয় বস্তু, তাহাই বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন। এইরূপে যিনি শ্রীগুরুর পূজা করেন, তাঁহার অগণ্য পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

গুরুসেবাবিধি—

প্রতিদিন গুরুদেবের জলকুম্ভ, কুশ, পুষ্প ও যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবেন। তাঁহার অঙ্গমার্জ্জন, চন্দনলেপন, গৃহমার্জ্জন, ও বস্ত্রপ্রক্ষালন করিবেন। তাঁহার নির্ম্মাল্য, শয্যা, পাদুকা, আসন, ছায়া ও বেদী লঙ্ঘন করিবেন না। তাঁহার দন্তকাষ্ঠ আহরণ ও তাঁহাকে নিজকৃত্য নিবেদন করিবেন। সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় ও হিতে রত থাকিবেন, এবং তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কুত্রাপি গমন করিবেন না। গুরুসন্নিধানে কদাচ পাদপ্রসারণ করিবেন না। তাঁহার সন্নিধানে জৃম্ভণ, হাস্য, কণ্ঠাচ্ছাদন ও আস্ফোটন করিবেন না। গুরুপুত্র, গুরুপত্নী ও গুরুর আত্মীয়বর্গের প্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবেন। অসাক্ষাতেও শ্রীশব্দাদি ব্যতিরেকে কেবল গুরুর নামাক্ষর উচ্চারণ করিবেন না। তাঁহার গতি, বাক্য ও কার্য্যের অনুকরণ করিবেন না। গুরুর গুরু সন্নিহিত থাকিলে, তাঁহাকেও গুরুর ন্যায় পূজা করিবেন। গুরুর আজ্ঞা না লইয়া পিত্রাদি গুরুজনকেও অভিবাদন করিবেন না। অকারণে বা অভক্তি পূর্ব্বক গুরুর নাম গ্রহণ করিবেন না। যখন গ্রহণ করিবেন, তখন 'ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ' এই প্রকারেই নামোচ্চারণ করিবেন। কখন মোহবশতঃ তাঁহাকে কোনরূপ আজ্ঞা করিবেন না এবং কদাচ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেন না বা তাঁহার ভক্ষ্যদ্রব্যও ভোজন করিবেন না। তাঁহার আগমনকালে অগ্রসর হইবেন ও গমনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। তাঁহার সম্মুখে শয্যা বা আসন গ্রহণ করিবেন না। যে কিছু নিজের প্রিয়বস্তু, শ্রীগুরুকে নিবেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভোজন করিবেন। গুরু কর্ত্তৃক তাড়িত বা পীড়িত হইয়াও তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। তাঁহার বাক্যে অবহেলা করিবেন না। ধন ও প্রাণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়াচরণ করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুমাহাত্ম্য—

চরাচর জগতের মোহনার্থ কোন কোন পুরাণ ও আগমাদি কল্প পর্য্যন্ত তত্তদ্দেবতাকে পরদেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও, সকল শাস্ত্র বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে এক ভগবান্ বিষ্ণুই পরদেবতা বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্য—

মনুষ্য শ্রীগুরুর অনুগ্রহে শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্ররাজাদি জপ করিতে করিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভানন্তর শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সহস্র বৎসর

বিপুল তপস্যা করেন, তাঁহারাই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই লোকপাবন হয়েন। সমস্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুমন্ত্রের মধ্যে আবার কৃষ্ণমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণমন্ত্র ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী পরব্রহ্ম। তদীয় মন্ত্রের স্মরণমাত্র ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলাসূচক মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতর এবং তন্মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম।

অধিকারিনির্ণয়—

তান্ত্রিক মন্ত্রের দীক্ষাদানে সাধ্বী স্ত্রীর এবং সুবুদ্ধি শূদ্রাদিরও অধিকার আছে। তবে স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্রে সংস্কার অপেক্ষিত হয়। তদুভয়ই সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। গুরু মন্ত্রদানে সিদ্ধসাধ্যাদি, স্বকুলান্যকুলত্ব, বাল-প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীপুংনপুংসকত্ব, রাশিনক্ষত্রমেলন, সুপ্তপ্রবোধকাল ও ঋণধনাদি বিচার করিবেন। কেবল স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্রে মালামন্ত্রে ত্র্যক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রে ঐ সকল বিচার করিতে হইবে না। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোপালমন্ত্রে কিছুই বিচার করিতে হইবে না; কারণ, গোপালমন্ত্র গোপাললীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী। এই নিমিত্ত গোপালমন্ত্রের অরিদোষ, ঋণধন-বিচার বা রাশ্যাদিবিচার প্রয়োজন হয় না।

মন্ত্রসংস্কার—

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি এই দশটি মন্ত্রসংস্কার। কৃষ্ণমন্ত্র বলবান্ বলিয়া উক্ত দশবিধ সংস্কারের কোন সংস্কারই অপেক্ষা করেন না।

দীক্ষার নিত্যতা—

দ্বিজাতির যেমন উপনয়ন না হইলে বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়ন হইলেই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রে ও দেবার্চ্চনা-দিতে অধিকার হয় না এবং দীক্ষিতেরই অধিকার হয়; অতএব সকলেই দীক্ষিত হইবেন।

দীক্ষাকাল—

চৈত্রমাসে দীক্ষা বহুদুঃখপ্রদা হয়। বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে ভয়, ভাদ্রে প্রজাহানি, আশ্বিনে সর্ব্বশুভ, কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণে শুভ, পৌষে জ্ঞানহানি, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্ব হইয়া থাকে। রবি বৃহস্পতি সোম বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা প্রশস্ত। রোহিণী শ্রবণা

ধনিষ্ঠা উত্তরাষাঢ়া উত্তরফল্গুনী উত্তরভাদ্রপদ পুষ্যা ও শতভিষা নক্ষত্রে দীক্ষা প্রশস্ত। অশ্বিনী রোহিনী স্বাতি বিশাখা হস্তা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেও দীক্ষা হইতে পারে। দ্বিতীয়া পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী দশমী ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে দীক্ষা প্রশস্ত। শুভ সিদ্ধ আয়ুষ্মান্ ধ্রুব প্রীতি সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও হর্ষণ যোগ দীক্ষাতে প্রশস্ত। বৃষ সিংহ কন্যা ধনু ও মীন লগ্ন দীক্ষাতে প্রশস্ত। বব বালব কৌলব তৈতিল ও বণিজ করণ দীক্ষাতে প্রশস্ত। চন্দ্র ও তারা অনুকূল হইলে শুদ্ধদিনে শুক্লপক্ষে গুরু ও শুক্রের উদয়ে সল্লগ্নে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। সত্তীর্থে—চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে এবং শ্রাবণী পূর্ণিমা ও চৈত্রশুক্লাচতুর্দ্দশীতে মাসাদিশুদ্ধির অপেক্ষা নাই। সদ্‌গুরু অতিদুর্লভ, কোনভাগ্যে সদ্‌গুরুর লাভ হইলে, তাঁহার আজ্ঞামাত্র দীক্ষিত হইবেন, দেশকালাদি বিচার করিবেন না। গ্রামেই হউক অরণ্যেই হউক বা ক্ষেত্রেই হউক, দিবসেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, সদ্‌গুরুর লাভ হইলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

দীক্ষাপ্রয়োগ—

শিষ্য পূর্ব্বদিন সংযত থাকিয়া পরদিন নিত্যক্রিয়া সমাপনানন্তর স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক দীক্ষার সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্প যথা—

ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুককামঃ অমুকদেবতায়াঃ অমুকা-ক্ষরমন্ত্রগ্রহণমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্পের পর গুরুদেবকে বরণ করিবেন। বরণ যথা—

ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্। (শিষ্যোক্তি)

ওঁ সাধ্বহমাসে। (গুরুর উক্তি)

ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। (শিষ্যোক্তি)

ওঁ অর্চ্চয়। (গুরুর উক্তি)

পরে শিষ্য অক্ষত পুষ্প বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার দক্ষিণ জানু ধরিয়া পাঠ করিবেন—বিষ্ণুরোং তৎ সদদ্য ইত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকমন্ত্রোপদেশকর্ম্মণি অমুকগোত্রম্ অমুকপ্রবরং শ্রীঅমু-কম্ এভি র্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। গুরু বলিবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি। শিষ্য বলিবেন—ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু। গুরু বলিবেন—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর গুরু আচমন, মণ্ডপের দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, অর্ঘ্যস্থাপিত জল দ্বারা নিজশরীর পূজোপকরণ ও দ্বারদেশের অভ্যুক্ষণ, দ্বারদেবতার অর্চ্চন,

মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ, বাস্তুপুরুষাদির অর্চ্চন, বিঘ্নোৎসারণ ও আসনগ্রহণ করিয়া মণ্ডপ শোধন করিবেন। পরে পাত্রাসাদন, দীপপ্রজ্বালন, গুর্ব্বাদিবন্দন, করশোধন, দশদিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি করিয়া পূজাপদ্ধতি অনুসারে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও এবং মানস ও বাহ্য উপচার দ্বারা অর্চ্চন করিবেন। পরে যথাবিধি সংস্থাপিত ঘটে মূলদেবতার সর্ব্বাঙ্গের উদ্দেশে মূল-মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপপুরঃসর উক্ত জপ সমর্পণ ও যথোক্তবিধানে হোম করিয়া শিষ্যকে অগ্নিসন্নিধানে উপবেশন করাইবেন। পরে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা শোধিত ঘটস্থ জল দ্বারা শিষ্যকে অভি-ষেক করিয়া আত্মদেবতাকে শিষ্যসংক্রান্তা চিন্তা ও তদুভয়ের ঐক্য ভাবনা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। পরে "হুং ফট্" মন্ত্র দ্বারা শিষ্যের শিখা বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদানানন্তর মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া "অমুকমন্ত্রং তে দদামি" এই বাক্য বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল দিবেন। শিষ্য বলিবেন, "দদস্ব"। পরে গুরু ঋষ্যাদিযুক্ত মন্ত্র শিষ্যদেহে ন্যাস করিয়া তাঁহার দক্ষিণকর্ণে ৮ বার জপ করিবেন। পরে শিষ্য গুরু তদ্দত্তমন্ত্র ও মন্ত্রদেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া মন্ত্রদেবতার করে উক্ত জপ সমর্পণানন্তর গুরুর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইবেন। তখন গুরু "উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তিরতুলা বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥" এই বাক্যটি পাঠ করিয়া শিষ্যকে উত্থাপন করিবেন। পরে তিনি স্বশক্তিরক্ষার্থ উক্ত মন্ত্র শতবার জপ করিবেন। পরিশেষে শিষ্য গুরুর অর্চ্চনানন্তর কুশ তিল ও জল লইয়া "বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য ইত্যাদি কৃতৈতৎ অমুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া দক্ষিণা দিয়া শরীর অর্থ ও প্রাণাদি সমস্ত শ্রীগুরু-চরণে নিবেদন করিবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গুরুদেবকে ভোজন করাইবেন এবং তদবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করিয়া মন্ত্রৈকশরণ হইয়া সুখে কাল-যাপন করিবেন।'

দীক্ষিত ব্যক্তির পূজাতে নিত্যতা—

দীক্ষিত ব্যক্তি যদি প্রতিদিন মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা না করেন, তবে তাঁহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয়, এবং ইষ্টদেবতা তাঁহার অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন।

সদাচার। সদাচার ব্যতিরেকে কাহারও কিছু সিদ্ধ হয় না, অতএব সদাচার অবশ্যাপেক্ষণীয়। নির্দ্দোষ সাধুগণের আচারকেই সদাচার বলা যায়।

নিত্যকৃত্যে নিশান্তকৃত্য—

নিশান্তে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জাগরণ ও ধরিত্রীদেবীর প্রণতি-পুরঃসর শয্যাত্যাগ করিবেন। পরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনানন্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও বসনান্তর পরিধান পূর্ব্বক আচমন ও উপবেশন করিয়া শ্রীগুরুর স্মরণ করিবেন। এইরূপে যূথেশ্বরী পর্য্যন্ত স্মরণ ও প্রণামাদি করিয়া শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশান্তলীলা স্মরণ করিবেন। তদনন্তর শৌচ ও দন্তধাবন করিয়া আচমন করিবেন। পরে স্নান ও স্নানাঙ্গতর্পণ করিয়া সম্প্রদায়ানুসারে তিলকমালাদি ধারণ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রবোধনাদি কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবেন।

প্রাতঃকৃত্য—

পুষ্পাদ্যাহরণ, তুলসীচয়ন, সন্ধ্যাবন্দন, ইষ্টদেবতার অর্চ্চন ও প্রাতর্লীলা স্মরণ করিবেন।

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য—

শ্রীগুরুসেবা ও পূর্ব্বাহ্নলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন।

মধ্যাহ্নকৃত্য—

মধ্যাহ্নস্নান, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, হোম, বৈশ্বদেব, বলিপ্রদান, অতিথিসৎকার, নিত্যশ্রাদ্ধ গোগ্রাসদান ও মধ্যাহ্নলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন।

অপরাহ্নকৃত্য—

শাস্ত্রালোচনা ও অপরাহ্নলীলা স্মরণ প্রভৃতি করিবেন।

সায়ংকৃত্য—

সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি ও সায়াহ্নলীলা স্মরণাদি করিবেন।

প্রদোষকৃত্য—

মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ও প্রদোষলীলা স্মরণাদি করিবেন।

রাত্রিকৃত্য—

রাত্রিলীলা স্মরণাদি করিবেন।

পক্ষকৃত্য—

যিনি উক্তপ্রকারে নিত্য শ্রীকৃষ্ণপূজামহোৎসব করিতেছেন, তিনি উভয় পক্ষের হরিবাসরে বিশেষরূপে উক্ত মহোৎসব সম্পাদন করিবেন।

হরিবাসর ব্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে বলে? কেহ কেহ বলেন, সঙ্কল্পই ব্রত। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘকাল অনুপালনীয় সঙ্কল্পই ব্রত। আবার কেহ

কেহ বলেন, স্ব-কর্ত্তব্য-বিষয়ক নিয়তসঙ্কল্পই ব্রত। সঙ্কল্প জ্ঞানবিশেষ। অতএব ভাবপক্ষে, অর্থাৎ বিধিপক্ষে 'এইটি আমার কর্ত্তব্য' এই প্রকার এবং অভাবপক্ষে, অর্থাৎ নিষেধপক্ষে 'এইটি আমার অকর্ত্তব্য' এইপ্রকার জ্ঞানই সঙ্কল্প শব্দের অর্থ। এই নিমিত্তই অভিধানে মানস কর্ম্ম সঙ্কল্পশব্দের অর্থ অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, সঙ্কল্পবিষয়ক কর্ম্মবিশেষই ব্রতশব্দের অর্থ। ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক ভেদে দ্বিবিধ। দ্রব্যবিশেষ ভোজন ও পূজন প্রভৃতি প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম, এবং উপবাসাদি নিবৃত্তিরূপ কর্ম্ম। নিবৃত্তিরূপ কর্ম্ম আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ত্রিবিধ। একাদশ্যাদি ব্রত নিত্যকর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক কর্ম্ম; আর বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাসাদি ব্রতরূপ বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম।

একাদশীব্রত নিত্য। বিধিবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, নিষেধবাক্য দ্বারা প্রাপ্তি, অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণ এবং করণে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফলশ্রবণ হেতু একাদশী-ব্রতকে নিত্যব্রত বলা হয়। সামান্যতঃ বিহিত ও নিষিদ্ধের অতিক্রমে দোষ-শ্রবণ হেতু বিধিপ্রাপ্ত ও নিষেধপ্রাপ্ত বিষয়ের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, শাস্ত্র-কর্ত্তারা, যাহার অকরণে প্রত্যবায় শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্বই মুখ্য বলিয়া থাকেন; ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু বিষ্ণুপরায়ণ জনগণের পক্ষে যাহাতে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফলবিশেষ শ্রবণ করা যায়, তাহার নিত্যত্বই মুখ্য নিত্যত্ব জানিতে হইবে। অথবা যাহাতে শ্রীভগবত্তোষণরূপ ফলবিশেষ শ্রবণ করা যায়, তাহা সকল লোকের পক্ষেই মুখ্যতর নিত্য। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়-পক্ষীয় একাদশীব্রতই নিত্য। সংক্রান্ত্যাদিতেও একাদশীব্রত নিত্য। মৃত-কাদি অশৌচেও একাদশী নিত্য। শ্রাদ্ধবিষয়েও একাদশী নিত্য। একাদশী-ব্রতে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের সকল লোকই অধিকারী।

ব্রতদিননির্ণয়। একাদশী সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। বিদ্ধা একাদশী আবার পূর্ব্ববিদ্ধা ও উত্তরবিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সকল রবির এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত থাকিলে, উহাদিগকে সম্পূর্ণা তিথি বলা হয়। হরিবাসরের পক্ষে অর্থাৎ একাদশীর পক্ষে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম নহে। একাদশী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত থাকিলে, তবে উহা সম্পূর্ণা হয়। দিন বা রাত্রির পরিমাণের পঞ্চদশ ভাগের এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত। তাদৃশ দুই মুহূর্ত্তকাল যদি রবির উদয়ের পূর্ব্ব হইতে একাদশী আরম্ভ হয়, তবে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা একাদশী বলা হয়।

অন্যথা উহা বিদ্ধার মধ্যে গণ্য। পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশী সকলেরই পরিত্যাজ্যা। দশমীবিদ্ধা একাদশী সন্দিগ্ধা, সংযুক্তা ও সঙ্কীর্ণা ভেদে ত্রিবিধা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি তিনদণ্ডব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সন্দিগ্ধা একাদশী বলা হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি দুইদণ্ডব্যাপিনী একাদশী হয়, তবে তাহাকে সংযুক্তা একাদশী বলা হয়। আর সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্টিদণ্ডব্যাপিনী যে একাদশী, তাহাকে সঙ্কীর্ণা একাদশী বলা হয়। ধর্ম্মফলাভিলাষী ব্যক্তি এই ত্রিবিধা দশমীবিদ্ধা একাদশীকেই ত্যাগ করিবেন। দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা। কোন কোন স্থলে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীরও ত্যাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে, দ্বাদশী বর্দ্ধিত হইয়া ত্রয়োদশীর দিনে, অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিপদের দিনে গমন করিলেই দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিতে বলেন। তন্মধ্যে একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর দিনে গমন করিলে, যে দশমীবেধবিহীনা সম্পূর্ণা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করা কর্ত্তব্য, তাহা অবৈষ্ণবেরাও অস্বীকার করেন না। অপরাপর তিথি-মলের ন্যায় একাদশীর তিথিমল যে অগ্রাহ্য নহে, পরন্তু গ্রাহ্য, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তিথি কখন কখন ষষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গমন করিয়া থাকে। ঐ পরদিনগামিনী তিথিকে তিথিমল বলা হয়। তিথিমল সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু একাদশী তিথির মল পরিত্যাজ্য নহে, পরন্তু গ্রাহ্য।

অতঃপর দ্বাদশী প্রভৃতির বৃদ্ধিতেও যে একাদশী ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

"শুদ্ধং বৃদ্ধিমুপৈতি চেদ্ধরিদিনং ভদ্রা ন সোন্মীলনী
ভদ্রৈবাভ্যধিকা ন হর্ষ্যহরিয়ং বঞ্জুল্যভিখ্যা সতী।
নন্দাদিত্রিতয়াম্বয়ে তু মহতী স্যাৎ ত্রিস্পৃশা দ্বাদশী
পূর্ণে পর্ব্বণি নির্গতে পরদিনে স্যাৎ পক্ষবর্দ্ধিন্যপি॥
আদিত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়া পুষ্যেণ পাপাপহা
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতস্থঋক্ষং দিনাদে ভবেৎ।
পূর্ণং চোনমথাধিকং চ হরিভাধিক্যে তু ভান্তভুজিঃ
ঋক্ষাধিক্যসমত্বয়োস্তু দিনতঃ প্রাগ্‌ভে চ পশ্চাদ্‌ব্রতম্‌।
হিত্বা বৈষ্ণবমন্তসত্ত্বমিতরেষৃক্ষেষু ভদ্রাতিথে-
স্তত্রার্বাগপি তৎপ্রথণ্ডন ইহৈবাহ্নি ব্রতে পারণম্‌।

অন্যস্মিন্নধিকা তিথি র্যদি ভতো ভাস্তেন বৃদ্ধৌ তিথে-
রস্তঃ পারণকং ভবেদিতি মহাষ্টদ্বাদশীনির্ণয়ঃ ॥"

শুদ্ধা একাদশী বৃদ্ধি পাইয়া যদি পরদিন কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্ট হয়, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হয় তবে ঐ দ্বাদশীকে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলা হয়। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, ঐ দ্বাদশীকে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলা হয়। একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর যোগ হইলে, উক্ত যোগদিবসকে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ষষ্টিদণ্ডের অধিক হইয়া পরদিনে গমন করিলে, তত্তৎপক্ষীয়া দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলা হয়। আর শুক্লপক্ষের দ্বাদশী পুনর্বসুযোগে জয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী, শ্রবণাযোগে বিজয়ানাম্নী মহাদ্বাদশী, পুষ্যাযোগে পাপনাশিনীনাম্নী মহাদ্বাদশী এবং রোহিণী-যোগে জয়ন্তীনাম্নী মহাদ্বাদশী বলিয়া উক্ত হয়েন। এই অষ্টমহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, শুদ্ধা একাদশীকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতেই উপবাস কর্ত্তব্য। একাদশী বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশীর সহিত মিশ্রিত হইলে, ঐ দ্বাদশীমিশ্রিতা একাদশীতে উপবাস করিতে হইবে। তৎপক্ষে দ্বাদশীর বৃদ্ধি বা অবৃদ্ধির অপেক্ষা নাই। দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে, একাদশীমিশ্রা দ্বাদশী উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, একাদশীমিশ্রা দ্বাদশী একাদশী বলিয়াই উপোষ্যা হইবেন। একাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে, একাদশীর পরবর্ত্তিনী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দ্বাদশী বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। দ্বাদশীর মল অগ্রাহ্যই থাকিবেন। প্রথমে অল্পমাত্র একাদশী, মধ্যে ক্ষীণা দ্বাদশী ও অন্তে ত্রয়োদশী হইলে, ঐ যোগদিবস ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা হইয়া প্রতি-পদের দিন বৃদ্ধি পাইলে, তত্তৎপক্ষীয়া দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলিয়া উপোষ্যা হইবেন। কিন্তু ত্রয়োদশীর ক্ষয় ঘটিলে, পক্ষবর্দ্ধিনীস্থলেও দ্বাদশীতে উপবাস না হইয়া একাদশীতেই উপবাস হইবে। কারণ, ঐ স্থলে, দ্বাদশীতে উপবাস করিলে, নৃসিংহচতুর্দ্দশীর অনুরোধে পারণের লোপ অথবা পারণের অনুরোধে চতুর্দ্দশীব্রতের লোপ হইতে পারে। আর শুদ্ধাশুদ্ধ যে কোন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পুনর্ব্বসুর যোগে জয়া, শ্রবণার যোগে বিজয়া, রোহিণীর যোগে জয়ন্তী ও পুষ্যার যোগে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী হয়। উক্ত চারিটি মহাদ্বাদশীই উপোষ্যা। কিন্তু ঐ সকল নক্ষত্র সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। উহারা সূর্য্যোদয়ের পর প্রবৃত্ত হইলে, মহাদ্বাদশী

হইবে না। ঐ সকল নক্ষত্র যদি সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষায় অধিক বা সমান বা ন্যূন হইলেও মহাদ্বাদশী হইবে। আর যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হয়, তবে দিনমানাপেক্ষা অধিক বা সমান হইলেই হইবে, ন্যূন হইলে হইবে না। তন্মধ্যে জয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী স্থলে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই; বিজয়া স্থলে অন্ততঃ বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। দেড় প্রহর পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে, ত্রয়োদশীর ক্ষয়ে চতুর্দ্দশীতে পারণ ঘটিবার সম্ভাবনা; চতুর্দ্দশীতে পারণ কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। উপবাস দিবস তিথি ও নক্ষত্র বর্দ্ধিত হইয়া পরদিবসে গমন করিলে, তিথির আধিক্যে নক্ষত্রান্তে দ্বাদশীর প্রথম পাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিথিমধ্যেই পারণ হইবে; আর নক্ষত্রাধিক্যে তিথি ও নক্ষত্র উভয়েরই মধ্যে পারণ করিতে হইবে; কারণ দ্বাদশী তিথির লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। পারণ দিবসে যদি দ্বাদশী না থাকে, এবং রোহিণী ও শ্রবণা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রমধ্যেই পারণ হইবে। আর যদি পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে নক্ষত্রান্তে পারণ করিতে হইবে।

মাসকৃত্য—

অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসের মাসকৃত্য সকল যথাবিধি পালন করিতে হইবে।

ফাল্গুনকৃত্যে শিবরাত্রিব্রত—

যদিও শিবরাত্রিব্রত বৈষ্ণবদিগের আবশ্যক নহে, তথাপি সদাচার হেতু লিখিত হইতেছে। শিবরাত্রিব্রতের পরিত্যাগে ভগবৎপূজার ফল হয় না বলিয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থ বৈষ্ণবগণও শিবরাত্রিব্রত পালন করিবেন। শুদ্ধা চতুর্দ্দশী সকলেরই উপোষ্যা। উহা বিদ্ধা হইলে, প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশীকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, শিবভক্তগণ তাদৃশী চতুর্দ্দশীরই সমাদর করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে;—শিবভক্তগণ প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশীকেই গ্রহণ করিবেন। তাদৃশী চতুর্দ্দশীতে উপবাসের বিধান হেতু জাগরণও বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডকে প্রদোষ বলিয়া থাকেন। যদি দুই দিন চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে, প্রদোষ ও মহানিশা এই উভয়-ব্যাপ্তির অনুরোধে, প্রথম দিন উপবাস করিতে হইবে, এই যে বিধান, ইহা বৈষ্ণবেতরপক্ষে; কারণ, বৈষ্ণবগণ কখনই বিদ্ধাব্রত করিবেন না, ইহাই সাধুদিগের মত; অতএব বৈষ্ণবেরা তাদৃশ স্থলেও পরদিন অবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই

উপবাস করিবেন। শিবরাত্রিব্রতে বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীকে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবেন। শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী তিথি সর্ব্বদা পালন করিবেন, এই যে বচন, ইহা সকাম-বৈষ্ণব-বিষয়ক; নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ বিদ্ধাব্রত সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবেন। এই নিমিত্তই স্কন্দপুরাণে পরাশর মুনি বলিয়াছেন,—হে রাজন্, শিবচতুর্দ্দশী পরদিন, অমাবস্থার সহিত যোগ হইলে, বৈষ্ণবগণ ঐ পরদিনই উপবাস করিবেন; কারণ, উক্ত ব্রতই শ্রীশিবের প্রিয়; তাঁহারা কখনই ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিবেন না।

কেহ কেহ বলেন,—"শিবরাত্রিব্রতে ভূতং" এবং "মাঘাসিতং ভূতদিনং" এই দুইটি বচন পরদিন-প্রদোষব্যাপি-চতুর্দ্দশ্যুপবাস-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশী দুইদিন হইলে, বৈষ্ণবগণ পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিয়া পরবিদ্ধাতেই উপবাস করিবেন, ইহাই উক্ত বচনদ্বয়ের অভিপ্রায়। কিন্তু উক্তপ্রকার ব্যবস্থা সঙ্গত হয় না; কারণ, উক্ত বচনদ্বয়ের ঐপ্রকার অভিপ্রায় হইলে, "উপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা"—যদি পঞ্চদশীর সহিত যোগ হয়—এইরূপ বিশেষোক্তির প্রয়োজন দেখা যায় না, অর্থাৎ পঞ্চদশীর সহিত চতুর্দ্দশীর নিত্যসংযোগ হেতু উহা বিশেষ করিয়া বলিবার কোন কারণ দেখা যায় না; বিশেষতঃ, উক্ত অভিপ্রায় স্বীকারে "প্রদোষব্যাপিনীসাম্যেঽপ্যুপোষ্যং প্রথমং দিনম্" এই কারিকার সহিত বিরোধ ঘটে; কারণ, কারিকার অভিপ্রায়, প্রথম দিন উপবাস কর্ত্তব্য, এবং প্রমাণবচনের অভিপ্রায়, প্রথম দিন উপবাস অকর্ত্তব্য। অতএব উক্ত বচনদ্বয় পরদিন-প্রদোষব্যাপি-চতুর্দ্দশ্যুপবাস-বিষয়ক না হইয়া পূর্ব্বদিবসীয়-ত্রয়োদশীবিদ্ধা-চতুর্দ্দশ্যুপবাস-নিষেধ-বিষয়কই হইতেছে। এই পক্ষে বিশেষ [illegible]। প্রথম বচনের "বিবর্জ্জয়েৎ" ও দ্বিতীয় বচনের "কুর্য্যাৎ" [illegible] নঞেরই পর্য্যুদাস অর্থ না হইয়া প্রসজ্যপ্রতিষেধ অর্থ হওয়াই সঙ্গত। উক্ত নঞ্দ্বয়ের পর্য্যুদাস অর্থ হইলে, চতুর্দ্দশীর ক্ষয়স্থলে বৈষ্ণবেরও বিদ্ধোপবাসের প্রসক্তি হইয়া পড়ে; কিন্তু উহাদের প্রসজ্যপ্রতিষেধ অর্থ হইলে, প্রসজ্যপ্রতিষেধার্থক নঞের নিষেধেই তাৎপর্য্য হেতু চতুর্দ্দশীর ক্ষয়স্থলেও বৈষ্ণবের বিদ্ধোপবাসের প্রসক্তি ঘটে না। পূর্ব্বপক্ষে বিদ্ধোপবাসপ্রসক্তির [illegible]স্বীকারে অমাবস্যা-সংযোগ-ব্যবস্থা হেতু চতুর্দ্দশীক্ষয়স্থলে ব্রতের লোপ প্রসঙ্গ [illegible] অতএব ঐপ্রকার ব্যবস্থা বৈষ্ণবসম্মত নয় বলিয়া উপেক্ষণীয়। আবার [illegible] কেহ বলেন,—চতুর্দ্দশী শুদ্ধা হইলে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব উভয়েই ঐ শুদ্ধা [illegible]দ্দশীতেই উপবাস করিবেন। আর যদি ঐ চতুর্দ্দশী বিদ্ধা হয়, তবে অবৈষ্ণবগণ

প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতেই উপবাস করিবেন। উভয়দিনে মুহূর্ত্তানূ্যন-প্রদোষ-ব্যাপ্তি-স্থলে অধিক-কাল-ব্যাপিনী গ্রহণ করিবেন। প্রদোষ-ব্যাপ্তির সমতায় পূর্ব্বদিন গ্রহণ করিবেন। কারণ, পূর্ব্বদিন প্রদোষ ও নিশীথ এতদুভয়ব্যাপিনী হওয়ায় পূর্ব্বদিনই ব্রতযোগ্য হইতেছে। উভয়দিনই প্রদোষব্যাপিনী না হইলে, যে দিন নিশীথব্যাপিনী হইবে, সেই দিনই গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বদিন মুহূর্ত্তের অনূ্যন ত্রয়োদশী থাকিলে এবং পরদিন মুহূর্ত্তদ্বয়ের অনূ্যন চতুর্দ্দশী থাকিলে, পরদিন গ্রহণ করিবেন। তদুভয়ের একতরের অভাব ঘটিলে, পূর্ব্বদিন গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়েই ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে উপবাসের বিধায়ক এবং প্রদোষব্যাপিনী চতুর্দ্দশীতে উপবাসের বিধায়ক বচনের সমন্বয় করিতে হইবে। যদি অমাবস্যার ক্ষয় হয়, তবে ত্রয়োদশীবেধ ও পঞ্চদশীযোগ হইলেও অমাবস্যাতে পারণবিধির অনুরোধে পূর্ব্বদিনই ব্রত করিবেন। আর যদি চতুর্দ্দশীর ক্ষয় হয়, তবে উক্ত কারণ বশতঃ সেই ক্ষয়দিবসেই ব্রত করিবেন। পারণ সর্ব্বপ্রকার উপবাসেই চতুর্দ্দশীর অন্তে অমাবস্যাতেই করিতে হইবে। কারণ, অমাবস্যা-তেই পারণের বিধান দেখা যায়; প্রতিপদে পারণের বিধান-দেখা যায় না। পরদিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী থাকিলে, চতুর্দ্দশীতেই পারণ করিবারও বিধান আছে। কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কোনক্রমেই বিদ্ধোপবাস স্বীকার করেন না।

চৈত্রকৃত্যে শ্রীরামনবমী—

শ্রীরামনবমী শুদ্ধা গ্রাহ্যা ও পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাজ্যা। একাদশীব্রতভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিলে, পূর্ব্ববিদ্ধাও গ্রাহ্য হইবেন।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী—

নৃসিংহচতুর্দ্দশীও শুদ্ধাই গ্রাহ্যা। কেহ কেহ বলেন, চতুর্দ্দশীক্ষয়ে পূর্ব্ববিদ্ধাও গ্রাহ্য হইবেন। কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না।

ভাদ্রকৃত্যে জন্মাষ্টমী—

শ্রাবণী পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী, তাহাকেই জন্মাষ্টমী বলা হয়। ঐ জন্মাষ্টমী ভাদ্রমাসেই ঘটে বলিয়া উহাকে ভাদ্রকৃত্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে। জন্মাষ্টমীব্রত নিত্য। উহাতে উপবাস কর্ত্তব্য। ঐ অষ্টমী রোহিণীযুক্তা হইলে, মহাফল হয়, অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে উপবাস করিলে ফলাতিশয় হয়। ঐ রোহিণী যদি অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীর সহিত সংযোগ পায়, কিম্বা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে সোমবার বা বুধবারের লাভ হয়, অথবা তাদৃশী অষ্টমী যদি নবমীসংযুক্তা হয়, তাহা হইলেও মহাফলা

হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ রোহিণী প্রভৃতির যোগ না হইলেও কেবল অষ্টমী-তেই উপবাস করিতে হইবে; কারণ, অষ্টমীতে উপবাসই বিধি, রোহিণ্যাদির যোগ কেবল বৈশিষ্ট্যবোধক। অষ্টমীতে উপবাস না করিলে, ব্রতলোপ ঘটিয়া থাকে। ঐ অষ্টমী উদয়ে সপ্তমীবিদ্ধা হইলে, সর্ব্বথা ত্যাজ্যা। রোহিণী নক্ষত্রের যোগ বা সোমাদি বারের যোগ হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস কর্ত্তব্য নহে। সপ্তমীবেধরহিতা অষ্টমী না পাইলে, নবমীতেও উপবাস হইবে। সপ্তমী-বেধরহিতা অষ্টমী পাইলে, নক্ষত্রাদির যোগ হউক, বা না হউক, ঐ দিবসই উপবাস হইবে। যদি ঐ সপ্তমীবেধরহিতা শুদ্ধা অষ্টমী রবির উদয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া বৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করে, এবং পরদিবস যদি অষ্টমী মুহূর্ত্তের ন্যূন বা অন্যূন কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এবং নক্ষত্র ও বারের যোগ না হয়, তবে পূর্ব্বদিন উপবাস হইবে। আর পরদিবস নক্ষত্র ও বারের যোগ হইলে, যোগ-দিবসই উপবাস হইবে। শুদ্ধাষ্টমী দুই দিবস হইলে, যে দিন অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইবে, সেই দিন উপবাস হইবে। দুই দিনই অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী পাইলে পূর্ব্বদিন, না পাইলে পরদিন উপবাস হইবে। তবে যদি পূর্ব্বদিন বারযোগ পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনই উপবাস হইবে। পারণদিনে তিথির বৃদ্ধিক্রমে অষ্টমী থাকিলে, তিথ্যন্তে পারণ, নক্ষত্রের বৃদ্ধিক্রমে নক্ষত্র থাকিলে, নক্ষত্রান্তে পারণ হইবে। কেহ কেহ বলেন, ব্রতেই যখন নক্ষত্রের অপেক্ষা নাই, তখন পারণে নক্ষত্রের অপেক্ষা কেন? তিথিঘটিত ব্রতে তিথিরই অপেক্ষা। উপবাসদিনে অষ্টমী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা হইয়া বৃদ্ধিক্রমে পরদিনে গমন করিলেও অল্পক্ষণই থাকে, পরদিনের কৃত্য করিতে করিতেই উক্ত তিথিমল শেষ হইয়া যায়; অতএব উৎসবান্তেই পারণের বিধান হইয়াছে। এই মতে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের বৃদ্ধি হইলেও উৎসবান্তে বা তিথ্যন্তেই পারণ উক্ত হয়, উভয়ের অন্তে পারণ উক্ত হয় না।

শ্রবণদ্বাদশী। শ্রবণদ্বাদশী মাসকৃত্যের অন্তর্গত। মাসকৃত্য মলমাসে হয় না। অতএব শুদ্ধ ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাকে শ্রবণদ্বাদশী বলা হয়। শ্রবণদ্বাদশী উপস্থিত হইলে, এবং উহা মহাদ্বাদশীলক্ষণা-ক্রান্তা না হইলে, কেহ কেহ সমর্থপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশী এই দুইটি ও অসমর্থ-পক্ষে একটি অর্থাৎ যোগাদর বশতঃ কেবল দ্বাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রবণাদ্বাদশীও যখন মহাদ্বাদশীলক্ষণাক্রান্তা না হইলে উপোষ্যা হয়েন না এবং

মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে যখন একাদশী ত্যাগ করিয়াও মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হয়, তখন শ্রবণদ্বাদশীতেও তাহাই না হইবে কেন? দ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ না হইয়া কেবল একাদশীতেই যদি উহার যোগ হয়, তবে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিতে হইবে। ঈদৃশী একাদশী শ্রবণৈকাদশী বলিয়া উক্ত হয়েন। কিন্তু ঐ শ্রবণাযুক্তা একাদশীর রাত্রি প্রভৃতি কোন সময়েও যদি দ্বাদশীর সহিত শ্রবণার যোগ না হয়, তবেই উক্ত যোগদিবসকে শ্রবণৈকাদশী বলা হইবে। অন্যথা ঐ যোগদিবসের উপবাসকে শ্রবণৈকাদশীর উপবাস না বলিয়া বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগের উপবাস বলা হইবে। কারণ, একাদশী দ্বাদশী ও শ্রবণা একদিনে হইলে, ঐ যোগদিবসকে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ বলা হয়। বিষ্ণুশৃঙ্খল উপস্থিত হইলে, উহার বিশেষত্ব হেতু বৈষ্ণবগণ ঐ দিবসই উপবাস করিয়া থাকেন। বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ দুইপ্রকার। একাদশীর সহিত শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর যোগ প্রথম অর্থাৎ সামান্য এবং শ্রবণস্পৃষ্ট একাদশী ও শ্রবণস্পৃষ্ট দ্বাদশীর পরস্পর যোগে দ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ হয়। উভয়ত্রই যোগদিবসই উপোষ্য। পরদিবস মহাদ্বাদশী ঘটিলেও বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে যোগদিবসই উপোষ্য হইবেন। পরদিবস মহাদ্বাদশী না ঘটিলে, পূর্ব্বদিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হউক বা না হউক পূর্ব্বদিনই উপোষ্য হইবেন। কারণ, পূর্ব্বদিন শ্রবণার যোগে বিষ্ণুশৃঙ্খল হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলিয়া এবং বিষ্ণুশৃঙ্খল না হইলে শ্রবণৈকাদশী বলিয়া উপোষ্য হইবেন; আর পূর্ব্বদিন শ্রবণার অযোগে মহাদ্বাদশী ব্যতিরেকে একাদশীর অত্যাজ্যত্ব বিধায় একাদশী বলিয়াই উপোষ্য হইবেন। বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগদিবস বুধবার পাইলে উহাকে দেবদুন্দুভিযোগ বলা হয়। উক্ত যোগের অধিকতর মাহাত্ম্য। মহাদ্বাদশীস্থলে উপবাসদিনে বৃদ্ধি বশতঃ তিথি ও নক্ষত্রের পরদিবস নিষ্ক্রমণে নক্ষত্রান্তে তিথিমধ্যেই পারণ হইবে। নক্ষত্রের আধিক্যে বা সাম্যেও তিথি ত্যাজ্য হইবেন না। তিথ্যভাবে ত্রয়োদশীতেই পারণ হইবে। প্রথমবিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের নিষ্ক্রমণে তিথ্যাধিক্যে নক্ষত্রান্তে এবং নক্ষত্রাধিক্যে বা তৎসাম্যেও দ্বাদশ্যতিক্রম দোষাবহ বলিয়া তিথিমধ্যেই পারণ হইবে। তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিতে রাত্রিপারণ নিষিদ্ধ বলিয়া দিবাভাগে যথাকালেই পারণ হইবে। দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। এইস্থলে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় বলিয়াই ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান জানিতে হইবে। শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাসদিবসে এবং বিষ্ণুশৃঙ্খলস্থলে পারণ-

দিবসেই বামনদেবের উৎসব হইবে। বামনব্রতে উপবাসের বিধান নাই, কেবল উৎসবই কর্ত্তব্য। কি শ্রবণাদশী কি প্রথমবিষ্ণুশৃঙ্খল উভয়ত্রই বিদ্ধাত্যাগ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খলে বিদ্ধাত্যাগ অসম্ভব। কারণ, ঐ তিথিকেও বিজয়াই বলা হয়।

কার্ত্তিককৃত্যে দ্যূতপ্রতিপৎ—

কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপদের নাম দ্যূতপ্রতিপৎ। ঐ দ্যূতপ্রতিপৎ পরবিদ্ধা ত্যাজ্যা ও পূর্ব্ববিদ্ধাই গ্রাহ্যা।

রাসযাত্রা। যে দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পৌর্ণমাসী হইবে, সেই দিনই রাসযাত্রা আরম্ভ হইবে। উভয়দিনে প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা হইলে পরদিন, এবং উভয়দিন প্রদোষে মুহূর্ত্তের অন্যূন পূর্ণিমা না হইলে পূর্ব্বদিন যাত্রারম্ভ হইবে। কেহ কেহ বলেন, যে দিন রাকানাম্নী পূর্ণিমা, সেই দিনই যাত্রারম্ভ কর্ত্তব্য। পূর্ণিমা দ্বিবিধা; অনুমতি ও রাকা। যে পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি পূর্ণিমা বলা যায়; আর যে পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেই পূর্ণিমাকে রাকা পূর্ণিমা বলা যায়। যে দিন অপরাহ্ণ-ত্রিমুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী পূর্ণিমা হয়, সেই দিনই রাকা পূর্ণিমা বলা যায়। দিনমানকে পাঁচ ভাগ করিয়া তাহার চতুর্থ ভাগকে অপরাহ্ণ বলা হয়। অপরাহ্ণের পরিমাণ তিন মুহূর্ত্ত বা ছয় দণ্ড। অতএব দিবা আঠার দণ্ডের পর যদি ছয় দণ্ড পূর্ণিমা থাকে, তবে সেই পূর্ণিমাকে রাকা পূর্ণিমা বলা যায়; কারণ, সেই দিবসই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। কেহ কেহ বলেন, যে দিন অভিজিৎসময়ব্যাপিনী পূর্ণিমা, সেই দিনই যাত্রারম্ভ হইবে। অভিজিৎসময় বলিতে দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত বা মধ্যাহ্ন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাসযাত্রাতেও পূর্ব্ববিদ্ধা তিথি বর্জ্জনীয়া। বস্তুতঃ রাকা পূর্ণিমার গুণাধায়কত্ব নিবন্ধন প্রথম মত এবং অমূলকত্ব বিধায় অপর দুইটি মত অনাদরণীয়।

অধিমাসে তু সংপ্রাপ্তে স্মৃত্বা গোপীপ্রিয়ং হরিম্, সুবর্ণঞ্চাজ্যসংযুক্তং ত্রয়স্ত্রিংশদপূপকম্।
দদ্যাচ্চ বেদবিদুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে নশ্যত্যকরণে শীঘ্রং পুণ্যং দ্বাদশমাসজম্॥

মলমাস প্রাপ্ত হইলে, গোপীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া সুবর্ণ ও ঘৃতসংযুক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎটি পিষ্টক বেদজ্ঞ কুটুম্বান্বিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। এইরূপ না করিলে, দ্বাদশমাসজনিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়।

প্রকাশানন্দের সহিত মিলন।

প্রভু এইবার দুইমাস পর্য্যন্ত কাশীধামে থাকিয়া সনাতনগোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। চন্দ্রশেখরের সঙ্গী পরমানন্দ নামে একজন কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। প্রভু সনাতনগোস্বামীকে শিক্ষাপ্রদান ও পরমানন্দের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াই কালযাপন করিতেন, সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিতেন না। সন্ন্যাসীরা প্রভুর নানাপ্রকার নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, সন্ন্যাসী হইয়া ভাবকের ন্যায় নৃত্যগীত করে, বেদান্তপাঠ করে না, মূর্খ সন্ন্যাসী নিজধর্ম্ম জানে না, কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। প্রভু শুনিতেন, শুনিয়া হাসিতেন, কিছুই উত্তর করিতেন না। চন্দ্রশেখর, তপন-মিশ্র ও মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র কিন্তু অতিশয় দুঃখবোধ করিতেন। তাঁহাদের মনের দুঃখ মনেই থাকিত, প্রভুকে কোন কথাই বলিতে সাহস হইত না। শেষে একদিন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র মনে মনে ভাবিলেন, প্রভুর স্বভাব, তাঁহাকে যে দেখে, সেই ঈশ্বর বলিয়া মানে, আমি যদি কোনপ্রকারে সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রভুর মিলন ঘটাইতে পারি, তবেই সন্ন্যাসীরা প্রভুর ভক্ত হয়, এবং তাহা হইলেই আমারও মনের দুঃখের অবসান হয়। এইপ্রকার ভাবিয়া তিনি সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুকেও নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এদিকে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর প্রভুর নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আপনি সন্ন্যাসীদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, আমরা কিন্তু আর আপনার নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেছি না। হয় আপনি সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করুন, না হয় আমরা জীবন ত্যাগ করি।" প্রভু শুনিয়া পূর্ব্ববৎ ঈষৎ হাসিলেন, কোন কথাই বলিলেন না। এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণে ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমার একটি প্রার্থনা আছে, প্রসন্ন হইয়া তাহা পূরণ করিতে হইবে। আমি সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আপনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলেন না জানি, তথাপি আপনাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।" প্রভু হাসিয়া মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। সন্ন্যাসী-দিগকে কৃপা করিবেন বলিয়াই প্রভু এই নিমন্ত্রণ-ঘটনা ঘটাইলেন।

প্রভু নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের ভবনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসিগণ বসিয়া আছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালনস্থানে যাইয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ঐ স্থানেই উপবেশন

করিলেন। প্রভু উপবিষ্ট হইয়া এক অপূর্ব্ব শক্তির আবিষ্কার করিলেন। ঐ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সন্ন্যাসিগণ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসিগণের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রভুকে সম্মান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, সভামধ্যে আগমন করুন; আমরা সকলে যে স্থানে বসিয়াছি, আপনিও সেই স্থানেই উপবেশন করুন; এই অপবিত্র পাদপ্রক্ষালন-স্থান আপনার উপবেশনের যোগ্য নহে।" প্রভু বলিলেন, "আমি হীনসম্প্রদায়, আপনাদিগের সহিত একাসনে উপবেশনের অযোগ্য।" প্রভুর বিনয়মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া, প্রকাশানন্দ তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সভামধ্যে লইয়া বসাইলেন। পরে বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য, তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এইখানেই রহিয়াছ, অথচ আমাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কর না কেন? তুমি সন্ন্যাসী, বেদান্ত-পঠনই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম ছাড়িয়া কতকগুলি ভাবক লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, ইহারই বা কারণ কি? তোমার প্রভাব নারায়ণের তুল্য দেখিতেছি, তুমি কেন হীনাচার কর?" প্রভু বিনয়নম্রবচনে উত্তর করিলেন, "আমি মূর্খ, মূর্খ বলিয়া গুরু আমাকে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন; আমি গুরুর আদেশেই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকি।"

"প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥"

"গুরুর আদেশে আমি অনুক্ষণ কৃষ্ণনামই গ্রহণ করি। নাম লইতে লইতে মন ভ্রান্ত হইয়া গেল। ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না, উন্মত্ত হইলাম। উন্মত্ত হইয়া কখন নাচি, কখন কাঁদি, কখন হাসি। এই অবস্থায় একদিন মনে করিলাম, কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইলাম, জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল, গুরুকে জিজ্ঞাসা করি, আমায় এ কি দশা ঘটিল? জিজ্ঞাসাও করিলাম। গুরু বলিলেন,—'কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের স্বভাবেই তোমাকে উন্মত্ত করিয়াছে'।"

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেম তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চাশ্রু-গদ্‌গদ-বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ-বিষাদ-ধৈর্য্য-গর্ব্ব-হর্ষ-দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥
নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার ত্রিভুবন॥"

শ্রুতির মুখ্যার্থ।

প্রভুর উক্ত বিনয়মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত আর্দ্র হইল, মন ফিরিয়া গেল। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য; যাহার ভাগ্যোদয় হয়, সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণে ভক্তি কর, তাহাতে আমরাও অসন্তুষ্ট নহি। কিন্তু তুমি যে বেদান্ত শ্রবণ কর না, ইহার কারণ কি? বেদান্তশ্রবণে দোষ কি?" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা যদি দুঃখ না ভাবেন, তবেই আমি কিছু নিবেদন করিতে পারি।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তোমার প্রভাব নারায়ণের সদৃশ, বাক্যগুলি অমৃততুল্য

শ্রবণসুখকর এবং রূপ নয়নমনোহর। তোমার কথায় আমাদিগের কোনরূপ দুঃখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তোমার যাহা মনে লয়, তাহাই বলিতে পার।"

প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

মনুষ্যমাত্রই ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট। এমন মনুষ্যই দেখা যায় না, যাঁহার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটি দোষের মধ্যে কোন একটি দোষও নাই। মনুষ্যের পদে পদেই ভ্রম ও প্রমাদ দেখা যায়। আবার মনুষ্য স্বার্থের দাস বলিয়া তাঁহার বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনেচ্ছাও অবশ্যম্ভাবিনী। তার পর, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলের অপটুত্বরূপ করণাপাটবও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ দোষগ্রস্ত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বভাব ব্রহ্মবস্তুকে স্পর্শ করিতে না পারিয়া সদোষই হইতেছে।

মনুষ্যের ভ্রমাদি-দোষ-যোগ হেতু তদীয় প্রত্যক্ষাদি পরমার্থে প্রমাণ না হইলেও পরব্রহ্মের প্রমাণ নাই এমন নয়। জিজ্ঞাসিত পরব্রহ্ম সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য ও আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তু। তাঁহার প্রমাণও তাদৃশই হওয়া উচিত। সর্ব্বপুরুষপরম্পরায় লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের নিদান বলিয়া যাহাকে অপ্রাকৃত বাক্য বলা যায়, সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদই একমাত্র স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্ম-বিষয়ে প্রমাণ।

স্বয়ং নারায়ণও বেদব্যাসরূপে এইপ্রকার অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন—

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।"

তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াও তর্কমূলক ব্রহ্মকারণবাদের পরিবর্ত্তে বেদমূলক ব্রহ্মকারণবাদই আশ্রয় করা উচিত। যদি কেহ বলেন, যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, সেইরূপ তর্কই আশ্রয় করা হউক; তাহা হইলেও, তর্কের অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; কারণ, প্রতিষ্ঠিত তর্কের স্থিরীকরণও তর্কসাপেক্ষ।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

অচিন্ত্য বিষয় সকলে তর্ক প্রয়োগ করা উচিত নয়। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।"

শাস্ত্রই পরব্রহ্মের প্রমাণ, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল অনুমান দ্বারা পরমেশ্বরকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করিবেন না।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"

অচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অতএব তদ্‌বিষয়ে অসামঞ্জস্যের আশঙ্কা করা অনুচিত।

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥"

হে ভগবন্, তোমার বাক্যরূপ বেদই স্বর্গ ও মোক্ষাদি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে এবং সাধ্যবিষয়ে ও সাধনবিষয়ে পিতৃপুরুষদিগের ,দেবতাদিগের ও মনুষ্যদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষু অর্থাৎ প্রমাণ। তাঁহারা উক্ত চক্ষুর সাহায্যে সাধন দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত প্রমাণকে সার্থক করিয়াছেন।

সর্ব্বপ্রমাণমুকুটমণি বেদের ত্রিবিধ প্রস্থান; শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকল শ্রুতিপ্রস্থান। মীমাংসাযুগলের নাম ন্যায়-প্রস্থান। আর ইতিহাস ও পুরাণ সকলই স্মৃতিপ্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থানে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন। ন্যায়প্রস্থানে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিচারিত হইয়াছেন। আর স্মৃতিপ্রস্থানে শ্রুতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থানের অর্থ অবধারিত হইয়াছেন। অতএব শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতিপ্রস্থান তিনটিই একার্থপ্রতিপাদক। শ্রুতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। স্মৃতিতে তদুভয়ের মুখ্যার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে শ্রুতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে আচার্য্যেরও কোন দোষ দেখা যায় না। আচার্য্য ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই শ্রুতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন। বহির্মুখ অসুরদিগের বুদ্ধিমোহনার্থই পরমেশ্বর আচার্য্যকে গৌণার্থকল্পনের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারেই আচার্য্য গৌণার্থ কল্পনা করিয়া মায়াবাদভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা বহির্মুখ অসুরদিগের বৈদিক সম্প্রদায় হইতে বহিষ্করণরূপ উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হইলেও, মায়াবাদভাষ্যের শ্রবণে অন্তর্মুখ জনগণের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ দ্বারা অসমোর্দ্ধ-চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীভগবান্‌ই বোধিত হয়েন। অসমোর্দ্ধ-চিদ্বিভূতি-বিশিষ্ট শ্রীভগবানের দেহও চিন্ময়। পুরুষসূক্তমন্ত্রে যে ত্রিপাদ্বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি। শ্রুতিতে শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতির ন্যায় চিদ্বিগ্রহও উক্ত হইয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক গৌণার্থ কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের চিদ্বিভূতি ও চিদ্বিগ্রহ অস্বীকার করা কি সাহসের কার্য্য হয় নাই? যাহা ভিন্নদেশীয় ও

ভিন্নকালীয় ভক্তগণ আবহমানকাল ভক্তিভাবিত হৃদয়ে অভিন্নভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছেন, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিয়া কি অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? দিবান্ধ পেচক সূর্য্যকে দর্শন করে না বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব কি অস্বীকৃত হইবে? সাধারণ মনুষ্য সকল ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এবং তত্তল্লোকবাসী পিতৃদেবাদি দর্শন করেন না বলিয়া কি ঐ সকল অস্বীকৃত হইয়া থাকে? ঐ সকল যদি অস্বীকৃত না হয়, তবে ভক্তিমাত্রবেগ্য নিত্যলোক সকল, নিত্য পরিকর সকল, নিত্য বিগ্রহ সকল ও নিত্যলীলা সকলই বা অস্বীকৃত হইবেন কেন? শ্রীভগবানের ধাম পরিকর ও বিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়া মনে করা বা প্রচার করা অপরাধের মধ্যেই গণ্য। অসুর সকলই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদি প্রাকৃত বলিয়া মনে করে ও প্রচার করে।

শক্তিতত্ত্বরূপ জীবকে শক্তিমত্তত্ত্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অভেদ জ্ঞান করা, 'পরিণামবাদে দোষারোপ পূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করা, প্রণবের মহাবাক্যত্ব আচ্ছাদন পূর্ব্বক তত্ত্বমস্যাদি প্রাদেশিক বাক্য সকলের মহাবাক্যত্ব প্রচার করা, জ্ঞানবিশেষরূপা ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞানসামান্যের প্রাধান্য স্থাপন করা ও প্রেমরূপ পরমপুরুষার্থের উল্লেখ না করিয়া মোক্ষরূপ পুরুষার্থের উৎকর্ষ বর্ণন করা কি দোষাবহ নহে? এই সকল দূষিত মতের সংস্থাপন করিতে যাইয়াই আচার্য্য মায়াবাদী হইয়াছেন। সংসারকে মায়াময়—মিথ্যা না বলিলে, এই সকল মত সংস্থাপন করা যায় না। যায় না বলিয়াই আচার্য্য প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ সংসারের অপলাপ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বস্তুতঃ বিশ্ব কি কাল্পনিক? জীবই কি ব্রহ্ম? ঐ ব্রহ্ম কি নির্গুণ? তাদৃশ-ব্রহ্মভাবাপত্তিই কি জীবের পুরুষার্থ? জ্ঞানই কি ঐ পুরুষার্থের সাধন?—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। এই প্রতিক্ষণ অনুভূয়মান বিশ্বসংসারকে স্বপ্নবৎ ইন্দ্রজালবৎ রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিরজতবৎ ও মরুমরীচিকাবৎ মিথ্যা বলিয়া অবস্তু বলিয়া ধারণা করিব কিরূপে? শ্রুতি যাহার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় নির্দ্দেশ করিতেছেন, সূত্র যাহার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় বিচার করিতেছেন, ইতিহাসপুরাণে যাহার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বর্ণনা করিতেছেন, তাহাকে কি কখন মিথ্যা বা অবস্তু বলা যাইতে পারে? যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা নাই, তাহার আবার সৃষ্টিই বা কি, স্থিতিই বা কি, প্রলয়ই বা কি? সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম যাহার নিমিত্ত ও উপাদান, সেই বিশ্বসংসার কখনই অলীক হইতে পারে না। একই ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত

ও উপাদান উভয়ই। একই ব্রহ্মের নিমিত্তোপাদানত্ব অসম্ভব নহে। ব্রহ্মের বিচিত্র-শক্তিযোগ হেতু উভয়রূপত্বই সম্ভব হয়। ব্রহ্ম অপরিণামিনী স্বরূপশক্তি দ্বারা বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং পরিণামিনী মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বের উপাদান-কারণ হয়েন। অপরিণামি ব্রহ্মবস্তুর নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হইলেও, উপাদান-কারণত্ব অসম্ভব, কারণ, উপাদানকারণ পরিণামি, এরূপও বলা যায় না; ব্রহ্মের উপাদানত্ব বিশেষ্যভূত ব্রহ্মে বাধিত হইলেও, শক্তিমদ্‌ব্রহ্মের শক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া, অবাধিতই হইতেছে. অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু অপরিণামি হইলেও, শক্তিমদ্‌ব্রহ্মের বিশেষণীভূতা শক্তির পরিণামে তদভিন্ন ব্রহ্মের পরিণাম সিদ্ধ হওয়ায়, উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মের যুগপৎ কার্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণতস্বরূপে অবস্থান আপাততঃ বিরুদ্ধ বোধ হইলেও, অচিন্ত্যশক্তি-যোগ হেতু মায়াশক্তি দ্বারা কার্য্যাকারে পরিণাম ও স্বরূপশক্তি দ্বারা অপরিণত-স্বরূপে অবস্থান সঙ্গতই হইতেছে। জগৎ ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ। একদেশস্থিত অগ্নির প্রসারিণী জ্যোৎস্নার ন্যায়. কূটস্থ ব্রহ্মের—কেন্দ্রস্থানীয় ব্রহ্মের বৃত্ত-স্থানীয় প্রসারিণী শক্তিই জগৎ। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মশক্তি সত্য; ব্রহ্মশক্তিপরিণাম-ভূত জগৎও সত্য। ব্রহ্মশক্তিপরিণামভূত জগৎ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না।

মায়াবাদী বলেন, জীবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মায়ানাম্নী একটি অনাদি অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি আছেন। ঐ শক্তির দুইটি বৃত্তি; আবরণ বৃত্তি ও বিক্ষেপ বৃত্তি। আবরণবৃত্তি দ্বারা আবৃত হইয়া জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করেন এবং বিক্ষেপবৃত্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এই বিশ্বভ্রম দর্শন করেন। জীবের এই বিশ্বভ্রম মায়ারই অঘটনঘটন। ঐ জীবও অপর কেহ নহেন, ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তুই যখন নাই, তখন জীব ব্রহ্মই, অপর হইতে পারেন না। ব্রহ্মই নিজ মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া জীব হয়েন। একই ব্রহ্ম সমষ্টি মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ঐন্দ্রজালিকস্থানীয় ঈশ্বর হয়েন এবং ব্যষ্টি মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া ইন্দ্রজালমুগ্ধস্থানীয় জীব হয়েন। ব্রহ্মই ঈশ্বর হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও জীবের বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা করেন এবং জীব হইয়া সৃষ্ট্যাদি ও বন্ধমোক্ষ অনুভব করেন। বদ্ধজীবের দৃষ্টিতে মায়া ও তৎকার্য্য বাস্তবিক। যুক্তিদৃষ্টিতে উহা অনির্বাচ্য, অর্থাৎ স্পষ্ট প্রতীয়মান বলিয়া নাই বলা যায় না এবং নিত্য বাধিত বলিয়া আছেও বলা যায় না। শাস্ত্রদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ—অলীক। অতএব ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই মিথ্যা। বিশ্ব, বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি, জীবের বন্ধমোক্ষ, পুরুষার্থ ও তৎসাধনাদি সমস্তই মিথ্যা। এইরূপে সমস্তই মিথ্যা হইলেও, মায়া-

বাদ শূন্যবাদ নহে; কারণ, এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। ঐ ব্রহ্ম সত্তামাত্র, নির্গুণ, নির্বিশেষ।

মায়াবাদীর এই যে মত, ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতই। বৌদ্ধ বলেন, বিশ্ব অসৎ। মায়াবাদী বলেন, মায়া ও তৎকার্য্য সমস্তই মিথ্যা। বৌদ্ধ শূন্য হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন। মায়াবাদী সত্তামাত্র ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা করেন। সূক্ষ্ম-বিচারে সত্তামাত্র ব্রহ্মেরও শূন্যত্বই দেখা যায়। অতএব বৌদ্ধবাদ ও মায়াবাদ একই হইয়াছে।

মায়াবাদ খণ্ডন।

অতঃপর ঐ মায়াবাদ কতদূর বিচারসহ, তাহাই দেখা যাউক। মায়াবাদী বলেন,—সত্তামাত্র ব্রহ্মের মায়াকৃত আবরণ অসম্ভব। অসম্ভব হইলেও মেঘ দ্বারা আদিত্যমণ্ডলের আবরণের ন্যায় মায়া দ্বারা ব্রহ্মের আবরণ আবৃতদৃষ্টি দর্শকের সম্বন্ধে অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন মেঘাচ্ছন্নদৃষ্টি পুরুষ সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন বোধ করেন, তেমনি মায়াবৃত জীব ব্রহ্মকে মায়াবৃত বোধ করিয়া থাকেন। এই বোধ জন্মিলেই জীবের প্রকৃত আত্মবোধ অপহৃত হইয়া যায়। আত্মবোধ অপহৃত হইলেই অনাত্মাতে আত্মার বোধ হইতে থাকে। এই বোধ ভ্রমাত্মক। ইহার অপর নাম অধ্যাস। এই অধ্যাস অনাদি। বীজাঙ্কুরের ন্যায় পূর্ব্বপূর্ব্ব অধ্যাস হইতে পর পর অধ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত অধ্যাস বশতঃ দেহাদির ইষ্টানিষ্ট আত্মার ইষ্টানিষ্ট বোধ করিয়া জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ফল-ভোগ সিদ্ধ হয়। এই ভোগের পরিহারার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের উপদেশার্থই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। শাস্ত্র স্বরূপতঃ বাধিত হইলেও ব্যবহারদশাতে উহার বাধ নাই। মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও তদনু-গত ব্যবহারের কোন বাধা হইতে পারে না।

তন্মতে সংসার অধ্যস্ত। সংসার অধ্যস্ত হইলে, উক্ত অধ্যাসের অধিষ্ঠান দেখাইতে হয়। শুক্তিরজতস্থলে শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানেই রজতের অধ্যাস হইয়া থাকে। বিবর্ত্তবাদীর সংসারের অধিষ্ঠান কিন্তু অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। যদি বলেন, আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস যখন বলা হইয়াছে, তখন আর অধ্যাসের অধিষ্ঠান অন্বেষণ করিতে হইবে কেন? বেশ কথা, আত্মাই সংসারাধ্যাসের অধিষ্ঠান। আত্মা ত ব্রহ্মই, অতএব ব্রহ্মই অধ্যাসের অধিষ্ঠান। স্বয়ং ব্রহ্ম

যদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলেন, তবে তিনি কি নিজমায়ায় মুগ্ধ হইলেন না?—অবশ্যই হইলেন। যাঁহাতে ভ্রম থাকে, তিনিই ভ্রান্ত হয়েন। ঐন্দ্র-জালিক ব্রহ্ম নিজের ইন্দ্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন। বস্তুতঃ ঐন্দ্রজালিক কিন্তু নিজের ইন্দ্রজালে নিজেই মুগ্ধ হয়েন না, অপরকেই মুগ্ধ করিয়া থাকেন। দার্ষ্টা-ন্তিক স্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহই নাই। অতএব ব্রহ্ম অপর কাহাকেও না পাইয়া নিজের ইন্দ্রজালে নিজেই মুগ্ধ হইলেন। আবার যে অধিষ্ঠানে অন্য কিছুর অধ্যাস হয়, অধ্যাসের কালে সেই অধিষ্ঠানের সামান্যতঃ জ্ঞান থাকিয়া বিশে-ষতঃ জ্ঞান না থাকার প্রয়োজন হয়। 'শুক্তি আছে' এই প্রকার সামান্যতঃ শুক্তির জ্ঞান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান থাকিলে, শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানা যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেই, শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অন্যথা পারে না। তদ্রূপ সংসারের ভ্রমে 'ব্রহ্ম আছেন' এই প্রকার সামান্যতঃ ব্রহ্মের জ্ঞান থাকিয়া, যে সকল বিশেষ জ্ঞান থাকিলে, ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়, সেই সকল বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেই, ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অন্যথা পারে না। বিবর্ত্তবাদী কি ব্রহ্মের এই প্রকার সামান্যতঃ স্বরূপজ্ঞান ও বিশেষতঃ স্বরূপধর্ম্মের জ্ঞান স্বীকার করিবেন? নির্বিশেষ বস্তুর বিশেষজ্ঞান অসম্ভব। ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া অধিষ্ঠানও সম্ভব হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম উত্তরোত্তর অজ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়েন বলিলে, স্বয়ং ব্রহ্মই কল্পিত হইয়া পড়েন। বিশে-ষতঃ শুক্তিরজতস্থলে সত্য রজতই শুক্তিতে আরোপিত হইতে দেখা যায়, অসত্য রজত আরোপিত হয় না, হইতেও পারে না। অধ্যাস সংস্কারকেই অপেক্ষা করে, সংস্কারের বিষয়কে অপেক্ষা করে না, অতএব সংস্কারের বিষয়টি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; উত্তর দিক্‌কে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া সংস্কার হইলে যখন তখন উত্তর দিক্‌কে পূর্ব্বদিক্ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ঐ বোধে পূর্ব্বদিকের সত্যত্ব অপেক্ষিত হয় না; এরূপও বলা যায় না; কারণ, মূলে পূর্ব্বদিকের সত্যত্ববোধ না থাকিলে, কখনই উত্তরদিক্‌কে পূর্ব্ব-দিক্ বলিয়া বোধ হইতে পারে না। এই সকল কারণে সংসারের ব্যবহারিকী সত্তা স্বীকারেও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; কারণ, যে ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত সংসারের ব্যবহারিকী সত্তা স্বীকার করা হইতেছে, অসত্য সংসার দ্বারা কি সেই ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে? মিথ্যা রজত কল্পনা করিয়া কি কখন শুক্তিতে রজতভ্রম আনয়ন করা যায়? কেবল ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত অনাদি ভ্রম

স্বীকার করিয়া লইলেও, অন্ধপরম্পরান্যায়ে অনবস্থাদোষের দুর্ব্বারত্ব নিবন্ধন, তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এক ব্যক্তি একখণ্ড পিত্তল লইয়া অপর এক ব্যক্তির হস্তে দিয়া বলিলেন, "ইহা সুবর্ণ।" দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা লইয়া প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা সুবর্ণ কে বলিল?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "অমুক অন্ধ বলিয়াছে ইহা সুবর্ণ।" দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই অন্ধকে ইহা সুবর্ণ কে বলিল?" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "আর এক অন্ধ।" এইরূপ প্রশ্নোত্তরপরম্পরার মূলে যদি একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে না পাওয়া যায়, তবে কি ঐ পিত্তলখণ্ড সুবর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে? তর্কপরিহারার্থ ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহারের সিদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলেও, উহার রাসায়নিক প্রয়োগ বা দানফল সম্ভব হইতে পারে না। পিত্তলখণ্ড দ্বারা সুবর্ণ-ঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হইতে পারে না বা সুবর্ণদানের ফল লাভ হইতে পারে না। মরুমরীচিকায় কখনই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অধিকন্তু সংসা-রের সত্তা বা কার্য্যকারিতা উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে। যাহার সত্তা ও কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়, তাহা কি কখন মিথ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই সংসার জীবের আত্মজ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি—অব্যভিচারি কারণ। দেহের—উপাধির অস্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন আত্মজ্ঞান অসম্ভব। আত্মা-স্তিত্বজ্ঞানে দেহের—উপাধির—সংসারের অস্তিত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য। দেহের অস্তিত্বজ্ঞান ভিন্ন দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে না। আত্মা-স্তিত্বজ্ঞানে সংসারের সত্তা ও কার্য্যকারিতা উভয়ই দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বেও কোন না কোন অবস্থায় সংসারের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। শশবিষাণের বা আকাশকুসুমের উৎপত্তি কেহই স্বীকার করেন না। যদি বলেন, যাহা সৎ, তাহারই কি উৎপত্তি হইতে পারে?—আমরা বলি পারে। পরিণামি সৎ বস্তুর পরিণামই তাহার উৎপত্তি। পরিণামেই উৎপত্তিশব্দের তাৎপর্য্য। বিবর্ত্ত বুঝাইতে উৎপত্তিশব্দের প্রয়োগ হয় না। সংসার উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রলয়ের পরে ও স্থিতিকালে ব্রহ্মরূপ অধি-ষ্ঠানেই অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে মায়িক সংসারের অধিষ্ঠান অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। সংসারকে কল্পনাময় বলাও যেরূপ দোষাবহ, শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে মায়িক সংসারের অধিষ্ঠান স্বীকার করাও সেইরূপ দোষাবহ। মায়িক সংসারের সহিত শুদ্ধ ব্রহ্মের আধারাধেয়ভাব স্বীকার করা যায় না। সংসার শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্কল্প দ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে।

এরূপ হইলেও, আমরা অজ্ঞতা বশতঃ শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপে সংসারসম্বন্ধের—সংসারাধারত্বের আরোপ করিয়া থাকি। শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে সংসারের ও শুদ্ধ জীবস্বরূপে দেহের এবং সংসারে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের ও দেহে শুদ্ধ জীবস্বরূপের সম্বন্ধারোপই বিবর্ত্তের স্থল। এই উভয়স্থলকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের কোথাও বিবর্ত্তবাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সংসার কল্পনাময় নহে, সংসারসম্বন্ধই কল্পিত—আরোপিত—অধ্যস্ত। এই অধ্যস্ত সম্বন্ধের প্রতি সাধকের বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ কোথাও কোথাও সংসারকে মিথ্যা বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ঐ প্রতিজ্ঞাও বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করেন না। অতএব বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের চতুর্দ্দশ সূত্রের বিচারে বিবর্ত্তবাদস্থাপনের প্রয়াস কি আচার্য্যের ব্যর্থ হয় নাই? ঐ সূত্র কি বলিতেছেন?—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"—উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিযুক্ত ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" প্রভৃতি বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই বলিয়াছেন। এই নিমিত্তই পিতা উপাদানভূত ব্রহ্মের জ্ঞানে উপাদেয় নিখিল জগতের জ্ঞান হয় বলিয়াছেন। পুত্র শ্বেতকেতু পিতার উপদেশের অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া প্রশ্ন করিলে, পিতা পুনশ্চ বলিলেন, "সৌম্য, যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে, ঘটপটাদি সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থই জানা হইয়া যায়; কারণ, কার্য্যমাত্রই রূপনামাত্মক বাগ্-ব্যবহার, মৃত্তিকাই সত্য; ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ উপদেশ, অর্থাৎ এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা হয়। এই ত সূত্রের তাৎপর্য্য। এই সূত্রে তর্কবল আশ্রয় পূর্ব্বক বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে যাওয়া কি বিড়ম্বনা নয়? জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকৃতি, জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। ইহা বিবিধ-বৈচিত্র্যময় হইলেও, ব্রহ্মশক্তি বিধায় শক্তিমদ্ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। এই শক্তি ও শক্তিমানের একাত্মতাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি "ঐতদাত্ম্যং" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "এতৎ ব্রহ্ম আত্মা নিয়ন্তা স্থাপয়িতা প্রবর্ত্তয়িতা ব্যাপকঃ আশ্রয়ঃ চ যস্য তৎ এতদাত্মং তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যং"—ব্রহ্ম এই সংসারের আত্মা অর্থাৎ নিয়ন্তা স্থাপয়িতা প্রবর্ত্তয়িতা ব্যাপক ও আশ্রয় বলিয়াই ইহাকে ঐতদাত্ম্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের সত্তা স্বতন্ত্রা এবং সংসারের সত্তা পরতন্ত্রা। ব্রহ্ম স্বাধীন এবং ব্রহ্মশক্তিভূত জীবজড়াত্মক জগৎ ব্রহ্মাধীন। জগৎ ব্রহ্মের অধীন বলিয়াই জগতের সত্তা পরতন্ত্রা বলা হয়। ঐ পরতন্ত্র সত্ত্ব আবার কূটস্থ ও বিকারি ভেদে দ্বিবিধ।

যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই কূটস্থ এবং জগৎ বিকারি। কূটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞও আবার জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। অতএব জীব, ঈশ্বর ও জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাধীন; ব্রহ্মই স্বাধীন। স্বাধীন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া অভেদশাস্ত্র সকলের এবং ব্রহ্মাধীন জীব ঈশ্বর ও জগৎকে লক্ষ্য করিয়া ভেদশাস্ত্র সকলের প্রবৃত্তি। ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ঈশ্বর ব্রহ্মের স্বাংশ এবং জীব বিভিন্নাংশ। স্বাংশ স্বরূপের মধ্যে এবং বিভিন্নাংশ শক্তির মধ্যে গণ্য হয়েন। জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র—ভিন্ন নহেন। এইরূপে জগৎকে ব্রহ্মশক্তি বলিলেই যখন সকল বিরোধের পরিহার হইতেছে, তখন উহাকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া 'ন স্যাৎ' করিবার—উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন কি? 'আমি আছি' এই জ্ঞানও যখন জগতের সত্যত্বকে অপেক্ষা করিতেছে; কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি প্রবুদ্ধ, কি সাধক, কি সিদ্ধ, কেহই যখন জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না; জগতের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য দ্বারাই যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়; জগৎ আছে বলিয়াই যখন আমি জগতের সহিত আমার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া জগৎ হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া 'আমি আছি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছি এবং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; মুক্ত পুরুষও যখন জগতের সত্তা স্বীকার না করিয়া বদ্ধ জীবের উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; জগৎ মিথ্যা হইলে যখন উহার সহিত বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাও মিথ্যা হইয়া যায়; তখন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ফল কি? কি শ্রুতি কি স্মৃতি কি ন্যায় কুত্রাপি যখন বন্ধমোক্ষব্যবস্থার মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় না, তখন যিনি বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থার মিথ্যাত্ব বলিবেন, অথচ স্বয়ং বন্ধমোক্ষের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি কি লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হইবেন না?

জীবই কি ব্রহ্ম?

প্রথম প্রশ্ন মীমাংসিত হইল। জগৎ মিথ্যা নয়, ইহা স্থির হইল। অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দ্বিতীয় প্রশ্ন, জীবই কি ব্রহ্ম? এই প্রশ্নের উত্তর—জীবই ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মই জীব। ব্রহ্ম শক্তিমৎ, জীব ব্রহ্মের শক্তি: শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর ভিন্ন নহেন। এইরূপে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইলেও, অণুত্ব-বৃহত্ত্বাদি-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্টরূপে, আশ্রিত জীব হইতে আশ্রয় ব্রহ্মের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রুতিতে জীবকে অণু ও ব্রহ্মকে বৃহৎ

বলিয়াছেন। কোথাও জীবকে অংশ, স্ফুলিঙ্গ ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতি বলিয়াছেন, আবার কোথাও বা জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নও বলিয়াছেন। অতএব শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলিয়াছেন, এই কথাই বলিতে হয়। বেদান্তসূত্রেও বিচার পূর্ব্বক উক্ত ভেদাভেদই মীমাংসিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও শ্রুতি ও ন্যায়ের মতই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ফলতঃ অংশের সহিত অংশীর, অণুর সহিত বিভুর, প্রতিবিম্বের সহিত বিম্বের, শক্তির সহিত শক্তিমানের যেরূপ তাদাত্ম্য অর্থাৎ অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকৃত হয়, জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপই অচিন্ত্য ভেদাভেদ বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে, জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি জগদ্ব্যাপার নিষিদ্ধ হইত না; আবার জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে, তদুভয়ের ঐক্যও উক্ত হইত না। জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ নাস্তিকতার পোষক এবং ভেদবাদ অজ্ঞতার পরিচায়ক।

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শক্তিশক্তিমতোর্ভেদং পশ্যন্তি পরমার্থতঃ।
অভেদঞ্চানুপশ্যন্তি যোগিনস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥"

তত্ত্বজ্ঞ যোগী সকল শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর ভেদ ও অভেদ উভয়ই দর্শন করিয়া থাকেন। শক্তি শক্তিমানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থান করে; কারণ, শক্তিমান্ শক্তির আত্মা, অর্থাৎ নিয়ন্তা, স্থাপয়িতা, প্রবর্ত্তয়িতা, ব্যাপক ও আশ্রয়। শক্তি শক্তিমান্ কর্ত্তৃক নিয়মিত, স্থাপিত, প্রবর্ত্তিত, ব্যাপ্ত ও অধিষ্ঠিত হইয়াও বহ্নি হইতে বহ্নিশিখার ন্যায় শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমানের এই যে ভেদাভেদভাব উহা স্বরূপতঃ অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের অগোচর। অতএব "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতির বলে জীবব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি সকল যেমন অভেদ নির্দ্দেশ করেন, তেমনি "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতি সকল স্পষ্টাক্ষরে ভেদও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানো জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।"

জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি পক্ষী সহযোগে সখিভাবে দেহরূপ একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। আর ঈশ্বররূপ পক্ষী ফলভুক্ না হইয়া প্রদীপ্তভাবেই

অবস্থান করেন। দেহরূপ এক বৃক্ষে সংস্থিত ও মায়ার বশীভূত হইয়া জীব অশেষশোকভাজন হয়েন। পরে যখন আপনা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে নিজের উপাস্যরূপে এবং আপনাকে তাঁহার উপাসকরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরের মহিমা অধিগত হইয়া শোকরহিত হয়েন।

এই মুণ্ডকশ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে জীব যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহাই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি-তাৎপর্য্য-জ্ঞান-কারণ-রূপ উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা ভেদই নির্ণীত হইতেছে।

১ { উপক্রম—"দ্বা সুপর্ণা।"
উপসংহার—"অন্যমীশম্।" }

২। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন—"দ্বা", "তয়োরন্যঃ", "অনশ্নন্নন্যঃ।"

৩। অপূর্ব্বতা—অণুত্ব-বৃহত্ত্বাদি-বিরুদ্ধ-নিত্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিভাবে ভেদের শাস্ত্র ব্যতিরেকে লৌকিক প্রমাণান্তর হইতে অপ্রতীতি।

৪। ফল অর্থাৎ প্রয়োজন—"বীতশোকঃ।"

৫। অর্থবাদ—"তস্য মহিমানমেতি।"

৬। উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি—"অনশ্নন্নন্যঃ।"

উক্ত শ্রুতিটি কঠোপনিষদের "ঋতং পিবন্তৌ" প্রভৃতি শ্রুতিটির সমানার্থক। কঠশ্রুতিতেও মুণ্ডকশ্রুতির ন্যায় ভেদবোধনার্থ দ্বিবচনেরই প্রয়োগ হইয়াছে। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে উক্ত মন্ত্রটির এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়।—

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বম্ অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি অনশ্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞতাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি"—তদুভয়ের মধ্যে যিনি স্বাদু কর্ম্মফল ভোজন করেন, তিনি সত্ত্ব এবং যিনি ভোজন না করিয়াও সর্ব্বতোভাবে ঐ ভোজন দর্শন করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ; সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই জ্ঞানসমন্বিত।—"তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি অথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ"—যাহার সহিত বা যদ্দ্বারা স্বপ্ন দর্শন হয়, তাহাই সত্ত্ব এবং যিনি অন্তর্যামী, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

এই প্রকার ব্যাখ্যান দৃষ্টে কেহ কেহ বলেন, সত্ত্ব শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; কিন্তু তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ, অন্তঃকরণ অচেতন; অচেতন অন্তঃকরণের ফলভোক্তৃত্ব অসম্ভব। এই নিমিত্তই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ লিঙ্গোপাধি আত্মা এবং সত্ত্বশব্দের অর্থ সত্ত্বোপাধি ঈশ্বর এই কথাই বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে সত্ত্বশব্দের অর্থ জীব

এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা বা ঈশ্বর। যিনি যাহাই বলুন, সত্ত্ব শব্দের অন্তঃকরণ অর্থ অপ্রামাণিক। অতএব "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতির দ্বৌ শব্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মার বোধক ইহাই স্থির। ইহা স্থির হইলে, তদুভয়ের ভেদও অনিবার্য্য।

অন্তর্যামিব্রাহ্মণেও ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গোপেত বাক্য ভেদপক্ষেই প্রমাণ হইতেছেন।

উপক্রম—"বেথ ত্বং কার্য্যান্তর্যামিণম্"

উপসংহার—"এষ তে আত্মান্তর্যামী"

অভ্যাস—"এষ তে আত্মা"

অপূর্ব্বতা—অন্তর্যামিত্বের শাস্ত্র ব্যতিরেকে অপ্রাপ্তি।

ফল—"স বৈ ব্রহ্মবিৎ"

অর্থবাদ—"তচ্চেৎ ত্বং…মূর্দ্ধা তৈ বিপতিষ্যতি"

উপপত্তি—"যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদি।

উক্ত ব্রাহ্মণে একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানন্তর "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অভেদেই উপসংহার করা হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, ইন্দ্রাদি দৈবতা সকলের জ্ঞানফল হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলাধিক্যই একবিজ্ঞানশ্রুতির অর্থ বলিয়া উপসংহারবাক্যের অর্থ এইপ্রকার হইবে—"সুষুপ্তিতে সূক্ষ্মশরীরের লয় হেতু আত্মাই জ্ঞানসাধন এবং আত্মাই জ্ঞেয় হয়েন। অতএব তখন আর কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবেন? তখন আপনাদ্বারাই আপনাকে দেখিবেন। তখন আত্মেতর কর্ত্তা, করণ ও কর্ম্মের অভাব হেতু আত্মাই কর্ত্তা করণ ও কর্ম্ম হয়েন।" উপসংহারবাক্যের এইপ্রকার অর্থ না করিলে, "ভেদেনৈনমধীয়তে" এই সূত্রের সহিত বিরোধ ঘটে; কারণ, এই সূত্রে অন্তর্যামিব্রাহ্মণের ভেদপরত্বই উক্ত হইতেছে।

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব বাদ।

নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম অদ্বয় তত্ত্ব। ঐ ব্রহ্মে সদসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়া অনির্বচনীয় একটি অজ্ঞান দৃষ্ট হয়। উক্ত অজ্ঞানের দুইটি বৃত্তি; বিদ্যা ও অবিদ্যা। ব্রহ্ম বিদ্যাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে বিদ্যোপহিত ঈশ্বরভাব এবং অবিদ্যাবৃত্তিক অজ্ঞানের সম্বন্ধে অবিদ্যোপহিত জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। স্বরূপজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের

নিবৃত্তি হইলে, উক্ত ঈশ্বরভাব ও জীবভাব এই উভয়ভাবই অপগত হইয়া থাকে। তখন ব্রহ্ম নির্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তারূপেই অবস্থান করেন। তদবস্থায় জীবের ও ব্রহ্মের পরস্পর ভেদ থাকে না। ইহাই বিবর্ত্তবাদীর মত। এই মতে ব্রহ্মের যুগপৎ ও অকস্মাৎ জীবরূপে মায়াবদ্ধত্ব ও ঈশ্বররূপে মায়ামুক্তত্ব অপরিহার্য্য। ব্রহ্মের যুগপৎ ও অকস্মাৎ জীবরূপে মায়াবদ্ধত্ব ও ঈশ্বররূপে মায়ামুক্তত্ব কি সম্ভব হয়? যদি বলেন, উপাধিগত-তারতম্য-বশতঃ পরিচ্ছেদের ও প্রতিবিম্বের রীতি অনুসারেই জীবেশ্বরের বিভাগ সঙ্গত হইবে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সমষ্ট্যুপহিত মহান্ ব্রহ্মখণ্ড ঈশ্বর ও অবিদ্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্ট্যুপহিত অল্প ব্রহ্মখণ্ড জীব এবং বিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত বা সমষ্ট্যুপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত বা ব্যষ্ট্যুপহিত ব্রহ্মই জীব, এইরূপ জীবেশ্বরবিভাগ সঙ্গত হইবে; তাহা বলিতে পারেন না; কারণ, এইপ্রকার পরিচ্ছেদ বা প্রতিবিম্ব উপপন্নই হয় না। যে উপাধি দ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ স্বীকার করা হইতেছে এবং যে উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকার করা হইতেছে, সেই উপাধি বাস্তব কি অলীক? উপাধি বাস্তব হইলে, সর্ব্বাস্পৃশ্য ব্রহ্মের উপাধিস্পর্শ অসম্ভব হয়। আর নির্ধর্ম্মক, ব্যাপক ও নিরবয়ব ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযোগও তদ্রূপই; কারণ, নির্ধর্ম্মক বস্তুর উপাধিসম্বন্ধের অসম্ভাবনা বশতঃ, ব্যাপক বস্তুর বিম্বপ্রতিবিম্বভেদভাবের অসম্ভাবনা বশতঃ এবং নিরবয়ব বস্তুর দৃশ্যত্বের অসম্ভাবনা বশতঃ প্রতিবিম্বযোগ সম্ভব হয় না। যাহা রূপাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট, যাহা পরিচ্ছিন্ন ও যাহা সাবয়ব, তাহারই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশস্থ উপাধিপরিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃপদার্থাংশেরই প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, আকাশের প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায় না; কারণ, আকাশ অদৃশ্য বস্তু। বিশেষতঃ পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব বাস্তব হইলে, জীবব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যের বোধমাত্র, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অভেদবোধ হইবামাত্র উক্ত ভেদবুদ্ধির ত্যাগ হইতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি আপনাকে রাজা বোধ করিলেই প্রকৃত রাজা হইতে পারে না। ব্রহ্মানুসন্ধানের প্রভাবেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, এরূপও বলা যায় না; কারণ, তৎপক্ষে মায়াবাদীর নিজমতেরই ক্ষতি দেখা যায়। মায়াবাদী ব্রহ্মের কোন প্রভাবই—কোন্ শক্তিই স্বীকার করেন না। উক্ত দোষের বারণার্থ উপাধির মিথ্যাত্ব স্বীকারে, পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের অনুপপত্তি বশতঃ মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ঘটাকাশাদিস্থলে ঘটপরিচ্ছিন্না-কাশরূপ ও ঘটাম্বুপ্রতিবিম্বিতাকাশরূপ যে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, ঐ

দুইটি দৃষ্টান্ত বাস্তবোপাধিময়, অতএব ঐ দুইটি দৃষ্টান্তের প্রদর্শন দ্বারা স্বপ্ন-দৃষ্টান্তোপজীবী মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হয় না; কারণ, মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তস্থলে সত্য ঘটঘটাম্বুর প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। উপাধির মিথ্যাত্বে ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব উভয়ই মিথ্যা হয়। দার্ষ্টান্তিক স্থল মিথ্যা। যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহা সত্য। অঘটমানা মিথ্যার সহিত সত্য ঘটমানের সাদৃশ্য ঠিক হয় নাই। যাহাদের পরস্পর সাদৃশ্য হয় না, তাহারা কথনই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিক-ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব, মায়াবাদীদিগের পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের কল্পনা অজ্ঞতার পরিচয়। পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়ই অসিদ্ধ। যাহা স্বয়ং অসিদ্ধ, তদ্দ্বারা অন্যের প্রতিপাদন হইতে পারে না। অতএব স্বরূপের ও সামর্থ্যের ভেদ বশতঃ জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; ঈশ্বরের স্বরূপ ও সামর্থ্য জীবের স্বরূপ ও সামর্থ্য হইতে ভিন্ন ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদের নিরাসে, বিবর্ত্তবাদের প্রাণ যে একজীববাদ, তাহাও নিরস্ত হইতেছে। পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয়ের প্রত্যাখ্যানে ব্রহ্ম ও অবিদ্যা এই দুইটি বস্তুর প্রাপ্তি হইতেছে। এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্ম চিন্মাত্র বস্তু বলিয়া তাঁহাতে অবিদ্যার যোগ অসম্ভব হয়; যাহাতে অবিদ্যার যোগ সম্ভব হয় না, তাহা অবশ্য শুদ্ধ; ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মই অবিদ্যার যোগে অশুদ্ধ হইয়া জীব হইতেছেন; আবার ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবগতা অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর হইতেছেন এবং ঐ শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বরগতা মায়ার বিষয় হইয়া জীব হইতেছেন; অতএব বিরোধ পূর্ব্বাবস্থাতেই থাকিয়া যাইতেছে। শুদ্ধ ব্রহ্মে অকস্মাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধ হইতেছে। তাদৃশ জীব কর্ত্তৃক কল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া ব্রহ্মই ঈশ্বর হইতেছেন। তাদৃশ ঈশ্বরের মায়া কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ঐ ব্রহ্মই জীব হইতেছেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র বস্তুতে অবিদ্যা, অবিদ্যাকল্পিত ঈশ্বরে বিদ্যা, বিদ্যাবত্ত্বেও মায়িকত্ব প্রভৃতি উক্তি সকলের সামঞ্জস্য হয় না। একজীব-বাদে এইপ্রকার দোষ সকল দেখা যায়।

যদি বলেন, পরিচ্ছেদত্ব ও প্রতিবিম্বত্বের প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ঐ সকল শাস্ত্র গৌণী বৃত্তি দ্বারাই সার্থক হইবে। ঐ সকল শাস্ত্র পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য দ্বারা গৌণীবৃত্তিতেই প্রবৃত্ত হইবে। "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" এবং বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্" এই দুইটি পূর্ব্বোত্তরপক্ষময় ন্যায় দ্বারাই ঐ সকল শাস্ত্রের

প্রবৃত্তি। তন্মধ্যে পূর্ব্বপক্ষময় ন্যায় দ্বারা উক্ত বাদদ্বয়ের খণ্ডন এবং উত্তর-পক্ষময় ন্যায় দ্বারা উক্ত বাদদ্বয়ের গৌণীবৃত্তিতে ব্যবস্থাপন বুঝিতে হইবে। উক্ত ন্যায়দ্বয়ের অর্থ যথা—"যেরূপ অম্বু দ্বারা ভূখণ্ডের পরিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপ উপাধি দ্বারা কি ব্রহ্মপ্রদেশের পরিচ্ছেদ হয়?—না, অম্বু দ্বারা ভূখণ্ডের ন্যায় উপাধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের অর্থাৎ ব্রহ্মাংশের গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, যাহা অগৃহ্য, তাহার গ্রহণ অসম্ভব, অতএব উপাধি দ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ স্বীকার করা যায় না। যেরূপ অম্বুতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গৃহীত হয়, তদ্রূপ উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গৃহীত হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মবস্তু সূর্য্যের ন্যায় পরিচ্ছন্ন নহেন, পরন্তু ব্যাপক। ব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না; অতএব ব্রহ্মের উপাধিতে প্রতিবিম্ব স্বীকার করা যায় না। এইরূপে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের মুখ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইলেও, 'দেবদত্ত সিংহ' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, গৌণীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হয় না। বৃদ্ধিশালিত্ব ও হ্রাসশালিত্ব রূপ গুণাংশ লইয়াই উহাদের গৌণীবৃত্তিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যেরূপ মহৎ ও অল্প ভূখণ্ড এবং যেরূপ রবি ও তৎপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস ভজন করে, তদ্রূপ ঈশ্বর ও জীবও মহত্ত্ব ও অল্পত্ব এবং বৃদ্ধি ও হ্রাস ভজন করিয়া থাকেন, এবং তদংশেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দেখা যায়। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য প্রযুক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের সঙ্গতি হইতেছে।

তথাপি যদি কেহ আপত্তি করেন, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন এইপ্রকার বিরোধের সমন্বয় কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারদশায় ব্রহ্মের যে শক্তি বা সামর্থ্য উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া অসংসারি ও শক্তিমৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন এবং মোক্ষদশায় উপাধিপরিচ্ছেদের অভাব হেতু অভিন্ন-রূপে প্রতীত হয়েন, তিনিই জীব; অতএব তাদৃশ জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সম্ভব হইতেছে। জীবের চিদংশত্ব নিবন্ধন উপাধিপরিচ্ছেদও অসম্ভব বলা যায় না; কারণ, মায়াশক্তি দ্বারা জীবশক্তির অভিভবকেই জীবের উপাধিপরিচ্ছেদ বলা হয়। শক্তিদ্বয়ের পরস্পরাভিভাবকতা বিজ্ঞান-সম্মতা। যদি বলেন, জীবের উপাধিপরিচ্ছেদ নিবন্ধন, জীবব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলেও, তদুভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, অভেদের সিদ্ধিতে জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয়, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর অভিন্ন হইলে জীবের সংসারিত্বে ব্রহ্মেরও সংসারিত্বের আপত্তি হয়; তাহা বলিতে পারেন না; কারণ, বিবিধশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের শক্তিবিশেষের অভিভবে কৃৎস্ন

ব্রহ্মের অভিভব অসম্ভব। দর্শনাদি-বিবিধ-সামর্থ্য-সমন্বিত মানবের দর্শনাদি কোন একটি শক্তির অভিভবে মানবের অভিভব কেহই স্বীকার করেন না। একটি কোষাণুর সামর্থ্যের অভিভবে সমস্ত দেহের অভিভব কেহই স্বীকার করিবেন না। আবার ব্রহ্মশক্তিবিশেষ দ্বারা ব্রহ্মশক্তিবিশেষের অভিভব দোষাবহও হয় না। এইরূপ শক্তিত্বপুরস্কারে জীব একই। জীব এক হইয়াও উপাধির তারতম্য বশতঃ বহু হয়েন। যেমন একই মূলপ্রকৃতি ক্ষোভতারতম্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের আকারে প্রকাশিত হয়, যেমন একই মূলশক্তি স্পন্দনতারতম্যে তাপ, আলোক, শব্দ, চুম্বকাকর্ষণ, বিদ্যুৎ, কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণ, ও কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণ ভেদে সপ্ত আকার প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একই জীবশক্তি মায়াভিভববশতঃ উপাধিতারতম্যে বহুজীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ?

তৃতীয় প্রশ্ন ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ? প্রকৃতির গুণ লইয়া সগুণ-নির্গুণবিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন; আর অপ্রাকৃত গুণ লইয়া সগুণ ও নির্গুণ বিচার করিলে, ব্রহ্ম সগুণ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবেন; কারণ, শ্রুতি একই ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই বলিতেছেন। ব্রহ্ম প্রকৃতিগুণরহিত হইয়াও অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্ট, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে; কারণ, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ নিরতিশয় বৃহৎ; গুণরহিত ব্রহ্মই অসিদ্ধ। এইরূপে ব্রহ্ম সগুণ হইলেও, প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট নহেন; ব্রহ্মে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই প্রাকৃত গুণত্রয় স্বীকৃত হয় না। ব্রহ্মে স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী জ্ঞানবলক্রিয়া স্বীকৃত হইলেও, সত্ত্বাদিগুণত্রয় অঙ্গীকৃত হয় না। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

তুমি সর্ব্বাশ্রয়। একই স্বরূপশক্তি তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি তোমাতে অর্থাৎ তোমার শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করেন না, কিন্তু তোমারই শক্তিবিশেষরূপ জীবের আশ্রয়েই অবস্থান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সগুণ হইলে, নির্গুণ শ্রুতি সকলের গতি কি হইবে? তাহার উত্তর এই—নির্গুণ শ্রুতি সকল কোথাও নিষেধ দ্বারা কোথাও সামানাধিকরণ্য দ্বারা সগুণ পরম বস্তুর উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে। "অস্থূলমনণু" প্রভৃতি শ্রুতি সকল নিষেধ দ্বারা এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতি সকল সামানাধিকরণ্য দ্বারা সগুণ পরম বস্তুর উদ্দেশ করিয়া সার্থক হইবে। বস্তুতঃ নির্গুণ শ্রুতি সকলেরও গুণবিধানেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। যে সকল শ্রুতিকে আপাততঃ গুণের নিষেধকারিণী বলিয়াই বোধ হয়, তাহারাও গুণের নিষেধ করে না, পরন্তু প্রাকৃত গুণের নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত গুণের বিধানই করিয়া থাকে। যেমন অনুদরা কন্যা বলিলে, কন্যার উদরের নিষেধ করা হয় না, পরন্তু বৃহৎ উদরের নিষেধ দ্বারা অল্প উদরের বিধানই করা হয়, তদ্রূপ "অপাণিপাদঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত পাণিপাদের নিষেধ দ্বারা অপ্রাকৃত পাণিপাদের বিধানই করা হইয়া থাকে। নিষেধকারিণী শ্রুতি সকলের নিষেধবাচক নঞের অর্থ বিচার করিলে, এইরূপই তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়; কারণ, ঐ সকল শ্রুতিতে প্রায়ই মুখ্যার্থে নঞের প্রয়োগ হয় নাই, ঐ সকল শ্রুতির নঞ্ সকল প্রায়ই সমাসে গুণীভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব "অস্থূলমণনু" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ অস্থূলত্বাদিগুণবিশিষ্ট।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে;—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি সকলে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। মায়াবাদীর মতে, ঐ দুইটি সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্মের লক্ষণ; নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অলক্ষণ, অনির্দ্দেশ্য। তাঁহাদের মতে ঐ অলক্ষণ, অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মই স্বয়ং কূটস্থ থাকিয়াই উপাধিপরিচ্ছিন্ন হইয়া সলক্ষণ ও নির্দ্দেশার্হ সগুণ বা সবিশেষ ব্রহ্ম হয়েন। কিন্তু শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে, সেরূপ বোধ হয় না। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম পৃথক্ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। নির্গুণ বা নির্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কি শব্দ, নির্গুণ বা নির্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণমাত্রই সবিশেষবস্তুবিষয়ক। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ও "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" প্রভৃতি শ্রুতি সকল স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন যে, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম দুইটি তত্ত্ব নহেন, পরন্তু একই তত্ত্ব। একই তত্ত্বের নির্গুণ ও সগুণ দুইটি রূপ। একই ব্রহ্ম

আবির্ভাবভেদে সগুণ বা সবিশেষভাবে ও নির্গুণ বা নির্বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সগুণ বা সবিশেষ ও নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম পৃথক্ তত্ত্ব হইলে, শ্রুতির উক্তি অন্য প্রকার হইত। সবিশেষ বা সগুণ ও নির্বিশেষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম পৃথক্ তত্ত্ব হইলে, বেদান্তে নির্বিশেষ বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ বস্তুর লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাকেই জীবের প্রাপ্য বলিয়া উপসংহার করিতেন না, এবং প্রাপ্তিগত বা ফলগত তারতম্যও নির্দ্দেশ করিতেন। একই অদ্বয় তত্ত্ব যে আবির্ভাবভেদে সবিশেষভাবে ও নির্বিশেষভাবে প্রকাশ পান, তাহা স্মৃতিতেও স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে ;—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ঐ তত্ত্ব কোথাও ব্রহ্ম কোথাও পরমাত্মা ও কোথাও ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

জ্ঞান—চিদেকরূপ ; চিদৈকস্বরূপ বস্তু। অদ্বয় জ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব। জ্ঞানকে অদ্বয় বলিবার কারণ তিনটি ; প্রথম, জ্ঞানের ন্যায় অপর স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুর অভাব। চিদেকরূপ জীবচৈতন্য ও অচিদেকরূপ প্রকৃতিকালাদি জ্ঞানের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে। দ্বিতীয়, জ্ঞানের স্বশক্ত্যেকসহায়ত্ব। তৃতীয়, ঐ পরমাশ্রয় জ্ঞান ব্যতিরেকে জীবাদি শক্তি সকলের অসিদ্ধত্ব। তত্ত্ব শব্দের অর্থ পরমস্বরূপ। ঐ তত্ত্ব বা পরমস্বরূপের তাৎপর্য্য বস্তুর সারে, অর্থাৎ বস্তুর সারই বস্তুর তত্ত্ব বা পরমস্বরূপ। জ্ঞানই বস্তু। পরম সুখই জ্ঞানের সার। অতএব পরমসুখরূপ জ্ঞানসারই অদ্বয় জ্ঞান। অদ্বয় জ্ঞান পরম পুরুষার্থ বলিয়াই পরমসুখ হয়েন। উহা স্বয়ংসিদ্ধ। যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার নিত্যত্ব স্বাভাবিক। অতএব এক নিত্য স্বয়ংসিদ্ধ পরমসুখরূপ তত্ত্বই কোথাও ব্রহ্ম কোথাও পরমাত্মা ও কোথাও ভগবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন, ইহাই উক্ত স্মৃতির তাৎপর্য্য।

মনুষ্যানন্দ হইতে প্রাজাপত্যানন্দ পর্য্যন্ত আনন্দ সকল যাঁহাদের পক্ষে তুচ্ছ হইয়া যায়, সেই ব্রহ্মানন্দানুভবনিমগ্ন জ্ঞানী পরমহংসগণের নির্ম্মল চিত্ত, সাধন-বলে বিষয়াকারতারহিত হইয়া, যে অখণ্ডানন্দস্বরূপ তত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হয়, এবং তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়াও, সাধনকালে, স্বরূপশক্তি ও তদ্বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে সামান্যতঃ লক্ষিত, অতএব সিদ্ধিকালে, তদ্রূপেই স্ফুরিত, সেই এক অখণ্ডানন্দস্বরূপ তত্ত্বের ঐ স্বরূপশক্তি ও তদ্বৈচিত্র্য সকল

গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানী পরমহংসগণের চিত্ত, যাঁহার স্বরূপশক্তি ও তদ্‌বৈচিত্র্য সকল গ্রহণ করিতে না পারিয়া, যাঁহাকে সামান্যতঃ লক্ষিত ও স্ফুরিত অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদভাবেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সেই জীবশক্তিতাদাত্ম্যাপন্ন তত্ত্বই ব্রহ্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। তিনিই আবার পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মানন্দও যাঁহাদের ভগবদনুভবানন্দের অন্তর্ভূত হইয়া তুচ্ছ হইয়া যায়, সেই ভগবদানন্দানুভবনিমগ্ন ভক্ত পরমহংসগণের বিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে অনুভবের পক্ষে একমাত্র সাধকতম ও ভগবৎস্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মিকা ভক্তি দ্বারা বিভাবিত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকলে নিজ স্বরূপশক্তি দ্বারা কোন এক বিশেষ রূপ ধারণ পূর্ব্বক অপর শক্তিবর্গের মূলাশ্রয় শ্রীভগবদ্রূপে বিরাজিত ও বিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে পরিস্ফুরিত এবং তদ্রূপেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। অতএব যিনি জ্ঞানী পরমহংসগণের সম্বন্ধে অবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে লক্ষিত ও স্ফুরিত হইয়া তদ্রূপেই প্রতিপাদিত এবং জীবশক্তিতাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন, তিনিই আবার ভক্ত পরমহংসগণের সম্বন্ধে বিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তা-ভেদে লক্ষিত ও স্ফুরিত হইয়া তদ্রূপেই প্রতিপাদিত এবং পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবৎশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। আর সেই তত্ত্বই যোগী পরমহংসগণের সম্বন্ধে মায়াশক্তির অন্তর্যামিরূপে লক্ষিত ও স্ফুরিত হইয়া তদ্রূপেই প্রতিপাদিত এবং মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্ট পরমাত্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জীবশক্তির সহিত একীভূত নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, যোগিগণ তাঁহাকেই মায়াশক্তির অন্তর্যামী সবিশেষ পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, ভক্তগণ তাঁহাকেই পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত সবিশেষ ভগবৎস্বরূপে দর্শন করেন। তিনই এক, একই তিন। তিনই নিগুণ বা নির্বিশেষ এবং তিনই সগুণ বা সবিশেষ।

পুরুষার্থ কি ?

চতুর্থ প্রশ্ন, ব্রহ্মভাবাপত্তিই কি জীবের পুরুষার্থ? পুরুষার্থশব্দের অর্থ পুরুষের প্রয়োজন। ঐ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন। আর উক্ত প্রয়োজনের যাহা সাধন, তাহাই গৌণ প্রয়োজন। ইহলোকে একং স্বর্গাদিতে পুরুষের সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিলেও, আত্যন্তিক সুখলাভ ও আত্যন্তিক

দুঃখপরিহার ব্রহ্মভাবাপত্তি ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিয়াই ব্রহ্মভাবাপত্তিকেই পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন বলা যায়। ব্রহ্মভাবাপত্তি শব্দের অর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। ঐ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার আবার নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও সবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মবস্তু পরমানন্দস্বরূপ। জীব সকল তদীয় হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান-রহিত বলিয়া মায়াকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তৎস্বরূপজ্ঞানের লোপ ও মায়াকল্পিত উপাধির আবেশ হেতু অনাদি সংসারদুঃখে নিমগ্ন। জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ-কাররূপ ব্রহ্মভাবাপত্তিই জীবের পরমানন্দলাভ। ঐ পরমানন্দলাভ ও তৎসাধনী-ভূত জ্ঞানই জীবের পুরুষার্থ। দুঃখনিবৃত্তি উহার অবান্তর ফল। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, দুঃখ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহা নিবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলা যায়। তন্মধ্যে মায়াবৃত্তি অবিদ্যার নাশের পর, কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের অস্পষ্টস্বরূপলক্ষণ যে বিজ্ঞান, তাহার আবির্ভাবের নাম নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার; ঐ ব্রহ্ম-তত্ত্বের স্পষ্টস্বরূপলক্ষণ বিজ্ঞানানন্দের আবির্ভাবই সবিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ভগবৎসাক্ষাৎকার। উভয়ই মোক্ষ। উক্ত দ্বিবিধ মোক্ষের প্রত্যেকটি আবার উপাসনাবিশেষানুসারে দুইপ্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। একপ্রকার উপাসনা দ্বারা সর্ব্বলোক ও সর্ব্বাবরণ অতিক্রমের পর সিদ্ধ হয় এবং অন্যপ্রকার উপাসনা দ্বারা স্বস্থানে থাকিয়াই সিদ্ধ হয়। অতএব মোক্ষ উৎক্রান্তদশায় ও জীবদ্দশায় উভয়ত্রই সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতে হইতেছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণা মুক্তিতে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। আর ভগবৎসাক্ষাৎ-কারলক্ষণা মুক্তিতে জাগ্রতের ন্যায় অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মুক্তি আবার সালোক্যাদিভেদে পঞ্চবিধ। শ্রীভগবানের সহিত সমানলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে বাস হইলে, তাহাকে সালোক্য বলা যায়। বৈকুণ্ঠাদিধামের নিত্যত্ব শ্রুত্যাদিসম্মত। "ব্রহ্মসদনের ঊর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে। লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন।" শ্রীভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যের লাভ হইলে, তাহাকে সার্ষ্টি বলা যায়। শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার লাভ হইলে, তাহাকে সামীপ্য বলা যায়। শ্রীভগবানের সহিত সমান নিত্যরূপের লাভ হইলে, তাহাকে সারূপ্য বলা যায়। শ্রীভগবানের রূপের নিত্যত্ব শ্রুত্যাদিশাস্ত্রসম্মত। আর শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ হইলে, তাহাকে সাযুজ্য বলা যায়। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবৎসাযুজ্যে প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মসাযুজ্যে সুষুপ্তির ন্যায় অস্পষ্ট স্ফূর্ত্তি এবং ভগবৎসাযুজ্যে স্বপ্নবৎ

অনতিস্পষ্ট স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় আবার সেবাসহিত ও সেবারহিত ভেদে প্রত্যেকেই দুই দুই প্রকার হইয়া থাকে। উভয়প্রকারেই জাগ্রদবস্থার ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে,—

"স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতি রাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

তিনি এইপ্রকার দর্শন মনন ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়েন। তিনি স্বরাট্ হয়েন। সকল লোকেই তাঁহার যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে।

মুক্তিমাত্রই গুণাতীত এবং উহা আবৃত্তিরহিত। নির্গুণ ভূমবিদ্যাতে মুক্তের স্বেচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপের প্রাকট্য শ্রবণ করা যায়।

শ্রুতি বলিতেছেন, "ন স পুনরাবর্ত্ততে।"—তিনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।

সূত্র বলিতেছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"—তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না, তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

স্মৃতি বলিতেছেন,—

"তস্যৈ নমোঽস্তু কাষ্ঠায়ৈ যত্রাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥"

যে দিকে শ্রীহরি অবস্থান করেন, সেই দিক্‌কে নমস্কার। সেই দিকে গমন করিয়া শান্ত নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণ আর প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

হে অর্জ্জুন; ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের যে কোন লোকে গমন করা হউক পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। কিন্তু আমাকে লাভ করিলে, পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যে স্থানে গমন করিলে, আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও। আমার প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্য ধাম লাভ করিবে।

পুরুষার্থলাভের উপায় কি ?

শেষ প্রশ্ন হইতেছে, ঐ পুরুষার্থলাভের উপায় কি ?—জ্ঞানই উহার একমাত্র উপায়। ঐ জ্ঞানশব্দের তাৎপর্য্য জীবব্রহ্মের অভেদানুসন্ধানে নহে, পরন্তু ভক্তভজনীয়ত্বানুসন্ধানে। জীব আপনাকে সেবক ও শ্রীভগবানকে সেব্য ভাবিয়া যে জীবব্রহ্মের স্বরূপানুসন্ধান করেন, সেই স্বরূপানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানই পুরুষার্থলাভের অদ্বিতীয় উপায়। এই জ্ঞানের নামান্তর ভক্তি। অতএব ভক্তিই পুরুষার্থলাভের একমাত্র উপায়।

পরতত্ত্ব এক—অদ্বিতীয়। উহা এক হইয়াও, উপাসকের সাধনানুরূপ যোগ্যতা অনুসারে, আবির্ভাবের ভেদে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন; অর্থাৎ জ্ঞানযোগীর সম্বন্ধে নির্গুণ ব্রহ্মাকারে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন, অষ্টাঙ্গযোগীর সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি-কতিপয়-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মাকারে আবির্ভূত হইয়া পরমাত্মশব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন, এবং ভক্তিযোগীর সম্বন্ধে পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবদাকারে আবির্ভূত হইয়া ভগবচ্ছব্দ দ্বারা অভিহিত হয়েন। উক্ত পরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভাব বশতই জীবের পরমেশ্বরবৈমুখ্য ঘটে। ঐ বৈমুখ্যই জীবের ছিদ্র এবং ঐ ছিদ্র দ্বারাই জীবশক্তিতে মায়াশক্তির প্রবেশ বা সঞ্চার হয়। বৈমুখ্যলব্ধছিদ্রা মায়া নিজাংশভূতা জীবমায়া ও গুণমায়া দ্বারা জীবকে পরপর আবরণ করিয়া থাকেন। আবরণশব্দে দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদই বোধিত হয়। দেশতঃ পরিচ্ছেদ বশতঃ জীবের বিভু পরতত্ত্বের বিস্মৃতি এবং কালতঃ পরিচ্ছেদ বশতঃ নিত্য আত্মতত্ত্বের বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। এইরূপে বিস্মৃতাত্মতত্ত্ব জীব গুণমায়া দ্বারা আবৃত হয়েন। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদই গুণমায়াকৃত আবরণ। ঐ আবরণ বশতঃ জীবের আত্মবিপর্য্যয় ঘটে। আত্মবিপর্যায় শব্দের অর্থ আত্মার অনাত্ম-বস্তুতে অধ্যাস বশতঃ দেহে আত্মাভিমান ও তদাভিনিবেশ। দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইটি। সূক্ষ্মশরীর আবার কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ভেদে দুইটি। কারণাত্মক সূক্ষ্মশরীরের নাম কারণশরীর। কার্য্যাত্মক সূক্ষ্মশরীরের নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর। কারণশরীর সত্ত্বগুণপ্রধান এবং জ্ঞানশক্তির অভি-ব্যক্তিস্থান। সূক্ষ্মশরীর রজোগুণপ্রধান এবং ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তিস্থান। স্থূল-শরীর তমোগুণপ্রধান এবং ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিস্থান। আত্মার জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বশতঃ কারণশরীরে, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বশতঃ সূক্ষ্মশরীরে এবং ক্রিয়া-

শক্তির প্রকাশ বশতঃ স্থূলশরীরে আত্মাভিমান জন্মে, অর্থাৎ 'ঐ সকল শরীরই আমি' এই প্রকার জ্ঞান জন্মে। উক্ত জ্ঞানের দৃঢ়তাই তদভিনিবেশ। উহাকে তন্ময়তা বলিলেও বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশই ভয়ের হেতু। ভয়শব্দ দ্বারা সংসারভয় বোধিত হয়। সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। সংসার জীবের বন্ধন। সংসারবদ্ধ জীব বিষয়বাসনাবশে বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভোগে জীবের স্বাধীনত্ব নাই। জীব প্রাক্তন কর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন। প্রাক্তনকর্ম্মবশে বিষয়বিশেষের সহিত সংযোগ বা বিয়োগ ঘটে। উক্ত সংযোগ এবং বিয়োগই আবার তৃষ্ণার বা বিতৃষ্ণার মূল। তৃষ্ণার ফল আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার ফল বিক্ষেপ। ঐ আকর্ষণ এবং বিক্ষেপই অবস্থাবিশেষে চিত্তের প্রসাদ বা অবসাদ উৎপাদন দ্বারা সুখের বা দুঃখের আকারে পরিণত হয়। সুখ বা দুঃখ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। সুখরূপা বৃত্তি প্রবৃত্তিজনিকা এবং দুঃখরূপা বৃত্তি নিবৃত্তিজনিকা। মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাহাই দুঃখরূপা বৃত্তির পরিহার ও সুখরূপা বৃত্তির লাভের নিমিত্ত। দুঃখহানি এবং সুখলাভই মানবের উদ্দেশ্য হইলেও, ঐ উদ্দেশ্য সকল সময়ে সফল হইতে দেখা যায় না। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণ, মানবের জ্ঞানশক্তির সঙ্কীর্ণতা। মানব জ্ঞানবান্ এবং তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনযন্ত্রও অসাধারণ। অপর কোন কোন জীবের যেরূপ কেবল সংস্কারমাত্রই আছে, তাঁহার তাহা নহে; তাঁহার কার্য্যে জ্ঞানবত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনযন্ত্রও কেবল সংস্কারের আশ্রয় নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিচারপটু; তিনি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক অবস্থা সমূহের বিশ্লেষণ, বিভক্ত অবস্থা সকলের পরস্পর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অবধারণ পূর্ব্বক ব্যষ্টিসমষ্টিভাবে বস্তুবিচারকরণ ও বিচারিত বস্তু সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা কারণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক উক্ত বিচারকার্য্যের উপসংহার করিতে পারেন। এই সকল সত্য হইলেও, মানবের জ্ঞানশক্তি যে সঙ্কীর্ণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মায়ারচিত-জ্ঞানযন্ত্রোত্থ মানবীয় জ্ঞান যে যথেষ্ট প্রসার বা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না, তাহা স্থির। মানবের জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হইয়া সঙ্কীর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়; পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশের অপগম ভিন্ন ঘটে না। দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশের অপগমই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞানশক্তির প্রসারতা এবং জ্ঞানশক্তির প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানকৃত স্বরূপাবরণাদি জনিত দুঃখরূপ সংসারবন্ধনের বিনিবৃত্তি পূর্ব্বক স্বরূপাদি-

সাক্ষাৎকার-জনিত পরমানন্দের লাভই মোক্ষ। ঐ মোক্ষ উপায়সাধ্য। কর্ম্ম মোক্ষের উপায় নহে। কি নিষিদ্ধ কি বিহিত কোন কর্ম্মকেই মোক্ষের উপায় বলা যায় না। নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণে নরকাদি অনিষ্টই ঘটে। বিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাদৃশ অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকিলেও, তদ্দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় না, স্বর্গাদিভোগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মোক্ষ জ্ঞানৈকসাধ্য। কর্ম্মযোগকে কেহ কেহ মোক্ষের উপায় বলেন বটে, কিন্তু তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় নহে। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানোদয়েই মোক্ষ শ্রবণ করা যায়। কর্ম্মযোগ পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষসাধক। পরম্পরায় মোক্ষসাধক কর্ম্মযোগ দ্বিবিধ;—ভগবদাজ্ঞাবোধে তৎপ্রীতিসম্পাদনার্থ কর্ম্মকরণ ও কৃতকর্ম্মের ফল তদুদ্দেশে অর্পণ। উভয়ই নিষ্কাম। উভয়ই নিষ্কাম হইলেও, প্রথমটিতে ফলের প্রতি লক্ষ্য অর্থাৎ সাগ্রহ দৃষ্টি থাকায় এবং শেষটিতে তাহা না থাকায়, শেষটির অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ জানিতে হইবে। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মযোগের নামান্তর আরোপসিদ্ধা ভক্তি। উহারা ভক্তি না হইয়াও ফলগত সাদৃশ্য দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপ হেতু আরোপসিদ্ধা ভক্তি নামে উক্ত হয়।

উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মযোগ যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯ অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক।

যে কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সেই সকল যাহাতে আমাতে অর্পণ হয়, সেইরূপ কর। এইরূপ করিতে করিতে কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাসযোগ-যুক্তাত্মা হইয়া শুভাশুভ-ফলক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিমুক্তির পর আমাকে লাভ করিবে।

জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষসাধক হইলেও, ভক্তিবর্জ্জিত কেবল জ্ঞান মোক্ষ উৎপাদন করিতে পারে না।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১ স্কন্ধ ৫ অধ্যায়।

শুভাশুভকর্ম্মলেপরহিত ব্রহ্মের সহিত একাকার অতএব অবিদ্যাখ্য অজ্ঞানের নিবর্ত্তক যে নির্ভেদ জ্ঞান, তাহাও যদি ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হয়, তবে তাহা কোনরূপেই শোভা পায় না, অর্থাৎ তাহা ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে কাম্যকর্ম্ম বা অকাম্যকর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি কখন শোভা পাইতে পারে ?

তবে যে জ্ঞানকে কোথাও কোথাও স্বরূপানুভবের সাধন বলা হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞানকে নহে। ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞান স্বরূপানুভব সাধন করিতে অক্ষম। স্বরূপানুভবের সাধনীভূত জ্ঞানের নামান্তর সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। উহা ভক্তির সাহচর্য্যে অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই উহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥"

৭ অধ্যায় ১৬—১৮ শ্লোক।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

১৮ অধ্যায় ৫৪—৫৫ শ্লোক।

সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভেদে চতুর্বিধ। তন্মধ্যে সর্ব্বদা মন্নিষ্ঠ, অনন্যভক্তিযুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীদিগের অতিশয় প্রিয়, এবং জ্ঞানীও তদ্রূপ আমার প্রিয়। আর্ত্তাদি চতুর্বিধ ভক্তই উদারস্বভাব ; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মার সদৃশ প্রিয় ; কারণ, জ্ঞানী মদেকচিত্ত হইয়া আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

যিনি শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপের সাক্ষৎকার লাভ করিয়াছেন, এবং তন্নিমিত্ত যিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়াছেন, তিনি আর শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, পরন্তু

সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। পরা ভক্তি দ্বারা আমার স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি অনুভব করা যায়। আমার স্বরূপাদির অনুভব হইলে, মনুষ্য আমার সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানবিশেষরূপা শুদ্ধা ভক্তিই একমাত্র মোক্ষোপায়। উহা সাক্ষাৎ মোক্ষ-জনিকা। উহা কর্ম্মজ্ঞাননিরপেক্ষভাবেই মোক্ষফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ শুদ্ধা ভক্তির নামান্তর স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ঐ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি যথা—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চনপর হও; আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে দেহ ও মন আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

শরণাপত্তি স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও, উহার দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, উহাকে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধিকা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; উহা মোক্ষপ্রতিবন্ধক পাপ সকল দূর করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে। শরণাপত্তি যথা—

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব; তুমি শোক করিও না।

একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষজনিকা। এই নিমিত্তই গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

১৮ অধ্যায় ৬৪—৬৫ শ্লোক।

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনশ্চ শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, আমার বাক্য দৃঢ় বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, অতএব তোমার হিত বলিব। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চনপরায়ণ হও; আমাকে নমস্কার কর; এইরূপ

করিলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তোমার শপথ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রিয়।

ঐ শুদ্ধা ভক্তি আবার সাধন ও সাধ্য ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে সাধ্য শুদ্ধা ভক্তির আবার দুইটি অবস্থা; ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। উহা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। উহা জ্ঞানবিশেষ। উহা জ্ঞানের সারাংশ। উহা জ্ঞানের সারাংশ হইয়াও চিত্তবৃত্তি নহে; উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। তবে যে উহাকে কোথাও কোথাও চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে, সে কেবল আত্মার অন্তঃকরণ-তদাত্মাপত্তি লক্ষ্য করিয়া। আত্মার জ্ঞানসাররূপ বৃত্তিবিশেষের অঙ্কুরাবস্থার নাম ভাব এবং ভাবের পরিপাকাবস্থার নাম প্রেম। ঐ প্রেম আবার মিশ্র ও কেবল ভেদে দ্বিবিধ। মিশ্র প্রেম শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যানুভবের এবং কেবল প্রেম মাধুর্য্যানুভবের সাধন। কেবল প্রেমই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কেবল প্রেমের নামই পরম প্রেম। পরম প্রেমই পরমপুরুষার্থের সাধন। সাধ্য ও সাধনের অভেদে উহাই পরমপুরুষার্থ।

প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রধান প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি যাহা বলিলে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন-রূপ বিবাদ নাই। আমরা কল্পিত অর্থ জানিয়াও সম্প্রদায়ের অনুরোধে আচার্য্যের উদ্ভাবিত অর্থ মান্য করিয়া থাকি। তুমি বেদান্তের যেরূপ অর্থ করিলে, তাহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে। আমরা তোমাকে না জানিয়া যে কিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।" প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে ক্ষমা করিলেন। প্রভুর প্রসাদ লাভে তাঁহাদিগের মন ফিরিয়া গেল। তাঁহারা সকলেই মায়াবাদ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রভুকে লইয়া ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষার পর প্রভু নিজের বাসায় আগমন করিলেন। চন্দ্রশেখরবৈদ্য ও তপনমিশ্র শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। অপরাপর সন্ন্যাসী সকল শুনিয়া প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে বা স্নান করিতে যান, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে সমস্ত বারাণসী কৃতার্থ হইল।

"সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার॥"

প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তন।

একদিন প্রকাশানন্দের এক শিষ্য সন্ন্যাসীর সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি সে দিন বেদান্তসূত্রের যে সকল মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অতীব মনোরম। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতির ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মনে না লাগিলেও কেবল সম্প্রদায়ের অনুরোধে মান্য করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথাই সার কথা। উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা শ্রীভগবান্‌কেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝা যায়। সেই পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান্‌কে সত্তামাত্র বলিয়া প্রচার করিলে, তাঁহার পূর্ণতার হানি করা হয়। ব্রহ্মাংশভূত জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া সংসার জয় করা যায় না। ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস অস্বীকার করিয়া ও তাঁহার চিদ্বিগ্রহকে মায়িক মনে করিয়া অবশ্য অপরাধী হইতে হয়। এই কলিকালে এক কৃষ্ণনামই সারাৎসার।" শিষ্যের কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। আচার্য্য অদ্বৈতবাদস্থাপনে প্রয়াসী হইয়া বেদান্তসূত্রের গৌণার্থ কল্পনা করিয়াছেন। গৌণার্থকল্পনা ব্যতিরেকে কেবল মুখ্যার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা যায় না। আচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা শক্তিবর্গসাধারণী। তবে বৈষ্ণবগণ যদ্দ্বারা ব্রহ্মের ভগবত্তা স্থাপনা করেন, সেই স্বরূপশক্তি তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই। স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও জীবের অনাদিত্ব স্বীকারে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিরও নিত্যত্ব প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, স্বরূপশক্তির স্বীকার ব্যতিরেকে কূটস্থ শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গতি হয় না। ব্রহ্ম স্বয়ং মায়াশক্তি দ্বারা জীব হইয়াও স্বরূপশক্তি দ্বারাই কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তির অস্বীকারে ব্রহ্মের কূটস্থস্বরূপে অবস্থানের উপপত্তি করা যায় না। তবে তিনি স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য স্বীকার না করিয়া ঐ স্বরূপশক্তিকে ব্রহ্মাভিন্না বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্যের এইরূপ করিবার বিশেষ কারণ আছে। স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিলে, শুদ্ধাদ্বৈত রক্ষা পায় না। বৈচিত্র্যময়ী স্বরূপশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের যে ভগবত্তা, সেই ভগবত্তা স্বীকার করিলে, স্বগতভেদের অনিবার্য্যতা বশতঃ অদ্বৈতবাদ রক্ষা করা যায় না। গ্রন্থকর্ত্তারা নিজমত স্থাপন করিতে যাইয়া প্রায়ই এইপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। জৈমিনি কর্ম্মের স্থাপনা

করিতে যাইয়া পূর্ব্বমীমাংসায় ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। কপিল সাংখ্যমত স্থাপন করিতে গিয়া পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক প্রকৃতিকেই কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা পরমাণুকেই বিশ্বের কারণ বলিয়া থাকেন। পাতঞ্জলি অন্তর্যামী পরমাত্মাকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আচার্য্যও তদ্রূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তর্কদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রুতি ও স্মৃতি সকল সকলকালেই বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া থাকেন। 'তর্ক দ্বারা ঐ সকল মতের সমন্বয় করা যায় না। তর্ক দ্বারা গুহানিহিত ধর্ম্মের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না। মহাজনের পদবীর অনুসরণ ব্যতিরেকে প্রকৃত পথ পাওয়া যায় না।" মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সন্ন্যাসী-দিগের এই সকল আলাপ শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বিন্দুমাধব দর্শনে গমন করিলেন।

প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনগোস্বামী প্রভুর সহিত নৃত্য ও কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে শত শত লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া হরিধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই হরিধ্বনি শুনিয়া প্রকাশানন্দও শিষ্য-বর্গের সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া প্রভুর নৃত্য, দেহমাধুর্য্য ও কম্পাদি সাত্ত্বিকবিকার সকল দর্শন করিয়া শিষ্যগণের সহিত সবিস্ময়ে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। লোকসমাগমে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তখন তিনি নিজভাব সংবরণ করিলেন। প্রকাশানন্দ আসিয়া প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। তদ্দর্শনে প্রভু বলিলেন, "করেন কি? আপনি পূজ্যতম জগদ্‌গুরু, আমি আপনার শিষ্যতুল্য, আপনি কি আমার বন্দনা করিতে পারেন? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কখন হীনের বন্দনা করিতে পারেন না। আপনি ব্রহ্মসম, আপনার বন্দনায় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। যদিও আপনি সকলকেই ব্রহ্মতুল্য দর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি লোকশিক্ষানুরোধে আপনি আমাকে বন্দনা করিতে পারেন না।" প্রভুর দীনতা দেখিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি। সেই সকল অপরাধের ক্ষমাপনার্থ আমি আপনার চরণস্পর্শ করিতেছি।" প্রভু বলিলেন, 'বিষ্ণু বিষ্ণু' আমি হীন জীব; আপনি আমাকে বন্দনা করিয়া অপরাধী হইবেন এবং আমাকেও অপরাধী করিবেন।" প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আপনি হীন জীব নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ

নারায়ণ। আপনি লোকশিক্ষার্থ আপনাকে দাস বলিয়া অভিমান করিলেও, আপনি আমাদিগের পূজ্য। আপনাকে নিন্দা করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে আপনাকে বন্দনা করিয়া উক্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ করি।" তিনি এইপ্রকার কথার পর, প্রভুকে আর কিছু বলিতে না দিয়া, তাঁহাকে বসাইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "প্রভো, আপনি সেদিন আচার্য্যের মায়াবাদে দোষারোপ করিয়া যে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চমৎকার বোধ হইয়াছে। আপনি ঈশ্বর, আপনার অচিন্ত্যশক্তি, আপনাতে সকলই সম্ভবে। কৃপা করিয়া সঙ্ক্ষেপে সমুদায় বেদান্তের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করুন, আমরা শুনিয়া কৃতার্থ হইব।" প্রভু বলিলেন, "আমি তুচ্ছ জীব, বেদান্তের কি ব্যাখ্যা করিব? স্বয়ং সূত্রকারই বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। প্রণবের অর্থ গায়ত্রী। গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবত। ঐ চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ করেন। নারদ আবার উহা বেদব্যাসকে উপদেশ করেন। বেদব্যাস ঐ নারদোপদিষ্ট চতুঃশ্লোকীকে বিস্তার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্র বেদের উপনিষদের ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। যে ঋক্ হইতে যে বেদান্তসূত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই বেদান্তসূত্রের অনুরূপ শ্লোক আবার শ্রীমদ্ভাগবতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব বেদ, উপনিষদ ও সূত্রের যাহা অভিপ্রায়, শ্রীমদ্ভাগবতেরও তাহাই অভিপ্রায় জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, বেদ ও বেদান্তেরও তাহাই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। চতুঃশ্লোকীতে ঐ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে।"

চতুঃশ্লোকী ভাগবত।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"

সৃষ্টির আদিতে নিজ নাভিকমলস্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

হে ব্রহ্মন্, আমার সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ বিধায় আমিই সম্বন্ধ তত্ত্ব, মৎপ্রাপ্তির

উপায়স্বরূপ আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞানই সাধনভক্ত্যাখ্য বিধেয়লক্ষণ অভিধেয় তত্ত্ব, আর উক্ত বিধেয়লক্ষণ সাধনের ফলভূত মৎসেবাপ্রদ প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব। আমি ঐ তিন তত্ত্বই তোমাকে উপদেশ করিতেছি। প্রথমতঃ জ্ঞান বলিতেছি। ঐ জ্ঞান আত্মার স্বরূপ ও অহঙ্কাররূপে সদা সর্ব্বগোচর হইলেও, বিশেষ-বোধের নিমিত্ত উপদেশার্হ হইয়াছে। উপদেশ ব্যতিরেকে অধিগত জ্ঞানেরও বিশেষবোধ হইতে পারে না। ঐ জ্ঞান মদ্বিষয়ক শাব্দজ্ঞান বলিয়া উপ-দেশের অযোগ্যও নহে। অতএব তুমি প্রথমতঃ মদুপদিষ্ট মদ্বিষয়ক শাব্দ-বোধরূপ পরোক্ষজ্ঞান গ্রহণ কর। উহা পরমগুহ্য হইলেও আমি তোমাকে বলিতেছি। আবার আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক বিজ্ঞান অর্থাৎ বৃত্তিব্যাপ্য অনুভবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান এবং উক্ত জ্ঞানের সহায়ভূত সাধনাঙ্গ এবং সাধনের ব্যাপারস্বরূপ বা ফলভূত প্রেমও প্রদান করিতেছি।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

আমার অনুগ্রহ ভিন্ন মদীয় পরিমাণ বা বিভূতি, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের তত্ত্ব কেহই বিদিত হইতে পারে না। অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার ঐ সকল তত্ত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হউক।

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না। কার্য্য কারণ ও তদতীত যাহা কিছু, সে সকল আমিই। কার্য্যভূত জগৎ আমার গুণমায়ার প্রকাশ। কারণভূত আধার আমার জীবমায়ার প্রকাশ। কাল আমার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। তদুভয়ের অতীত জীব সকল আমার প্রকাশাপ্রকাশ-সামর্থ্যরূপা তটস্থাশক্তি। স্বরূপশক্তি সকল আমার প্রকাশসামর্থ্যরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি। ব্রহ্ম সূর্য্যস্থানীয় আমার মণ্ডলস্থানীয় নির্বিশেষ প্রকাশ; পরমাত্মা আমার সবিশেষ প্রকাশাংশ। আমার মণ্ডলবহিশ্চরপরমাণুস্থানীয় জীব সকলের অন্তরালবর্ত্তিনী ছায়ারূপা মায়া আমার আবরণসামর্থ্য বা স্বরূপাপ্রকাশসামর্থ্য। কেহই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রলয়ের পরও কেবল আমি থাকি, অপর কিছুই থাকে না। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বও আমিই। আবার প্রলয়ে যাহা অবশেষ থাকে, তাহাও আমিই; কারণ, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় দেশ ব্যাপিয়া ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিয়া

থাকি; আমার দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের পর এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করি, আমার কালতঃ পরিচ্ছেদ নাই। মায়াদি শক্তি সকল আমার বিভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আমার আবির্ভাববিশেষ। আমি মধ্যমাকার হইয়াও বিভু। আমার রূপ সর্ব্ববিলক্ষণ ও অনন্ত। আমার গুণও তদ্রূপ। আমার কর্ম্ম সৃষ্টিলীলা, দেবলীলা ও নরলীলায় নিত্য পরিব্যক্ত।

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

আমা ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্নভাবে যাহার প্রতীতি অর্থাৎ প্রকাশ, অথচ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে আপনাতে যাহার প্রতীতি অর্থাৎ প্রকাশ নাই, যাহা আলোক ও অন্ধকারের অথবা তদুভয়ের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাই আমার শক্তিবর্গসাধারণ মায়ার লক্ষণ। আর পরমার্থভূত আমা ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি, অর্থাৎ আমার প্রকাশে অপ্রকাশ বশতঃ আমার বহির্ভাগেই—মদ্বিমুখ জীবের আশ্রয়েই—যাহার প্রতীতি, এবং আপনাতে যাহার প্রতীতি নাই, অর্থাৎ মদাশ্রয়ত্ব ভিন্ন যাহার স্বতঃ প্রকাশ নাই, তাদৃশলক্ষণান্বিত বস্তুকেই আমার ছায়ারূপা মায়া বলিয়া জানিবে। এই শেষোক্তা মায়ার দুইটি রূপ। একটির নাম আভাস, অপরটির নাম তমঃ। তন্মধ্যে আভাস বা প্রতিচ্ছবির ন্যায় স্বভাব বশতঃ আভাস এই নাম এবং তমঃ বা তমঃপ্রায় বর্ণশাবল্যের ন্যায় স্বভাব বশতঃ তমঃ এই নাম জানিতে হইবে। আভাসরূপা মায়ার অপর নাম জীবমায়া, আর তমোরূপা মায়ার অপর নাম গুণমায়া। এই দুই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই জীব আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইল।

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

আত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যে একমাত্র বস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকে অর্থাৎ যুগপৎ অন্বিতভাবে ও অনন্বিতভাবে কেন্দ্রস্থ বস্তুর ন্যায় সাক্ষিস্বরূপে সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া উপপন্ন হয়েন, অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা পরোক্ষে ও ভক্তি দ্বারা অপরোক্ষে অনুভূত হয়েন, সেই বস্তু কি এবং তৎসাক্ষাৎকারের উপায়ই বা কি, ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, ভক্তিই ঐ উপায়। ধর্ম্মাদি দেশ কাল ও পাত্রাদির বিচারসাপেক্ষ; ভক্তি দেশ কাল ও

পাত্রাদির বিচারনিরপেক্ষ। ভক্তির সর্ব্বদেশকালাদিব্যাপ্তি হেতু উহাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য হইতেছে। ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষার্থের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিধেয় ও প্রয়োজন নিরূপিত হইল।

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেযুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥"

যেমন প্রকৃত্যাদি ক্ষিত্যন্ত মহাভূত সকল উৎকৃষ্ট বিরাড়্‌দেহ ও অপকৃষ্ট খনিজদেহ প্রভৃতি সমস্ত ভূতভৌতিক শরীরে পরিণামতঃ প্রবিষ্ট হইয়াও অপরিণত অবস্থায় ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আধারস্বরূপে অবস্থান করে, আমিও তদ্রূপ বিবিধ শক্তি ও অংশ দ্বারা ঐ সকলে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট কূটস্থ অবস্থায় সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্য প্রেমরূপ পুরুষার্থের লাভে জীব আমাকে এইরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন।

নিরন্তর এই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বিচার করিলেই শ্রুতির ও সূত্রের অর্থ বোধ হইবে। কৃষ্ণনাম করিলেই অনায়াসে মোক্ষের সহিত প্রেম লাভ হইবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণে ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ প্রভুর কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কীর্ত্তনের আনন্দে বারাণসীপুরী টলমল করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিগণ কৃতার্থ হইলেন। এইরূপে সন্ন্যাসিগণকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তপনমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সমভি-ব্যাহারী হইতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং সনাতন গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত বনপথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ চরণদর্শনার্থ অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্রসরোবরের নিকট প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন হইল। প্রভু পুরী ও ভারতীর চরণবন্দন করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। অপরাপর ভক্তগণ প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। প্রভু পৃথক্ পৃথক্ সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে প্রভু ভক্তগণের সহিত নিজ বাসায় গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে নিজভবনে লইয়া ভিক্ষা করাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি মহাপ্রসাদ আনাও, আজ এইখানেই সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাইব।" ভট্টাচার্য্য মহাপ্রসাদ আনাইলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত নিজবাসাতেই ভিক্ষা করিলেন।

অন্ত্যলীলা।

ভক্তসমাগম।

প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর শ্রীচরণদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুলীনগ্রামের শ্রীখণ্ডের নদীয়ার ও অপরাপর স্থানের ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। শচীদেবী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ভক্তগণ গমনের জন্য প্রস্তুত হইলে, শিবানন্দ সেন পূর্ব্ববৎ সকলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ পথে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। একটি কুকুর শিবানন্দ সেনের সঙ্গ লইল। শিবানন্দ তাহাকেও যত্নসহকারে পালন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন একস্থানে নদী পার হইবার সময় উড়িয়া নাবিক কুকুরটিকে নৌকায় উঠাইল না। কুকুর নদীর অপরপারেই থাকিয়া গেল, শিবানন্দ মনে বড় দুঃখ পাইলেন। পরে তিনি দশপণ কড়ি দিয়া কুকুরকে পার করাইয়া সঙ্গে লইলেন। আর একদিন শিবানন্দের ভৃত্য কুকুরটিকে অন্ন দিতে ভুলিয়া যাওয়ায়, কুকুর অন্ন পাইল না। শিবানন্দ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে তিনি রাত্রিতে কুকুরকে খাওয়াইবার জন্য অনুসন্ধান করিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও কুকুরকে পাওয়া গেল না, শিবানন্দ সেদিন দুঃখে উপবাসী রহিলেন। পরদিন প্রভাতেও কুকুরকে পাওয়া গেল না। সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহারা নীলাচলে আসিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে লইয়া জগন্নাথ দর্শন ও মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। তদনন্তর সকলেই পূর্ব্ববৎ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। শেষে একদিন ভক্তগণ দেখিলেন, সেই কুকুরটি প্রভুর অনতিদূরে বসিয়া আছে। প্রভু তাহাকে প্রসাদী নারিকেল-শস্য ফেলিয়া দিতেছেন, কুকুর উহা ভক্ষণ করিতেছে ও ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিতেছে। দেখিয়া ভক্তগণ যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। শিবানন্দ কুকুরকে দেখিয়া

প্রণাম করিলেন এবং দৈন্য করিয়া নিজ অপরাধ ক্ষমা করাইতে লাগিলেন। তার পর আর সেই কুকুরকে দেখা গেল না, সে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিল।

শ্রীরূপগোস্বামীর নীলাচলে আগমন।

এদিকে শ্রীরূপগোস্বামী কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন করিলেন। মথুরায় আসিয়াই তাঁহার সুবুদ্ধিরায়ের সহিত দেখা হইল। গৌড়েশ্বর হুসেন সা মহিষীর প্ররোচনায় যবনের জল মুখে দিয়া সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ করিলে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে চলিয়া আসিলেন। বারাণসীতে আসিয়া তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডিতগণ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। সুবুদ্ধিরায় শুনিয়া কিছু খিন্ন হইলেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময় মহাপ্রভু বারাণসীতে আগমন করিলেন। সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে পাইয়া নিজের অবস্থা সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত তামসিক, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর, তাহা হইলেই পাপমুক্ত হইবে। এক নামাভাসে পাপদোষের খণ্ডন হইবে, অপর নাম লইতে লইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হইবে।" সুবুদ্ধিরায় তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, সুতরাং মথুরায় আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন না, শুনিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইয়া প্রয়াগে গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং উহারই কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বৈষ্ণবসেবায় রত হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরূপগোস্বামী মথুরায় আগমন করিলেন। সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে লইয়া দ্বাদশবন দর্শন করাইলেন। শ্রীরূপগোস্বামী একমাস শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানানন্তর জ্যেষ্ঠ সনাতনের অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীরপথে পুনশ্চ প্রয়াগে প্রত্যাগমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী রাজপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব শ্রীরূপ-গোস্বামীর সহিত দেখা হইল না। তিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে শুনিলেন, শ্রীরূপগোস্বামী কনিষ্ঠ বল্লভের সহিত প্রয়াগে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রয়াগে আসিয়া সনাতন গোস্বামীকে না পাইয়া বারাণসীতে

আগমন করিলেন। বারাণসীতে আসিয়া শুনিলেন, সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছেন, এবং প্রভুও দুইমাস থাকিয়া সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়া ও কাশীপুরীর সন্ন্যাসীদিগকে কৃতার্থ করিয়া বনপথে নীলাচলে গমন করিয়াছেন। এই সকল শুনিয়া শ্রীরূপগোস্বামী আর কালবিলম্ব করিলেন না, সত্বর গৌড়ে চলিয়া আসিলেন। গৌড়ে আসিয়া বল্লভের গঙ্গালাভ হইল। শ্রীরূপগোস্বামী গৌড় হইতে নীলাচলে আগমন করিলেন। তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখনই তাঁহার কৃষ্ণলীলাময় নাটক রচনা করিবার অভিলাষ হয়। শ্রীবৃন্দাবনেই উক্ত নাটকের মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক লিখেন। পথে আসিতে আসিতে নাটকের ঘটনা চিন্তা করিয়া তাহার একটি কড়চাও প্রস্তুত করেন। পরে তিনি উড়িষ্যার পথে সত্যভামাপুর নামক গ্রামে একরাত্রি বাস করেন। ঐ রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখেন, সত্যভামা দেবী আদেশ করিতেছেন,—

"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥"

স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীরূপগোস্বামী বুঝিলেন, আমি রসপুষ্টির নিমিত্ত ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিতেছিলাম; দেবী আমাকে আদেশ করিলেন, ঐ একখানি নাটক ভাঙ্গিয়া ব্রজলীলা হইতে পুরলীলা পৃথক্ করিয়া দুইখানি নাটক রচনা করিতে। প্রায়িকীলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর ও পুরপরিকর ভিন্ন ভিন্ন। পরিকর সকল ভিন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে যখন পুরে গমন করেন, তখন ব্রজবাসীদিগের যে বিরহ উপস্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন ভিন্ন সেই বিরহের অবসান না হওয়ায়, রসের পুষ্টি হয় না। এই নিমিত্তই ভাগবতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ না করিয়া সদাই ব্রজে ক্রীড়া করেন, এবং প্রকটপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া ব্রজ হইতে পুরীতে গমন ও পুরী হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজ হইতে পুরীতে গমন করেন, তখন ব্রজে বিরহ উপস্থিত হয়। ঐ বিরহ তিনমাস থাকে। ঐ বিরহজনিত ক্লান্তির উদ্রেকে ব্রজবাসীদিগের চিত্ত যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া যায়, তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি দ্বারা নিজ সমাচার প্রেরণের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার আবির্ভাব হইলে, ব্রজবাসিগণ তাঁহার পুরগমনবৃত্তান্ত স্বপ্ন বলিয়াই অনুভব করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রজে আগমনানন্তর মাসদ্বয় প্রকট বিহার পূর্ব্বক নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। তৎকালে, অর্থাৎ যখন শ্রীবৃন্দাবনলীলা

অপ্রকট হয়, তখন পুরলীলা প্রকট থাকে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার স্পষ্ট বর্ণন না থাকায় ব্রজোপাসকের নিরতিশয় কষ্ট হয়। ঐ কষ্টের বারণার্থেই আমি কাদাচিৎকী লীলা অবলম্বনে নাটক রচনা করিতেছি। কাদাচিৎকী লীলায় ব্রজ-পরিকর ও পুরপরিকর একই; অতএব এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে পুরে আগমন করিলেও, ব্রজবাসীরা পুরেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া বিরহসন্তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। এইরূপে রসেরও যথেষ্ট পোষণ হয়। কিন্তু সত্যভামা দেবী আমাকে দুইখানি নাটক করিয়া ব্রজলীলার ব্রজে ও পুরলীলার পুরেই পরিসমাপ্তি করিতে আদেশ করিতেছেন। প্রায়িকীলীলার অনুসরণ ভিন্ন ব্রজ-লীলার ব্রজে পরিসমাপ্তি করা যায় না। অতএব প্রায়িকীলীলার অনুসরণে ব্রজলীলাময় নাটক রচনা করিব এবং কাদাচিৎকী লীলার অনুসরণে পুরলীলাময় অপর একখানি নাটক রচনা করিব। পরে তাহাই নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নীলাচলে উপনীত হইলেন। প্রথমেই হরিদাস ঠাকুরের সহিত দেখা হইল। হরিদাস ঠাকুর রূপগোস্বামীকে বিশেষ কৃপা করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি প্রভুর মুখে তোমার নীলাচলে আসিবার কথা শুনিয়াছি।" এই সময়ে প্রভু উপনভোগ দর্শন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ঐ স্থানে আগমন করিলেন। রূপগোস্বামী প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, রূপ প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু হরিদাসের সহিত মিলনের পর রূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভু রূপগোস্বামীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপগোস্বামী সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন গমন এবং বল্লভের গঙ্গালাভ প্রভৃতি সমস্তই সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন। প্রভু রূপগোস্বামীকে হরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতে বলিয়া বাসায় গমন করিলেন। পরদিন ভক্তগণের সহিত রূপগোস্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। রূপগোস্বামী একে একে ভক্তগণের চরণবন্দন করিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে একে একে আলিঙ্গন দিলেন। পরে প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে কায়মনে রূপের প্রতি কৃপা ও শক্তিসঞ্চার কর। রূপ তোমাদিগের কৃপায় ভক্তিরস প্রচার করিবে।" কিয়ৎ-ক্ষণ কথাবার্ত্তার পর প্রভু চলিয়া গেলেন। রূপগোস্বামী প্রভুর ভক্তগণের বিশেষ স্নেহভাজন হইলেন। প্রভু প্রতিদিন যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, তাহাই রূপগোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুর ভোজন করেন। ক্রমে গুণ্ডিচামার্জ্জন ও বন্যভোজন হইয়া গেল। একদিন প্রভু রূপগোস্বামীকে বলিলেন,—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥"

এই কথা বলিয়া প্রভু মধ্যাহ্নস্নানাদি করিতে চলিয়া গেলেন। রূপগোস্বামী শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, স্বপ্নাদেশ ও সাক্ষাৎ আদেশ একরূপই হইতেছে। স্বপ্নে সত্যভামা দেবী পুরলীলা পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন, সাক্ষাতে প্রভুও ব্রজলীলার ব্রজেই সমাপ্তি করিতে আদেশ করিতেছেন। অতএব দুইটি প্রস্তাবনাই করিতে হইল। পরে তাহাই করিলেন। দুইটি প্রস্তাবনা করিয়া দুইখানি নাটকের একখানিতে ব্রজলীলা ও অপরখানিতে পুরলীলা লিখিতে লাগিলেন। এদিকে রথযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। রূপগোস্বামী রথোপরি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলেন। রথাগ্রে প্রভুর নর্ত্তনকীর্ত্তনও দেখিলেন। প্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

প্রভু যে কেন সহসা এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিলেন না। স্বরূপ গোসাঁই প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুরূপ পদ গাইতে লাগিলেন। রূপগোস্বামীও প্রভুর অভিপ্রায় বিদিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিলেন।

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

হে সহচরি, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমার প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতি লাভ করিলাম, আমিও সেই রাধা, আমাদিগের পরস্পরের মিলনসুখও তথাবিধ; কিন্তু মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বরে নিনাদিত যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জকাননে গমন করিতেই আমার মন সমুৎসুক হইতেছে।

রূপগোস্বামী শ্লোকটি তালপত্রে লিখিয়া ঘরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে প্রভু আসিয়া চালে গোঁজা শ্লোকটি লইয়া

পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এইসময়ে রূপগোস্বামী স্নান করিয়া বাসায় আসিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। প্রভু তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "রূপ, তুমি আমার মনের গূঢ়ভাব কিরূপে বিদিত হইলে?" এই কথা বলিয়া প্রভু রূপগোস্বামীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ঐ শ্লোকটি লইয়া স্বরূপ গোসাঁইকে দেখাইলেন, এবং রূপগোস্বামী কিরূপে তাঁহার মনের ভাব বিদিত হইলেন, তাহা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "ইহা আর পরীক্ষা করিব কি? তোমার কৃপাতেই রূপ তোমার মনের ভাব বিদিত হইয়াছে, অন্যথা তোমার মনের ভাব বিদিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?" প্রভু বলিলেন, "হাঁ, আমার সহিত রূপের দেখা হয় এবং সেই সময়েই আমি ইহাকে যোগ্যপাত্র জানিয়া কৃপা করিয়াছিলাম। আমি তৎকালে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক ইহাকে কিছু উপদেশও করিয়াছিলাম। তুমিও ইহাকে রসতত্ত্ব উপদেশ করিও।"

ক্রমে চাতুর্ম্মাস্য অতিক্রান্ত হইল। গৌড়ের ভক্তগণ গৌড়ে ফিরিয়া গেলেন। রূপগোস্বামী পুরীতেই থাকিলেন। তিনি একদিন বাসায় বসিয়া নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া রূপগোস্বামী উঠিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। উপবেশনের পর প্রভু "রূপ, কি পুস্তক লিখিতেছ?" বলিয়া উহার একখানি পত্র তুলিয়া লইলেন। রূপের হস্তাক্ষর মুক্তার সদৃশ পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। প্রভু হস্তাক্ষর দেখিয়া সুখী হইলেন এবং যথেষ্ট প্রশংসাও করিলেন। পরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

জানি না, কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি কত অমৃত দ্বারা রচিত হইয়াছে। এই দুইটি বর্ণ যখন মুখে নৃত্য করে, তখন অনেক মুখ পাইবার অভিলাষ হয়; শ্রবণমধ্যে অঙ্কুরিত হইলে, অসংখ্য শ্রবণ লাভের অভিলাষ জন্মে; আর চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গত হইলে, নিখিল ইন্দ্রিয়ব্যাপারকেই পরাজয় করিয়া থাকে।

শ্লোক শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্লোকার্থের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমি শাস্ত্রে ও সাধুজনের মুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমাই শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ ত কখন শুনি নাই।" প্রভু রূপগোস্বামীকে ও হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

আর একদিন প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ ও স্বরূপের সহিত শ্রীরূপের বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে আগত দেখিয়া রূপগোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুর উঠিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু ভক্তগণের সহিত পিঁড়ার উপর উপবেশন করিলেন। রূপগোস্বামী ও হরিদাস ঠাকুর পিঁড়ার উপর উঠিলেন না, নিম্নেই বসিলেন। প্রভু উপবিষ্ট হইয়া রূপকে উক্ত শ্লোক দুইটি পাঠ করিতে বলিলেন। রূপগোস্বামী লজ্জাবশতঃ পাঠ করিতে পারিলেন না, মৌন ধারণ করিলেন; স্বরূপ গোঁসাই স্বয়ং শ্লোক দুইটি পাঠ করিলেন। রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম শুনিয়া বিশেষ সুখ পাইলেন এবং শ্লোক দুইটির অনেক প্রশংসা করিলেন। পরে রামানন্দরায় বলিলেন, "কোন্ গ্রন্থ রচনা হইতেছে? যাহার ভিতরে এরূপ সিদ্ধান্তের খনি, সেই গ্রন্থের নাম কি?" স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাটক। এই নাটকে পূর্ব্বে ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র বর্ণিত হইতেছিল। প্রভুর আদেশানুসারে সম্প্রতি উহা বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামে দুইভাগে দুইখানি নাটকের আকারে রচিত হইতেছে।" রামানন্দ রায় শুনিয়া নান্দীশ্লোক, ইষ্টদেবের বর্ণন, পাত্রসন্নিধান, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তির কারণ প্রভৃতি নাটকীয় অনেকগুলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে একে একে সকলগুলি শুনাইলেন। শুনিয়া রামানন্দ যথেষ্ট প্রশংসা সহকারে বলিতে লাগিলেন, "ইহা ত কবিত্ব নয়, পরন্তু অমৃতের ধার; ইহা নাটকাকারে সিদ্ধান্তের সার। প্রভুর কৃপা ব্যতিরেকে জীবের কি এরূপ বর্ণনশক্তি হইতে পারে?" প্রভু বলিলেন, "আমি ইহাঁর সহিত মিলনে ইহাঁর গুণে অতীব তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা সকলে এরূপ বর দাও, যাহাতে ইনি নিরন্তর ব্রজলীলারস বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাঁর যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার নাম সনাতন, তিনিও পরম বিজ্ঞ। রায়, তোমার ন্যায় তাঁহারও বৈরাগ্যের রীতি অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহাতে দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি একাধারে বর্ত্তমান। আমি এই দুই ভাইকে শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলাম। ইহাঁরা বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিবেন।" রামানন্দ

বলিলেন, "তুমি ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; তুমি কাষ্ঠের পুতুলকেও নাচাইতে পার। তুমি আমার মুখ দিয়া যে সকল রস প্রকাশ করিয়াছিলে; ইঁহার লিখনেও সেই সকল রসই দেখিতেছি। তুমি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার নিমিত্ত ব্রজরস প্রচার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, যাঁহার দ্বারা উহা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিবে, তাঁহার দ্বারাই প্রচার করিতে পারিবে, জগৎ তোমার অধীন।" রামানন্দের কথা শেষ হইলে, প্রভু রূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া সকল ভক্তের চরণবন্দন করাইলেন। ভক্তগণ রূপগোস্বামীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

ক্রমে দোলযাত্রার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রূপগোস্বামী দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। দোলযাত্রার পর প্রভু রূপগোস্বামীকে বলিলেন, "রূপ, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া ব্রজরস প্রচার কর, এবং একবার সনাতনকে আমার নিকট পাঠাইও।" রূপগোস্বামী প্রভুর ও ভক্তগণের চরণগ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর আবেশ ও আবির্ভাব।

জীবোদ্ধারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার। তিনি অবতীর্ণ হইয়া তিন প্রকারে জীব সকলকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। কোথাও সাক্ষাৎ দর্শনদান দ্বারা, কোথাও যোগ্য ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, কোথাও বা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া জীবগণের উদ্ধারসাধন করিতে লাগিলেন। অম্বুয়া নামক স্থানে নকুল ব্রহ্মচারী নামক এক ভক্ত বাস করিতেন। প্রভু সেই নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে আবিষ্ট হইলেন। প্রভুর আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী প্রেমাবিষ্ট ও বিবিধ সাত্ত্বিকভাবে অলঙ্কৃত হইয়া লোক সকলকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেন এই ব্যাপার লোকমুখে শ্রবণ করিয়া সত্য সত্যই ব্রহ্মচারীতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মনে করিলেন, আমি স্বয়ং কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও নকুল ব্রহ্মচারী যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাতে প্রভুর আবেশ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর ভবনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, লোকে লোকারণ্য। শিবানন্দ নকুল ব্রহ্মচারীর সহিত দেখা না করিয়া ঐ লোকের ভিড়ের ভিতরই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন লোক আসিয়া বলিল,

"এখানে শিবানন্দ সেন কে আছেন আসুন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন।" শিবানন্দ শুনিয়া সবিস্ময়ে ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী বলিলেন,—

"গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥"

শিবানন্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তনে, নিত্যানন্দ প্রভুর নর্ত্তনে এবং রাঘব পণ্ডিতের ও শচীদেবীর মন্দিরে প্রভুর প্রায়ই আবির্ভাব দৃষ্ট হইত। একবার শিবানন্দের ভবনেও প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত আবির্ভাবের বৃত্তান্ত এইরূপ;— এক বৎসর পুরী হইতে বিদায়ের কালে প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, আগামি বৎসর তোমরা এখানে আসিও না, আমিই গৌড়ে যাইব। প্রভুর আজ্ঞানুসারে ভক্তগণ ঐ বৎসর ক্ষেত্রে গমন করিলেন না। প্রভুরও কিন্তু গৌড়ে আগমন হইল না। ভক্তগণ প্রভুর আগমন না হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইলেন। একদিন জগদানন্দ ও শিবানন্দ বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু ইহাঁকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। নৃসিংহানন্দ জগদানন্দ ও শিবানন্দকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহা-দের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "প্রভুর এ বৎসর গৌড়ে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আগমন হইল না, এই নিমিত্তই আমরা বিষাদগ্রস্ত হইয়াছি।" নৃসিংহানন্দ বলিলেন, "আমি প্রভুকে আনিব, তোমরা বিষাদ ত্যাগ কর।" পরে তিনি তাঁহাদিগকে প্রভুর নিমিত্ত পাকের আয়োজন করিতে বলিলেন। পাকের আয়োজন হইলে, নৃসিংহানন্দ পাক সমাধা করিয়া তিনটি ভোগ সাজাইলেন। ঐ তিনটি ভোগের একটি মহাপ্রভুর, একটি জগন্নাথের ও তৃতীয়টি নিজেষ্ট নৃসিংহদেবের। এইরূপে ভোগ সাজাইয়া নৃসিংহা-নন্দ ধ্যানে বসিলেন। দেখিলেন, প্রভু আবির্ভূত হইয়া তিনটি ভোগই নিঃশেষে ভোজন করিলেন। নৃসিংহানন্দ পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, প্রভু পানিহাটী হইয়া তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন; ঐ দেখ, ভোগ খাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।" শিবানন্দ দেখিলেন, সত্য সত্যই পাত্র শূন্য; কিন্তু তথাপি প্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরবৎসর ক্ষেত্রে যাইয়া প্রভুর মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

ছোট হরিদাসের দণ্ড।

ভগবান্ আচার্য্য নামক এক পরম বৈষ্ণব প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া পুরীতেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। উহাঁর নাম গোপাল আচার্য্য। গোপাল কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। গোপাল বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে আগমন করিলে, ভগবান্ আচার্য্যের ভ্রাতার নিকট বেদান্ত শ্রবণের অভিলাষ হইল। স্বরূপ গোসাঁইর সহিত ভগবান্ আচার্য্যের সখ্যভাব ছিল। ভগবান্ আচার্য্য একদিন স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "গোপাল বেদান্ত পড়িয়া কাশী হইতে আসিয়াছে, একদিন প্রভুর সমক্ষে তাহার মুখে বেদান্ত শুনিবার ইচ্ছা করিতেছি, তুমি কি বল?" স্বরূপ গোসাঁই শুনিয়া বলিলেন, "তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, বৈষ্ণব হইয়া মায়াবাদ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, উহাও আবার প্রভুর সমক্ষে। মায়াবাদী সেব্যসেবকভাব ত্যাগ করিয়া আপনাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকে। উহা বৈষ্ণবের পক্ষে অপরাধ। প্রভু কেন মায়াবাদ শুনিবেন? ঐ অভিপ্রায় মন হইতে নিঃশেষে তাড়াইয়া দাও।" স্বরূপ গোসাঁইর কথা শুনিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন। অতঃপর প্রভুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। গৃহে ভাল তণ্ডুল না থাকায়, আচার্য্য প্রভুর কীর্ত্তনীয়া হরিদাসকে ভাল তণ্ডুল আনিবার নিমিত্ত প্রভুর ভক্ত শিখি মাইতির ভগিনী মাধবীদেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হরিদাস যাইয়া আচার্য্যের নাম করিয়া তণ্ডুল আনয়ন করিলেন। পাক সমাধা হইলে, প্রভু আসিয়া ভোজনে বসিলেন। উত্তম তণ্ডুলের অন্ন দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, এই তণ্ডুল কোন্ স্থান হইতে আনাইলেন?" আচার্য্য বলিলেন, "মাধবী দেবীর নিকট হইতে।" প্রভু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আনয়ন করিল?" আচার্য্য বলিলেন, "প্রভুর কীর্ত্তনীয়া হরিদাস।" প্রভু আর কিছু বলিলেন না। ভোজন করিয়া বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "ছোট হরিদাসকে আর এখানে আসিতে দিবে না।" হরিদাস দুঃখে তিন দিবস উপবাস করিলেন। তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে হরিদাসের দণ্ডের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "বৈরাগী হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্ভাষণ করে। বলবান্ ইন্দ্রিয় মুনিরও মন হরণ করিয়া থাকে।" ভক্তগণ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তখন আর কিছুই বলিলেন না। তাঁহারা অপর একদিন হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু কোন ফল

হইল না, প্রভুর কৃপা হইল না। আরও দুই একদিন ঐরূপ চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। অগত্যা হরিদাস পুরী ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে চলিয়া গেলেন।

একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া অদূরে হরিদাসের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। মানুষ দেখা গেল না, কিন্তু হরিদাসের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "হরিদাস বোধ হয় আত্মঘাতী হইয়া ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে।" কেহ বলিলেন, "তাহা কি সম্ভব, যে এত নাম করিত, সেও কি কখন ভূত হইতে পারে?" সে দিন এই-রূপেই কাটিয়া গেল। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগত এক বৈষ্ণবের মুখে হরিদাস প্রয়াগে জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে তাঁহারা পুরীতে আসিয়া ঐ কথা প্রচার করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্। প্রকৃতিসম্ভাষী সন্ন্যাসীর ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।" ভক্তগণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

দামোদরের নদীয়াগমন।

একটি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণবালক প্রভুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল। সে নিত্য প্রভুকে প্রণাম করিতে আসিত। তাহার পিতা ছিল না, বিধবা জননী ছিল। সেই ব্রাহ্মণবালকটি দেখিতে অতিসুন্দর, প্রভু তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বালকটির প্রতি প্রভুর তাদৃশ স্নেহ দামোদরের ভাল লাগিত না। ঐ বালকটির মাতা বিধবা ও অল্পবয়স্কা, পাছে বালকটির প্রতি স্নেহ দেখিয়া লোকে প্রভুর চরিত্রে দোষারোপ করে, এই নিমিত্তই দামোদর উহাকে প্রভুর নিকট আসিতে নিষেধ করিতেন. বালকটি কিন্তু নিষেধ না মানিয়াই প্রতিদিন আসিত। শেষে দামোদর কিছু বিরক্ত হইয়া একদিন প্রভুকে ঐ কথা বলিলেন। প্রভু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আর একদিন দামোদরকে বলিলেন, "দামোদর, তুমি নদীয়ায় যাইয়া মাতার নিকট অবস্থান কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। তোমার ন্যায় সাবধান লোক আর নাই। তুমি যখন আমাকেই সতর্ক করিয়াছ, তখন মাতার রক্ষণাবেক্ষণে তুমিই সমর্থ।" প্রভুর আদেশে দামোদর নদীয়ায় যাইয়া শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন, এবং সর্ব্বদা প্রভুর চরিত্র শ্রবণ করাইয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন।

কলিযুগের নিস্তারোপায়।

অতঃপর প্রভু এক দিন হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন, "হরিদাস, এই কলিকালে ম্লেচ্ছ ও যবনই অধিক, তাহারা প্রায়ই দুরাচার ও গোব্রাহ্মণ-হিংসাকারী, তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে?" হরিদাস বলিলেন, "প্রভো, কলিকালের লোক যেমন দুরাচার, সাধনও তেমনি প্রবল, নামাভাসেই জীব নিস্তার পাইবে।"

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

একটিমাত্র নাম যাঁহার মুখে উচ্চারিত হয়, বা যাঁহার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, বা কর্ণমূল প্রাপ্ত হয়, উহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ব্যবধানযুক্ত বা বর্ণরহিত হইলেও, যে জীবের উদ্ধারসাধন করিবে, ইহা নিশ্চিত। তবে যে উহাকে অনেকস্থলেই সফল হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ আছে। ঐ নাম যদি দেহ, ধন ও জনসংগ্রহের নিমিত্ত বা অপর কোনরূপ লোভপ্রযুক্ত উচ্চারিত হয়, তবে উহার ফল সত্বর দৃষ্ট হয় না। সত্বর দৃষ্ট না হইলেও উহার ফল অবশ্যম্ভাবি।

"কলে র্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

কলি বিবিধ-দোষ-দূষিত হইলেও, উহার একটি মহান্ গুণ এই যে, কলিকালে একবার কৃষ্ণনাম করিলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিরপরাধে নাম লইলে এইরূপই হইয়া থাকে। সাপরাধেরও উপায় আছে। সাপরাধ ব্যক্তিও নামের শরণাপন্ন হইলেই মুক্ত হইতে পারে।

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

যিনি সকল অপরাধে অপরাধী, তিনি শ্রীহরির চরণাশ্রয় করিলেই মুক্ত

হয়েন। আর যে নরাধম শ্রীহরির চরণে অপরাধ করে, সেও কদাচিৎ নামাশ্রয়েই ঐ অপরাধ হইতেও মুক্ত হইতে পারে। ঈদৃশ পরমসুহৃৎ নামের নিকট যে অপরাধী, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবি। কিন্তু তাদৃশ পতিষ্যমাণ ব্যক্তি যদি নামের শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত নাম করে, তবে সেও পতন হইতে রক্ষিত ও শ্রীহরির চরণলাভে কৃতার্থ হয়। নাম যে সকল জীবকেই কৃতার্থ করেন, তাহা বলা বাহুল্য; নামাভাস হইতেও জীব কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল তাহার সাক্ষী।

হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধান্ত শ্রবণে প্রভু অন্তরে আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার ভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥"

হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"প্রভো, তোমার কৃপায় স্থাবর-জঙ্গম সকলও নিস্তার পাইয়াছে। তুমি যে উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহার শ্রবণেই উহাদের নিস্তার হইয়াছে।"

সনাতনগোস্বামীর নীলাচলে আগমন।

রূপগোস্বামী যে সময়ে নীলাচল হইতে গৌড়ে গমন করিলেন, সেই সময়েই সনাতন গোস্বামীও মথুরা হইতে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি একাকী বনপথে মথুরা হইতে নীলাচলে আগমন করিলেন। আগমনকালে ঝারিখণ্ডের পথে উপবাসে ও জলের দোষে তাঁহার সর্ব্বশরীরে কণ্ডু উৎপন্ন হইল। কণ্ডুর উৎপত্তিতে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি একে নীচজাতি, তাহাতে আবার চর্ম্মরোগগ্রস্ত, অতএব এই পাপময় দেহ আর রাখিব না, রথচক্রে ইহাকে ত্যাগ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুরীতে উপনীত হইয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিলেন। অনন্তর সনাতনগোস্বামী মহাপ্রভুর চরণদর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাসায় যাইয়া চরণদর্শন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইলে, যদি জগন্নাথের কোন সেবক হঠাৎ আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন, তবে আমার

অপরাধ হইবে। এই ভাবিয়া তিনি গমনবিষয়ে নিরস্ত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভু এখনই এই স্থানে আগমন করিবেন।" বলিতে বলিতেই মহাপ্রভু উপনভোগ দর্শন করিয়া কতিপয় ভক্তের সহিত ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আগত দেখিয়া হরিদাস ঠাকুর ও সনাতন গোস্বামী দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সনাতন গোস্বামী "প্রভু আমাকে স্পর্শ করিবেন না স্পর্শ করিবেন না" বলিতে বলিতে পশ্চাদ্দিকে গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার কথা না শুনিয়া বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন গোস্বামীর অঙ্গের কণ্ডুক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল। প্রভু সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তগণের নিকট তাঁহার পরিচয় দিলেন। পরে তাঁহাকে রূপগোস্বামীর গৌড়ে গমন ও বল্লভের গঙ্গা-প্রাপ্তির কথা বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের বাসাতেই থাকিতে আদেশ করিয়া নিজ-বাসায় গমন করিলেন। গোবিন্দ প্রসাদ লইয়া আসিলে সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের সহিত ঐ প্রসাদ পাইলেন।

সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের বাসাতেই থাকেন, জগন্নাথ দর্শন করিতে যান না, দূর হইতে মন্দিরের চক্র দেখিয়াই প্রণাম করেন, এবং প্রভু প্রতিদিন যে কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, তাহাই ভোজন করেন। প্রভু যখন তাঁহাদের বাসায় আগমন করেন, তখনই তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথার আলাপ করেন। এইভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন প্রভু আসিয়া বলিলেন, "সনাতন, দেহত্যাগ করিলে, কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনেই পাওয়া যায়। দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইত, তবে কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম। দেহ-ত্যাগাদি তমোধর্ম্ম। রজোধর্ম্ম বা তমোধর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, ভক্তি দ্বারাই প্রেমের উদয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনে রত হও, অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্য ধন লাভ হইবে।" সনাতন গোস্বামী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রভু আমার মনের গতি বুঝিয়া আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন। পরে বলিলেন, "প্রভো, তুমি যখন যাহাকে যেরূপে নাচাও, সে তখন সেইরূপেই নাচিয়া থাকে; আমি নীচ পামর, আমাকে বাঁচাইলে আপনার কি লাভ হইবে?" প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তোমার এই দেহ যখন তুমি আমাকে সমর্পণ করিয়াছ, তখন আর

তোমার ইহাতে অধিকার নাই; আমি তোমার এই শরীর দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিব; আমি এই দেহ দ্বারা ভক্তি প্রচার করিব।" এই কথা বলিয়া প্রভু উঠিয়া গেলেন।

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন। ভক্তের অনুরোধে সেদিন সেইস্থানেই প্রভুর ভিক্ষা হইল। প্রভু মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষার সময় সনাতন গোস্বামীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল, সমুদ্রতীরের বালুকা সকল উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিবৎ হইয়াছে। তথাপি সনাতন গোস্বামী সিংহদ্বারের পথে না যাইয়া সমুদ্রতীরপথেই প্রভুর নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন, তুমি কোন্ পথে আগমন করিলে?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "সমুদ্রতীরপথে।" প্রভু বলিলেন, "এ সময়ে সমুদ্রতীরপথে না আসিয়া সিংহদ্বার দিয়া শীতলপথে আসিলেই হইত।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "সিংহদ্বারপথে আমার গমনাগমনের অধিকার নাই।" প্রভু শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"যদ্যপি তুমি হও জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদার রক্ষণ।
মর্য্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদালঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন॥"

এই কথা বলিয়া, সনাতন গোস্বামী নিষেধ করিলেও, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সনাতন গোস্বামীর গাত্রের কণ্ডুর রস লাগিল। সনাতন গোস্বামী মনে বিশেষ দুঃখ পাইলেন।

সনাতন গোস্বামী এই দুঃখের কথা একদিন জগদানন্দের নিকট ব্যক্ত করিলেন। জগদানন্দ শুনিয়া বলিলেন, "তুমি রথযাত্রা দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও, এবং সেই স্থানেই বাস কর। প্রভুর আজ্ঞাও তোমরা দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনেই বাস কর।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আপনার উপদেশই ভাল বোধ হইতেছে, আমি শ্রীবৃন্দাবনেই যাইব।" পরে তিনি

প্রভুকেও ঐ কথা শুনাইলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "জগদানন্দের যেমন বুদ্ধি, তেমনি কথা; সেদিনকার জগা, তোমাকেও উপদেশ করিতে আরম্ভ করিল।" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "আমার বিবেচনায় জগদানন্দই পরম-সৌভাগ্যবান্, জগদানন্দই আপনার স্নেহরূপ সুধারস পান করেন; আর আমাদিগেকে আপনি গৌরবরূপ নিম্বরস পান করাইতেছেন।" প্রভু ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রাণাধিক শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝায়াছ ব্যবহার ভক্তি॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন।
বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমা না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ॥
যদ্যপি কারও মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাঁহো কোন ভাবোদয়॥
তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতাজ্ঞান।
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃত সমান॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়॥
প্রাকৃত হইলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্রবস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে॥"

"তোমার এই দেহ অপ্রাকৃত। এই দেহে রোগের সম্ভাবনা নাই। তথাপি কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজমায়ায় তোমার এই দেহে কণ্ডু উৎপাদন পূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখিতেছেন, আমি তোমার কণ্ডু দেখিয়া ঘৃণা করি কি না। আমি যদি ঘৃণা করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন না করিতাম, তবে আমি অপরাধী হইতাম।"

এই কথা বলিয়া প্রভু পুনশ্চ সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।

এই আলিঙ্গনে দেহ রোগমুক্ত ও পূর্ব্ববৎ সুন্দর হইল। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "সনাতন, তুমি এবৎসর এই স্থানেই থাক, পরে আমি তোমাকে শ্রীবৃন্দাবনেই পাঠাইব।" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, আপনার লীলা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য; আপনি সনাতনকে বনপথে আনিয়া কণ্ডু উৎপাদন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া আপনিই আবার ইহাকে নীরোগ করিলেন।" প্রভু একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

দোলযাত্রার পর প্রভু সনাতনগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। সনাতনগোস্বামী প্রভু যে পথে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই গমন করিলেন। এদিকে শ্রীরূপগোস্বামীও গৌড়দেশে তাঁহাদের যে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তাহা কুটুম্বগণের মধ্যে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে পুনরাগমন করিলেন। দুই ভাই মিলিয়া লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ সকলের প্রচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর বল্লভের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীও নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক পিতৃব্যদ্বয়ের সহিত মিলিত ও গ্রন্থপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্র।

একদা প্রদ্যুম্নমিশ্র নামক প্রভুর এক ভক্ত প্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আমি অতিদীন ও অধম গৃহস্থ, বহুভাগ্যে আপনার দুর্ল্লভ চরণ পাইয়াছি, সদয় হইয়া কৃষ্ণকথা বলিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন।" প্রভু বলিলেন, "তোমার কৃষ্ণকথা শুনিবার অভিলাষ হইয়াছে, এ অতিভাগ্যের কথা; কিন্তু আমি কৃষ্ণকথা বলিতে জানি না, রামানন্দের মুখে শ্রবণ কর।" প্রভুর আদেশ পাইয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দরায়ের ভবনে গমন করিলেন। রামানন্দ রায়ের ভৃত্য মিশ্রকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া বলিল, "এখন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।" মিশ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এখন কি করিতেছেন?" ভৃত্য বলিল, "তিনি এখন দুইটি সুন্দরী যুবতীকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা করাইতেছেন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে আপনাকে এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।" ভৃত্যের কথা শুনিয়া মিশ্র সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন। এদিকে রামানন্দ রায় সেই দুই যুবতীকে সেব্যবুদ্ধিতে স্বহস্তে তৈলাদিমর্দ্দন, স্নান, বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান, নৃত্যগীতাদি

শিক্ষা ও প্রসাদ ভোজন করাইয়া মিশ্রের নিকট আগমন করিলেন। তিনি যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র কিন্তু বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত দেখা করাই প্রয়োজন।" রামানন্দও অধিক কিছু না বলিয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

পরদিন মিশ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দের নিকট যাওয়া হইয়াছিল কি?" মিশ্র বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া কোন কথা হয় নাই।" প্রভু পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন?" মিশ্র রামানন্দের ভৃত্যের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আপনাকে বিরক্ত বলিয়াই মনে করি, প্রকৃতির দর্শন দূরে থাকুক, প্রকৃতির নাম শুনিলেও আমার চিত্তে বিকার জন্মে; আর রামানন্দ সুন্দরী তরুণী দেবদাসীর অঙ্গ সকল দর্শন ও স্পর্শ করিয়াও নির্বিকার থাকেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। রামানন্দের রাগমার্গে ভজন, রাগমার্গের ভজনের অধিকার রামানন্দেরই আছে, অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। এই নিমিত্তই আমি রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া থাকি। তোমার যদি কৃষ্ণকথা শুনিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে পুনশ্চ রামানন্দের নিকট গমন করিয়া নিজের অভিলাষ জানাইবে।" প্রভুর আদেশে মিশ্র পুনর্ব্বার অবসরকালে রামানন্দের নিকট গমন করিলেন। রামানন্দ মিশ্রকে দেখিয়া প্রণতিপুরঃসর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিশ্র বলিলেন, "প্রভু আমাকে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" রামানন্দ শুনিয়া আনন্দ সহাকারে বলিলেন, "আমার নিতান্ত ভাগ্য যে, প্রভু আপনাকে আমার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইয়াছেন। কি কথা শুনিবেন, আজ্ঞা করুন।" মিশ্র বলিলেন, "আপনি বিদ্যানগরে প্রভুকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, আমার তাহাই শুনিবার অভিলাষ।" রামানন্দ শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতে বলিতে রসামৃতসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আপনি প্রশ্ন করিয়া আপনি সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয়প্রহর হইল, কথার শেষ হইল না। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই প্রেমাবেশে দিবসের অবসান জানিতে পারিলেন না। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বেলার অবসান জানাইলেন।

তখন রামরায় কথার বিরাম করিয়া মিশ্রকে বিদায় দিলেন। মিশ্র কৃতার্থ হইয়া গৃহে গিয়া স্নানভোজনাদি সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে প্রভুর চরণদর্শনানন্তর রামরায়ের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন।

বঙ্গীয় কবি।

ভগবান্ আচার্য্যের পরিচিত একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরীতে আসিয়া আচার্য্যের গৃহে বাসা করিলেন। তিনি একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উহা তিনি প্রথমে ভগবান্ আচার্য্যকে শুনাইলেন। অনেক বৈষ্ণবও প্রভুর চরিত্রসম্বন্ধীয় উক্ত নাটকখানি শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া সকলেই নাটকখানির প্রশংসা করিলেন। পরে সকলেই ঐ নাটকখানি প্রভুকে শুনাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভুর একটি নিয়ম ছিল, কেহ কোন গ্রন্থ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা করিলে, উহা প্রথমে স্বরূপ গোসাঁইকে শুনাইতেন। স্বরূপ গোসাঁই শুনিয়া অনুমোদন করিলে, তবে উহা প্রভুকে শুনান হইত। তদনুসারে ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ গোসাঁইকে উক্ত নাটকখানি শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই, পাছে রসাভাস শুনিতে হয়, এই ভয়ে প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন। পরে আচার্য্যের বিশেষ অনুরোধে শ্রবণ করাই স্থির হইল। এক-দিন কয়েকজন ভক্তের সহিত স্বরূপগোসাই নাটকখানি শুনিতে বসিলেন। গ্রন্থকার স্বয়ং পাঠ করিতে লাগিলেন,—

> "বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
> কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
> প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
> স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥"

শ্লোক শুনিয়াই ভক্তগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "শ্লোকটির ব্যখ্যা কর।" গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিলেন,—

যিনি স্বভাবজড় এই অশেষ বিশ্বের চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত বিকসিতকমল-নয়ন শ্রীজগন্নাথের দেহে আত্মস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কনককান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল করুন।

ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরূপ গোসাঁই ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আরে মূর্খ, তোমার কি জগন্নাথ, কি মহাপ্রভু, এই দুইয়ের কাহাতেও বিশ্বাস নাই? পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ

জগন্নাথদেবকে জড় বলিলে এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও জীব বলিলে! আরও এক কথা, পরমেশ্বরে দেহদেহিভেদ করিলে! এই সকল অপরাধে তোমার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবিনী।" যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শ্লোকটির প্রশংসা করিতেছিলেন, তাঁহারা এখন স্বরূপ গোসাঁইর কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। গ্রন্থকর্ত্তারও লজ্জায় ও ভয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন স্বরূপ গোসাঁই পুনশ্চ বলিলেন, "আর তোমার নাটক শুনাইতে হইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রীকৃষ্ণচরিত্র হইতেও গূঢ়, তুমি তাহার কি বর্ণনা করিবে? অগ্রে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত বুঝ, পরে প্রভুর চরিত বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে। দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহা হইতে অভিন্ন। শ্রীজগন্নাথ স্থাবররূপে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ জঙ্গমরূপে আবির্ভূত। প্রকৃতিজড় সংসারের উদ্ধারার্থই ঈদৃশ অবতার। ভগবান্ স্থাবররূপে একস্থানে থাকিয়া এবং জঙ্গমরূপে ইতস্ততঃ গতায়াত করিয়া সংসারের উদ্ধারসাধন করিতেছেন। তুমি এক অভিপ্রায়ে শ্লোক রচনা করিয়াছ, সরস্বতী তোমার শ্লোকের অপর অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব তোমার এইরূপ বর্ণনার ভাগ্যকেও আমি প্রশংসা করি।" স্বরূপ গোসাঁইর কথা শুনিয়া গ্রন্থকার ভক্তগণের চরণে ধরিয়া দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভুর চরণোপান্তে উপস্থিত করিলেন। তিনি এইরূপে কৃতার্থ হইয়া প্রভুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন। •

রঘুনাথ দাসের নীলাচলে আগমন।

একদিন প্রভু স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ দূর হইতেই প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। মুকুন্দ দত্ত দেখিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ আসিয়াছে।" প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ আসিয়া প্রভুর চরণধারণ করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন। পরে রঘুনাথ একে একে সকল ভক্তের চরণবন্দন করিলেন। সকলেই রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণকৃপাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, রঘুনাথকে বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।" রঘুনাথ বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ জানি না, আপনিই আমাকে করুণা করিয়া উদ্ধার করিলেন।" প্রভু রঘুনাথকে নিতান্ত ক্ষীণ ও

মলিন দেখিয়া স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "আমি রঘুনাথকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে পুত্ররূপে বা ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর; আমাদিগের তিনজন রঘুনাথ, ইনি হইলেন স্বরূপের রঘুনাথ।" স্বরূপ গোসাঁই "প্রভুর যেমন আজ্ঞা" এই কথা বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন, "রঘুনাথের পথে অনেক কষ্ট হইয়াছে, কয়েকদিন ইহাকে বিশেষ যত্ন করিবে।" তদনন্তর রঘুনাথকে স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করিতে বলিয়া প্রভু মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপন করিতে উঠিয়া গেলেন। রঘুনাথ স্নানানন্তর জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর অবশেষ ভোজন করিলেন। পাঁচদিন এই প্রকারেই কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ দিবস রঘুনাথ পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া ভিক্ষার্থ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সমস্ত দিবস নামকীর্ত্তন করেন, এবং সন্ধ্যাকালে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া মাগিয়া খান। রঘুনন্দন তাহাই করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ প্রভুকে রঘুনাথের আচরণ বিদিত করিলেন। প্রভু শুনিয়া সানন্দে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা।
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

রঘুনাথ সমস্ত দিন নামকীর্ত্তন করেন, সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করেন, সম্মুখে কোন কথাই বলেন না। একদিন স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "আপনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কি কর্ত্তব্য?" স্বরূপ গোসাঁই প্রভুকে বলিলেন, "রঘুনাথ বলিতেছে, আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা আমি জানি না, প্রভু নিজমুখে আমাকে উহা উপদেশ করুন।" প্রভু বলিলেন, "আমি স্বরূপকেই তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিলাম। সাধ্যসাধন-

তত্ত্ব তুমি স্বরূপের নিকট হইতেই শিক্ষা করিবে। স্বরূপ যত জানে, আমি তত জানি না। তথাপি যদি আমার আজ্ঞা শুনিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, আমি সঙ্ক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি শুন।"

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥"

রঘুনাথ শুনিয়া প্রভুর চরণবন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনশ্চ স্বরূপের করে সমর্পণ করিলেন।

অতঃপর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। প্রভু পূর্ব্ববৎ রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনাথের চমৎকার বোধ হইল। রথের পর রঘুনাথ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলে, আচার্য্য প্রভু রঘুনাথকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। শিবানন্দ সেন বলিলেন, "রঘুনাথ, তোমার পিতা তোমার অনুসন্ধানার্থ দশজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। ঝাঁকরাতে আমাদিগের সহিত তাহাদিগের দেখা হয়। তাহারা আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকে না পাইয়া বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছে।"

অনন্তর গৌড়ের ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলে, রঘুনাথের পিতা রঘুনাথের সমাচার জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের বাটীতে একজন লোক পাঠাইলেন। ঐ লোক শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের পুরীতে অবস্থিতি ও প্রবল বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া গিয়া রঘুনাথের পিতাকে জানাইলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহার মাতা ও পিতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে তাঁহারা চারিশত মুদ্রার সহিত একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভৃত্যকে শিবানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। যাইবার সময় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা শিবানন্দের নিকট রঘুনাথের সমাচার লইয়া তদুদ্দেশে গমন করিবে।" তদনুসারে তাঁহারা শিবানন্দ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রঘুনাথের পিতার অভিপ্রায় জানাইলেন। শিবানন্দ শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন পুরীতে যাইতে পারিবে না। আমি আবার যখন যাইব, তখন তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। সম্প্রতি তোমরা ফিরিয়া যাও।" তাঁহারা ফিরিয়া যাইয়া রঘুনাথের পিতাকে শিবানন্দের আদেশ শুনাইলেন। বর্ষান্তরে শিবানন্দ পুরীগমনকালে সেই চারিশত মুদ্রার সহিত ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদ্বয়কে সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া মুদ্রা

লইয়া রঘুনাথের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার আদেশ শুনাইলেন। রঘুনাথ শুনিয়াও উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা ঐ ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদ্বয় মুদ্রা লইয়া পুরীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাঁহাদিগের অনেক অনুরোধে উক্ত মুদ্রা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া মাসে দুইদিন প্রভুকে ভিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রঘুনাথের প্রতি-মাসে আটপণ কৌড়ি ব্যয় হইত। তিনি এইরূপে দুইবৎসর পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া শেষে তাহাও ত্যাগ করিলেন। রঘুনাথ প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করিলে, প্রভু স্বরূপ গোসাঁইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল কেন?" স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "বোধ হয়, বিষয়ীর অন্ন প্রভুকে দেওয়ায় তাহার মন প্রসন্ন হয় না।" প্রভু বলিলেন, "ভাল হইল, আমি রঘুনাথের উপরোধে নিমন্ত্রণ লইতাম, সে আপনা হইতে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল, আমিও তুষ্ট হইলাম। বিষয়ীর অন্ন খাইলে, মন মলিন হয়, মলিন মনে কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। এইরূপ নিমন্ত্রণে দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া থাকে।"

এই ঘটনার পর হইতেই রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা ত্যাগ করিয়া ছত্রে যাইয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত প্রভুর কর্ণগোচর হইল। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার; রঘুনাথ এই আচার ত্যাগ করিয়া ছত্রে ভিক্ষা দ্বারা যথালাভে উদরপূরণ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম।" শঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গুঞ্জামালা ও শিলা আনিয়া প্রভুকে দিয়াছিলেন। প্রভু ঐ মালা ও শিলা তিনবৎসর পর্য্যন্ত নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্যাচরণে প্রসন্ন হইয়া ঐ শিলা ও মালা রঘুনাথকে প্রদান করিলেন। উহা দিয়া প্রভু রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি এই শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ভাবিয়া আগ্রহ সহকারে সেবা কর। তুমি সাত্ত্বিক-ভাবে জল ও তুলসীমঞ্জরী দ্বারা এই শিলার সেবা করিলে, অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিবে।" রঘুনাথ তদবধি সানন্দে উক্ত শিলার পূজা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁই রঘুনাথকে উক্ত শিলার নিমিত্ত একখানি কাষ্ঠাসন, দুইখানি বস্ত্রখণ্ড ও একটি জলের কুঁজা প্রদান করিলেন। রঘুনাথ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানে শিলার পূজা করিতে লাগিলেন। একদিন স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "রঘুনাথ, আট কৌড়ির খাজাসন্দেশ দিয়া পূজা করিলেই ভাল হয়।" রঘুনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের অদ্ভুত বৈরাগ্য, ছিন্ন বসন

পরিধান, নীরস বস্তু ভোজন, সাড়ে সাতপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং চারিদণ্ডকালমাত্র আহারনিদ্রাদি। তিনি ক্রমে ছত্রে যাইয়া ভিক্ষাও ত্যাগ করিলেন। পসারীরা যে কিছু অবিক্রীত প্রসাদান্ন ফেলিয়া দেন, যাহা দুর্গন্ধ বশতঃ গরুতেও খায় না, তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া জলে ধুইয়া কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন স্বরূপ গোসাঁই রঘুনাথকে ঐ প্রকার ভোজন করিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে উহার কিঞ্চিৎ মাগিয়া ভোজন করিলেন। ভোজন করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রতিদিন এইরূপ অমৃত ভোজন কর, আমাদিগকে দাও না।" এই বিষয় আবার প্রভুও গোবিন্দের মুখে শুনিলেন। শুনিয়া একদিন প্রভু আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি না কি উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজন কর? তাহা তুমি আমাকে দাও না কেন?" এই কথা বলিয়া প্রভু স্বয়ং একগ্রাস তুলিয়া লইয়া ভোজন করিলেন। অপর গ্রাস লইতে ইচ্ছা করিলেন, স্বরূপ গোসাঁই "ইহা তোমার যোগ্য নয়" বলিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, লইতে দিলেন না। প্রভু বলিলেন, "প্রতিদিনই প্রসাদ ভোজন করি, কিন্তু এরূপ অমৃততুল্য প্রসাদ ত আর কখন পাই নাই।" রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া প্রভু বিশেষ সন্তোষলাভ করিলেন।

বল্লভভট্ট।

পুনর্ব্বার রথযাত্রা আসিল। গৌড়দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ আগমন করিলেন। এই সময়ে প্রয়াগ হইতে বল্লভভট্টও পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বল্লভভট্ট প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে ভাগবতবুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বল্লভভট্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"আমার বহুদিন হইতে আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা। আজ জগন্নাথের কৃপায় আমার ঐ অভিলাষ পূর্ণ হইল, আপনাকে দর্শন করিলাম। যিনি আপনার দর্শনলাভ করেন, তিনি নিতান্ত ভাগ্যবান্। আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবানের তুল্যই দেখিয়া থাকি। যিনি আপনাকে স্মরণ করেন, তিনি নিশ্চয় পবিত্র হয়েন। আপনার স্মরণেই যখন পবিত্র হওয়া যায়, তখন আপনার দর্শনে যে পবিত্র হইলাম, তাহা বলা বাহুল্য। কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনই কলিকালের ধর্ম্ম। কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। আপনি যখন ঐ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতেছেন, তখন আপনি অবশ্য

কৃষ্ণশক্তি ধারণ করেন। আপনি জগৎ ভরিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়াছেন। যিনি আপনাকে দর্শন করেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসমান হয়েন। কৃষ্ণ-শক্তি বিনা কি কখন এই প্রকার সম্ভব হয়? কৃষ্ণই একমাত্র প্রেমদাতা। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥"

"পঙ্কজনাভ নারায়ণের বহু বহু অবতারই আছেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলময় বটেন; কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কে আছেন, যিনি তরুলতাকেও প্রেম প্রদান করিতে পারেন?"

প্রভু শুনিয়া বলিলেন,—"আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, কৃষ্ণভক্তির কিছুই জানি না। অদ্বৈতাচার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সঙ্গেই আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম অদ্বৈতাচার্য্য। তাঁহার সদৃশী বৈষ্ণবতা আর কাহাতেও দেখি নাই। তাঁহার করুণায় ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। নিত্যানন্দ অবধূত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর, সদাই ভাবোন্মত্ত। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ষড়্‌দর্শনবেত্তা ও জগদ্‌গুরু। রামানন্দরায় কৃষ্ণভক্তিরসের খনি। তিনি রাগমার্গের মধুর ভক্ত। দামোদর স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস। তাঁহার প্রেম ব্রজদেবীর প্রেমের ন্যায় শুদ্ধ ও ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন। হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত। তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্‌ভিন্ন আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব ও মুরারি প্রভৃতি অপরাপর ভক্তগণ আছেন। তাঁহাদের সঙ্গের গুণেই আমি কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি।" বল্লভভট্ট আপনাকে ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই প্রভু ভঙ্গী করিয়া এই সকল কথা বলিলেন। ভট্ট শুনিয়া কিঞ্চিৎ নম্রভাবে বলিলেন, "এই সকল বৈষ্ণব কোন্ স্থানে থাকেন? আমার ইহাঁদিগকে দর্শন করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।" প্রভু বলিলেন, "ইহাঁরা প্রায়ই গৌড়দেশে অবস্থিতি করেন, কেহ কেহ উৎকলেও থাকেন। সম্প্রতি রথযাত্রা উপলক্ষে সকলেই এইস্থানে সমবেত হইয়াছেন। এইস্থানেই স্থানে স্থানে বাসা করিয়া আছেন। এইস্থানেই ইহাঁদিগের সহিত মিলন হইবে।" ভট্ট শুনিয়া সপরিকর প্রভুর নিমন্ত্রণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পরদিন প্রভু সপরিবারে বল্লভভট্টের বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু একে একে সকলের সহিত বল্লভ

ভট্টের মিলন করাইয়া দিলেন। বল্লভভট্ট বৈষ্ণবগণের অদ্ভুত তেজ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাগর্ব্ব কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা লাভ করিল। তিনি প্রভুর ভক্তগণের নিকট আপনাকে খদ্যোতের তুল্য দেখিতে লাগিলেন। পরে প্রচুর মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুকে সগণে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন।

অনন্তর রথের দিন প্রভু পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিলেন। বল্লভভট্ট প্রভুর অলৌকিক ভাবাবেশ, সৌন্দর্য্য, প্রভাব, নর্ত্তন ও কীর্ত্তনাদি সন্দর্শন করিয়া ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। অতঃপর একদিন প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আমি ভাগবতের একখানি টীকা প্রণয়ন করিতেছি, উহার কোন কোন স্থান প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা করি।" প্রভু বলিলেন, "আমি ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারি না; আমি ভাগবতার্থ শ্রবণে অনধিকারী; বসিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি, রাত্রিদিন নাম করিয়াও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিতে পারি না।" বল্লভভট্ট বলিলেন, "ঐ টীকাতে কৃষ্ণনামেরও অর্থব্যাখ্যা কিছু বিস্তৃতভাবেই করিয়াছি, আপনি তাহাই শ্রবণ করুন।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনামের অর্থ, শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন, উহার অপর কোন অর্থ জানিও না, মানিও না। কৃষ্ণনামের যদি অন্য কোন অর্থ থাকে, আমার তাহাতে অধিকার নাই।" এইরূপে প্রভু বল্লভভট্টকে উপেক্ষা করিলেন। ভট্ট কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া আর কেহই ভট্টের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভট্টের তাহাতে কিছু অপমান বোধ হইল। তিনি নিজের সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। শেষে নিজকৃত ব্যাখ্যান শুনাইবার নিমিত্ত স্বরূপ গোসাঁইর নিকট অনেক অনুনয়বিনয়ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁই উভয়সঙ্কটে পতিত হইলেন। ভট্টের অনুরোধ ছাড়াইতে পারেন না, প্রভুর ভক্তগণ পাছে কিছু বলেন ভাবিয়া উহা রক্ষা করিতেও পারেন না। ভট্ট প্রত্যহই প্রভুর নিকট আগমন করেন। প্রভুর ভক্তগণের সহিত বিচার করিতেও প্রয়াসী হন। কিন্তু বিচারের সুযোগ হয় না, তিনি যাহা বলেন, বলিবামাত্র তাহা অদ্বৈতাচার্য্য খণ্ডন করিয়া ফেলেন। শেষে একদিন তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন, "জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পুরুষ, পতিব্রতা নারী কখনই পতির নাম গ্রহণ করেন না, আপনারা কিন্তু যখন তখন কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম?" অদ্বৈতাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনার

সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মই বসিয়া রহিয়াছেন, উনিই ইহার উত্তর প্রদান করিবেন।" তখন প্রভু বলিলেন, "স্বামীর আজ্ঞাপালনই পতিব্রতার ধর্ম্ম; কৃষ্ণের আজ্ঞাতেই জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।" প্রভুর কথায় ভট্ট নির্ব্বাক্ হইলেন। শেষে আর একদিন ভট্ট সগর্ব্বে প্রভুকে বলিলেন, "শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার টীকার একস্থলের সহিত অন্যস্থলের একবাক্যতা হয় না। আমি ঐ সকল দোষ পরিহার পূর্ব্বক আর একখানি টীকা প্রণয়ন করিতেছি।" প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যিনি স্বামীকে মানেন না, তিনি বেশ্যার মধ্যেই গণ্য হয়েন।" ভট্ট লজ্জায় অধোবদন হইয়া উঠিয়া গেলেন। প্রভু ভট্টের অনুচিত গর্ব্বের শোধনের নিমিত্তই এইরূপ আচরণ করিলেন। এইবার প্রভুর উদ্দেশ্যও সফল হইল। ভট্ট বুঝিলেন, প্রভু তাঁহার শোধনের নিমিত্তই এইরূপ আচরণ করিলেন। প্রভু পূর্ব্বে তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন, অথচ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা ও অবমাননা করিতেছেন, ইহা তাঁহারই মঙ্গলের জন্য, তাঁহার অযথা বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত। প্রভু যেমন ইন্দ্রের মঙ্গলার্থই তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্তই তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন। ভট্ট যখন নিজের মঙ্গল হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তিনি যখন নিজের কল্যাণ স্পষ্ট বুঝিলেন, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সত্বর প্রভুর নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তুমি পরমভাগবত ও মহাপণ্ডিত, তোমাতে অনুচিত গর্ব্ব থাকা উচিত হয় না; শ্রীধরস্বামী জগদ্গুরু, তাঁহার অনুগ্রহেই শ্রীভাগবতের অর্থবোধ হইয়া থাকে; অতএব তাঁহাকে অমান্য না করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা কর, সকলেই তোমার ব্যাখ্যা সাদরে গ্রহণ করিবে। তুমি নিরভিমান হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, কৃষ্ণ অচিরেই তোমাকে কৃপা করিয়া চরণ দিবেন।" বল্লভভট্ট বালগোপালমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, কিশোরগোপালের ভজন করিবেন। তিনি প্রভুকে অপর একদিন সগণে ভিক্ষা করাইয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোরগোপালের মন্ত্র গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। বল্লভ ভট্ট প্রভুর আদেশ লাভ করিয়া গদাধর পণ্ডিতের নিকট গমন পূর্ব্বক দীক্ষিত ও কৃতার্থ হইলেন।

রামচন্দ্রপুরী।

একদিন প্রভু পরমানন্দপুরীর সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রামচন্দ্রপুরী আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান ও তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। তিনিও প্রভুকে আলিঙ্গন দিয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত আসিয়া রামচন্দ্রপুরীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রসাদ আনাইয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইলেন। রামচন্দ্রপুরী ভোজনানন্তর স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া জগদানন্দকে আপনার ভুক্তাবশেষ সমস্তই ভোজন করাইলেন। জগদানন্দের ভোজন সমাধা হইলে, পুরীগোসাঁই তাঁহাকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তোমার স্বভাব আমি বড় ভাল দেখিতেছি না, তুমি আমাকে অনুরোধ করিয়া প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়াছ, সন্ন্যাসী যদি এরূপ প্রচুর পরিমাণে ভোজন করে, তবে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; তারপর, তুমি নিজেও প্রচুরপরিমাণেই ভোজন করিলে, এত অধিক ভোজন করা ভাল নয়, অধিক ভোজনে দারিদ্র্য ঘটে।" জগদানন্দ শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। রামচন্দ্র পুরী বিশ্বনিন্দুক ও মহাদাম্ভিক। তিনি অন্যের নিকট দাম্ভিকতা প্রকাশ করিবেন সে বড় বিচিত্র নয়, গুরুর নিকটই দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্তর্ধান সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রাণপণে গুরুসেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে রামচন্দ্রপুরী গিয়া মাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন, "মৃত্যুকালে মথুরা পাইনু না বলিয়া কাঁদিতেছেন কেন? আপনি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, আপনাকেই স্মরণ করুন, চিদ্‌ব্রহ্মের আবার রোদন কেন?" রামচন্দ্র পুরীর কথা শুনিয়া শ্রীপাদ মাধবচন্দ্রপুরী বিশেষ দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠ, তুমি আমার সম্মুখ হইতে বিদায় হও, কোথায় আমি কৃষ্ণকৃপা পাইনু না বলিয়া কাঁদিতেছি, আর তুমি কি না সেই সময়ে আসিয়া আমাকে অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছ।" অনন্তর পুরীগোসাঁই নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

এইরূপ যাঁহার প্রকৃতি, তিনি যে স্বয়ং ভোজন করিয়া এবং অপরকে ভোজন করাইয়া শেষে নিন্দা করিবেন, তাহা বড় অধিক কথা নয়।

রামচন্দ্রপুরী প্রভুর নিকট থাকিয়া সতত প্রভুর ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রভুর নিমন্ত্রণকারীর চারিপণ কৌড়ি ব্যয় হয়। ঐ চারিপণ কৌড়ির দ্রব্য প্রভু, তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এই তিনজনে মিলিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। সুতরাং রামচন্দ্রপুরী প্রভুর অত্যাহাররূপ ছিদ্র পাইলেন না। শেষে একদিন তিনি প্রভুর বাসায় পিপীলিকার সঞ্চার দেখিয়া, প্রভু গোপনে মিষ্টান্ন ভোজন করেন, এইরূপ অনুমান করিয়া, লোকের নিকট প্রভুকে মিষ্টান্নভোজী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে প্রভুর ভক্তগণের নিকটও বলিতে আরম্ভ করিলেন, যে, "সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করিলে কি তাহার ইন্দ্রিয়বারণ হইতে পারে!" এই কথা লোক-পরম্পরায় প্রভুর কাণে উঠিল। প্রভু শুনিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইয়া নিজভৃত্য গোবিন্দকে বলিলেন,—

"আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥"

গোবিন্দ ভক্তগণের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইলেন। শুনিয়া ভক্তগণের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইল। সকলেই রামচন্দ্রপুরীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক বিপ্র আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "এক চৌঠির অন্ন ও পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন আনয়ন করুন; তদ্ভিন্ন প্রভু আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না।" গোবিন্দের কথা শুনিয়া সেই নিমন্ত্রণকারী বিপ্র মস্তকে করাঘাত সহকারে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পরে গোবিন্দের কথানুরূপ কার্য্য করিলেন। প্রভু আনীত প্রসাদের অর্দ্ধাংশমাত্র ভোজন করিয়া অপরার্দ্ধ গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের জন্য রাখিয়া দিলেন। ভক্তগণ দুঃখে অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরী শুনিয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তোমাকে অতিশয় ক্ষীণকলেবর দেখিতেছি, শুনিলাম, তুমি না কি অর্দ্ধাশন করিতেছ, ঈদৃশ শুষ্কবৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিয়া কোনরূপে উদরভরণ করিবেন। এইরূপ করিলেই জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।" গীতাতেই উক্ত হইয়াছে,—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

প্রভু বলিলেন, "আপনি গুরু, আমি শিষ্য; আমার পরম ভাগ্য, আপনি উপযাচক হইয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।" প্রভুর কথা শুনিয়া

রামচন্দ্রপুরী চলিয়া গেলেন। কয়েকদিন থাকিয়া পুরীগোসাঁই তীর্থপর্য্যটনে গমন করিলেন। ভক্তগণ আপনাদিগের জীবন পাইলেন।

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণের বিরহতরঙ্গ। দেহ ও মন সদাই নানাভাবে আকুলিত। দিবাভাগে নৃত্য কীর্ত্তন ও জগন্নাথ দর্শন করেন, রাত্রিতে স্বরূপ গোসাঁই ও রামানন্দের সহিত নিভৃতে বসিয়া রসাস্বাদন করেন। তাঁহাকে যে দেখে, সেই প্রেমে ভাসিতে থাকে।

গোপীনাথ পট্টনায়ক।

একদিন অকস্মাৎ একজন লোক আসিয়া প্রভুকে বলিল, "প্রভো, রাজার আদেশে গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণদণ্ড হইতেছে, আপনি রক্ষা না করিলে তাঁহার রক্ষা হয় না। রায় ভবানন্দ সবংশে আপনার সেবক, তাঁর পুত্রের জীবন-রক্ষা আপনার উচিত হইতেছে।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "রাজা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন কেন?" আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, "গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার কর্ম্মচারী, রাজধন অপচয় করিয়াছেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া রাজার অনেক অর্থ বাকী ফেলিয়াছেন, রাজা ঐ অর্থ প্রার্থনা করায় ক্রমে ক্রমে আদায় দিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নিজের কয়েকটি ঘোটক বিক্রয় করিয়া ঐ বাকী অর্থ হইতে অংশতঃ আদায় দিতে চাহেন, রাজাও তাহাতেই সম্মত হইয়া ঘোটকের মূল্য অবধারণ করিবার নিমিত্ত নিজের এক পুত্রকে প্রেরণ করেন। তিনি ঘোটকের উচিত মূল্য হইতে কিছু কম মূল্য অবধারণ করেন। রাজপুত্রের স্বভাব, তিনি প্রায়ই ঘাড় ফিরান এবং ঊর্দ্ধমুখে বার বার এদিক ওদিক তাকান। ঘোড়ার মূল্য কম করায় গোপীনাথ উপহাস করিয়া বলেন, 'আমার ঘোড়ার ত ঘাড় উচ্চ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি নয়, তবে কেন মূল্য এত কম করা হইয়াছে?' রাজপুত্র শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যান এবং রাজাকে জানাইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করান। তদনুসারে গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। বাকী রাজস্ব আদায় না দিলে, ঐরূপেই গোপীনাথের প্রাণদণ্ড করা হইবে। এখন প্রভুই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।" প্রভু বলিলেন, "রাজা গোপীনাথের নিকট বাকী আদায় করিবেন, আমি সন্ন্যাসী তাহার কি প্রতিবিধান করিব?" প্রভুর উপেক্ষা দেখিয়া স্বরূপ গোসাঁই প্রভৃতি প্রভুর

ভক্তগণ গোপীনাথের জীবনরক্ষার জন্য প্রভুর চরণে ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ধরিলে কি হইবে? তোমরা সকলে মিলিয়া প্রভু জগন্নাথকে ধর, তিনি সকলই করিতে না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ।"

এই সময়ে হরিচন্দন মহাপাত্র যাইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন, "রাজন্, গোপীনাথ আপনার ভৃত্য, প্রাণদণ্ডের অযোগ্য। তাহার নিকট রাজস্ব বাকী, প্রাণদণ্ড করিলে কি হইবে? সে ঘোড়া কয়েকটি দিতে চায়, উচিত মূল্যে লওয়া হউক, অবশিষ্ট রাজস্ব ক্রমে আদায় হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমারও তাহাই অভিপ্রায়, অর্থের জন্য প্রাণ লইব কেন? তুমি যাও, ঘোড়ার মূল্য করিয়া লও এবং গোপীনাথকে ছাড়িয়া দাও।" এখানে গোপীনাথ চাঙ্গে আরোপিত হইয়াও নির্ভয়ে একমনে কৃষ্ণনাম করিতেছিলেন। তিনি দুই হস্তে সংখ্যা করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজের অঙ্গে এক একটি অঙ্কপাত করিতেছিলেন, হরিচন্দন আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

গোপীনাথ প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন, প্রভু তাহা শুনিলেন। তিনি শুনিয়া কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "মিশ্র, আমি আলালনাথে যাইয়া থাকিব; নানা উপদ্রবে আমার বড়ই অশান্তি বোধ হইতেছে। ভবানন্দের গোষ্ঠী রাজকর্ম্ম করে, রাজার অর্থ লুটিয়া খায়, রাজা নিজের রাজস্ব আদায় করিতে চান, লাভের মধ্যে লোকে আমাকে বিরক্ত করে; অতএব আমি আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা করি না।" কাশীমিশ্র বলিলেন, "আপনি মনে ক্ষোভ করিবেন না। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার সহিত বিষয়ীর কি সম্বন্ধ আছে? আপনার সহিত আমাদিগের যদি কিছু সম্বন্ধ থাকে, সে কেবল পরমার্থ-সম্বন্ধ। তথাপি যদি কেহ বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়া আপনার নিকট আইসে, সে নিতান্ত মূঢ়। আপনার জন্য রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করিলেন, সনাতন বিষয় ত্যাগ করিলেন, রঘুনাথ বিষয় ত্যাগ করিলেন, আর আমরা কি আপনার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ করিব? যাহাকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছিল, সেই গোপীনাথেরও তাদৃশ অভিপ্রায় নয়। সেও আপনার সহিত বিষয়সম্বন্ধ করিতে চায় না। তবে তার দুঃখে দুঃখী হইয়া অপর কেহ আপনাকে তাহার কথা নিবেদন করিয়া থাকিবে। তাহাও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, আর যেন এরূপ কর্ম্ম না হয়। যাঁহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইবে, আপনি স্বয়ংই তাহাকে এইবারের মত রক্ষা করিবেন। ইহার জন্য আপনাকে আলালনাথে যাইতে হইবে না।"

কাশীমিশ্র এই বিষয় রাজা প্রতাপরুদ্রকেও কথাপ্রসঙ্গে শুনাইলেন। প্রতাপরুদ্র শুনিয়া বলিলেন, "ইহার জন্য প্রভু কেন পুরী ত্যাগ করিবেন? ভবানন্দ আমার প্রিয়। তাহার পুত্রেরাও আমার অনুগত। আমি গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইতে আদেশ করি নাই। গোপীনাথ বড়জানাকে উপহাস করিয়াছিল বলিয়া বড়জানা তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই চাঙ্গে চড়াইয়াছিল, প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত নহে।" রাজা প্রতাপরুদ্র এই কথা বলিয়া গোপীনাথের নিকট প্রাপ্য অর্থ সমস্তই ছাড়িয়া দিলেন এবং গোপীনাথের বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। সকলে শুনিয়া ভক্তের প্রতি প্রভুর পরোক্ষে কৃপা বুঝিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

প্রভু লোকমুখে গোপীনাথের প্রতি রাজার প্রসাদ শ্রবণ করিয়া, অন্তরে আনন্দিত হইলেন, এবং কাশীমিশ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মিশ্র, তুমি আমাকে রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করাইলে?" কাশীমিশ্র প্রণতি পুরঃসর বলিলেন, "আপনি কেন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন? রাজা স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বকই এইরূপ করিয়াছেন। আরও তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, প্রভু যেন মনে না করেন, আমি মহাপ্রভুর অনুরোধ বশতঃ গোপীনাথ পট্টনায়ককে ঋণ হইতে মুক্ত করিলাম, আমি ভবানন্দের প্রতি আমার যে ভালবাসা আছে তৎপ্রযুক্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই এইরূপ করিলাম।"

অতঃপর রায় ভবানন্দ পঞ্চপুত্রের সহিত প্রভুর নিকট আসিয়া চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আপনি গোপীনাথকে বিপদে রক্ষা করিলেন সত্য, কিন্তু রামানন্দকে ও বাণীনাথকে যেমন নির্বিষয় করিয়াছেন, সেইরূপ না করিলে প্রকৃত কৃপা করা হইল না, ইহা কৃপার আভাসমাত্র। আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ শুদ্ধ কৃপা করুন, যাহাতে আমরা নির্বিষয় হইতে পারি।" প্রভু বলিলেন, "তোমরা যদি সকলেই সন্ন্যাসী হইবে, তবে তোমাদিগের কুটুম্ব সকলের ভরণপোষণাদি কে করিবে? তোমরা বিষয়েই থাক বা বৈরাগ্যই কর, আমার জন্মজন্মান্তরের দাস থাকিবে। কিন্তু একটি কথা, রাজার মূলধন রাজাকে দিয়া লভ্যমাত্র ভোগ কর, এবং ঐ প্রাপ্ত ধন ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় কর, অসদ্ব্যয় করিও না; রাজদ্রব্যের অপচয় করিও না; কারণ, রাজদ্রব্যের অপচয় করা

প্রভুর ভৃত্য ও ভক্ত।

বৎসর অতীত হইল। পুনর্ব্বার রথযাত্রা আসিল। প্রভু যদিও নিত্যানন্দকে গৌড়েই থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সেই আদেশ না মানিয়াই প্রভুর চরণদর্শনলালসে প্রতিবৎসরই রথযাত্রার সময় আসিয়া থাকেন। তিনি এই বৎসরও অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত যাত্রা করিলেন। প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর জন্য তাঁহার প্রিয় খাদ্যদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা পুরীতে আসিয়া ঐ সকল দ্রব্য গোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গোবিন্দ উহা প্রভুর ভোজনের সময় দিবেন বলিয়া ভোজনগৃহের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। ঐ দিন জগন্নাথ নরেন্দ্র সরোবরে নৌকারোহণে জলবিহার করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথের জলবিহার দর্শনের পর কিছুক্ষণ নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিলেন। পরে আপনারাও জলক্রীড়া করিয়া বাসায় আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ভক্তগণকে লইয়া জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত ক্ষেত্রবাসী প্রভুর সেই কীর্ত্তন দর্শনার্থ আগমন করিলেন। রাজপরিবারগণ অট্টালিকার ছাদোপরি আরোহণ করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন। স্বরূপগোসাঁই প্রভুর আদেশানুসারে "জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ"—হে জগন্মোহন, তোমার নির্ম্মঞ্ছন যাই—এই উড়িয়াপদ গাইতে লাগিলেন। লোক সকল চারিদিক হইতে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের কোলাহলে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। প্রভু বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এইরূপ কীর্ত্তন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনীয়াগণকে শ্রান্ত দেখিয়া প্রভুকে জানাইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন। প্রভু সগণে সমুদ্রে স্নান করিয়া প্রসাদ পাইয়া গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে আসিয়া প্রভুকে দ্বার জুড়িয়া শয়ান দেখিলেন। তিনি প্রতিদিন ভোজনের পর প্রভু শয়ন করিলে কিছুক্ষণ তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়া পরে নিজে ভোজন করিয়া থাকেন। আজ প্রভুকে দ্বারদেশে শয়ান দেখিয়া কিরূপে গৃহে যাইয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। প্রভু উত্তর করিলেন, "আমার অত্যন্ত শ্রম বোধ হইয়াছে, নড়িতে পারিতেছি না।" তখন গোবিন্দ সেবার বাধ হয় দেখিয়া অগত্যা প্রভুর একখানি বহির্ব্বাস লইয়া প্রভুর চরণোপরি আচ্ছাদন দিয়া ঐ চরণ লঙ্ঘন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশানন্তর প্রভুর পাদসম্বাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু নিদ্রা গেলেন। দণ্ড দুই কাল এইভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রভু দেখিলেন, গোবিন্দ তখনও তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেছেন, ভোজন করিতে যান নাই। তদ্দর্শনে প্রভু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "অদিরসা, এখনও প্রসাদ পাইতে যাও নাই?" গোবিন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু দ্বার জুড়িয়া শুইয়া আছেন, যাইতে পথ পাই নাই।" প্রভু বলিলেন, "আসিতে পথ পাইয়াছিলে ত?" গোবিন্দ শুনিয়া নিরুত্তর, ভাবিলেন, আসিবার সময় সেবার বাধ হয় বলিয়া আসিয়াছিলাম, যাইবার সময় নিজের ভোজনের নিমিত্ত প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হইতে পারি না। ভক্তের ইহাও এক অপূর্ব্ব লীলা, প্রভুর সেবার জন্য অপরাধ ভাবেন না, নিজের কার্য্যের জন্য অপরাধের ভয় করিয়া থাকেন। প্রভু গোবিন্দের মনের ভাব বুঝিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতে গেলেন।

অনন্তর প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণকে লইয়া গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন, বনভোজন, রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তন, হেরাপঞ্চমী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতির যাত্রা দর্শন করিলেন। ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম মিষ্টান্ন প্রসাদ আনিয়া প্রভুর জন্য গোবিন্দের হস্তে প্রদান করেন; গোবিন্দও প্রভুর ভোজনের সময় 'অমুক ভক্ত অমুক দ্রব্য দিয়াছেন' বলিয়া প্রভুকে নিবেদন করেন; প্রভু গ্রহণ করেন না, কেবল বলেন, 'রাখিয়া দাও।' এইরূপে মিষ্টান্ন রাখিতে রাখিতে ঘর ভরিয়া গেল। একদিন গোবিন্দ প্রভুর ভোজনকালে বলিলেন, "ভক্তগণের মধ্যে যিনি যাহা আনিয়া দেন, আপনাকে নিবেদন করি, আপনি গ্রহণ করেন না, রাখিয়া দিতেই বলেন; রাখিতে রাখিতে ঘর ভরিয়া গেল। ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভুকে 'অমুক বস্তু দিয়াছিলে?' আমি তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না। সময়ে সময়ে মিথ্যা কথাও বলিতে হয়। প্রভু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গীকার করিলে আর আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে হয় না।" প্রভু শুনিয়া ঈষৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আন, কে কি দিয়াছে আন।" গোবিন্দ একে একে যতদূর মনে হইল নাম করিয়া করিয়া প্রভুকে দিতে লাগিলেন। প্রভুও দণ্ডের মধ্যে শতজনের ভক্ষ্যদ্রব্য খাইয়া ফেলিলেন। মিষ্টান্ন-ভোজন শেষ হইলে, প্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু আছে?" গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘব পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে ঝালি ভরিয়া যাহা আনিয়াছিলেন, তাহাই আছে।" প্রভু শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "উহা আজ থাক,

পরে দেখা যাইবে।" অপর একদিন প্রভু ভোজনে বসিলেন; স্বরূপ গোসাঁই ঐ রাঘব পণ্ডিতের ঝালি হইতে কিছু কিছু লইয়া প্রভুকে পরিবেশন করিলেন। প্রভু খাইয়া ঐ সকল দ্রব্যের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। স্বরূপগোসাঁই কোন কোন দিন রাত্রিকালেও রাঘবের ঝালি হইতে কোন কোন দ্রব্য লইয়া প্রভুকে খাওয়াইলেন। চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুকে নিজ নিজ বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া ইচ্ছামত ভোজন করাইতে লাগিলেন। একদিন শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া দধি ও অন্ন ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে বাসায় যাইবার সময় প্রভু শিবানন্দকে বলিলেন, "তোমার এই দ্বিতীয় পুত্রটির নাম কি?" শিবানন্দ বলিলেন, "রামদাস।" প্রভু আবার বলিলেন, "এবার তোমার যে পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম হইবে হরিদাস।" শিবানন্দের পত্নী গর্ব্ভিণী ছিলেন। প্রভু তদুদ্দেশেই ঐ কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। চতুর্ম্মাস্য অতীত হইলে, গৌড়ের ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু উড়িষ্যার ভক্তগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের নির্ব্বাণ।

একদিন গোবিন্দ প্রসাদ দিতে যাইয়া দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং তদবস্থাতেই মন্দ মন্দ নামকীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "আজ আমার নামের সংখ্যা পূরণ হয় নাই, প্রসাদ পাইব না, কণামাত্র দাও গ্রহণ করি।" এই বলিয়া তিনি আনীত প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, তোমার অসুখ হইয়াছিল, কেমন আছ?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, "আমার শরীর অসুস্থ নয়, কিন্তু মন অসুস্থ হইয়াছে, নামের সংখ্যা পূরণ করিতে পারিতেছি না।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, সংখ্যা কমাইয়া দাও।" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, আমি অতি হীন পামর, তুমি আমাকে অঙ্গীকার করিয়া নরক হইতে বৈকুণ্ঠে উঠাইলে, ম্লেচ্ছকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করাইলে। তুমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পার। এখন আমার একটি বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তোমার চরণকমল দেখিতে দেখিতে তোমার নাম লইতে লইতে দেহত্যাগ করি,

এইমাত্র নিবেদন।" প্রভু বলিলেন, "তোমার আবার দেহত্যাগ কি? তোমার দেহ সিদ্ধদেহ; বিশেষতঃ তোমাদিগকে লইয়াই আমার সকল; তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা উচিত হয় না।" হরিদাস ঠাকুর বলিলেন, "প্রভো, তোমার চরণে আমার এইমাত্র নিবেদন, আর ছলনা করিও না। তুমি সত্বর লীলা সম্বরণ করিবে বোধ হইতেছে; অতএব অবশ্য আমার আশা পুরাইবে, কাল মধ্যাহ্নকালে আসিয়া এই অধমকে দর্শন দিবে।"

প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন দিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে চলিয়া গেলেন। পরদিন যথাসময়ে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া হরিদাস ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর অগ্রে প্রভুর চরণবন্দন করিয়া পরে সকল বৈষ্ণবের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, সমাচার কি বল?" হরিদাস ঠাকুর উত্তর করিলেন, "তোমার কৃপাই আমার সমাচার।" প্রভু অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস ঠাকুর প্রভুকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভীষ্মের ন্যায় দেহত্যাগ করিলেন। প্রভু হরিদাস ঠাকুরের দেহ ক্রোড়ে লইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বরূপ গোসাঁই প্রভুকে সাবধান করিলেন। পরে ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরের দেহ উঠাইয়া লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের দেহটি লইয়া বালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া সমাজ বেষ্টন পূর্ব্বক নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরিদাস ঠাকুরের দেহোপরি বালুকা চাপাইয়া তদুপরি একটি বেদী বাঁধাইলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের সমাজ দিয়া প্রভু ভক্ত-গণের সহিত সমুদ্রে স্নান করিলেন। স্নানানন্তর কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিংহদ্বারে আসিয়া প্রভু হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের নিমিত্ত অঞ্চল পাতিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পসারী সকল আনন্দে প্রচুর প্রসাদ আনয়ন করিলেন। স্বরূপ-গোসাঁই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া প্রভুকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি চারিজন মুটে করিয়া প্রচুর প্রসাদ লইয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর বাসায় আসিলেন। এদিকে বাণীনাথ এবং কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু বৈষ্ণবগণকে ভোজনে বসাইয়া স্বয়ং ঐ প্রসাদ পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "আপনি পুরী গোসাঁই ও ভারতী গোসাঁইকে লইয়া প্রসাদ অঙ্গীকার করুন; আপনি প্রসাদ না পাইলে, কেহই ভোজন করিবেন না;

আপনাকে পরিবেশন করিতে হইবে না, আমরাই পরিবেশন করিতেছি।" প্রভু অগত্যা ভোজন করিতে বসিলেন। স্বরূপ গোসাঁই ও কাশীশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিদাস ঠাকুরের বিজয়মহোৎসব সমাধা হইল।

রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ।

আবার রথযাত্রা আসিল। গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেন উড়িষ্যার পথের সন্ধান বিশেষ জানেন, সকলকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। একদিন একস্থানে যাত্রী সকলকে ঘাটিতে আটক করিয়া রাখিল। শিবানন্দ নিজে আটক থাকিয়া যাত্রীদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন। শিবানন্দের আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। নিত্যানন্দ প্রভু চটিতে পৌঁছিয়া বাসা না পাইয়া শিবানন্দকে অনেক গালাগালি করিতে লাগিলেন। পরে শিবানন্দ আসিলে, তাঁহার পত্নী নিত্যানন্দ প্রভুর গালাগালি শুনাইয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ পত্নীকে প্রবোধ দিয়া স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু বাসা না পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া গাছতলায় বসিয়া ছিলেন, শিবানন্দ আসিলেই তাঁহাকে চরণপ্রহার করিলেন। শিবানন্দ প্রভুর চরণপ্রহারে দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ বোধ করিয়া প্রভুকে বাসা দেওয়াইয়া তাঁহার সান্ত্বনা করিলেন। শিবানন্দের সঙ্গে শ্রীকান্ত নামে তাঁহার একটি অল্পবয়স্ক ভাগিনেয় ছিল। সে জানিত, শিবানন্দ মহাপ্রভুর ভক্ত। মহাপ্রভুর ভক্তকে নিত্যানন্দ প্রভু পাদপ্রহার করিলেন, তাহা তাহার সহ্য হইল না। শ্রীকান্ত ক্রোধে ও অভিমানে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী আসিয়া অগ্রে প্রভুর চরণ দর্শন করিল। তাহার গাত্রে একটি গাত্রাবরণ ছিল। সে ঐ গাত্রাবরণ উন্মোচন না করিয়াই প্রভুর চরণবন্দন করিল। প্রভুর ভক্তগণ তদ্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীকান্ত, গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া প্রভুর চরণ লও।" প্রভু বলিলেন, "শ্রীকান্ত পথে বড় দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, উহার যেমন মনে লয়, সেইরূপ করুক।" ভক্তগণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

অনন্তর শিবানন্দাদি গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া একে একে প্রভুর চরণবন্দন করিলেন। পরমেশ্বর নামে একজন মোদকবিক্রেতা নদীয়ায় প্রভুর বাটীর নিকটেই থাকিতেন। পরমেশ্বর প্রভুকে বাল্যাবস্থায় মোদক খাওয়াইতেন।

এবার সেই পরমেশ্বর ভক্তগণের সমভিব্যাহারে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরমেশ্বর আসিয়া প্রভুর চরণবন্দন করিলে, প্রভু তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমেশ্বর বলিলেন, "মুকুন্দার মাতাও আসিয়াছে," প্রভু শুনিয়াও কোন কথাই বলিলেন না।

জগদানন্দ।

প্রভু গৌড়ের ভক্তগণকে লইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অনেক আনন্দ করিলেন। এই যাত্রায় জগদানন্দ প্রভুর নিমিত্ত কিছু সুগন্ধি চন্দনাদি তৈল আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত তৈলের কলসটি গোবিন্দকে দিয়া বলিলেন, "এই তৈল প্রভুর মস্তকে দিবে; ইহা মস্তকে দিলে, বায়ু ও পিত্তের উপশম হইয়া থাকে।" গোবিন্দ উহা গ্রহণ করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই, উহা জগন্নাথকে দীপ জ্বালাইতে দিবে, তাহা হইলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ সে দিন আর কোন কথাই বলিলেন না। কয়েকদিন পরে আবার ঐ তৈলের কথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি লোকাপবাদেরও ভয় রাখ না? আমি সুগন্ধি তৈল মাখিয়া পথে বাহির হইলে, লোকে আমাকে কি বলিবে?" গোবিন্দ ভয়ে আর কোন কথাই বলিলেন না। পরদিন প্রভু স্বয়ংই জগদানন্দকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি গৌড় হইতে আমার নিমিত্ত সুগন্ধি তৈল আনিয়াছ, আমি কিন্তু উহা ব্যবহার করিতে পারিব না; উহা জগন্নাথকে দীপ জ্বালাইতে দাও।" জগদানন্দ শুনিয়া বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, কে তোমাকে বলিল?" এই কথা বলিয়াই তিনি তৈলের কলসটি গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং বাসায় যাইয়া অভিমানে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ অভিমানে অন্নপান ত্যাগ করিলেন। এই ভাবেই দুই দিবস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিবসে প্রভু স্বয়ং জগদানন্দের দ্বারে আসিয়া বাহির হইতেই বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ, উঠিয়া পাক কর, আজ আমি এই স্থানেই ভিক্ষা করিব।" জগদানন্দ অমনি উঠিয়া প্রভুর নিমিত্ত পাক করিলেন। প্রভু মধ্যাহ্নে আসিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। তিনি ভোজন করিতে করিতেই বলিলেন, "পণ্ডিত, ক্রোধাবেশের পাকের কি এইরূপ অমৃততুল্য আস্বাদ হয়?" জগদানন্দ কোন কথাই

বলিলেন না, প্রভুকে ইচ্ছামত ভোজন করাইতে লাগিলেন। ভোজনের পর প্রভু গোবিন্দকে আদেশ করিলেন, "গোবিন্দ, তুমি এইখানেই থাক, পণ্ডিত ভোজনে বসিলে, আমাকে ইহার সংবাদ জানাইবে।" গোবিন্দ বসিয়া রহিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি যাইয়া প্রভুর সেবা করিয়া আইস, ইত্যবসরে আমিও ভোজন করিতেছি।" গোবিন্দ প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে গমন করিলেন। প্রভু গোবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত কি ভোজন করিয়াছে?" গোবিন্দ বলিলেন, "না, তিনি এখনও ভোজন করেন নাই।" প্রভু বলিলেন, "তবে তুমি চলিয়া আসিলে কেন? আবার যাও, পণ্ডিত ভোজনে বসিল কি না দেখিয়া আইস।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, পণ্ডিত ভোজনে বসিয়াছেন। দেখিয়া প্রভুকে সমাচার দিলেন। প্রভু শুনিয়া নিরুদ্‌বেগ হইলেন। গোবিন্দ প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু নিদ্রিত হইলে, জগদানন্দের বাসায় গিয়া প্রসাদ পাইলেন।

বৈরাগ্যের কঠোরতায় প্রভুর শরীর দিন দিন অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। জগদানন্দ প্রভুকে সেই ক্ষীণ কলেবরে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া বিশেষ কষ্ট বোধ করিলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি তুলাভরা বালিশ প্রস্তুত করাইয়া প্রভুর উপাধানার্থ গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং স্বরূপ গোসাঁইকে বলিয়া দিলেন, প্রভুর শয়নকালে তুমি নিজে উহা তাঁহার মস্তকে দিবে।" স্বরূপ গোসাঁই তাহাই করিলেন। প্রভু দেখিয়া গোবিন্দকে বলিলেন, "উহা ফেলিয়া দাও।" পরে স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "তোমরা অতঃপর আমাকে খাটপালঙ্কে শয়ন করাইবে।" স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "তুমি বালিশ অঙ্গীকার না করিলে, জগদানন্দ দুঃখ পাইবেন।" প্রভু বলিলেন, "জগদানন্দ দুঃখ পাইবেন বলিয়া কি আমি সন্ন্যাসী হইয়া বিষয় ভোগ করিব?" স্বরূপ গোসাঁই আর কিছুই বলিলেন না, জগদানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া শুষ্ক কলাপাত কুচাইয়া তাহাই প্রভুর বহির্বাসে জড়াইয়া বালিশ করিয়া দিলেন। অনেক যত্নে প্রভু ঐ বালিশ অঙ্গীকার করিলেন। জগদানন্দ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, পুরীতে থাকিব না, শ্রীবৃন্দাবনে যাইব। শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই স্থির করিয়া প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "আমার প্রতি রাগ করিয়া বুঝি মথুরায় যাইয়া ভিখারী হইবে?" জগদানন্দ বলিলেন, "আমার অনেক দিন হইতেই শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের বাসনা হইয়াছে।"

প্রভু কিন্তু তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না। জগদানন্দ অনন্যোপায় হইয়া স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "তুমি অনুরোধ করিয়া আমার শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের বাসনাটি পূর্ণ কর।" স্বরূপ গোসাঁই অবসর বুঝিয়া প্রভুকে বলিলেন, "জগদানন্দের অনেকদিন হইল, শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আপনার আজ্ঞা না হওয়ায় যাইতে পারিতেছেন না। তিনি যেমন নদীয়ায় যাইয়া শচীমাতাকে দেখিয়া আসিলেন, তেমনি একবার বৃন্দাবনও দেখিয়া আসুন।" জগদানন্দ ফিরিয়া আসিবেন শুনিয়া প্রভুর অনুমতি হইল। প্রভু জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, বারাণসী পর্য্যন্ত নির্ভয়ে যাইবে। বারাণসী হইতে বাহির হইয়া দেশওয়ালী লোকের সঙ্গ লইবে, পথে চোরের ভয় আছে। মথুরায় যাইয়া সনাতনের সঙ্গেই থাকিবে। মথুরার স্বামীদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে, তাঁহাদের সঙ্গ করিবে না, তাঁহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার মিলিবে না। শ্রীবৃন্দাবনে অধিকদিন বাস করিবে না, সত্বর চলিয়া আসিবে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিবে না। আর সনাতনকে বলিবে, আমার জন্য স্থান ঠিক করিয়া রাখে, আমিও শীঘ্রই যাইতেছি।"

জগদানন্দ প্রভুর অনুমতি পাইয়া বনপথে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বারাণসী হইতে মথুরায় গমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী জগদানন্দ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া একে একে দ্বাদশ বন দর্শন করাইলেন। সনাতন গোস্বামী ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দের পাকের আয়োজন করিয়া স্বয়ং মাধুকরী করেন। একদিন জগদানন্দ সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ঐ দিন মুকুন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীকে একখানি বহির্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ বহির্বাসখানি মাথায় বাঁধিয়া জগদানন্দের বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। জগদানন্দ রাঙ্গা বস্ত্র দেখিয়াই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তিনি উহা প্রভুর প্রসাদ মনে করিয়া বলিলেন, "সনাতন, তুমি ঐ বস্ত্র কাহার কাছে পাইলে?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "মুকুন্দ সরস্বতীর নিকট।" জগদানন্দ রন্ধন করিতেছিলেন, উঠিয়া সনাতন গোস্বামীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। পরে যখন বোধ হইল, অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি, তখন কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সনাতন, তুমি প্রভুর একজন প্রধান ভক্ত হইয়া অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র ধারণ করিয়াছ?" সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র পরিধান করা উচিত নয়, আমি ইহা অন্য কাহাকেও দিব। যে কারণে ইহা ধারণ করিয়া-

ছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। তোমারই যথার্থ চৈতন্যনিষ্ঠা।" অনন্তর দুইজনে শ্রীচৈতন্যের বিরহে কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। জগদানন্দ দুইমাস শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া পুনশ্চ পুরীতেই আগমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী আসিবার সময় রাসস্থলীর ধূলি প্রভুকে ভেট দিয়াছিলেন। প্রভু উহা পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন।

প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ।

একদিন্ প্রভু যমেশ্বর টোটায় গমন করিতেছিলেন। পথপার্শ্বে কিয়দ্দূরে একটি দেবদাসী গুর্জ্জরী রাগ আলাপ করিয়া সুমধুর স্বরে একটি গীতগোবিন্দের পদ গান করিতেছিল। প্রভু দূর হইতেই ঐ গীত শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন। স্ত্রী কি পুরুষ গান করিতেছে সে বোধ রহিল না। আবেশে গানকারীর সহিত মিলিবার নিমিত্ত উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। শিজের কাঁটায় সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সঙ্গে গোবিন্দ ছিলেন। প্রভুকে দৌড়িতে দেখিয়া গোবিন্দও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। প্রভু গানকারিণীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "স্ত্রীলোক গান করিতেছে।" স্ত্রীলোক শুনিয়াই প্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তখনই ফিরিয়া পথে উঠিলেন। উঠিয়াই বলিলেন, "গোবিন্দ, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে। স্ত্রীস্পর্শ হইলে, নিশ্চয় আমার মরণ হইত। আমি তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।" গোবিন্দ বলিলেন, "জগন্নাথই রক্ষা করিলেন, আমি কোন্ ছার।" প্রভু বলিলেন, "তুমি নিরন্তর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে এইরূপ সতর্ক করিবে।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলেন। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণের মনে মহান্ ভয় জন্মিল।

রঘুনাথ ভট্ট।

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বারাণসী হইতে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে একজন ভৃত্য ছিল। পথে রামদাস বিশ্বাস নামক একজন কায়স্থের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। রামদাসও নীলাচলে যাইতেছিলেন। রামদাস শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ও ব্যাকরণাদি

শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও সংসারবিরক্ত ছিলেন, অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করিতেন। তিনি পথে রঘুনাথ ভট্টের অনেক সেবা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ ভট্ট তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে কিছু কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি তাহা শুনিতেন না। এইরূপে তাঁহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে পৌঁছিয়া প্রভুর বাসায় যাইয়া তাঁহার চরণদর্শন করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তপনমিশ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাকে একটি বাসা দেওয়াইলেন। রঘুনাথ ভট্ট নিত্য প্রভুর চরণ দর্শন করেন ও মধ্যে মধ্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং পাক করিয়া ভিক্ষা করান। এইরূপে আটমাস চলিয়া গেল। আটমাসের পর প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি দারপরিগ্রহ করিও না, বাটীতে যাইয়া বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা কর ও বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়ন কর। পুনর্ব্বার নীলাচলে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" এই কথা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অগত্যা রঘুনাথ ভট্ট প্রভুকে ছাড়িয়া গমনের ইচ্ছা না থাকিলেও কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপাদি ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর রঘুনাথ প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত মাতাপিতার সেবা করিলেন। চারি বৎসরের পর তাঁহারা কাশীধাম প্রাপ্ত হইলে, তিনি পুনর্ব্বার নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। এবারও পূর্ব্ববৎ আট-মাস থাকিয়া, প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। আট মাসের পর প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। রঘুনাথ প্রভুর আদেশানুসারে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর ও রূপ গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভুর প্রলাপ।

অতঃপর প্রভু রাধাভাবে পরমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপী-দিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার যে দশা হইয়াছিল, প্রভুরও দিন দিন সেই দশা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ভাবাবেশে নিতান্ত কাতর হইয়া নিরন্তর বিবিধ শ্লোক পাঠ সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বিলাপ নিম্নলিখিতপ্রকারে বর্ণিত হইয়া থাকে।

"প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি হরি র্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ ॥"

তদর্থ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী-বধে সাবধান্ ॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণ-ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে, নারি উকাশিতে ॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্যজন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥
কৃষ্ণকৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।

নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥"

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥"

"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কি বা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥
সখি হে, শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়িছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে ॥
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কি বা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ?
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥

পুনঃ কহে হায় হায়! শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥"

"কৈঅবরহিদং পেম্মং ন হি হোই মানুসে লোত্র।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥"

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীবয়॥
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হঞা।
আপন হৃদয়কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা॥"

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

"দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহো মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনিসুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

শুদ্ধ-প্রেম-সুখ-সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায়॥
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"
"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"
"যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি আইলাঙ কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।

কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥"

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার-করুণা-সিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥"

"ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥"

"তোমার মাধুরীবল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥
মত্ত গজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।

প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥"

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশো র্মে ॥"

"উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন রীতি, মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥
ভুবনের নারীগণ, সদা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কে না করে মান ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতিবচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ দরশন ॥

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে, এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরীগুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥"

"মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥"

"কি বা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কি বা মনোনেত্রোৎসব, কি বা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥
চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"

প্রভু একদিন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, ত্রিভঙ্গসুন্দর, মুরলীবদন, পীতাম্বর, বনমালাধারী, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া রাসলীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে শ্রীরাধার সহিত নৃত্য করিতেছেন এবং অপরাপর গোপীগণ তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তদ্দর্শনে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম এই জ্ঞানে আবিষ্ট হইয়া রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে

জাগাইলেন। প্রভু জাগরিত হইয়া বাহ্যজ্ঞানের উদয়ে দুঃখিত হইলেন। অভ্যাস বশতঃ নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া যথাকালে জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তিনি পূর্ব্ববৎ গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। একটি উৎকলবাসিনী রমণী লোকের ভিড়ে জগন্নাথদর্শনে অসমর্থ হইয়া গরুড়ের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতসারে প্রভুর স্কন্ধে পা দিয়া দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দেখিতেছিল। গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ঐ রমণীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, উহাকে কিছু বলিও না, ও আপন ইচ্ছামত জগন্নাথ দর্শন করুক।" স্ত্রীলোকটি কিন্তু নিজের ঘোরতর অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রভু তদ্দর্শনে বলিলেন, "আহা! জগন্নাথ আমাকে তোমার মত আর্ত্তি দিলেন না।" প্রভু এতক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীবৃন্দাবনলীলাই দর্শন করিতেছিলেন। অতঃপর বোধ হইল, কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। তখন কিছু বিষণ্ণ হইয়া বাসায় আগমন করিলেন। বাসায় আসিয়া ভূতলে বসিয়া নখ দ্বারা ভূমিলেখনে প্রবৃত্ত হইলেন। নয়নের নীরে মৃত্তিকা কর্দ্দমময়ী হইতে লাগিল। দেহের স্বভাবে স্নানভোজনাদিও করিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল। স্বরূপ ও রামানন্দ আসিয়া মিলিলেন।

"প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ সোঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
স্বরূপ রায়ের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল, হইল চাপল ॥
শুন বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা-লাউ-থালি ধরি,
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥
চিন্তা-কাঁথা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন কায়,
হা হা কৃষ্ণ! প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগাদি দশা হাতে, লোভের ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥

ব্যাসশুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ-মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥
কৃষ্ণ গুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ,
যে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা' সবার গ্রাস-শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥
শূন্য-কুঞ্জ-মণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥"

প্রভু চিন্তা জাগর ও উদ্বেগাদি দশ দশায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় মধ্যে মধ্যে ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোসাঁই শ্লোকানুরূপ পদ সকল গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ-রাত্রি অতিবাহিত হইল। রামানন্দ প্রভুকে গম্ভীরার ভিতর শয়ন করাইয়া

গৃহে গমন করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই ও গোবিন্দ প্রভুর দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভু শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না, উচ্চ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে না পাইয়া স্বরূপ গোসাঁই কপাট খুলিয়া দেখিলেন, প্রভু ঘরের ভিতর নাই। প্রভুকে ঘরের ভিতর না দেখিয়া স্বরূপ গোসাঁই বিস্ময়ান্বিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন। পরে দীপ জ্বালিয়া দুই জনে প্রভুর অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে যাইয়া প্রভুকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রভুকে পাইয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইলেন। প্রভু পড়িয়া আছেন, সংজ্ঞা নাই। অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হওয়ায় শরীর পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। নয়ন উত্তান এবং মুখ দিয়া ফেণ ও লালা নির্গত হইতেছে। স্বরূপ গোসাঁই উচ্চ করিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পর প্রভুর সংজ্ঞা হইল, হরি বোল বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অঙ্গসন্ধি সকল সংলগ্ন হইলে, শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল। তখন প্রভু সিংহদ্বার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ গোসাঁইর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি এখানে কেন?" স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "প্রভু বাসায় চলুন, সেইখানেই বলিব।" এই কথার পর স্বরূপ গোসাঁই প্রভুকে বাসায় লইয়া আসিয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "আমার ত কিছুই স্মরণ হয় না। আমি চারিদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি। আবার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্হিত হইতেছেন।" এমন সময় জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। প্রভু স্নান করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীর দিয়া যাইতে যাইতে চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলেন। আবিষ্ট হইয়াই তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রভু বায়ুবেগে গমন করিতেছিলেন, গোবিন্দ পশ্চাতে থাকিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি প্রভুকে ধরিতে না পারিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইয়া স্বরূপ গোসাঁই প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ শব্দলক্ষ্যে দৌড়িয়া আসিলেন। এদিকে যাইতে যাইতে প্রভুর স্তম্ভ হইল, আর দৌড়িতে পারিলেন না। কদম্বকোরকের ন্যায় সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দ তখন প্রভুর নিকটে আসিয়া করোয়ার জল দ্বারা সিঞ্চন ও বহির্বাস দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বরূপাদি ভক্তগণও আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। উচ্চকীর্ত্তন ও জলসেচনাদি করিতে করিতে প্রভুর কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তখন তিনি স্বরূপ গোসাঁইর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি গোবর্দ্ধনের সমীপে যাইয়া দেখিলাম, কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তিনি গোচারণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনের উপর উঠিয়া বাঁশী বাজাইলেন। তাঁহার বাঁশীর শব্দ শুনিয়াই রাধা ঠাকুরাণী আগমন করিলেন। রাধা ঠাকুরাণীর সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব! দেখিতে দেখিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া গিরিকন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সখীগণ ফলফুল তুলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তোমরা যাইয়া আমাকে এখানে ধরিয়া আনিলে। আমাকে ধরিয়া আনিয়া বড়ই দুঃখ দিলে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা আমার আর দেখা হইল না।" এই কথা বলিয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় পুরী গোসাঁই ও ভারতী গোসাঁই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তখন প্রভু তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন। অনন্তর প্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এতদূর আগমন করিলেন কেন?" তাঁহারা বলিলেন, "তোমার নৃত্য দেখিতে আসিলাম।" প্রভু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া ভক্তগণের সহিত স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে লইয়া ভোজন করিলেন।

এইরূপ ভাবাবেশেই প্রভুর অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি কখন সম্পূর্ণ আবিষ্ট, কখন অর্দ্ধ বাহ্য ও কখন সম্পূর্ণ বাহ্য দশায় অবস্থান করেন। স্নান ভোজনাদি দেহের স্বভাবেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একদিন জগন্নাথকে দর্শন করিতে করিতে প্রভুর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াই জ্ঞান হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ যুগপৎ স্ফুরিত হইয়া প্রভুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভু সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময়ে জগন্নাথের উপলভোগ সরিল। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। প্রভু সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া বক্ষ্যমাণপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ্য অধর রস,
যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চ জন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পাঁচে পাঁচ দিকে ধায়॥
সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ।

মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে, হর পরধন ॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এক কালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এত দুঃখ সহনে না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহে ডুবায় আগে উঠি ধায় ॥
কৃষ্ণবচনমাধুরী, নানারসনর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগৎ-নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষঃ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥

এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায়॥”

একদিন মহাপ্রভু স্নান করিতে যাইয়া পথে এক পুষ্পের উদ্যান দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবোধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর আবেশভরে রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

“আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এ সব পুরুষজাতি কৃষ্ণসখার সমান॥
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীপ্রায়॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে॥
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥
কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইল নাহিক অন্যথা॥
রাধাপ্রিয়সখী মোরা নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ॥

রাধাঙ্গসঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত।
কৃষ্ণকুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত॥
কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা এহো বিরহিণী।
কি উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥
আগে দেখ বৃক্ষগণ পুষ্পফলভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥
কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হয় অন্যচিতে॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান।
কি বা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
কোটিমন্মথমথন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্রমন॥
সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥"

প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। এই সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া অনেক যত্নে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। প্রভু সংজ্ঞা পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপসহকারে বলিতে লাগিলেন,—"কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? এই দেখিলাম, আর কেন দেখি না?"

"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জনচিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥
কহ সখি, কি করি উপায়?

কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক পীতে না পাইল॥
পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যান।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যান॥"

"বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

"কৃষ্ণ জিনি পদ্ম-চাঁদ, পাতিয়াছে মুখফাঁদ,
তাহে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফাঁদে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগ-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তাঁ'সবার মনোবক্ষ,
হরি দাসী করিবারে দক্ষ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজযুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥
কৃষ্ণকরপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ॥"

অনন্তর প্রভু স্বরূপ গোসাঁইকে বলিলেন, "স্বরূপ, একটি গীত গাও।" স্বরূপ গোসাঁই গাইতে লাগিলেন,—

"রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।"

গান শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে নৃত্যারম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্য হইলে, রামরায় প্রভুকে বসাইয়া শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক স্নানার্থ সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। প্রভু স্নানানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন ও ভোজন করিলেন। ভোজন সমাধা হইলে, গোবিন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন।

প্রভুর যখন এইরূপ আবেশ চলিতেছে, সেই সময়েই আবার রথযাত্রা উপস্থিত হইল। তদুপলক্ষে গৌড় হইতে প্রভুর অনেক ভক্ত আগমন করিলেন। রঘুনাথ দাসের এক জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। ঐ কালিদাসও এবার আগমন করিলেন। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে ঈদৃশ বিশ্বাস যে তিনি জাত্যাদিবিচার না করিয়া সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। কোন নীচজাতীয় বৈষ্ণব তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট প্রদানে অসম্মত হইলে,

তিনি গোপনে যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করিয়া ছাড়িতেন না। মহাপ্রভু এই কালিদাসকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন। মহাপ্রভু কাহাকেও নিজপাদোদক প্রদান করিতেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কোন না কোন ছলে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া সিংহদ্বারের উত্তরদিকে পাদপ্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরে উঠিতেন। তিনি যেখানে পাদপ্রক্ষালন করিতেন, সেইখানে একটি গর্ত্ত ছিল; তাঁহার পাদ-প্রক্ষালন-জল ঐ গর্ত্তমধ্যে পতিত হইত, কেহই পাইতেন না। একদিন গোবিন্দ ঐ স্থানে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে কালিদাস আসিয়া হাত পাতিলেন। কালিদাস হাত পাতিয়া এক দুই করিয়া ক্রমে তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলেন। তিন অঞ্জলি পানের পর প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর এরূপ করিও না।" প্রভু পাদ-প্রক্ষালনানন্তর নৃসিংহদেবের স্তব পাঠ করিয়া মন্দিরে উঠিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। পরে বাসায় আসিয়া ভোজন করিলেন। কালিদাস প্রভুর অবশেষ পাইবার আশায় বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভু গোবিন্দ দ্বারা কালি-দাসকে ভুক্তাবশেষ দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

এই বৎসর শিবানন্দ পুরীদাস নামক কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনি একদিন পুরীদাসকে লইয়া প্রভুর চরণবন্দন করাইলেন। প্রভু পুরীদাসকে বলিলেন, "পুরীদাস, কৃষ্ণ বল।" পুরীদাস কিছুই বলিলেন না। শিবানন্দ পুরীদাসকে কৃষ্ণ বলাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু ফল হইল না, পুরীদাস নীরবই রহিলেন। তখন প্রভু বলিলেন, "আমি স্থাবরজঙ্গম সকলকেই কৃষ্ণনাম লওয়াইলাম, কিন্তু পুরীদাসকে কৃষ্ণনাম লওয়াইতে পারিলাম না।" স্বরূপ গোসাঁই শুনিয়া বলিলেন, "তুমি পুরীদাসকে স্বয়ং কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্র উপদেশ করিলে, পুরীদাস ঐ মহামন্ত্র পাইয়া মনে মনে জপ করিতেছে, ইহাই আমার অনুমান হয়।" প্রভু আর কিছুই বলিলেন না। ঐ দিন ঐ ভাবেই গেল। আর এক দিন শিবানন্দ পুরীদাসকে লইয়া আসিলেন। প্রভু পুরীদাসকে দেখিয়া বলিলেন, "পুরীদাস, শ্লোক পড়।" সপ্তম বৎসরের বালক, অধ্যয়ন নাই, কিন্তু পড়িতে লাগিলেন,—

> "শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
> বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥"

যিনি শ্রীবৃন্দাবনরমণীগণের শ্রবণযুগলের কুবলয় নয়নের অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের

ইন্দ্রনীলমণিময় হার প্রভৃতি অখিলভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীহরি অতিশয় জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্লোক শুনিয়া পুরীদাসের প্রতি প্রভুর কৃপা বুঝিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ অপার বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা দর্শন করিয়া গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা যতদিন ছিলেন, প্রভুর কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তিও হইত। তাঁহারা চলিয়া গেলে, প্রভু আবার সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইলেন। এই পূর্ণ আবিষ্ট অবস্থাতেই প্রভু একদিন জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন। সিংহদ্বারে যাইয়া দ্বাররক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ কোথায়?" দ্বাররক্ষক উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ এইস্থানেই অবস্থান করিতেছেন।" প্রভু তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "চল, আমাকে কৃষ্ণদর্শন করাও।" দ্বাররক্ষক প্রভুকে লইয়া গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন।" প্রভু নয়ন ভরিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় 'গোপালবল্লভ' নামক ভোগ লাগিল। ভোগ সরিলে, জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে মালা পরাইয়া হস্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "কিঞ্চিৎ আস্বাদন করুন।" প্রসাদ আস্বাদন দূরের কথা, গন্ধেই মন মোহিত হইয়া গেল। প্রভু এক কণিকামাত্র জিহ্বায় দিয়া সমস্তই গোবিন্দের অঞ্চলে প্রদান করিলেন। কণামাত্র প্রসাদ আস্বাদন করিয়াই প্রভু পুলকিত হইলেন। নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর সার্ব্বভৌম ও রামানন্দাদি ভক্তগণকে এবং পুরীগোসাঁই ও ভারতীগোসাঁইকে অবশিষ্ট প্রসাদ-গুলি কণিকা কণিকা করিয়া বাঁটিয়া দিলেন। প্রসাদের অলৌকিক মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া সকলেই প্রেমাবিষ্ট হইলেন। রামানন্দ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥"

"তনু মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরতলোভ,
হর্ষ আদি ভাব বিকাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর, শুন তোমার অধরচরিত।

মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায় ॥
সচেতন রহু দূরে, অচেতনে চেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অয়ে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম্ম ভয় ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু, করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥
অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া এই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগত-জন।
আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন ॥
নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তব দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠি খান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই ॥

অধরের এই রীত, আর শুনহ কুনীত,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণফেলা'॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কে বা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সেই জন তার লব পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাতে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যে বা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃতসার',
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥
এ তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান॥"

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু.মুমুচু স্তরবো যথার্য্যাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সেই সুধা অন্যলভ্য নয়॥
গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥
হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।

এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষ জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পি'তে তারে ডাকিয়া জাগায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুঝুটাধররস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥
এহো নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূল দ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এত অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥"

একদিন মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভুর যখন যে ভাবের উদয় হইতে লাগিল, স্বরূপ গোসাঁই তখন সেই ভাবের অনুরূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পদ সকল গান করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায়ও প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুও এক একটি শ্লোক পাঠ করিয়া তদর্থ দ্বারা প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া গমন করিলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়াও নিদ্রা না যাইয়া উচ্চস্বরে

কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হঠাৎ বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহের দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনি রহিল। প্রভু বাহির হইয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে যেখানে তেলেঙ্গা গাভি সকল থাকে, সেইখানে যাইয়াই অচেতন হইয়া পড়িলেন। এখানে গোবিন্দ প্রভুর সাড়াশব্দ না পাইয়া ঘরের কপাট খুলিয়া দেখিলেন, প্রভু ঘরে নাই। তখন তিনি স্বরূপ গোসাঁইকে ডাকিলেন। স্বরূপ গোসাঁই আসিয়া শুনিলেন, প্রভু ঘর হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। তখন তিনি দীপ জ্বালিয়া অপর কয়েকজন ভক্তের সহিত প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখা গেল, প্রভু সিংহদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে তেলেঙ্গা গাভিগণের নিকট সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছেন। হাত ও পা পেটের ভিতর প্রবেশ করায় আকারটি কূর্ম্মের ন্যায় দেখা যাইতেছে। মুখে ফেণ, অঙ্গে পুলক ও নেত্রে অশ্রুধার বহিতেছে। গাভি সকল প্রভুর অঙ্গ আঘ্রাণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ভক্তগণ গাভিগুলিকে সরাইয়া প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনের জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু চৈতন্যোদয় হইল না। তখন তাঁহারা প্রভুকে উঠাইয়া ঘরে আনিলেন। ঘরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভুর চৈতন্য হইল। চৈতন্য হইলেই শরীর পূর্ব্ববৎ হইল। প্রভু উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া স্বরূপ গোসাঁইর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, তুমি আমাকে কোথায় আনিলে? আমি বেণুর শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে বাঁশী বাজাইতেছিলেন। তাঁহার বাঁশীর শব্দ শুনিয়া শ্রীমতী রাধিকা আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। যাইতে যাইতে কুঞ্জমধ্যে গোপীগণের কণ্ঠধ্বনি ও ভূষণাদির শিঞ্জিত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শ্রবণ উল্লাসিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ তোমরা যাইয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে। আর সেই সকল শব্দ শুনা গেল না। উঃ! কৃষ্ণতৃষ্ণায় প্রাণ যায়, শ্লোক পাঠ কর।" স্বরূপ গোসাঁই পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

"হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের পরিহাসবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥
নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয়॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা দি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম হরি বেণুদ্বারে, হানি কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে মোরে করি রোষ, কহ পরিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড়হ এ সব কুটিনাটি॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃতসম মিঠা বোলে,
অমৃতসম ভূষণশিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন॥"
"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘনধ্বনি জিনি,
যার গানে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয়॥

কহ সখি, কি করি উপায়।
কৃষ্ণ রস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥
নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণধ্বনি চটক লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥
সেই শ্রীমুখভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিতকর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্মবিভূষিত॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥
যে বা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূলে হয় দাসী,
বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥
যে বা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলি শুনি,
কৃষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণাতরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায়॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাঁহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানাভাবের হইল মিলন॥

অবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সে অর্থ না জানে সব লোক॥"

"কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥"

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যে বা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায়॥
হা হা সখি, কি করি উপায়।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতিভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হবে মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥
কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।
চাহি যারে ছাড়াইতে, সেই শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে, যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে॥

ঔৎসুক্যের প্রাধান্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখ মনে করেন ভর্ৎসনে ॥
মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্যবদন, নেত্ররসায়ন,
কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাসনাগর ॥
কাঁহা গেলে তোমা পাও, তুমি কহ তাঁহা যাও,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লঞা ॥
ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দগীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥"

শরৎকালের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রভু প্রায়ই স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ ও প্রেমাবেশে নর্ত্তনকীর্ত্তন করিতেন। একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুর সন্নিকটে ছিলেন না, কিছু দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রভু একটি যুইফুলের বাগানের যেখানে ছিলেন, সেই স্থান হইতে সমুদ্র দর্শন করিলেন। চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল সাগরের নীলবর্ণ জল দেখিয়া প্রভুর যমুনা বলিয়া বোধ হইল। তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলেন। ঝাঁপ দিয়াই সংজ্ঞাহীন হইলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভুর সেই সংজ্ঞাহীন দেহযষ্টিকে কখন উন্মগ্ন ও কখন নিমগ্ন করিতে লাগিল। এদিকে স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে নির্দ্দিষ্টস্থানে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ অনেকানেক উদ্যান, গুণ্ডিচামন্দির ও চটক পর্ব্বত প্রভৃতি স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া শেষে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। সমুদ্রতীরেও প্রভুকে না পাইয়া প্রভু

অন্তর্ধান করিয়াছেন ইহাই মনে করিলেন। তাঁহারা প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, এক ধীবর জাল স্কন্ধে করিয়া নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। ধীবরের অলৌকিক চেষ্টা সকল দেখিয়া স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "ধীবর, তুমি তোমার পথে কোন মনুষ্যকে দেখিয়াছ কি?" ধীবর উত্তর করিল, "না, মানুষ দেখি নাই। আমি সমুদ্রে জাল ফেলিতেছিলাম, অকস্মাৎ একটি মৃত মানব আমার জালে পড়িল। আমি উহাকে মৎস্য অনুমান করিয়া জাল উঠাইলাম। জাল উঠাইয়া দেখিলাম, মৎস্য নয়, মৃতদেহ। তখন জাল হইতে মৃতদেহটি খসাইতে লাগিলাম। মৃতস্পর্শে আমার শরীরে ভূত প্রবেশ করিল। তদবধি শরীর মুহুর্মুহু কাঁপিতেছে, চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। আমরা রাত্রিতেই মৎস্য ধরিয়া বেড়াই। নৃসিংহ-স্মরণে আমাদিগের ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কিন্তু এই ভূতটা নৃসিংহ-স্মরণে আরও অধিক বল করিতেছে, তাই আমি ওঝার নিকট যাইতেছি। তোমরা ওদিকে যাইও না; আমি মৃতদেহটা ঐ দিকেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।" স্বরূপ গোসাঁই ধীবরের কথা শুনিয়া সমস্ত বুঝিলেন, এবং ধীবরকে বলিলেন, "ধীবর, তোমাকে আর ওঝার নিকট যাইতে হইবে না, আমিই তোমার আরোগ্য বিধান করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্রপাঠ সহকারে ধীবরকে তিনটি চড় মারিয়া নির্ভয় করিলেন। একে প্রভুর স্পর্শে প্রেমাবেশ হইয়াছে, তাহার উপর ভূতের ভয়, সুতরাং ধীবর অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিল, স্বরূপ গোসাঁইর কৌশলে ধীবর প্রকৃতিস্থ হইল। ধীবরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "ধীবর, তুমি যাঁহাকে ভূত মনে করিতেছ, তিনি ভূত নহেন, মহাপ্রভু। তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে, আমাদিগকে দেখাও।" ধীবর বলিল, "গোসাঁই, তিনি মহাপ্রভু নহেন, ভূতই; মহাপ্রভুকে আমি কতবারই দর্শন করিয়াছি; মহাপ্রভুর দেহ কি পাঁচ ছয় হাত?" স্বরূপ গোসাঁই শুনিয়া বলিলেন, "মহাপ্রভু প্রেমের বিকারে কখন কখন পাঁচ ছয় হাত হইয়া থাকেন।" তখন ধীবর আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গেল। তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন। শরীর জলে শাদা ও বালুকাময় হইয়াছে। তাঁহারা মহাপ্রভুকে আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করাইয়া শুষ্ক বসন পরিধান করাইলেন। পরে অঙ্গের বালুকা দূর করিয়া বহির্বাসের উপর শয়ন করাইয়া উচ্চস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে

তাঁহার চৈতন্য হইল, অন্তর্দ্দশার অপগমে অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইল। তখন প্রভু বলিতে লাগিলেন, "আমি কালিন্দীতীরে যাইয়া দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত জলবিহার করিতেছেন। একজন সখী আমাকে তাঁহা-দিগের সেই জলবিহাররঙ্গ দেখাইতে লাগিলেন। ঐ জলবিহাররঙ্গ যেরূপ দেখিলাম তাহা শ্রবণ কর।"

"পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখীকরে,
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলিরঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল-কর-পুষ্কর,
গোপীগণ-করিণীর সঙ্গে॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার।
কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ,
সে অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথম যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি,
তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি।
সহস্রকর জল সেকে, সহস্রনেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপদে নিকট গমনে।
সহস্রমুখে চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপীনর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥
কৃষ্ণ রাধা লয়ে বলে, গেলা কণ্ঠমগ্ন জলে,
ছাড়ি দিল যাঁহা অগাধ পানি।

তিঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন ॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
স্বহস্তে কেহ কাঁচুলি করিল ॥
কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জবন গেল লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥
হেথা কৃষ্ণ রাধাসনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ ॥
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণে করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দুঁহার রণ ॥

পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে পদ্ম লুঠে আসি,
কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রু মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল।
ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীজন॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুকবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বার মাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিল সকল॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
রত্নমন্দির পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে॥
এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানাভাতি
কলা কোলি বিবিধ প্রকার।

পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সন্তারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥
খরমুজ ক্ষীরণী তাল, কেশর পানিকল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোনো দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপুপী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ড ক্ষীরসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥
ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্যভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥”

বলিতে বলিতে প্রভুর সম্পূর্ণ বাহ্য হইল। প্রভু স্বরূপ গোসাঁইকে দেখিয়া সমুদ্রতীরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই নিবেদন করিলেন। পরে প্রভুকে স্নান করাইয়া বাসায় লইয়া গেলেন।

রথযাত্রার পর প্রভু গৌড়ের ভক্তগণের সহিত জগদানন্দকে নদীয়ায় জননীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জগদানন্দ শচীমাতার সমাচার লইয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন করিলেন। আসিবার সময় অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত জগদানন্দকে একটি প্রহেলিকা বলিয়াছিলেন। জগদানন্দ আসিয়া ঐ প্রহেলিকাটি প্রভুর নিকট যথাবৎ বলিলেন। প্রহেলিকাটি এই ;—

"বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কামে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল ॥"

প্রহেলিকা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্বরূপ গোসাঁই প্রভুকে প্রহেলিকার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আচার্য্য আগমশাস্ত্রোক্ত পূজার বিধি ভালরূপ জানেন। তিনি পূজার্থ দেবতার আবাহন করিয়া, পূজা সমাধা হইলে, পুনর্ব্বার দেবতাকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রহেলিকার গূঢ় অর্থ আমিও বুঝিলাম না।" ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ গোসাঁই বুঝিয়া বিমনা হইলেন। প্রভুর দিব্যোন্মাদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একরাত্রি প্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এইপ্রকার প্রলাপ করিতে লাগিলেন,—

"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধি র্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্ বিধিম্ ॥"

"ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
যার কান্ত্যমৃত পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়নচকোর ॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাও দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, কাঁহা শিখিপুচ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্রআঠা।
নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসমকান্তি,
সেই কান্তি জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গাররসসার ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না আনি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি এক ভাগবতের শ্লোক ॥"

"অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিয়ুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

"না জানিস্ প্রেমমর্ম্ম, বৃথা করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
আর হেন না করিস্ বিধান ॥
আরে বিধি, তো বড় নিঠুর।

অন্যোন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করায় সম্মিলন,
অকৃতার্থ কেনে করিস্ দূর॥
আরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্তস্থান,
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার॥
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেন কর রোষ,
ইঁহো যদি কহ দুরাচার।
তুই অক্রূর রূপ ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥
তোরে কি বা করি রোষ, আপনার কর্ম্মদোষ,
তোয় আমায় সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি, না চায় হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥
কৃষ্ণে কেন করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥
এইমত গৌর রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হা হা কৃষ্ণ, তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥”

এইপ্রকারে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইল। রামানন্দ প্রভুকে শয়ন করাইয়া গৃহে গমন করিলেন। স্বরূপ গোসাঁই গম্ভীরার দ্বারেই শুইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। স্বরূপ গোসাঁই গোবিন্দকে দীপ জ্বালিতে বলিলেন। দীপ জ্বালা হইলে, স্বরূপ গোসাঁই গৃহের ভিতর যাইয়া দেখিলেন, প্রভুর মুখের কয়েক স্থানে ক্ষত হইয়াছে, রক্ত নির্গত হইতেছে, প্রভু মাটিতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন। তখন তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া প্রভুকে পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। প্রভু সুস্থ হইলে, স্বরূপ গোসাঁই বলিলেন, "প্রভুর মুখে ক্ষত হইল কেন?" প্রভু বলিলেন, "নামকীর্ত্তন করিতে করিতে আমার মন কেমন আকুল হইয়া উঠিল, বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলাম, দ্বার অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না, তার পর কি হইয়াছে জানি না।" পরদিবস হইতে শঙ্কর পণ্ডিতকে প্রভুর পদতলে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা করা হইল। শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর চরণ নিজ বক্ষঃস্থলে ধরিয়া রাখেন। প্রভু আর অজ্ঞাতসারে শয্যাত্যাগ করিতে বা উঠিয়া বাহিরে যাইতে পারেন না। এই ভাবেই কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উদ্যানের প্রফুল্লিত তরুলতা সকল দেখিয়া এবং বিহঙ্গমগণের সুমধুর আলাপ শ্রবণ করিয়া প্রভুর ভাবাবেশ হইল। তিনি আবিষ্ট অবস্থাতেই স্বরূপ গোসাঁইকে গান করিতে বলিলেন। স্বরূপ গোসাঁই গাইতে লাগিলেন,—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥"

শ্রীগীতগোবিন্দ।

প্রভু গীত শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া অন্তর্ধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উদ্যান ভরিয়া গেল। প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্য লাভ করিয়া প্রলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চাচিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥"

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত।

"কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥
সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি লঞা যায় ॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে ॥
হেমকলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূর সঙ্গে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গ গন্ধ সঙ্গে,
মিলি যেন করে ডাকা চুরি ॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ॥
সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাঞা পিয়ে পেট ভরে, তবু পিঙো পিঙো করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥

এইমত গৌর হরি, মন কৈল গন্ধে চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় লতা-বৃক্ষ-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ-মাত্র পায়॥"

বাহ্য পাইয়া আবার স্বরূপ গোসাঁইকে গান করিতে বলিলেন। স্বরূপ গোসাঁই গাইতে লাগিলেন,—

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর-পরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥
উরসি মুরারে রুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিসলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥"

ক্রমে প্রাতঃকাল হইল। ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া বাসায় গেলেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক।

একদিন প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ ও রাম রায় শ্রবণ কর; কলিতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই পরম উপায়। কলিকালে যিনি সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের

আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

"নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

যাহা মানসমুকুরের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসাররূপ দাবানলের নিবারক, যাহা পরমশ্রেয়ঃসাধনস্বরূপ কুমুদকুলের সম্বন্ধে জ্যোৎস্নাসদৃশ, যাহা পরমবিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহার শ্রবণে সুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহা পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে, যাহা আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্নান করাইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে, সেই শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছেন।

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্ব-ভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার ঈদৃশী করুণা যে, তুমি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন বাঞ্ছা অনুসারে বহুনামের প্রচার করিয়াছ, আর ঐ সকল নামে তোমার নিজের

সকল শক্তিই নিহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার সেই সকল নামের স্মরণে কালনিয়মও কর নাই। সকল সময়েই নাম লইতে পারা যায়। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট যে, সেই নামে অনুরাগ জন্মিল না।

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হইতে নীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ হইয়া সদা শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিতে হইবে।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবের সম্মান দিবে জানি অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবিত্বশক্তিও প্রার্থনা করি না, কেবল জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করি।

"ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান ॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥"

হে নন্দনন্দন, আমি তোমার কিঙ্কর, বিষম ভবসাগরে নিমগ্ন; আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থ ধূলিকণার ন্যায় ভাবিয়া নিজদাস্যে অঙ্গীকার কর।

"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুন অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥"

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥"

প্রভো, কবে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, মুখে বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলককদম্বে বিভূষিত হইবে?

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি বেতন মোর দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিরহস্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥"

অপরঞ্চ পদ্যাবল্যাম্—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

হায় হায়! গোবিন্দবিরহে নিমেষকালও আমার পক্ষে যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে; নেত্র দিয়া বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি।

"দিবস না যায় কভে হৈল যুগ সম।
বর্ষামেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য দেখি ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈয়া করে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল অন্তর।
স্বাভাবিক প্রেম ভাব করিল উদয়॥
ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥
এত ভাবে শ্রীরাধার মন স্থির হৈল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তৈছে আপনি হইল॥"

অপরঞ্চ পদ্যাবল্যাম্—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চরণরতা কিঙ্করীই করুন, [illegible] নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই [illegible] তিনি স্বয়ং বহুনারীবল্লভ হইয়া যেখানে সেখানে যে কোন [illegible]র সহিত বিহারই করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ; অপর

যথা রাগ—

আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাত।
কি বা না দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কি বা অনুরাগ করে, কি বা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া।
কি বা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোর দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপেতে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভৎর্সনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।